Boighar.com

ইসাটাবুর অভিশাপ

বইঘর নিবেদন

কাজী আনোয়ার হোসেন
সহযোগী
সায়েম সোলায়মান

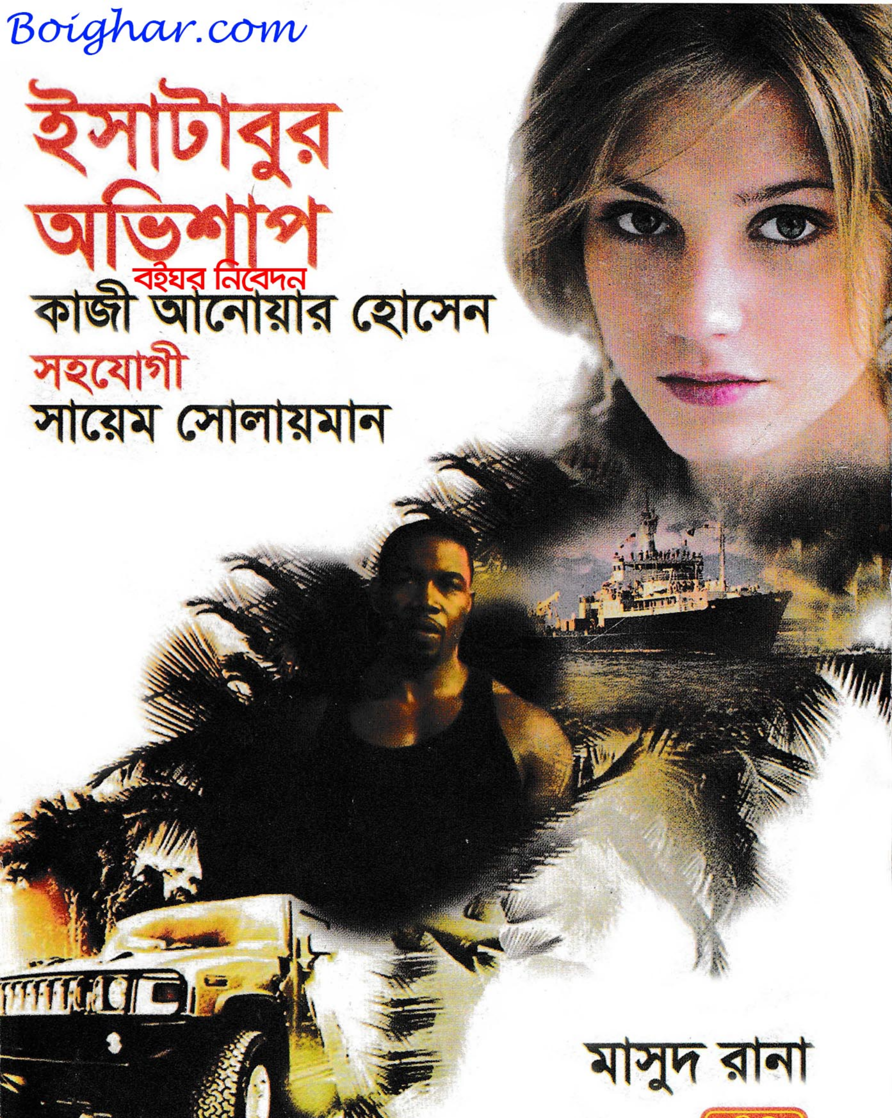

মাসুদ রানা

সেবা প্রকাশনী

বইঘর

মাসুদ রানা

ইসাটাবুর অভিশাপ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী

সায়েম সোলায়মান

‘মাই গড!...’ উঠে দাঁড়াল সোহেল,
‘বন্দি হয়েছে ও!’
‘মেসেজ তাই বলছে,’ গম্ভীর রাহাত খান,
‘এবং সাহায্য চেয়েছে।’
‘স্যর...আমি কি...’
‘ওকে ফেরত চাই আমি। জীবিত এবং অক্ষত।’
কপালের একটা শিরা টিপ্ টিপ্ করছে রাহাত খানের।
ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল সোহেল।
‘সোহেল যাচ্ছে,’ স্কাইপিতে বললেন রাহাত খান।
‘ববিকে পাবে ও হেণ্ডারসন ফিল্ডে,’ বললেন অ্যাডমিরাল।

সেবা প্রকাশনী
সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

মাসুদ রানা ৪৪৯

ইসাটাবুর অভিশাপ

কাজী আনোয়ার হোসেন

সহযোগী

সায়েম সোলায়মান

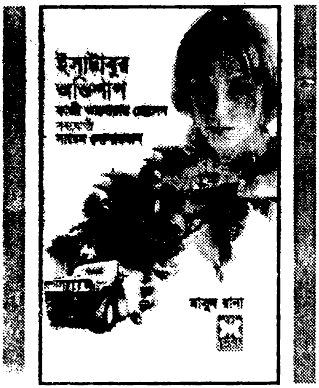

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

ISBN 984-16-7449-1

প্রকাশক: কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৬

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর: কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩১৪১৮৪ ০১৭৮৪-৮৪০২২৮
mail: alochonabibhag@gmail.com
webpage: facebook.com/shebaofficial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-449
ISATABUR OBHISHAP
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain
With: Sayem Solaiman

একশ' বাহাত্তর টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউণ্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় ◆ ভারতনাট্যম ◆ স্বর্ণমৃগ ◆ দুঃসাহসিক ◆ মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা ◆ দুর্গম দুর্গ ◆ শত্রু ভয়ঙ্কর ◆ সাগরসঙ্গম-১, ২ ◆ রানা! সাবধান!! ◆ বিস্মরণ ◆ রত্নদ্বীপ ◆ নীল আতঙ্ক-১, ২ ◆ কায়রো ◆ মৃত্যুপ্রহর ◆ গুপ্তচক্র ◆ মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ◆ রাত্রি অন্ধকার ◆ জাল ◆ অটল সিংহাসন ◆ মৃত্যুর ঠিকানা ◆ ক্ষ্যাপা নর্তক ◆ শয়তানের দূত ◆ এখনও ষড়যন্ত্র ◆ প্রমাণ কই? ◆ বিপদজনক-১, ২ ◆ রক্তের রঙ-১, ২ ◆ অদৃশ্য শত্রু ◆ পিশাচ দ্বীপ ◆ বিদেশী গুপ্তচর-১, ২ ◆ ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ ◆ গুপ্তহত্যা ◆ তিন শত্রু ◆ অকস্মাৎ সীমান্ত-১, ২ ◆ সতর্ক শয়তান ◆ নীল ছবি-১, ২ ◆ প্রবেশ নিষেধ-১, ২ ◆ পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ এসপিওনাজ-১, ২ ◆ লাল পাহাড় ◆ হৃৎকম্পন ◆ প্রতিহিংসা-১, ২ ◆ হংকং সম্রাট-১, ২ ◆ কুউউ! ◆ বিদায়, রানা-১, ২, ৩ ◆ প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ ◆ আক্রমণ-১, ২ ◆ গ্রাস-১, ২ ◆ স্বর্ণতরী-১, ২ ◆ পপি ◆ জিপসী-১, ২ ◆ আমিই রানা-১, ২ ◆ সেই উ সেন-১, ২ ◆ হ্যালো, সোহানা-১, ২ ◆ হাইজ্যাক-১, ২ ◆ আই লাভ ইউ, ম্যান-১, ২, ৩ ◆ সাগরকন্যা-১, ২ ◆ পালাবে কোথায়-১, ২ ◆ টার্গেট নাইন-১, ২ ◆ বিষ নিশ্বাস-১, ২ ◆ প্রেতাত্মা-১, ২ ◆ বন্দী গগল ◆ জিম্মি ◆ তুষার যাত্রা-১, ২ ◆ স্বর্ণসঙ্কট-১, ২ ◆ সন্ন্যাসিনী ◆ পাশের কামরা ◆ নিরাপদ কারাগার-১, ২ ◆ স্বর্গরাজ্য-১, ২ ◆ উদ্ধার-১, ২ ◆ হামলা-১, ২ ◆ প্রতিশোধ-১, ২ ◆ মেজর রাহাত-১, ২ ◆ লেনিনগ্রাদ-১, ২ ◆ অ্যামবুশ-১, ২ ◆ আরেক বারমুডা-১, ২ ◆ বেনামী বন্দর-১, ২ ◆ নকল রানা-১, ২ ◆ রিপোর্টার-১, ২ ◆ মরুযাত্রা-১, ২ ◆ বন্ধু ◆ সঙ্কেত-১, ২, ৩ ◆ স্পর্ধা-১, ২ ◆ চ্যালেঞ্জ ◆ শত্রুপক্ষ ◆ চারিদিকে শত্রু-১, ২ ◆ অগ্নিপুরুষ-১, ২ ◆ অন্ধকারে চিতা-১, ২ ◆ মরণকামড়-১, ২ ◆ মরণখেলা-১, ২ ◆ অপহরণ-১, ২ ◆ আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১, ২ ◆ বিপর্যয়-১, ২ ◆ শান্তিদূত-১, ২ ◆ শ্বেত সন্ত্রাস-১, ২ ◆ ছদ্মবেশী ◆ কালপ্রিট-১, ২ ◆ মৃত্যু আলিঙ্গন-১, ২ ◆ সময়সীমা মধ্যরাত ◆ আবার উ সেন-১, ২ ◆ বুমেরাং ◆ কে কেন কীভাবে ◆ মুক্ত বিহঙ্গ-১, ২ ◆ কুচক্র ◆ চাই সাম্রাজ্য-১, ২ ◆ অনুপ্রবেশ-১, ২ ◆ যাত্রা অশুভ-১, ২ ◆ জুয়াড়ী-১, ২ ◆ কালো টাকা-১, ২ ◆ কোকেন সম্রাট-১, ২ ◆ বিষকন্যা-১, ২ ◆ সত্যবাবা-১, ২ ◆ যাত্রীরা হুঁশিয়ার ◆ অপারেশন চিতা ◆ আক্রমণ '৮৯-১, ২ ◆ অশান্ত সাগর-১, ২ ◆ শ্বাপদসঙ্কুল-১, ২, ৩ ◆ দংশন-১, ২ ◆ প্রলয়সঙ্কেত-১, ২ ◆ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১, ২ ◆ তিক্ত অবকাশ-১, ২ ◆ ডাবল এজেন্ট-১, ২ ◆ আমি সোহানা-১, ২ ◆ অগ্নিশপথ-১, ২ ◆ জাপানি ফ্যানাটিক-১, ২, ৩ ◆ সাক্ষাৎ শয়তান-১, ২ ◆ গুপ্তঘাতক-১, ২ ◆ নরপিশাচ-১, ২, ৩ ◆ শত্রু বিভীষণ-১, ২ ◆ অন্ধ শিকারী-১, ২ ◆ দুই নম্বর-১, ২ ◆ কৃষ্ণপক্ষ-১, ২ ◆ কালো ছায়া-১, ২ ◆ নকল বিজ্ঞানী-১, ২ ◆ বড় ক্ষুধা-১, ২ ◆ স্বর্ণদ্বীপ-১, ২ ◆ রক্তপিপাসা-১, ২, ৩ ◆ অপচ্ছায়া-১, ২ ◆ ব্যর্থ মিশন-১, ২ ◆ নীল দংশন-১, ২ ◆ সাউদিয়া ১০৩-১, ২ ◆ কালপুরুষ-১, ২, ৩ ◆ নীল বজ্র-১, ২ ◆ মৃত্যুর প্রতিনিধি-১, ২ ◆ কালকূট-১, ২, ৩ ◆ অমানিশা-১, ২ ◆ সবাই চলে গেছে-১, ২ ◆ অনন্ত

যাত্রা-১, ২ ◆ রক্তচোষা ◆ কালো ফাইল-১, ২, ৩ ◆ মাফিয়া ◆ হীরকসম্রাট-১, ২ ◆ সাত রাজার ধন ◆ শেষ চাল-১, ২, ৩ ◆ বিগ ব্যাঙ ◆ অপারেশন বসনিয়া ◆ টার্গেট বাংলাদেশ ◆ মহাপ্রলয় ◆ যুদ্ধবাজ ◆ প্রিন্সেস হিয়া-১, ২ ◆ মৃত্যুফাঁদ ◆ শয়তানের ঘাঁটি ◆ ধ্বংসের নকশা ◆ মায়ান ট্রেজার ◆ ঝড়ের পূর্বাভাস ◆ আক্রান্ত দূতাবাস ◆ জন্মভূমি ◆ দুর্গম গিরি ◆ মরণযাত্রা ◆ মাদকচক্র ◆ শকুনের ছায়া-১, ২ ◆ তুরুপের তাস ◆ কালসাপ ◆ গুডবাই, রানা ◆ সীমা লঙ্ঘন ◆ রুদ্রঝড় ◆ কান্তার মরু ◆ কর্কটের বিষ ◆ বোস্টন জ্বলছে ◆ শয়তানের দোসর ◆ নরকের ঠিকানা ◆ অগ্নিবাণ ◆ কুহেলি রাত ◆ বিষাক্ত থাবা ◆ জন্মশত্রু ◆ মৃত্যুর হাতছানি ◆ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক ◆ সার্বিয়া চক্রান্ত ◆ দুরভিসন্ধি ◆ কিলার কোবরা ◆ মৃত্যুপথের যাত্রী ◆ পালাও, রানা! ◆ দেশপ্রেম ◆ রক্তলালসা ◆ বাঘের খাঁচা ◆ সিক্রেট এজেন্ট ◆ ভাইরাস X-99 ◆ মুক্তিপণ ◆ চীনে সঙ্কট ◆ গোপন শত্রু ◆ মোসাদ চক্রান্ত ◆ চরসদ্বীপ ◆ বিপদসীমা ◆ মৃত্যুবীজ ◆ জাতগোক্ষুর ◆ আবার ষড়যন্ত্র ◆ অন্ধ আক্রোশ ◆ অশুভ প্রহর ◆ কনকতরী ◆ স্বর্ণখনি-১, ২ ◆ অপারেশন ইজরাইল ◆ শয়তানের উপাসক ◆ হারানো মিগ ◆ ব্লাইণ্ড মিশন ◆ টপ সিক্রেট-১, ২ ◆ মহাবিপদ সঙ্কেত ◆ সবুজ সঙ্কেত ◆ অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা ◆ গহীন অরণ্য ◆ প্রজেক্ট X-15 ◆ অন্ধকারের বন্ধু ◆ আবার সোহানা ◆ আরেক গডফাদার ◆ অন্ধপ্রেম ◆ মিশন তেল আবিব ◆ ক্রাইম বস ◆ সুমেরুর ডাক-১, ২ ◆ ইশকাপনের টেক্কা ◆ কালো নকশা ◆ কালনাগিনী ◆ বেঈমান ◆ দুর্গে অন্তরীণ ◆ মরুকন্যা ◆ রেড ড্রাগন ◆ বিষচক্র ◆ শয়তানের দ্বীপ ◆ মাফিয়া ডন ◆ হারানো আটলান্টিস-১, ২ ◆ মৃত্যুবাণ ◆ কমাণ্ডো মিশন ◆ শেষ হাসি-১, ২ ◆ স্মাগলার ◆ বন্দি রানা ◆ নাটের গুরু ◆ আসছে সাইক্লোন ◆ সহযোদ্ধা ◆ গুপ্ত সঙ্কেত-১, ২ ◆ ক্রিমিনাল ◆ বেদুঈন কন্যা ◆ অরক্ষিত জলসীমা ◆ দুরন্ত ঈগল-১, ২ ◆ সর্পলতা ◆ অমানুষ ◆ অখণ্ড অবসর ◆ স্নাইপার-১, ২ ◆ ক্যাসিনো আন্দামান ◆ জলরাক্ষস ◆ মৃত্যুশীতল স্পর্শ-১, ২ ◆ স্বপ্নের ভালবাসা ◆ হ্যাকার-১, ২ ◆ খুনে মাফিয়া ◆ নিখোঁজ ◆ বুশ পাইলট ◆ অচেনা বন্দর-১, ২ ◆ ব্ল্যাকমেইলার ◆ অন্তর্ধান-১, ২ ◆ ড্রাগ লর্ড ◆ দ্বীপান্তর ◆ গুপ্ত আততায়ী-১, ২ ◆ বিপদে সোহানা ◆ চাই ঐশ্বর্য-১, ২ ◆ স্বর্ণ বিপর্যয়-১, ২ ◆ কিল-মাস্টার ◆ মৃত্যুর টিকেট ◆ কুরুক্ষেত্র-১, ২ ◆ ক্লাইম্বার ◆ আগুন নিয়ে খেলা-১, ২ ◆ মরুস্বর্গ ◆ সেই কুয়াশা-১, ২ ◆ টেরোরিস্ট ◆ সর্বনাশের দূত-১, ২ ◆ শুভ্র পিঞ্জর-১, ২ ◆ সূর্য-সৈনিক-১, ২ ◆ ট্রেজার হাণ্টার-১, ২ ◆ লাইমলাইট-১, ২ ◆ ডেথ ট্র্যাপ-১, ২ ◆ কিলার ভাইরাস-১, ২ ◆ টাইম বম ◆ আদিম আতঙ্ক ◆ পার্শিয়ান ট্রেজার-১, ২ ◆ বাউন্টি হান্টার্স-১, ২ ◆ মৃত্যুদ্বীপ ◆ জাপানি টাইকুন-১, ২ ◆ পাতকিনী ◆ নরকের কীট-১, ২ ◆ শার্প শুটার ◆ পাশবিক-১, ২ ◆ গুপ্তসংঘ ◆ বিষনাগিনী ◆ নীল রক্ত ◆ দুরন্ত কৈশোর ◆ মৃত্যুঘণ্টা ◆ ইসাটাবুর অভিশাপ ।

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক। জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই।

— লেখক

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া; কোনও ভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

বি. দ্র.: বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

এক

একটু কেঁপে উঠে রানাকে চমকে দিল ফাতনাটা, তারপর সাঁৎ করে চলে গেল পানির নিচে। ছিপে টান দিয়ে শিরদাঁড়া সোজা করল মাসুদ রানা। বড়শিটা জায়গামত গেঁথে যেতেই ছুট লাগিয়েছে মাছ। সুতো বেয়ে রানার ছিপধরা হাতে চলে এল মাছটার প্রাণস্পন্দন। বেশ বড় মাছ। রানার মনে পড়ল ওর বন্ধু সোহেল থাকলে বলত: *সাবধান, রানা! বিগো ফিশো!* মৃদু হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। সুতো ছাড়ছে এখন। ঢলে পড়া সূর্যের আলো থেকে চোখ বাঁচাতে হ্যাটটা নামিয়ে রেখেছিল কপালের ওপর, চট করে সোজা করল সেটা। মাছটাকে মিনিট পাঁচেক খেলিয়ে নৌকোর কাছে এনে যেই নেট করতে যাবে, ঘটনাটা ঘটল ঠিক তখনই।

ওর ঠিক উল্টোদিকে, খালের ওপারে ইসাটাবুর ঘন রেইনফরেস্ট; জড়াজড়ি করে থাকা লতা ও গাছের “দেয়াল” ভেদ করে তাড়া-খাওয়া হরিণের মতো বেরিয়ে এল এক লোক, থমকে দাঁড়াল—চেহারা দেখে আদিবাসী বলে মনে হচ্ছে। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে এদিকওদিক তাকাল সে, কী যেন খুঁজল খালের পানিতে, দেখল রানাকেও, তারপর পিছন ফিরে তাকাল—আরও এগোবে কি না, কিংবা কোন্‌দিকে যাবে সে-ব্যাপারে দ্বিধায় ভুগছে সম্ভবত। মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত, তারপরই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল; দৌড়ে এসে লাফিয়ে পড়ল খালের পানিতে। সাঁতার কাটছে, যত জলদি সম্ভব এগিয়ে আসছে রানার ইঞ্জিনবোটের দিকে।

খালের ওপারে, জঙ্গলের সীমানায়, মরা গাছের কাণ্ডের মতো

স্থির হয়ে শুয়ে ছিল দুটো কুমির; হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল ওগুলো, নেমে পড়ল পানিতে।

বিপদ টের পেল রানা।

সুতোয় ঢিল পেয়ে একটু দূরে সরে গিয়েছিল মাছটা, দ্রুত কাছে টেনে এনে নেট করল ও, বড়শি খুলে নিল ওটার মুখ থেকে, তারপর টান মারল ইঞ্জিনের স্টার্টার কর্ড ধরে। বুঝতে পারছে, পানিতে ঝাঁপিয়ে-পড়া লোকটা ওর কাছে পৌঁছানোর আগেই ধরে ফেলবে তাকে কুমির দুটো। দু'-তিনবার টান মারার পর চালু হলো ইঞ্জিন। নৌকার মুখ ঘুরিয়ে নিল রানা। গদাইলস্করি চালে রওনা হলো বোট।

অপরিচিত লোকটা চেঁচিয়ে উঠল এমন সময়, থেমে গেছে ওর সাঁতার, হাবুডুবু খাচ্ছে সে। বোঝা গেল, অন্তত একটা কুমির কামড় বসিয়ে দিয়েছে ওর গায়ে। তবে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে জুৎসই হয়নি কামড়টা, নইলে কামড়ে ধরেই লোকটাকে টেনে পানির নিচে নিয়ে যাওয়ার কথা।

নিজের পুরনো বোট এবং তার চেয়েও পুরনো ইঞ্জিনের জন্যে আফসোস হলো রানার। চোখের সামনে একটা লোক মরতে বসেছে কুমিরের হামলায়, অথচ কাছেই যেতে পারছে না ও। হালটা ধরে তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। এখনও সমানে চিৎকার করছে লোকটা, নিজের নিশ্চিত মৃত্যু টের পেয়েছে সে, হাত-পা ছুঁড়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে কুমিরের কবল থেকে। পিছিয়ে-পড়া কুমিরটাও পানির ওপর নাক তুলে এগিয়ে আসছে লোকটার দিকে, তেমন তাড়াহুড়ো করছে না, বুঝতে পারছে পালানোর কোনও পথ নেই শিকারের, অথবা হয়তো ওটার খিদে তেমন জোরালো নয়।

রাডার-হ্যাণ্ডেলটা ছেড়ে দিয়ে ঝুঁকে পড়ল রানা, থাবা মেরে তুলে নিল দুটো মাছ। দূরত্ব আন্দাজ করে ছুঁড়ে মারল দ্বিতীয় কুমিরটার নাকমুখ সই করে। একটুও দেরি না করে ঝুঁকে পড়ল আবারও, তুলে নিল বাকি মাছ দুটোও, ছুঁড়ে মারল সেগুলোও।

বইঘর.কম

আশা করছে একসঙ্গে চার-চারটে মাছ পেয়ে কিছুক্ষণের জন্য হলেও মনোযোগ সরে যাবে দ্বিতীয় কুমিরটার, লোকটাকে উদ্ধার করার জন্য মূল্যবান কয়েকটা মুহূর্ত পাওয়া যাবে।

আশাটা পূরণ হতে গিয়েও হলো না—বোট নিয়ে লোকটার খুব কাছে চলে গেছে রানা, বাঁচা গেছে ভেবে বোটের একটা প্রান্ত দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছে লোকটা, অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা দেখা দিয়েছে ওর দু'চোখে, কিন্তু প্রথম কুমিরটা আবারও কামড় দেয়ায় নগ্ন আতঙ্কে বিকৃত হয়ে গেল তার চেহারা। রানাকে কিছুটা চমকে দিয়ে আবারও চেঁচিয়ে উঠল সে, লোকটা বোটের প্রান্ত আঁকড়ে ধরে থাকায় হ্যাঁচকা টান লাগল; পানিতে পড়ে যেতে গিয়েও সামলে নিল রানা। ততক্ষণে লোকটা বোট আঁকড়ে ধরেই শরীর মুচড়ে ঘুরেছে কিছুটা। বোঝা যাচ্ছে অপর পা-টা দিয়ে বার বার লাথি মারছে সে কুমিরটাকে, অথবা মারার চেষ্টা করছে। ওর আহত পা থেকে বেরনো রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে পানি। চলন্ত বোটের কারণে লোকটা নড়ছে বলে নিচ থেকে খুব একটা সুবিধা করতে পারছে না কুমিরটা।

চট করে দ্বিতীয় কুমিরটার দিকে তাকাল রানা। দ্বিতীয় মাছটা এইমাত্র কামড়ে ধরল ওটা দুই চোয়ালের মাঝখানে। দড়াবাজদের মতো নিখুঁত একটা ঝটকা মারল। কিছুটা শূন্যে উঠে গেল মাছটা, তারপর সেঁধিয়ে গেল ওর হাঁ করা মুখের ভেতর।

ভাগ্য সাহায্য করল রানাকে—পানির নিচ থেকে সুবিধা করা যাচ্ছে না দেখে পানির ওপরে নাক তুলল প্রথম কুমির, পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে কামড় বসাবে লোকটার পিঠে। আরেকবার চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, চিৎকার শেষ হওয়ার আগেই ঝুঁকে পড়ল রানা। খামচে ধরল লোকটার শার্ট, হেঁচকা এক টানে লোকটার কোমর পর্যন্ত তুলে ফেলল পানির ওপরে। বসে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে, শার্ট ছেড়ে দিয়ে এবার আঁকড়ে ধরল লোকটার প্যান্টের বেল্ট, জোরে টান মারল আবারও। লোকটার নিজের চেষ্টা তো ছিলই, তার ওপর রানা টানছে—পানি ছেড়ে উঠে এল লোকটার পা দুটো,

হুড়মুড় করে পড়ল সে বোটের ভেতর। ঠিক তখনই খট্‌ করে একটা আওয়াজ হলো—নিষ্ফল কামড় চালিয়েছে প্রথম কুমির।

আহত লোকটা জড়িয়ে ধরেছে রানাকে, ও যে ট্যুরিস্ট বুঝে নিয়ে ইংরেজিতে বলল, 'আমাকে বাঁচাও, ভাই!'

কিছু না বলে লোকটার বাহুবন্ধন থেকে জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা। একটা টাওয়েল আছে বোটে, একথাবায় তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল লোকটার দিকে, তারপর ইংরেজিতে জরুরি কণ্ঠে বলল, 'যেখানে কামড় খেয়েছ সেখানে পেঁচাও জলদি, রক্ত বন্ধ করতে হবে তোমার। আর পারলে হ্যাণ্ডেলটা একটু ধরো, আমি কুমির দুটোকে দেখছি।' ছিপ তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

দড়াবাজি কায়দায় চতুর্থ ও শেষ মাছটা খাচ্ছে দ্বিতীয় কুমির, আর প্রথমটা হলদে সবুজ চোখ মেলে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে, আবার পুরোপুরি হয়ওনি; কাজেই এখন ওটা যা করতে পারে তা হলো, লেজ দিয়ে প্রচণ্ড বাড়ি মারতে পারে বোটের গায়ে। এ-রকম বাড়িতে, রানা জানে, কখনও কখনও চিড় ধরে যায় বোটে, কখনও আবার উল্টেও যায়; ক্ষুধার্ত কুমিররা অসহায় একাকী জেলেদের খুন করে ওভাবে।

ছিপের হ্যাণ্ডেল চেপে ধরল রানা। একটা সেকেণ্ডও নষ্ট না করে সরু প্রান্তটা দিয়ে জোরে গুঁতো মারল প্রথম কুমিরটার বাঁ চোখ নিশানা করে। চোখে না লেগে এক ইঞ্চি ডানে লাগল আঘাতটা, প্রচণ্ড রেগে গিয়ে ছিপটা কামড়ে ধরার জন্যে দু'চোয়াল ফাঁক করল কুমিরটা। কিন্তু ওটার ইচ্ছা পূরণ হতে দিল না রানা, একই কায়দায় আগেরবারের চেয়েও জোরে গুঁতো দিল ডান চোখ লক্ষ্য করে। এবার জায়গামতো লাগল আঘাত, কেঁপে উঠল কুমিরটার পুরো শরীর। একটা চোখ অন্ধ হয়ে গেছে ওটার, মুহূর্তের মধ্যে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে জন্তুটা, লেজ দিয়ে বাড়ি মারার ইচ্ছা বাদ দিয়ে চট করে ঘুরে গেল, পালাচ্ছে এখন প্রাণ নিয়ে।

ছিপ রেখে দিল রানা, তুলে নিল ওর সঙ্গে থাকা একমাত্র

অস্ত্রটা—ছোট একটা কুড়াল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত হলো দ্বিতীয় কুমিরের জন্যে। পানিতে স্থির ভেসে আছে সরীসৃপটা, ওর সঙ্গী ওভাবে পালিয়ে গেল কেন বুঝতে পারছে না, এখন হামলা করতে গেলে উল্টো নিজেরই কোনও ক্ষতি হয় কি না ভাবছে হয়তো। পরিস্থিতির সুযোগ নিল রানা, বোটের মুখ ঘুরাল চট্ করে। আহত লোকটার দিকে চোখ পড়ল এমন সময়।

অজ্ঞান হয়ে গেছে লোকটা। অতিরিক্ত রক্তপাত?

কুড়ালটা হাতে রেখেই এগিয়ে গেল রানা, ধরল নৌকোর হাল, ঘুরিয়ে নিল বোটের মুখ, এগিয়ে যাচ্ছে তীর অভিমুখে; যেখান থেকে খালে নেমেছিল ও, যেখানে রাখা আছে ওর ভাড়া করা জিপ। ফোর হুইলারের ছাদের স্টিল র‍্যাকে বোট, আর পেছনের সীটে আলগা ইঞ্জিন নিয়ে এখানে এসেছিল ও।

খালটা প্রায় নিস্তরঙ্গ, হাল না ধরলেও সোজাই এগিয়ে যাবে বোট। হ্যাণ্ডেল ছেড়ে দিল রানা, এগিয়ে গেল আহত লোকটার দিকে। বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে, কুড়ালের ফলা ওপরের দিকে রেখে হাতলটা চেপে ধরল এক পায়ের কেডসের নিচে। হাত বাড়িয়ে টেনে নিল টাওয়েলটা—ওটা কোনও কাজেই লাগাতে পারেনি আহত লোকটা; বটি দিয়ে মাছ কাটার কায়দায় সেটাকে লম্বালম্বি দু'ভাগে ভাগ করে ফেলল কুড়ালের ধারালো ফলার সাহায্যে। তারপর টুকরো দুটো নিয়ে আরেকটু কাছে গেল লোকটার।

ডান পায়ের দু'জায়গায় কামড় খেয়েছে লোকটা—রানের পেছনের দিকে, আর হাঁটুর ঠিক নিচে মাংসল জায়গাটায়। দ্বিতীয় আঘাতটা তেমন গুরুতর না, কিন্তু প্রথমটা...একনজরেই বোঝা যাচ্ছে...ওটা ভোগাবে আদিবাসী লোকটাকে। ওখানেই সম্ভবত প্রথমে কামড় বসিয়েছিল কুমিরটা, কিন্তু মাংস আলগা করে নেয়ার আগে অথবা লোকটাকে পানির নিচে টেনে নেয়ার আগে স্রেফ কপালজোরে বেঁচে গেছে সে। ওর পরনের প্যান্ট ছিঁড়ে গেছে সে-জায়গায়, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে কুমিরের প্রতিটা দাঁতের-দাগ, রক্তের মোটা ধারা বের হচ্ছে প্রায় সবগুলো দাগ থেকে।

জলদি হাসপাতালে নিতে হবে একে, তা না হলে বাঁচানো যাবে না।

লোকটার প্যান্টটা যে-জায়গায় ছিঁড়েছে, নিজের কাজের সুবিধার জন্য সেটা আরেকটু ছিঁড়ে নিল রানা। তোয়ালের বড় টুকরোটা হিসেবমতো এবং সাবধানে শক্ত করে বেঁধে দিল জায়গাটাতে। দ্বিতীয়টা বাঁধল পায়ের গোছার জখমে। কাজ করতে করতে খেয়াল করল, অজ্ঞান লোকটা মাঝারি সাইজের একটা মানিবেল্ট পরে আছে কোমরে।

কাজ শেষ করে চট করে উঠে দাঁড়াল। প্রায় পৌঁছে গেছে তীরে। ভটভটি ইঞ্জিন বন্ধ করল রানা, হাল ধরল বোটের। বোটের সামনের গলুই উজানের দিকে ঘুরিয়ে তীরে ভিড়তে সময় লাগল না।

কারও সাহায্য পাওয়া যাবে কি না বোঝার জন্য তাকাল এদিকওদিক। উঁহুঁ, ডানে-বাঁয়ে কেউ কোথাও নেই। বোঝা গেল ইসাটাবুর বাসিন্দারা বিনাকাজে আসে না এদিকে।

লাফিয়ে বোট থেকে নামল রানা, শক্তি খাটিয়ে নাকটা তুলে ফেলল তীরের বেশ কিছু ওপরে, তারপর আবার গিয়ে উঠল ওটাতে। সংজ্ঞাহীন লোকটার দু'বগলের নিচে ঢুকিয়ে দিল দু'হাত, বসাল লোকটাকে, তারপর একটু কসরত করে উপুড় করে তুলে নিল নিজের ডান কাঁধে। লাফিয়ে নামল তীরে, যত দ্রুত সম্ভব এগোচ্ছে জিপের দিকে—এখান থেকে যে-ট্র্যাক এগিয়ে গেছে মেইনরোডের দিকে, সেটার ধারে পার্ক করে রেখেছে ওটাকে।

লোকটাকে কায়দা করে শুইয়ে দিল ও জিপের পেছনের সীটে, তারপর নিজে উঠে পড়ল ড্রাইভিং সীটে, জিপ ছাড়তে গিয়ে টের পেল, সবচেয়ে কাছের হাসপাতালটা কোথায় জানে না।

ড্যাশবোর্ডের ফ্লিপকভারটা খুলে ফেলল, বের করল ভেতরে রাখা ট্যুরিস্ট গাইড বুকলেটটা—ইসাটাবুর একমাত্র বিমানবন্দর হেণ্ডারসন ফিল্ডের ইমিগ্রেশন পার হওয়ার সময় কাস্টমসের এক অফিসার ওটা ধরিয়ে দিয়েছিল রানার হাতে, কাজে লাগতে পারে

ভেবে যেখানে যেখানে যাচ্ছে, ওটা সঙ্গে রাখছে ও। চটিবইটা খুলল, একটার পর একটা পাতা উল্টাচ্ছে, দ্রুত চোখ বুলাচ্ছে।

হিস্টরি অভ ইসাটাবু...কাজে লাগবে না। মডার্ন ডেভেলপমেন্ট...বর্তমান সরকারের নিজের ঢোল নিজেই পেটানোর চেষ্টা আর কী...কাজে লাগবে না। জিয়োগ্রাফি অ্যাণ্ড ক্লাইমেট...এটা আগেই দেখেছে রানা। দ্য মেইন স্ট্রীট অভ ইসাটাবু...ঝড়ের গতিতে প্যারাটার ওপর নজর বুলাল ও। জানা গেল, হেণ্ডারসন ফিল্ড থেকে দ্বীপশহর ইসাটাবুর একমাত্র সমুদ্রবন্দর পয়েন্ট ক্রুয পর্যন্ত একটা মাত্র প্রধান সড়ক গেছে, বাকি রাস্তাগুলো সেটার শাখা-প্রশাখা। ল্যাণ্ডমার্কস...পরে দেখা যাবে। ওয়ার মিউযিয়াম অ্যাণ্ড পীস পার্কস...ধেৎ!

না দেখেই আরও দুটো পাতা উল্টাল রানা, যা খুঁজছিল তা পেয়ে গেল "লাইব্রেরিয" প্যারাটার নিচে।

হসপিটালস...দুটো হাসপাতাল আছে এখানে। একটা ন্যাশনাল রেফারেল—গ্র্যাণ্ড ইসাটাবু হোটেলের ঠিক উল্টোদিকে। আরেকটা সেন্ট্রাল—আগেরটার তুলনায় ছোট, সুযোগসুবিধাও কম, তবে বর্ণনা পড়ে মনে হচ্ছে, দুটোর মধ্যে এটাই বেশি কাছে।

দশ মিনিট সময় আছে হাতে, কথাটা মনে মনে নিজেকে বলে এক্সিলারেটরে পা দাবাল রানা। একটা ঝাঁকি খেয়ে রওয়ানা হলো পুরনো জিপ।

ট্র্যাকটা এবড়ো-খেবড়ো, স্পিডোমিটারের কাঁটা ষাট-সত্তরের ঘরে নিতে পারছে না রানা। তার ওপর মোটা মোটা ডালের আলগা ঝোপঝাড় গজিয়ে আছে যেখানে-খুশি-সেখানে. এক্সিলারেটরে পা দাবিয়ে দশ সেকেণ্ডও চলতে পারছে না, তার আগেই ব্রেকপ্যাডাল চাপতে হচ্ছে ওকে। সবচেয়ে বড় কথা, গতরাতের ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট থকথকে কাদা এখনও শুকোয়নি কোনও কোনও গর্ত থেকে।

কতক্ষণ পর জানে না—হাতঘড়ি দেখার ফুরসত নেই, বন্ধুর

বুনো ট্র্যাকটা পার হয়ে একটা শাখারাস্তায় জিপ তুলল ও।

গাড়ির গতি বাড়ল এবার। কেন জানে না, নিজের ভেতরে একটা তাগিদ বোধ করছে রানা; বার বার মনে হচ্ছে, পেছনের সীটে শুয়ে থাকা অজ্ঞান-অসহায় মানুষটাকে বাঁচানোর দায়িত্ব ওর কাঁধে। কিছুক্ষণ আগে আকুতি জানিয়েছিল লোকটা, কথাটা মনে পড়ে গেল রানার, 'তুমি যে-ই হও, আমাকে বাঁচাও, ভাই!'

গিয়ার বদল করল ও, পঁচাত্তরের ঘর ছুঁই ছুঁই করতে থাকা স্পিডোমিটারটা দেখল একপলক, পুরনো টায়ারের স্ক্রিচিং-এর আওয়াজ তুলে বিপজ্জনক ওভারটেক করল একটা গাড়িকে, তারপর গায়ের ওপর এসে-পড়া একটা ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল ব্যাকসীটের লোকটা জায়গামতো আছে কি না। তারপর মনোযোগ দিল রাস্তার ওপর। "ওভারটেকিং নিষিদ্ধ" লেখা একটা সাইনবোর্ড উদয় হয়েই হারিয়ে গেল।

সামনে প্রায় রঙধনুর মতো একটা বাঁক, তারপরই শাখারাস্তাটা গিয়ে মিশেছে প্রধান সড়কের সঙ্গে। গাড়ির বুড়ো ইঞ্জিনের ওপর একটুও দয়া-মায়া দেখাল না রানা, চারটা চাকার কী অবস্থা তা নিয়ে ভাবল না একবারও, এমনকী গতিও কমাল না একটুও। ফর্মুলা ওয়ান রেসিংকারের গতি তুলে দু'পাশের লোকগুলোর গায়ে কাদা ছিটিয়ে রঙধনুটা পার হলো রানা, উঠল বড় রাস্তায়। লাকড়িবোঝাই একটা লক্কড়ঝক্কড় পিকআপ ভ্যান যদি শেষমুহূর্তে ব্রেক না কষত, মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়ানো যেত না হয়তো।

দড়ির বাঁধন অমান্য করে একগাদা লাকড়ি খসে পড়ল রাস্তায়, দরজা খুলে ড্রাইভিং সীট থেকে নামল পিকআপ ভ্যানের ড্রাইভার। পড়েযাওয়া লাকড়িগুলো তোলার জন্য এগিয়ে যেতে যেতে চিৎকার করে বলল, 'শালা, রাত নামার আগেই মাল টেনে টাল হয়েছিস? নাকি কানা—চোখে দেখিস না? তোকে গাড়ি চালানোর লাইসেন্স দিয়েছে কোন্ জানোয়ারের-বাচ্চা?'

বইঘর.কম

একটা শব্দও কানে গেল না রানার। ও তখন গতি কমিয়েছে কিছুটা, বার বার তাকাচ্ছে ডানে-বাঁয়ে—ছাড়িয়ে যেতে চায় না সেণ্ট্রাল হাসপাতালটাকে। খেয়াল করল, দ্বীপশহরটার প্রায় পশ্চিম সীমানায় হাজির হয়ে গেছে।

হাসপাতালের ইমার্জেন্সি এণ্ট্রান্সের কাছে সজোরে ব্রেক কষার পর হাতঘড়ি দেখল রানা। দশ মিনিটে পৌঁছাতে পারেনি, চোদ্দ মিনিট লেগে গেছে। একটা মুহূর্তও নষ্ট না করে ছুটে গিয়ে রিপোর্ট করল ইমার্জেন্সি ডেস্কে। মিনিটখানেকের মধ্যে একটা হসপিটাল-ট্রলি নিয়ে জিপের কাছে হাজির হয়ে গেল আদিবাসী দুই পুরুষ নার্স। ইতোমধ্যে প্রায় নিস্তেজ হয়ে গেছে আহত লোকটা, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে সাদা হয়ে গেছে চেহারা।

লোকটাকে দুই নার্সের সহায়তায় ট্রলিতে তুলছে রানা, ইমার্জেন্সি ডেস্কটাকে পাশ কাটিয়ে দ্রুতপায়ে বাইরে বের হয়ে এল সুন্দরী এক মেয়ে ডাক্তার, ট্রাউজার আর ইন-ছাড়া শার্টের ওপর সবুজ অ্যাপ্রন পরেছে, ঘাড়ে ঝুলছে স্টেথস্কোপ। ওর কর্তব্যবোধে কোনও ঘাটতি দেখা যাচ্ছে না; রানাকে যেন দেখতেই পায়নি এমন ভঙ্গিতে হাজির হলো ট্রলিতে-তুলে-ফেলা আহত লোকটার কাছে। অভিজ্ঞ ভঙ্গিতে দ্রুত চেক করছে লোকটাকে।

ইসাটাবুর কোনও মেয়ে এত সুন্দরী হতে পারে ভাবেনি রানা। ঘাড় ছাড়িয়ে বেশিদূর নামতে দেয়নি মেয়েটা চুলগুলোকে, পাশ্চাত্য কায়দায় সুন্দর করে ছাঁটা। চালচলনে স্পষ্ট কর্তৃত্বের ছাপ। এ শুধু একজন ডাক্তারই না, হাসপাতালের অন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদেও আছে, অনুমান করল রানা। চামড়া মাখনরঙা, বয়সটাকে অনেক ধাক্কালেও ত্রিশের ওপারে নেয়া যাবে না। চাঁদমুখ চেহারায় একমাত্র কালিমা হিসেবে ধরা যেতে পারে কপালের একটা কাটাদাগ—ওটা ওর জন্মদাগও হতে পারে। প্রথম দেখায় মেয়েটাকে উদ্ধত আর অহঙ্কারী বলে মনে হলো রানার।

'বেঁচে আছে,' রোগীকে পরীক্ষা করা শেষে জানিয়ে দিল মেয়েটা। দুই পুরুষ নার্সের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা জলদি

ভেতরে নিয়ে যাও একে, ভর্তি করানোর হাঙ্গামায় না গিয়ে সরাসরি নিয়ে যাও ওটিতে। কেউ কিছু বললে আমার কথা বলবে।' প্রথমবারের মতো তাকাল রানার দিকে। 'কতক্ষণ আগের ঘটনা?' প্রাঞ্জল ইংরেজি উচ্চারণে অস্ট্রেলিয়ান টান আছে।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বড়জোর আধঘণ্টা। দ্বীপের পুবদিকের একটা খালে মাছ ধরছিলাম আমি, ওখানেই কুমির আক্রমণ করেছিল লোকটাকে।'

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা, সেই ঝাঁকির সঙ্গে যেন একাত্মতা ঘোষণা করে একটুখানি আন্দোলিত হলো ওর উন্নত বুক। 'দুটো কুমির হামলা করার পরও লোকটা বেঁচে গেছে...যারা বলে ঈশ্বর নেই, যারা বিশুর ক্ষমতায় বিশ্বাস করে না, তাদেরকে ডেকে এনে দেখানো দরকার, এখনও অলৌকিক ঘটনা ঘটে পৃথিবীতে।' হ্যাণ্ডশেক করার জন্য ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। 'নামানা ভেলর, এই হাসপাতালের চীফ মেডিকেল অফিসার।'

'মাসুদ রানা।'

'মিস্টার রানা, সরি বলতে হচ্ছে আপনাকে, কারণ সময় দিতে পারছি না আপাতত। কেন, আশাকরি বুঝতে পারছেন। ইচ্ছা করলে ইমার্জেন্সি রুমে অপেক্ষা করতে পারেন। বসার ব্যবস্থা আছে ওখানে, টাইম ম্যাগাযিনের কয়েকটা পুরনো কপিও আছে।' ঘুরতে গিয়েও ঘুরল না। 'যেভাবে তোয়ালে পেঁচিয়েছেন আহত লোকটার পায়ে, প্রশংসা না করে পারছি না। কাজটা প্রফেশনালদের মতো।' আর দেরি করল না, ঘুরে হন-হন করে হাঁটা ধরল আবারও; এনকয়রি ডেস্ক ছাড়িয়ে গিয়ে ঢুকল আরও ভেতরে, সম্ভবত ওটি'র দিকে।

কী করবে বুঝতে পারছে না রানা, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। ইমার্জেন্সি রুমে গিয়ে বসবে? ঘাঁটতে শুরু করবে টাইমের পুরনো সংখ্যাগুলো? কিন্তু তাতে লাভ কী? এই মুহূর্তে ওগুলো ওকে টানছে না একটুও। এদিকে চলেও যেতে পারছে না হাসপাতাল

থেকে: সায় দিচ্ছে না মন, নতুন কোনও সাহায্যের দরকার হতে পারে আহত লোকটার। আন্তরিক সহযোগিতার ভাব দেখিয়েছে ডক্টর ভেলর, রোগীর অবস্থা দেখে তাকে ভর্তি না করিয়েই নিয়ে গেছে ওটিতে। ইনফেকশন ঠেকানো, ক্ষতস্থান সেলাই, বাড়তি রক্ত দেয়া—ইত্যাদি কাজ ঠিকমতো করা গেলেও নিশ্চয়ই রোগীকে রাতারাতি ছেড়ে দেয়া হবে না? লোকটাকে ভর্তি করানো, চিকিৎসার খরচ চালানো ইত্যাদি অনেক কাজ এখনও বাকি আছে। অন্তত একটা মানুষ সঙ্গে না থাকলে সেগুলো কি সম্ভব? দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা।

এ-রকম কতবার হয়েছে ওর? এ-রকম আর কতবার হবে? কোনও অ্যাসাইনমেন্ট শেষে যতবার ও ছুটি নিতে চেয়েছে অ্যাকটিভ জীবনের কাছ থেকে, ততবারই কোনও-না-কোনও দায়িত্ব সওয়ার হয়েছে ওর ঘাড়ে। এবং নতুন দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে ওকে—কখনও নিজের প্রয়োজনে, কখনও অন্য কারও অনুরোধে, কখনও বা নিছক কপালের ফেরে।

নিজের ওপরই বিরক্ত হয়ে উঠছে টের পেয়ে আত্মসংবরণ করল রানা। পণ করেছিল, এই ছুটিতে সিগারেটটা ছেড়েই দেবে, অথবা চেষ্টা করবে যতটা সম্ভব কম খাওয়ার; কিন্তু নিজের অজান্তেই পকেট থেকে বের করল সিগারেট আর লাইটার। হাসপাতালের ভেতরে তামাক-শলাকা নিষিদ্ধ নিশ্চয়ই? কাজেই জিপের ড্রাইভিং সীটে বসে পুড়িয়ে শেষ করা যাক এটাকে। অলস পায়ে হেঁটে গিয়ে জায়গামতো উঠে বসল ও, টেনে দিল দরজাটা, নামিয়ে দিল কাঁচ।

আহত লোকটা কে? ওই ঘন জঙ্গলের ভেতরে কী করছিল সে? ওরকম পাগলের মতো ছুটে বেরিয়ে এল কেন হঠাৎ? আর বলা নেই কওয়া নেই, কেন লাফিয়ে পড়তে গেল খালের পানিতে?

লোকটা যে স্থানীয় সে-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই রানার—চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছে ও; কিন্তু কথা হচ্ছে,

রানার মতো একজন আগন্তুক যেখানে জানে ইসাটাবুর বিপজ্জনক ওয়াইল্ড লাইফ সম্পর্কে, সেখানে লোকটা একজন আদিবাসী হয়েও কেন লাফিয়ে পড়ল কুমিরে ভরা খালে? সলোমন দ্বীপপুঞ্জের রেইন ফরেস্ট যেমন বিখ্যাত, এখানকার বিনানোটিশের ঝড়তুফান আর অঝোরধারার বৃষ্টি যেমন বিখ্যাত, ঠিক তেমনই কুখ্যাত এখানকার বজ্জাত কুমিরগুলো—যেগুলোকে খালে, নদীতে, জঙ্গলের ঘন ঝোপের আড়াল থেকে, এমনকী কখনও কখনও পর্যটকে ভরা সমুদ্রসৈকতেও হানা দিতে দেখা গেছে। আর শুধু কুমিরই নয়, পয়েন্ট ক্রুয ছাড়িয়ে তিন-চার শ' গজ গেলেই সাগরে দেখা মেলে হ্যামারহেড বা টাইগার শার্কের।

হেলান দিল রানা, মাথা রাখল সীট-টপে। ধোঁয়া ছাড়ল সরু করে।

ডক্টর নাম্বানা ভেলর। মেয়েটা...একবাক্যে যদি বলা হয়...আচমকা অমনোযোগী করে দিয়েছে রানাকে। খুঁত বলতে যা চোখে পড়েছে তা বাদ দিয়ে বললে: মেয়েটা চোখা সুন্দরী, কর্তৃত্বপরায়ণ, মানবদরদী, এবং...সেক্সি। আরও একবার ধোঁয়া ছাড়ল রানা, হঠাৎ করেই খেয়াল করল অন্ধকার হয়ে আসছে চারদিক। ব্যাপার কী?

ব্যাপার আর কিছুই না, সলোমন দ্বীপপুঞ্জের খেয়ালি আবহাওয়া—এই রোদ এই বৃষ্টি। ঘন মেঘ ইতোমধ্যেই আড়াল করে ফেলেছে সূর্যটাকে, ভাপসা গরম লাগতে শুরু করেছে, পুব দিগন্তটাকে বার দুয়েক চিরে দিল অত্যুজ্জ্বল, নিঃশব্দ বিদ্যুচ্চমক। বৃষ্টি নামতে আর দেরি নেই।

ইমার্জেন্সি রুমে গিয়ে বসার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা, সিগারেটে সুখটান দিয়ে ওটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল রাস্তায়। দরজা খুলে নামতে যাবে, এমন সময় মনে পড়ল, গাড়ির দরজা লক না করে চলে যাওয়ার নিয়ম নেই ইসাটাবুতে; যে রেন্ট-আ-রাইড প্রতিষ্ঠান থেকে জিপটা ভাড়া করেছে ও, ওরাও পইপই করে বলে দিয়েছে কথাটা।

এখনও বলতে গেলে অসভ্যই রয়ে গেছে এখানকার আদিবাসীদের উল্লেখযোগ্য অংশ, কখনও কখনও পাশের দ্বীপগুলো থেকে আরও অসভ্যরা এসে যোগ দেয় ওদের সঙ্গে; ছিনতাই-পকেটকাটা-চুরি-ডাকাতি, এমনকী কখনও কখনও মেয়েদের শ্লীলতাহানি পর্যন্ত করছে ওরা দল বেঁধে। রয়্যাল ইসাটাবু পুলিশ ফোর্স নামেই রাজকীয়, কাজের বেলায় তাদের লোকবল যেমন সীমিত, উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবও তেমন প্রকট।

পেছনের যেদিকের দরজা দিয়ে আহত লোকটাকে ব্যাকসীটে তুলেছিল রানা, অনেকখানি ঘুরে সেটার লক নামিয়ে দিতে যাবে, এমন সময় দুটো ব্যাপার লক্ষ করল।

বেশ কিছুটা রক্ত লেগে গেছে পেছনের সীটে। আর আহত লোকটার মানিবেল্টটা পড়ে আছে জিপের মেঝেতে।

ভ্রূ কোঁচকাল রানা, হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ওয়াটারপ্রুফ মানিবেল্টটা। আগেরবার যখন খেয়াল করেছিল ও জিনিসটা, তখন ওটা আহত লোকটার কোমরে আটকানো অবস্থায় ছিল—কুমিরের কামড় খাওয়ার পরও। জিনিসটা যখন পাওয়া গেছে জিপের ভেতরে, তার অর্থ লোকটাকে যখন হসপিটাল-ট্রলিতে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তখন এটা যায়নি ওর সঙ্গে।

মানিবেল্টটা উল্টেপাল্টে ভালোমতো দেখল রানা। না, কোথাও কোনও কাটাছেঁড়ার নমুনা নেই। তারমানে?

গুড়গুড় করে মেঘ ডেকে উঠল আকাশে, দূর দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হলো সে-আওয়াজ।

তারমানে, রানা যখন আহত লোকটাকে নিয়ে আসছিল তখন অল্প কিছুক্ষণের জন্য কি জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল সে? রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি, কিন্তু মানিবেল্টটা খুলে ফেলে দিয়েছে জিপের মেঝেতে যাতে...

যাতে রানা দেখতে পায় এটা?

কেন? কী আছে এই বেল্টের ভেতর?

জানা হলো না জবাবটা—কানে তালা লাগিয়ে বাজ পড়ল কাছেই কোথাও, একঝলক বাতাস বয়ে গেল, তারপরই হুড়মুড় করে নামল কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি।

দ্রুত হাতে জিপ লক করে ছুট লাগাল রানা।

দুই

বাংলায় একটা কথা আছে: বাইরে ফিটফাট, ভেতরে সদরঘাট। সেণ্ট্রাল হাসপাতালের অবস্থাও তা-ই।

হাসপাতালের বাইরের অংশে সাজানো গোছানোর জন্যে যা খরচ করা হয়েছে, ভেতরে তার অর্ধেকও করা হয়েছে কি না সন্দেহ। সে-হিসেবে ইমার্জেন্সি রুমটা, এককথায় ভয়াবহ। ঘরটা মস্ত, আয়তাকার, ইমার্জেন্সি ডেস্ক ছাড়িয়েই; এখানে ভেণ্টিলেশন ব্যবস্থা নেই। ইমার্জেন্সি ডেস্কে যে-মেয়েকে বসানো হয়েছে, লাউডস্পিকারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে তার কণ্ঠ—সে দু'-চারটে বাত যা বলছে তা শুনতে কোনও সমস্যা হচ্ছে না হাসপাতালের কারোরই।

ইমার্জেন্সি রোগীদের স্বজনরা তো বটেই, ঘরটার ভেতরে ছোট ছোট চৌকিতে শুয়ে-বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে সাত-আটজন লোককে, প্রথম দেখায় যাদেরকে ইমার্জেন্সি রোগী বলেই মনে হয়! অর্থাৎ কেবিন দূরে থাক, সাধারণ ওয়ার্ডেও ঠাঁই দেয়া যায়নি হতভাগ্য লোকগুলোকে, নিয়ে আসা হয়েছে এই ঘরে। বেশিক্ষণ হয়নি জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে ঘরের মেঝে, বাতাসে ব্লিচিং পাউডার ও ফেনাইল জাতীয় কিছুর কড়া গন্ধ। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রোগীদের ক্ষতস্থানে ব্যবহৃত অ্যাণ্টিসেপ্টিক বা

বইঘর.কম

মলমের গন্ধ। যাদের অবস্থা বেশি খারাপ তারা নেতিয়ে পড়েছে, যারা একটু ভালো তারা হয় প্রলাপ বকছে নয়তো ফরিয়াদ জানাচ্ছে ঈশ্বরের কাছে। কাদের মনোরঞ্জনের জন্য কে জানে—কম করে হলেও বিশ বছরের পুরনো মডেলের একটা টিভি চলছে এককোনায় রাখা একটা ট্রলির ওপর, সেটার ঝিরঝিরে ছবি দেখলে বোঝার জো নেই কী দেখানো হচ্ছে আসলে।

সব মিলিয়ে গা গুলিয়ে ওঠার মতো পরিবেশ।

ভেতরে ঢুকে এদিকওদিক তাকিয়ে নিজের জন্য একটা কোনা বেছে নিল রানা, পিঠভাঙা একটা চেয়ার ঠেলে নিয়ে গেল দেয়ালের কাছে, ওটাতে বসে হেলান দিল দেয়ালে। ঘরের লোকগুলোকে দেখছে। লোকগুলোও দেখছে ওকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে।

যেভাবে বুক চিতিয়ে হেঁটে গিয়ে বসে পড়ল রানা, তাতে রোগী বলে মনে হয় না ওকে। অথচ ওর পরনের শার্ট আর জিন্সে রক্তের দাগ। নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই কোনও রোগীকে ভর্তি করিয়েছে কি না ইমার্জেন্সিতে, কারণ সেক্ষেত্রে ভিযিটর্স কার্ড বলে একটা আইডি ঝুলিয়ে দেয়া হতো ওর গলায় ফিতে দিয়ে, কিন্তু সেটাও দেখা যাচ্ছে না।

ঘামছে রানা। এ-রকম একটা পরিবেশে চিকিৎসাসেবা দিচ্ছে কী করে ওরা?

সবচেয়ে কাছের চৌকিটাও রানার কাছ থেকে দশ ফুট দূরে, সেখানে শুয়ে আছে অশীতিপর এক লোক, সারাক্ষণ মাথাটা নড়ছে একটু একটু; গর্তেবসা জ্বলজ্বলে চোখে এতক্ষণ দেখছিল রানাকে, দম বের হওয়ার কায়দায় বার কয়েক কেশে উল্টোদিকে ঘুরল এখন। ওই লোক ইমার্জেন্সি পেশেন্ট কেন, কে জানে!

এই ঘরে একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না রানার, কিন্তু বের হয়ে যাবেই বা কোথায়? বাইরে ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে এবং অকারণে কাকভেজা হওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই ওর। সবচেয়ে ভালো হতো,

যদি আহত লোকটাকে ডক্টর ভেলরের হাতে তুলে দিয়েই জিপ নিয়ে ফিরে যেত হোটেলে। সেক্ষেত্রে নোংরা কাপড় বদল করতে পারত—শার্ট আর জিন্সে রক্তের দাগ লক্ষ করেছে ও, চাইলে চট করে একটা শাওয়ারও নেয়া যেত। তারপর ধীরেসুস্থে ফিরে আসতে পারত সেণ্ট্রালে। ততক্ষণে যদি অপারেশনের কাজ শেষ হয়ে যেত ভেলরের, তা হলে জানা যেত লোকটার অবস্থা কী, ওর জন্য কিছু করতে হবে কি না।

ধেৎ, ভুল হয়ে গেছে।

এখন করার মতো কাজ একটাই আছে। মানিবেল্টটা খুলে দেখা যেতে পারে, কী আছে সেটার ভেতর।

বেল্টটা হাতে নিয়ে চেইন খুলতে যাচ্ছিল রানা, ইমার্জেন্সি রুমের খোলা দরজার বাইরে থেকে ওর নামটা উচ্চারিত হতে শুনে থেমে গেল।

'মাসুদ রানা?' ইংরেজিতে বলছে এনকয়রি ডেস্কের মেয়েটা, 'লম্বাচওড়া বিদেশি লোকটা? হ্যাঁ, দেখেছি। ইমার্জেন্সি রুমের দিকে গেছে। ওখানেই আছে সম্ভবত।'

ফাঁপা দৃষ্টিতে মানিবেল্টটার দিকে তাকিয়ে আছে রানা, ঘড়ির কাঁটার মতো কিছু একটা টিক্ টিক্ করছে মাথার ভেতরে। আস্তে করে পরে নিল ওটা নিজের কোমরে।

ওর নাম জানাজানি হয়ে গেছে? এবং ওকে খুঁজতে ইমার্জেন্সি রুমের দিকে আসছে এক বা একাধিক লোক?

লম্বা কিন্তু হালকাপাতলা শরীরের দুই পুলিশ অফিসার এসে দাঁড়াল গোবরাটে। ঘরের ভেতরে এদিকেওদিকে তাকাচ্ছে ওরা, খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে রানাকে। দেখতে পেয়ে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এল ওরা রানার দিকে। কাছে এসে একজন হাত বাড়িয়ে দিল ওর দিকে। 'মিস্টার রানা?'

হাতটা হালকাভাবে ধরে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আর আপনি?'

'আমি মোফাট ফুগুই, রয়্যাল ইসাটাবু পুলিশ ফোর্সের সার্জেন্ট,' লোকটার ইংরেজিকথন সাবলীল না।

বইঘর.কম

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল ফুগুই, ওর সঙ্গের পুলিশটা দাঁড়িয়ে থাকল। বোঝা গেল, পদমর্যাদায় সে ফুগুইয়ের নিচে।

'আসলে...' পুলিশি ক্যাপটা পেছনের দিকে কিছুটা ঠেলে দিল ফুগুই, ঘেমেওঠা কপাল চুলকাল একটু, 'দুর্ঘটনাটার ব্যাপারে জানতে এসেছি আমরা।'

'দুর্ঘটনা?'

মাথা ঝাঁকাল ফুগুই। 'কুমিরের হামলার কথা বলছি।'

আরেকটু আরাম করে বসার চেষ্টা করল রানা। 'ঠিক কী জানতে চান?'

'প্রথম থেকে শুরু করে সব।'

'বলব। তবে তার আগে একটা কথা জানতে পারি?'

'কী?'

'আমি একজন ট্যুরিস্ট, এখানে আসার আগে রয়্যাল পুলিশের ব্যাপারে দু'-চার লাইন পড়েছি ইন্টারনেটে। জানতে পেরেছি আপনাদের সীমাবদ্ধতার কথা। কিন্তু আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে, উইকিপিডিয়ার মতো রেফারেন্সও সবসময় ঠিক কথা বলে না।'

দাঁত বের করে হাসল ফুগুই। 'না, উইকিপিডিয়া ঠিক কথাই বলেছে।'

'তা হলে এত জলদি আমার সন্ধান পেলেন কী করে?'

'কারণ নাগরিক দায়িত্ব পালন করেছেন ডক্টর ভেলর। হাসপাতালের রিসিপশনিস্টকে দিয়ে ফোন করিয়েছেন তিনি আমাদের কাছে, মাটানিকাউ নদীর একটা খালে কী ঘটেছে জানতে পেরেছি আমরা। একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে, তা-ও জেনেছি। এটা আসলে...আমাদের রুটিন এনকয়ারি বলতে পারেন।'

কুমিরের হামলা থেকে শুরু করে এই হাসপাতালে পৌঁছানো পর্যন্ত ঘটনাগুলো বলল রানা, তবে মানিবেল্টের ব্যাপারটা এড়িয়ে

গেল সচেতনভাবে।

'তারমানে,' আবারও কপাল চুলকাল ফুগুই, 'আপনি বলতে চান...জঙ্গলের ভেতর থেকে হঠাৎ বাইরে বের হন মিস্টার...। কী যেন নাম লোকটার?'

নিরীহ ভঙ্গিতে দু'হাত উল্টাল রানা। 'আমি জানি না।'

'জিজ্ঞেস করেননি?'

'সুযোগ পাইনি। তার আগেই জ্ঞান হারায় সে।'

'সঙ্গে কিছু ছিল...মিস্টার...কী মুশকিল, নাম ছাড়া ডাকা যায় নাকি একটা মানুষকে? আলোচনার খাতিরে ওর একটা নাম দেয়া যাক...ধরুন রিকি। মিস্টার রিকির সঙ্গে কিছু ছিল?'

'কিচ্ছু না। অন্তত আমি দেখিনি।'

'জঙ্গল থেকে বের হয়েই সোজা লাফিয়ে পড়লেন তিনি খালের পানিতে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'কুমিরের কথা মাথায় আসেনি তাঁর?'

'সেটা তিনিই বলতে পারবেন। দেখে সে-রকম মনে হয়নি আমার।'

'হুঁ। আপনি একা লড়াই করেছেন দু'-দুটো কুমিরের বিরুদ্ধে?'

'আসলে লড়াই করেছি বললে বাড়িয়ে বলা হয়। যেটা কামড়ে ধরার চেষ্টা করছিল মিস্টার রিকিকে, সেটার একটা চোখে ছিপের গুঁতো দিতে পেরেছি আর কী। আর দ্বিতীয় কুমিরটা, আগেও বলেছি, আমার ছুঁড়েদেয়া মাছ খাওয়া ছাড়া তেমন কিছু করেনি।'

বিজ্ঞের মতো মাথা ঝাঁকাচ্ছে ফুগুই। 'আপনি যখন শুশ্রূষা করছিলেন মিস্টার রিকির, তখনও তিনি কিছু বলেননি আপনাকে?'

আশ্চর্য হওয়ার ভান করল রানা। 'কী বলবে? আর বলবেই বা কীভাবে? কুমিরের কামড় খেয়ে মরতে বসেছে যে-লোক, তার

বলার কী থাকতে পারে?'

'হুঁ। কবে এসেছেন আপনি ইসাটাবুতে?'

'গতকাল সন্ধ্যায়।'

'উঠেছেন কোথায়?'

'মাকিরা-উলাওয়া নামের একটা জায়গায়, হোটেল মেণ্ডনায়।'

'চিনি। মিস্টার রানা, নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একটা মানুষকে বাঁচিয়েছেন আপনি, আপনাকে এভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করাটা ঠিক না, তারপরও করছি। কারণ ইসাটাবুতে হঠাৎ করেই গায়েব হয়ে যাচ্ছে লোকজন, তাদের কেউ কখনও ফিরে আসছে না আর।'

'লোকজন এভাবে গায়েব হয়ে যাচ্ছে কেন?'

'জানি না...বুঝতে পারছি না আমরা আসলে...সামাল দিতে পারা তো পরের কথা। ব্যাপারটা একতরফাভাবে কুমিরের উৎপাত কি না, নির্ণয় করার চেষ্টা করছি।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, কিছু বলল না।

উঠে দাঁড়াল ফুগুই। 'আপনার মানিবেল্টটা...যদি কিছু মনে না করেন...ট্যুরিস্টদের কোমরে ঠিক যেন মানায় না।'

সার্জেন্টের চোখে চোখ রেখে মুচকি হাসল ও। 'পুরনো হয়ে গেছে, না? এটা আসলে এখান থেকে কিনিনি আমি, আসার সময় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।'

'তা-ই?' হ্যাটটা ঠিক করল ফুগুই। 'ওটার গায়ে দুটো ইংরেজি অক্ষর দেখতে পাচ্ছি—জে আর ভি। আপনার নাম তো মাসুদ রানা। সে-হিসেবে এম এবং আর অক্ষর দুটোরই কি শোভা পাওয়া উচিত ছিল না আপনার মানিবেল্টে?'

বুকের খাঁচায় বাড়ি মারতে চাওয়া হৃৎপিণ্ডটাকে জোর করে সামলাল রানা, সার্জেন্টের সঙ্গে যাতে চোখাচোখি না হয় সেজন্য লোকটার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল বেল্টের দিকে। মাথা নিচু করে রেখেই বলল, 'আসলে...আপনার দৃষ্টি ঈগলের মতো।

এতদিন হয়ে গেল ব্যবহার করছি এই জিনিস...' জে এবং ভি অক্ষর দুটো দেখতে পাওয়ামাত্র, যা বলতে যাচ্ছিল তা সামলে নিয়ে বলল, 'ওটা আমার বাগ্দত্তার নাম।'

'বাগ্দত্তা?'

'জয়া ভাদুড়ি,' মনে মনে অমিতাভ বচ্চনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল রানা।

'জয়া ভাদুড়ি? ভারতীয় উপমহাদেশের লোক নাকি আপনি?'

'জী।'

'কিন্তু...আপনার ফিয়্যান্সেকে আপনার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে না যে?'

'সঙ্গে করে না আনলে দেখা যাবে কী করে?'

'মানে?'

'ওদের পরিবারটা রক্ষণশীল। বিয়ের আগে...'

'হুঁ,' আবারও বলল ফুগুই। 'কী করেন আপনি?'

'তেমন কিছু না। বাপ-মা'র একমাত্র সন্তান আমি, একটা দুর্ঘটনায় বাবা-মা একসঙ্গে মারা যাওয়ার পর উত্তরাধিকার সূত্রে বেশকিছু সম্পত্তি আর টাকাপয়সা পেয়েছি, সেগুলো থেকে যা আয় হয় তা আমার মতো একা একটা মানুষের খাওয়া-পরা আর ঘোরাফেরার জন্য যথেষ্ট। তাই কিছু করতে হয় না আমাকে।'

'হুঁ। এখানে আসার পর কোনও সমস্যা বোধ করছেন?'

'সমস্যা! কীসের? ইসাটাবু তো খুব ভালো জায়গা। তবে...আমার জিপটা যাদের কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছি, তারা বলে দিয়েছে, গাড়ি লক না করে যাতে কোথাও না যাই,' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল রানা।

চেহারা দেখে মনে হলো না, রসিকতাটায় কোনও মজা পেয়েছে ফুগুই। রানার সঙ্গে হাত মিলিয়ে গুড ডে বলে চলে গেল সে তার সঙ্গীকে নিয়ে।

হাঁপ ছাড়ল রানা, বসে পড়ল চেয়ারে। খেয়াল করল, ঘরের প্রায় সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে। পুলিশের একজন সার্জেন্ট

এসে যার সঙ্গে কথা বলে যায়, যার শার্ট-প্যান্টে রক্তের দাগ দেখা যায়, সে-লোক নিশ্চয়ই কোনও-না-কোনও অস্বাভাবিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত।

কাউকে পাত্তা দিল না রানা, পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল। পুলিশকে কেন খবর দিতে গেল ডক্টর ভেলর? শুধুই কর্তব্যবোধ?

হলে অসুবিধা কোথায়? যেখানে সবাই কর্তব্য এড়াতে চায়, সেখানে দু'-একজন ব্যতিক্রমী হলে চোখে লাগাটাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া, জোর দিয়ে বলা যাবে না, সার্জেন্ট ফুগুইয়ের আচরণে বাড়াবাড়ি কিছু ছিল। আহত লোকটার পরিচয় বের করতে চাওয়াটা, আহত লোকটার জন্যই দরকার। ওর স্বজনদের খবর দেয়া যাবে, ওরা ওর দায়িত্ব নিতে পারবে। সেক্ষেত্রে, মানিবেল্টের কথাটা ফুগুইয়ের কাছে চেপে গিয়ে কি ভুল করল রানা?

প্লাস্টিক ক্লিপে চাপ দিয়ে বেল্টটা কোমর থেকে আলগা করল ও। ঘুণেখাওয়া ছোট্ট একটা টেবিল আছে কাছেই, ওটা টেনে নিয়ে বেল্টটা রাখল তার ওপর, চেইন খুলল।

ভেতর থেকে প্রথমেই পাওয়া গেল একটা এনআইডি কার্ড। ছবিটা একনজর দেখে নিঃসন্দেহ হলো রানা, এটা সেই আহত লোকেরই। তবে কার্ডের ছবিতে বয়স আরও কম লাগছে। অস্বাভাবিক নয়—সরকারি সংস্থাকে হয়তো পুরনো ছবি সরবরাহ করা হয়েছে।

নামের ঘরে লেখা আছে: জেকব ভাউযা। জে-ভি'র মানে বোঝা গেল। আরও জানা গেল, ভাউযা ইসাটাবুতেই জন্মেছে, জন্মতারিখ: তেইশ জুলাই উনিশ শ' সাতাত্তর। অর্থাৎ চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে বয়স।

কার্ডটা উল্টো করে ধরল রানা।

এখানে ভাউযার বাবা-মা'র নাম লেখা আছে, বলা হচ্ছে: সে একজন খ্রিস্টান। ঠিকানাটা মনোযোগ দিয়ে দেখল রানা, কিন্তু

সেটা পরিচিত বলে মনে হলো না ওর, না হওয়াটাই স্বাভাবিক। টেলিফোন নম্বরের ঘরে সাত ডিজিটের একটা নম্বর দেখা যাচ্ছে—সম্ভবত ইসাটাবুর কোনও স্থানীয় অপারেটরের: ৬৬২০৩৫১।

লেমিনেটেড কার্ডটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানা, ডানহাতের তর্জনী আর মধ্যমার সাহায্যে একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে ঘোরাচ্ছে। এই কার্ড দেখে কি কিছু বুঝতে পারা উচিত ওর? উত্তরটা যদি হ্যাঁ হয়ে থাকে, তা হলে কী সেটা?

ঠোঁট উল্টাল রানা, কাঁধ ঝাঁকাল আনমনে। কার্ডটা নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। বেল্টের চেইনখোলা জায়গাটা দু'-আঙুলে ফাঁক করল আরেকটু, ভেতরে আর কী কী আছে দেখছে।

প্রথমেই নজর কাড়ল কিছু টাকা। রানার দিকে যারা তাকিয়ে আছে তাদের দৃষ্টি আবারও উপেক্ষা করে সবগুলো নোট বের করল ও। এক শ' সলোমন আইল্যাণ্ডস ডলারের নোট আছে কয়েকটা। গুনল রানা। ঠিক সাতটা। দুটো বেশ চকচকে, বাকি পাঁচটা কেমন হলদেটে সবুজ। একটু খটকা লাগল ওর, জিন্সের পেছনের পকেট থেকে বের করল নিজের মানিব্যাগ।

গতকাল হেণ্ডারসন ফিল্ডে নামার পর ওখানকার এএনযেড ব্যাংকের টোয়েন্টি ফোর-সেভেন কিঅস্ক বুথ থেকে কিছু ডলার ভাঙিয়েছে ও, ভাঙতিগুলো সব নিয়েছে এক শ' সলোমন আইল্যাণ্ডস ডলারে। মানিব্যাগ থেকে ও-রকম একটা চকচকে নোট বের করল। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে ভাউযার দুটো চকচকে নোটের সঙ্গে মেলাল নিজেরটা। না, কোনও পার্থক্য চোখে পড়ছে না।

এবার ভাউযার একটা হলদেটে সবুজ নোট হাতে নিল রানা, মেলাতে শুরু করল নিজের নোটটার সঙ্গে।

রানি দ্বিতীয় এলিযাবেথের যৌবনকালের ছবিটা আছে যে-পিঠে, দুটো নোটের বেলাতেই সেদিকটা প্রথমে দেখছে ও। দুটো নোটেই "সলোমন আইল্যাণ্ডস" লেখাটা হুবহু একরকম।

বইঘর.কম

"সলোমন"-এর এস অক্ষরটার বাঁ পাশে রানির রাজদণ্ডের একই ছবি দেখা যাচ্ছে দুটো নোটেই। "আইল্যাণ্ডস"-এর এস অক্ষরটার ডান পাশে একটা তীরের-ফলা, দুটো নোটেই আছে সেটা।

আরেকটু নিচে তাকাল রানা। এখানে নোটের সিরিয়াল নম্বর। রানার নোটটা এ/আই ০০০২৫৫ ক্রমের। নোটটার নিচের দিকে, ডান পাশে, রানি এলিযাবেথের বাঁ কাঁধের ওপরে ঠিক একই নম্বর। ভাউযার হলদেটে সবুজ নোটটা এ/এম ০০৮৩৪০ সিরিয়ালের, রানির কাঁধের ওপর একই নম্বর।

এবার কথা মেলানোর পালা। দুটো নোটেই ওপরের দিকে মাঝখানে লেখা আছে: "দিস নোট ইয লিগাল টেণ্ডার ফর"...নিচে ওয়ান হাণ্ড্রেড ডলার্স...তার নিচে ইন দ্য সলোমন আইল্যাণ্ডস। তারও নিচে, কিছুটা জায়গা ফাঁকা রেখে, সলোমন আইল্যাণ্ডস মানিটারি অথরিটির চেয়ারম্যান এবং জনৈক সদস্যের স্বাক্ষর। একেবারে নিচের দিকে একটা ডায়মণ্ডের দু'পাশে দুটো বৃত্ত, পাশে দুটো টাইগার শার্ক। দুই হাঙরের দুই পাশে অঙ্কে লেখা: ১০০।

দুটো নোটই টেবিলটার ওপর রেখে দিল রানা, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ঘড়ির কাঁটার টিকটিকের মতো কিছু একটা যেন ক্রমাগত বাড়ি দিচ্ছে ওর মগজে, অস্বস্তিকর অনুভূতিতে ভুগছে ও।

পকেট থেকে রুমাল বের করল আবারও; ঘেমেওঠা কপাল, চোয়াল আর গলা মুছল। ওর মনে হলো, বাইরে বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমেছে।

টেবিলে-রাখা নোট দুটো উল্টাল ও, পাশাপাশি রাখল গায়ে গা মিশিয়ে। এবারও একেবারে ওপরের দিকে মাঝখানে লেখা "সলোমন আইল্যাণ্ডস"। সলোমন শব্দটার এস-এর বাঁ পাশে ১০০, আইল্যাণ্ডস শব্দটার এস-এর ডান পাশে প্রথমে একটা কচ্ছপ, তারপর ১০০। দুটো নোটেরই ঠিক মাঝখানে কথায় লেখা: ওয়ান হাণ্ড্রেড ডলার্স। দুটোর ডানদিকে চিত্রবিচিত্র একটা স্তম্ভের ছবি, আর বাঁ দিকে অন্য একটা ছবি।

সাদাকালো ছবিটাতে দেখা যাচ্ছে, সলোমন দ্বীপপুঞ্জের কোনও এক দ্বীপের একদল আদিবাসী পুরুষ, ধান অথবা ওই জাতীয় কোনও ফসল কেটে সেগুলো মাড়াই করার জন্য কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ছবির একেবারে সামনের লোকটা শুধু কৌপীনের মতো কী যেন পরেছে, বাকিদের পরনে লেংটি। থ্যাবড়ানো চেহারায় রঙ মেখে সং সেজে আছে সবাই। দলবদ্ধ পুরুষদের থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন বয়স্কা মহিলা, এদেরও পোশাক বলতে শুধু কৌপীন। সবারই স্তনযুগল ঝুলে নেমে এসেছে প্রায় নাভির কাছে। দু'-একজনের গলায় হাঙরের দাঁতের মালা।

তিন পায়ার ওপর বিশেষ কায়দায় ভর দিয়ে রাখা একটা গুঁড়ি ব্যবহৃত হবে মাড়াই করার কাজে; ওটাকে দেখা যাচ্ছে নোটের নিচের দিকে, মাঝখানে। গুঁড়িটার দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিটানি বন্ধ হয়ে গেল রানার।

ওর চকচকে নোটটায় গুঁড়িটা ত্রিমাত্রিক—বিশেষ কায়দায় এমনভাবে ছাপানো হয়েছে যে, নিচের মাটি দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। কিন্তু ভাউযার হলদেটে সবুজ নোটে গুঁড়িটা দ্বিমাত্রিক, সেটার তিন পায়া আছে বটে, কিন্তু নিচে মাটি দেখা যায় না।

এই বিশেষ ব্যাপারটা, ভাউযার হলদেটে-সবুজ বাকি চারটা নোটের ক্ষেত্রে মিলিয়ে দেখল রানা দ্রুত।

ওর পিঠ সোজা হয়ে গিয়েছিল আনমনে, চেপে রাখা দম প্রায় নিঃশব্দে ছেড়ে আবার হেলান দিল ও।

যা ভেবেছিল তা-ই—হলদেটে সবুজ নোটগুলো জাল।

বুকের ভেতরে আকুলিবিকুলি করছে আর একটা সিগারেটের জন্য, কিন্তু হাসপাতালের ভেতরে সিগারেট নিষিদ্ধ। কিছুক্ষণ ছটফট করে নিজের নোটটা মানিব্যাগে ঢুকিয়ে রাখল রানা, ভাউযার মানিবেল্টে ঢুকিয়ে রাখল ওর নোটগুলো আর আইডি কার্ড। তারপর হেলান দিল আবারও, দু'হাত একসঙ্গে করে রেখেছে চাঁদির ওপর। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সবচেয়ে কাছের

বইঘর.কম

চৌকিটার দিকে।

অশীতিপর লোকটা উঠে বসেছে, আরও জ্বলজ্বলে দেখাচ্ছে ওর চোখ দুটো, যেন দম বেরিয়ে যাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে বেশ কিছুক্ষণ কাশল সে। তারপর চৌকি থেকে নামল, কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে যাচ্ছে ঘরের একমাত্র টয়লেটের দিকে। দেখে মনে হচ্ছে টলছে মানুষটা—এখনই পড়ে যাবে।

চট্ করে চেয়ার ছাড়ল রানা, প্রায় ছুটে গিয়ে ধরল বুড়োকে। টয়লেট পর্যন্ত পৌঁছে দিল ওকে। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে যখন বের হলো বুড়ো, লোকটাকে ধরে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে এল চৌকি পর্যন্ত, শুয়ে পড়তে সাহায্য করল। বীভৎস কাশিটা কাশতে কাশতে কী যেন বলল লোকটা, ধন্যবাদ দিল কি না বোঝা গেল না ঠিক, পায়ের কাছে বিছিয়ে-রাখা একটা কম্বল টেনে নিল নিজের জন্য। নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসে পড়ল রানা।

তা হলে ভাউযার এই মানিবেল্টের মানে কী দাঁড়াচ্ছে?

বিশ, দশ এবং পাঁচ সলোমন-আইল্যাণ্ড ডলারের কয়েকটা নোট উঁকি দিচ্ছে চেইনখোলা বেল্টটার ভেতর থেকে, কেন যেন ওগুলোর প্রতি আগ্রহ বোধ করছে না রানা। এক শ' ডলারের পাঁচটা জাল নোট ওর সব কৌতূহলে পানি ঢেলে দিয়েছে।

ভাউযা কি জেনেবুঝে নোটগুলো বহন করছিল ওর মানিবেল্টে? উত্তরটা যদি হ্যাঁ হয়, তা হলে লোকটা কি জাল টাকার কারবারি? নাকি জঘন্য ওই পেশার দুষ্টচক্রে একজন দালাল?

এ-প্রশ্নের উত্তরও যদি হ্যাঁ হয়, তা হলে জটিল একটা সমস্যা এসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে রানার সামনে। বেল্টটা পরার এবং খোলার সময় রানা নিশ্চিত হয়েছে, ওটা কোমরের সঙ্গে বাঁধার ক্লিপটা প্লাস্টিকের হলেও যথেষ্ট মজবুত—আপনাআপনি খুলে যেতে পারে না। খালের তীর থেকে ভাউযাকে হাসপাতালে নিয়ে আসার সময় রানা যতই রাফ ড্রাইভিং করে থাকুক না কেন, ও নিশ্চিত, ক্লিপটা আপনাআপনি খুলে যায়নি। আর খুলে গেলেও জিপের মেঝেতে

ওভাবে পড়ে থাকতে পারে না। রানার এখনও ধারণা, ভাউযাই বেল্টটা খুলে ফেলে দিয়েছিল, যাতে...

যাতে কী? রানা যেন পায় ওটা? তারপর?

তারপর ভেতরের জাল নোটগুলো দেখতে পারে? তাতে কার কী উপকার? ভাউযা জাল নোটের কারবারি হলে ওর একটা লাভ আছে বটে। অজ্ঞান অবস্থায় ধরা পড়তে হবে না নোটগুলোসহ, আইনি জটিলতা এড়ানো যাবে...

না, মিলছে না। যে-মানিবেল্টে লোকটার আইডি কার্ড আছে, যে-বেল্টে ওর নামের আদ্যাক্ষর আছে, সেটা রানার মাধ্যমে হোক অথবা অন্য কারও মাধ্যমে হোক, পুলিশের কাছে গেলে ফাঁসবে ভাউযাই।

কিন্তু কথা হচ্ছে, এসবের সঙ্গে লোকটার জঙ্গল থেকে ছুটে বের হওয়া এবং পাগলের মতো খালের পানিতে লাফিয়ে পড়ার যোগসূত্র কী?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল রানা। এভাবে এখানে বসে থেকে সারাজীবন ধরে ভাবলেও সমাধান হবে না এই রহস্যের। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ও। কাঁচের ওপর বৃষ্টির ফোঁটার অত্যাচার অনেক কমে গেছে। তারমানে আরও দুর্বল হয়েছে বৃষ্টিপাত। ভালো।

বুকের ভেতরে একটা ছটফটানি টের পেল রানা। এভাবে অকর্মণ্যের মতো এই ইমার্জেন্সি রুমে বসে থাকতে অসহ্য লাগছে ওর। উঠে গিয়ে ডক্টর ভেলরের খোঁজ করবে নাকি? জাল টাকার কারবারি হোক বা না হোক, ভাউযার কী হলো জানা দরকার না?

মানিবেল্টের চেইনটা আটকে দিতে গিয়েও আটকাতে পারল না রানা—ভেতরে আর কিছু আছে কি না নিশ্চিত হওয়া উচিত।

টেবিলের ওপর থেকে জিনিসটা তুলে এনে ভালোমতো ঘাঁটতে শুরু করল ও। পাঁচ ডলারের দুটো নোটের মাঝখানে পাওয়া গেল পাসপোর্ট সাইযের একটা সাদাকালো ফটোগ্রাফ। ছবিটা হাতে নিল রানা।

বইঘর.কম

একটা মেয়ের ছবি, সম্ভবত নার্স সে। এই মেয়েও ইসাটাবুর সন্তান। একমাথা ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুলে নার্সদের ক্যাপটা দেখে মনে হচ্ছে, লম্বা লম্বা ঘাসের ঘন জঙ্গলে বড় একটুকরো পাথর যেন। তবে আধুনিক হওয়ার কিছুটা চেষ্টা করেছে মেয়েটা—ভ্রূ প্লাক করেছে, লিপস্টিক মেখেছে। আবক্ষ ছবিতে শার্ট, টাই আর নার্সকোট পরে আছে সে; সাদাকালো হওয়ায় কোনওটারই রঙ বোঝার উপায় নেই। ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসছে; অকৃত্রিম খুশি ওর দু'চোখে, টোলপড়া দু'গাল আর দুই ঠোঁটের কোনায়। চেহারাটা মিষ্টি আর মায়াকাড়া।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ফটোগ্রাফটা উল্টাল রানা। এপিঠে ইংরেজিতে ছোট হাতের অক্ষরে লেখা আছে: নান ম্যাডল (nan madol)। কিছুটা নিচে আরও ছোট করে লেখা:

দিন ৯টা ২৯ মিনিট ১৩ সেকেণ্ড

১৫৯ পাউণ্ড ৫০ শিলিং ৩৭ পেন্স।

মানে?

নান ম্যাডল কী? ছবির নার্সটার নাম?

সময়টা দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?

যে-দেশে চলে সলোমন আইল্যাণ্ড ডলার অথবা মার্কিন ডলার, সেখানে পাউণ্ড-শিলিং-পেন্সের হিসেব কেন?

আরও একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, মাথা নাড়ল আবারও। এখানে বসে চিন্তা করতে থাকলে সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই হবে না আসলে।

মেয়েটার ফটোগ্রাফটা ঢুকিয়ে রাখল ও ভাউযার মানিবেল্টে। নিশ্চিত হলো, মনের ভুলে কোনওকিছু ফেলে রাখেনি টেবিলের ওপর। টেনে দিল বেল্টের চেইন। উঠে দাঁড়িয়ে ওটা পরে নিল কোমরে। আরেকবার রুমাল বের করে ঘাম মুছে পা বাড়াল দরজার উদ্দেশে। খোঁজ করতে হবে ডক্টর ভেলরের। হাতঘড়ি দেখল। সর্বনাশ! খালের তীর থেকে রওয়ানা দেয়ার পর কোন্ ফাঁকে পাকা দেড়টা ঘণ্টা চলে গেছে, টেরই পায়নি। পাকস্থলী

জানান দিল, ডিনারের সময় হয়ে আসছে।

ভেলরের সঙ্গে যদি দেখা হয়, মেয়েটাকে কি ভাউযার কথা বলবে রানা? দরকার আছে? ভেলর যে-রকম কর্তব্যসচেতন, কোনও সন্দেহ নেই মানিবেল্টের ভেতরে জালনোট আছে শুনলে আবার খবর দেবে ফুগুইকে। সার্জেন্টকে দুর্নীতিপরায়ণ মনে হয়নি রানার, কিন্তু সে যে খুঁতখুঁতে সে-ব্যাপারেও সন্দেহ নেই। ভাউযাকে নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিতে পারে লোকটা—ভাউযা গুরুতর আহত হওয়ার পরও।

থাক, সিদ্ধান্ত নিল রানা, আপাতত কিছু বলবে না ভেলরকে। ঘটনা কোন্‌দিকে গড়ায় শেষপর্যন্ত, দেখা যাক। তা ছাড়া, কেন বলতে পারবে না রানা নিজেও—যে-লোকের জীবন বাঁচিয়েছে তার প্রতি একরকমের মায়া টের পাচ্ছে ও। লোকটা জ্ঞান ফিরে পেলে তার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে আছে ওর।

ধীর, অনিশ্চিত পায়ে হেঁটে ইমার্জেন্সি ডেস্কের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ও। উঁচু কণ্ঠের মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করতে যাবে ডক্টর ভেলরের কথা, এমন সময় ভেতরে যাওয়ার করিডোরের মুখ থেকে ডাক দিল ডক্টর নিজেই, 'মিস্টার রানা!'

ঘুরে তাকাল রানা।

ওটি'র অ্যাপ্রন আর মাস্ক খুলে ফেলেছে, তবে এখনও গ্লাভস আর টুপি পরে আছে ভেলর। মেয়েটার সুন্দর চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ।

ওর দিকে এগিয়ে গেল রানা। কাছে গিয়ে বলল, 'কী খবর?'

ঠোঁট উল্টিয়ে মাথা নাড়ল ভেলর। 'আপাতত স্টেইবল। দু'ব্যাগ রক্ত দেয়া হয়েছে লোকটাকে। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল ওর, রঙ ফিরে পেয়েছে কিছুটা। ক্ষতস্থান সেলাই করে দিয়েছি আমরা, ইনফেকশন যাতে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য যা যা করা সম্ভব ছিল করেছি। তারপরও...নিশ্চিত করে কিছু বলার উপায় নেই। আগামী চব্বিশটা ঘণ্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ লোকটার জন্য।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'লোকটার বয়স বেশি না, স্বাস্থ্যও

বইঘর.কম

ভালো, তা না হলে...'

'আহত পা-টার কী অবস্থা? হাড়ের কোনও ক্ষতি হয়েছে?'

'হাঁটুর নিচে কামড় দিয়েছে কুমিরটা, দু'চোয়ালের মাঝখানে চেপে ধরার জন্য সরু জিনিস পেয়েছে, যদিও ঠিকমতো কামড় বসাতে পারেনি। তবে বড় চিড় ধরেছে লোকটার মালাইচাকির নিচের হাড়ে, মানে টিবিয়ায়—ইতিমধ্যে এক্স-রে করেছি আমরা, সে আর কখনও স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারবে কি না সন্দেহ আছে। ...মিস্টার রানা, ইনফেকশন যদি ঠেকাতে না পারি আমরা, তা হলে আহত পা-টা কেটে বাদ দিতে হবে শেষপর্যন্ত।'

এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'দেখা করা যাবে মিস্টার ভাউযার সঙ্গে?'

মাথা নাড়ল ভেলর। 'আবারও সরি বলতে হচ্ছে, মিস্টার রানা। আপনার জিপ থেকে লোকটাকে নামানোর সময় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেয়েছি লোকটাকে, এখন পর্যন্ত জ্ঞান ফেরেনি ওর। ...আপনাকে তা হলে নিজের নাম বলেছে সে?'

নিজের ভুলে নিজের ওপর বিরক্ত হলো রানা, কিন্তু চেহারায় প্রকাশ হতে দিল না ভাবটা। 'আসলে...বোটে যখন তুললাম ওকে...জ্ঞান হারানোর আগে...'

'আর কী কী বলেছে সে? আই মীন...ঠিকানা বা ওই জাতীয় কিছু যদি বলে থাকে...ওর আত্মীয়স্বজনদের খবর দেয়া যেত।'

'না, ঠিকানা বলেনি,' রানার কথাটা মিথ্যা না, কারণ ভাউযার ঠিকানাটা জানে সে, কিন্তু সেটা আসলেই ভাউযা বলেনি ওকে।

'অন্যকিছু?'

মনে করার চেষ্টা করল রানা, তারপর মাথা নাড়ল। 'না, আর কিচ্ছু না। আসলে...কুমির সামলানোর কাজে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, লোকটার সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পাইনি।'

'ও আচ্ছা। মিস্টার রানা, একটা কথা বলে রাখি আপনাকে, জ্ঞান ফিরে পেতে দেরি হতে পারে মিস্টার ভাউযার।'

'কেন?'

'পিঠের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়, মেরুদণ্ডের ঠিক ওপরে, কুমিরের লেজের একটা বাড়ি খেয়েছে লোকটা। স্পাইনাল কর্ডের ওপর এত বড় আঘাত সহ্য করতে পারেনি ওর নার্ভাস সিস্টেম। ঠিক কোমা বলব না, তবে কোমার কাছাকাছি একটা অবস্থায় আছে সে এখন।'

'দুঃখজনক।'

'হ্যাঁ, আসলেই। বুঝতেই পারছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না জ্ঞান ফিরছে লোকটার, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা নিশ্চিত হতে পারছি দর্শনার্থীর সঙ্গে দেখা করতে পারবে সে, ততক্ষণ পর্যন্ত...'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

উসখুস করছে ভেলর, কিছু একটা যেন বলি বলি করেও বলতে পারছে না।

'কিছু বলবেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ব্যক্তিগত একটা প্রশ্ন...আপনাকে বলা উচিত হবে কি না...'

'নির্দ্বিধায় বলুন। প্রশ্নটা খুব বেশি ব্যক্তিগত হলে কথাটা তুলতেন না নিশ্চয়ই?'

'আপনি বলেছেন, ভাউযাকে যখন কুমিরে ধরল, তখন খালে মাছ ধরছিলেন। কিন্তু আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না আপনি একজন জেলে।'

মুচকি হাসল রানা। 'আমি আসলে শখের বশে ছিপ-বড়শি দিয়ে মাছ ধরি। আজ ইচ্ছা ছিল, চার-পাঁচটা মাছ ধরতে পারলে সেগুলো নিয়ে রওনা হব মোহনার দিকে। ওখানে নাকি একচিলতে সৈকত আছে, একের পর এক ঢেউ মাতামাতি করতে থাকে ওদিকটায়। সাগরতীরে একা বসে সূর্যাস্তটা দেখার ইচ্ছে ছিল, খিদে জানান দিলে বানিয়ে নিতাম ফিশ বারবিকিউ।'

হেসে ফেলল ভেলর। 'আপনার পেশা?'

'নির্দিষ্ট কোনও পেশা নেই, বেকার বা ভবঘুরে বলতে পারেন। তবে আর্কিয়োলজি নিয়ে কিছু পড়াশোনা আছে, আগ্রহও আছে সে-বিষয়ে।'

বইঘর.কম

'ইন্টারেস্টিং। আপনাকে দেখে দক্ষিণ এশীয় মনে হয়।'

'ঠিক।'

'ইসাটাবুতে দক্ষিণ এশিয়ার লোকেরা আসেই না বলা যায়। এখানকার বেশিরভাগ পর্যটক হয় অস্ট্রেলিয়া নয়তো নিউযিল্যাণ্ডের নাগরিক। আর আসে আমেরিকানরা, অতিবৃদ্ধ কিছু লোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার কয়েকটা যুদ্ধক্ষেত্র ঘুরেফিরে দেখে নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয় তারা।'

'আপনি বোধহয় অস্ট্রেলিয়ান, না?'

'ঘটনাচক্রে এখান থেকে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যান আমার বাবা। ওখানেই বিয়ে করেন আমার মাকে। ওটা ছিল আমার মা'র দ্বিতীয় বিয়ে, তিনি নিখাদ অস্ট্রেলিয়ান। ...সবাই বলে, আমি নাকি বাবার তেজ আর মা'র রূপ পেয়েছি।' আবারও হাসল ভেলর। 'অনেক বছর থেকেছি আমি অস্ট্রেলিয়ায়, পড়াশোনা করেছি; একসময় বাবার কাছ থেকে শেখা পিজিন ভাষা অপরিচিত লাগত আমার কাছে, ঝালাই করে নিয়েছি এখানে আসার পর।'

'ডাক্তারি পড়াশোনা কি অস্ট্রেলিয়াতেই করেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল ভেলর।

'তা হলে ফিরে এলেন কেন?'

'এখানে একটা কথা চালু আছে: একটা দ্বীপ থেকে একজন দ্বীপবাসীকে সরিয়ে নেয়া যেতে পারে, কিন্তু একজন দ্বীপবাসীর মন থেকে ওই দ্বীপটা সরিয়ে নেয়া যায় না। আমারও হয়েছে তা-ই। গ্র্যাজুয়েশন করলাম, ইন্টার্নশিপও করলাম। তারপর আর কেন যেন মন টিকল না। মা'র দেশের মানুষদের জন্য কাজ করার মতো অনেক লোক আছে, কিন্তু বাবার দেশের মানুষদের দেখবে কে? ওদের জন্য কিছু করার আশায় ফিরে এসেছি ইসাটাবুতে।

'খুব ভালো।'

'আসলে এই দেশের মাটি ও মানুষের প্রতি আমার যে কর্তব্য আছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারিনি। এখন তো আরও

পারব না, কারণ একটা প্রজেক্টের সঙ্গে জড়িয়ে গেছি।'

'প্রজেক্ট?'

'ইসাটাবুর বেশিরভাগ মানুষ কিন্তু এখনও খুব গরিব। পুরো দ্বীপশহরের মাত্র দুটো হাসপাতাল তাদের জন্য যথেষ্ট নয়। আরও হাসপাতাল, আর সেইসঙ্গে কয়েকটা ক্লিনিক দরকার। আমার ইচ্ছা আছে, এখানকার গর্ভবতীদের যথাসম্ভব-কম-খরচে প্রসূতিসেবা দেয়ার জন্য একটা ক্লিনিক খুলব। সেখানে নবজাতকদের টিকা দেয়ারও ব্যবস্থা থাকবে। সেজন্য ফাণ্ড জোগাড় করছি।'

'কিন্তু আপনাদের সরকার? তারা কি...'

হাত নেড়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল ভেলর। 'সরকারের কথা বলে কী লাভ? ইয়োরোপ-আমেরিকা ছাড়া দুনিয়ার কোন্ দেশের সরকার তার জনগণের ভালোমন্দের কথা ভাবে, বলুন তো? কাজেই নিজেদের পথ নিজেদেরকেই দেখতে হবে।'

সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'আপনার মতো দেশপ্রেমিক আর মানবদরদী দেখা যায় না সচরাচর। যদি কিছু মনে না করেন, আপনার প্রজেক্টের জন্য আমি কি কোনও ডোনেশনের ব্যবস্থা করে দিতে পারি?'

ভেলরের এবারের হাসিতে যেন মুক্তো ঝরল। 'তা হলে তো বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য সময় নিয়ে বসতে হয় আপনার সঙ্গে, ডিনার করতে হয় একসঙ্গে। ...ইসাটাবুতে আর কতদিন আছেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক নেই। পাঁচ-ছ'দিন হতে পারে। ভালো লেগে গেলে দু'-তিন দিন বেশিও থাকতে পারি।'

'আজ সন্ধ্যায় কি ফ্রি আছেন? যদি ডিনারে ইনভাইট করি, আসতে পারবেন?'

'ডিনার কেন, আপনার মতো সুন্দরী যদি শুধু পানি খাওয়ানোরও দাওয়াত দেয়, হাজির হতে বাধ্য হবে যে-কোনও লোক।'

বইঘর কম

লাল আভা পড়ল ভেলরের দু'গালে। 'তা হলে "রেইন ট্রি" রেস্টুরেন্টে, ঠিক আটটায়—দাওয়াতটা কিন্তু আমার পক্ষ থেকে।' ঘুরতে গিয়েও ঘুরল না মেয়েটা। 'বন্ধুরা আমাকে শুধু ভেলর বলে ডাকে। আর তুমি করে বলে।'

'আর আমার বন্ধুরাও আমাকে তুমি করে বলে,' একটুখানি হাসল রানা, 'এবং রানা নামে ডাকে। আরেকটা কথা। যতক্ষণ পর্যন্ত না খুঁজে পাচ্ছি ভাউযার স্বজনদের, ওকে এখানে ভর্তি করানো এবং চিকিৎসার খরচ চালানোর দায়িত্ব আমি নিলাম।'

স্থির দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে আছে ভেলর। কিছুক্ষণ পর বলল, 'তোমার মতো কাউকে কখনও দেখিনি আমি, রানা। তুমি...সম্পূর্ণ অন্যরকম।'

'তুমিও।'

তিন

ইসাটাবুর প্রধান সড়কের জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা আমাদের ঢাকার মতই—আধ ঘণ্টার কিছু বেশি সময় ধরে বৃষ্টি হয়েছে, তাতেই পানি জমে গেছে এখানে-সেখানে। হতাশ দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে ঝিরঝিরে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে জিপের কাছে এল রানা, দরজা খুলে উঠে বসল ড্রাইভিং সীটে। ইগনিশন কী-তে মোচড় দেয়ামাত্র আরও বাড়ল ওর হতাশা। ইঞ্জিনের পক্ষ থেকে কোনও সাড়া নেই। আরও একবার মোচড় দিল রানা, কিন্তু এবারও একই অবস্থা।

ব্যাটারি গেছে নাকি আছে জানার জন্য মাথার ওপরের বাতির সুইচ ঠেলল ও, জ্বলে উঠল ওটা। রেডিয়োটা অন করল

জিপের—কাজ করছে।

দরজা খুলে রাস্তায় নামল রানা, বনেট খুলে দেখতে হবে সমস্যা কী। কিন্তু খুলতে হলো না ওটা, কী হয়েছে বুঝে গেল ও।

দুটো লুকিংগ্লাস, দুটো সুদৃশ্য ধাতব দণ্ডের ভেতরে কায়দা করে বসিয়ে, দণ্ড দুটো ঝালাই করে দেয়া হয়েছিল বনেটের দু'পাশে; গাড়ির পার্টস চুরিতে পারদর্শী এক বা একাধিক চোর ঝুম-বৃষ্টির সুযোগে গ্লাস চুরির নিয়তে হ্যাঁচকা টানে ভেঙে ফেলেছে দুটো দণ্ডই; ফুটো দিয়ে ভেতরে সমানে ঢুকেছে জলস্রোত। স্টার্টার মোটরের বারোটা বেজেছে, নির্ঘাত, ডিস্ট্রিবিউটর ক্যাপ বা স্পার্কিং প্লাগ ওয়্যারেরও ক্ষতি হয়ে থাকতে পারে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। যা-ই হয়ে থাকুক, এ-মুহূর্তে সারাই করা ওর একার পক্ষে সম্ভব নয়। যে রেন্ট-আ-রাইড প্রতিষ্ঠান থেকে ভাড়া করেছিল জিপটা, খবর দিতে হবে সেখানে, ঘটনা জানাতে হবে, ওরাই লোক পাঠিয়ে যা করার করবে।

ট্যুরিস্ট গাইড বুকলেটে এ-রকম চুরিচামারির ব্যাপারে সতর্ক করা আছে। কিন্তু কী-ই বা করার ছিল রানার? কোন্ জায়গায় ওঁৎ পেতে আছে কোন্ তস্কর, আগে থেকে জানাটা নিশ্চয়ই সম্ভব না ওর পক্ষে? জিপের দরজায় তালা লাগিয়ে এদিকওদিক তাকাল।

হাসপাতালের গেটের থেকে একটু দূরে একটা বইয়ের-দোকান দেখা যাচ্ছে, সঙ্গে আছে ফলমূলের কয়েকটা দোকান আর মোটামুটি বড় একটা ড্রাগস্টোর। স্টোরটার পাশেই একটা ফোনবুথ। বইয়ের দোকানের দিকে এগিয়ে গেল রানা।

দোকানিকে দেখলে মনে হয় না ইংরেজি জানে। একটা চিন্তা খেলে গেল রানার মাথায়, ভাউযার মানিবেল্ট থেকে এক শ' ডলারের একটা জাল নোট বের করে গিয়ে দাঁড়াল দোকানির সামনে, বলল, '*চেইঞ্জ?*'

রানাকে আপাদমস্তক দেখল লোকটা, বুঝতে পেরেছে কী চায়

রানা, মাথা নাড়ল।

অর্থাৎ ভাঙতি থাক বা না থাক, রানাকে দেয়া হবে না।

দোকানির পাশেই সারি করে বিছিয়ে রাখা হয়েছে অনেকগুলো ট্যাবলয়েড ম্যাগাযিন, কভারপেইজ দেখে বোঝা যাচ্ছে সবগুলোই আসলে পর্নো-পত্রিকা, ট্যুরিস্টদের মনোরঞ্জনের জন্যে। দুটো ম্যাগাযিন তুলে নিল রানা, কভার উল্টে দেখে নিল ইংরেজিতে লেখা দাম। আর্টপেপারে ছাপানো এসব ম্যাগাযিনের কাটতি দুনিয়ার সব জায়গাতেই ভালো, তাই পত্রিকার পুরুত্বের তুলনায় দামটা অনেক বেশি হওয়ার পরও খদ্দেরদের আপত্তি থাকে না। দুটো ম্যাগাযিনের কভারপেজেই উন্নতবক্ষা দুই যুবতীর ছবি, লোকাট ব্রা ছাড়া ঊর্ধ্বাঙ্গে কিছু পরেনি তারা, ছবি তোলার সময় পোয দিতে গিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে দু'বাহু চেপে ধরেছে বুকের সঙ্গে, ফলে ঠেলে বের হয়ে আছে দু'জনেরই স্তনের অনেকখানি।

দুটো পত্রিকাই নিল রানা, জাল নোটটা আবার বাড়িয়ে ধরল দোকানির দিকে। আগেরবারের মতো বলল, 'চেইঞ্জ?'

ঠোঁট দুটো একটু বাঁকিয়ে উপহাসের হাসি হাসল দোকানি, হাত বাড়িয়ে নিল নোটটা। একবার উল্টেপাল্টে দেখে রেখে দিতে যাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজিতে বলে উঠল রানা, 'ওটা ফিরিয়ে দাও। আরেকটা দিচ্ছি তোমাকে।'

বুঝতে না পেরে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটা।

ছোঁ মেরে লোকটার হাত থেকে নোটটা ছিনিয়ে নিল রানা, রেখে দিল মানিবেল্টে, তারপর নিজের মানিব্যাগ থেকে সলোমন আইল্যাণ্ডের এক শ' ডলারের একটা আসল নোট বের করে বাড়িয়ে ধরল।

ওকে আরও একবার আপাদমস্তক দেখল দোকানি, মগজের কোথাও কোনও সমস্যা আছে কি না ভাবছে। দেরি করলে রানা আবার কোন্ কাণ্ড ঘটায়, ভেবে সে-ও প্রায় ছোঁ দিয়ে নোটটা নিল, ভাঙতি দেয়ার জন্য খুলল ক্যাশ কাউন্টারের ড্রয়ার।

'কয়েন্স, প্লিয,' নিজের চাহিদার কথা জানিয়ে দিল রানা।

বুঝতে পারেনি দোকানি, তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'কয়েন্স,' আবার বলল রানা।

ইসাটাবুর স্থানীয় ভাষায় কী যেন বলল দোকানি, বুঝতে না পারার পরও মাথা ঝাঁকাল রানা।

উপহাসের হাসিটা আরও একবার হেসে পাঁচ ডলারের মাত্র দুটো নোট আর কিছু কয়েন ফেরত দিল দোকানদার। রানা বুঝল, বেশি দাম রাখা হয়েছে ওর কাছ থেকে।

প্রতিবাদ করল না ও, ম্যাগাযিন দুটো বগলদাবা করে এবং ভাঙতিগুলো জিন্সের পকেটে ঢুকিয়ে হাঁটা ধরল ফোনবুথের দিকে।

শার্টের পকেট থেকে রেন্ট-আ-রাইড প্রতিষ্ঠানটার কার্ড বের করে রিসিভার তুলে নিল, কয়েনস্লটে দুটো কয়েন ফেলতেই পাওয়া গেল রিংটোন। জায়গামতো ফোন করে ওদেরকে জানিয়ে দিল জিপের সমস্যা আর সেটার ও বোটের বর্তমান অবস্থানের কথা। ওপ্রান্তের লোকটা ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে গজরগজর করল কিছুক্ষণ, যার সারমর্ম হলো: এই ঘটনার জন্য রানাই দায়ী, পইপই করে বলে দেয়ার পরও সতর্ক থাকেনি ও, চোরের দল তাই অনায়াসে নিয়ে যেতে পেরেছে লুকিংগ্লাস দুটো। এবং ক্ষতিপূরণ আর মেকানিকের চার্জ রানাকেই দিতে হবে।

প্রতিবাদ করল না রানা—ফোনে তর্কাতর্কি করার মানে হয় না, একটু পরই সিগনাল দিয়ে কেটে যাবে লাইন, রানার কাছে বেশি কয়েনও নেই। রিসিভার নামিয়ে রেখে বেরিয়ে আসছিল, মনে পড়ে গেল আরেকটা কথা।

ফোনটা করবে কি করবে না ভাবতে ভাবতে রিসিভার তুলে নিল আবার, স্লটে কয়েন ফেলল, তারপর ৬ ৬ ২ ০ ৩ ৫ ১ ডিজিটগুলো চাপল আস্তে আস্তে।

লাইনটা ব্যস্ত! ভাউযার ব্যক্তিগত নম্বর ব্যবহার করে কথা বলা হচ্ছে! কয়েকবার বিযি টোন দেয়ার পর লাইনটা কেটে গেল। রিসিভার রেখে দিল রানা।

এ-কোন্ রহস্যের জালে জড়িয়ে গেল ও? কী হচ্ছে ভাউযাকে

কেন্দ্র করে?

প্রত্যেক অপরাধীর চেহারায় অপরাধের ছাপ থাকে, কিন্তু ভাউযার চেহারায় সে-রকম কিছু দেখেনি ও, অথবা হতে পারে দেখার অবকাশ পায়নি। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর রিসিভারটা আবার তুলে নিল ও, ডায়াল করল ডিজিটগুলো।

হ্যাঁ, এবার রিং হচ্ছে।

ঠিক চারবার রিং হওয়ার পর সাড়া দিল একটা পুরুষকণ্ঠ, 'হ্যালো?'

মনে হচ্ছে সর্দি লেগেছে লোকটার, অথবা নাক দিয়ে কথা বলা ওর বদভ্যাস। একটামাত্র শব্দ উচ্চারণ করেছে, তারপরও বোঝা গেছে, অসহিষ্ণু সে।

'হ্যালো?' রানার কাছ থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে আবার বলল লোকটা।

'ভাউযা?' ধীরে ধীরে বলল রানা।

ওপ্রান্তে নীরবতা। সর্দিলাগা লোকটা বোধহয় বুঝতে পারছে না কী বলা উচিত।

'হ্যালো?' অদ্ভুত কথোপকথনটা চালিয়ে যেতে চায় রানা।

স্থানীয় ভাষায় কিছু একটা বলা হলো ও-প্রান্ত থেকে, ভাউযা শব্দটা ছাড়া অন্যকিছু বুঝল না রানা।

খোলস ছেড়ে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ও। ইংরেজিতে বলল, 'মিস্টার ভাউযার সঙ্গে কথা বলতে চাইছি আমি। এটা কি ওর নম্বর না?'

আবারও নীরবতা। তারপর ওপ্রান্তের লোকটাও বোধহয় খোলস ছাড়ার নিয়তে বলল, 'ইয়েস, দিস ইয ভাউযা স্পিকিং। হু আর য়্যু?'

ভাউযা কথা বলছে? ভাউযা?

রানা বলল, 'আমি পুলিশ সার্জেন্ট মোফাট ফুগুই।'

চুপ হয়ে গেছে ওপ্রান্তের লোকটা। বোধহয় কল্পনাও করেনি পুলিশ সার্জেন্টের ফোন আসতে পারে।

‘কেমন আছো, ভাউযা?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

আবারও কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর একটু যেন কেঁপে উঠল সর্দিলাগা কণ্ঠটা, ‘কী খবর, সার্জেন্ট? ইংরেজিতে কথা বলছ কেন?’

‘তাতে তোমার কোনও অসুবিধা হচ্ছে বলে তো মনে হচ্ছে না।’

আবারও চুপ করে আছে ওপ্রান্তের লোকটা, দ্বিধায় ভুগছে সম্ভবত।

‘আজ দুপুরে জঙ্গলের ভেতরে কী করছিলে তুমি, ভাউযা?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

আবারও নীরবতা। ওপ্রান্তের লোকটা কিছু বলার সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না হয়তো, অথবা সতর্ক হয়ে গেছে।

‘একটু কষ্ট করে থানায় আসতে পারবে?’ সুতো আরেকটু ছাড়ল রানা।

‘কেন?’

‘এখানে কে বা কারা যেন জালনোটের ব্যবসা ফেঁদেছে। রয়্যাল পুলিশ মনে করছে, তোমার কাছ থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে এ-ব্যাপারে।’

লাইন কেটে গেল।

রিসিভারটার দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ওটা ক্রেইডলে রেখে দিল রানা।

কী করা যায় এখন? আবার ফোন করবে ওই নম্বরে? লাভ হবে কোনও? সর্দিলাগা লোকটা ফোন ধরবে না, রানা নিশ্চিত। ব্যাটা ইতোমধ্যে ফোনটা সুইচ-অফ করে দিয়ে থাকতে পারে।

বুথ থেকে বেরিয়ে এল রানা। জিপ নেই, কিন্তু ফিরতেই হবে হোটেলে—ভেলরের ডিনার ইনভাইটেশনের জন্য রেডি হতে হবে। রক্তমাখা শার্ট আর জিন্স না পাল্টালেই নয়। লোকটার আইডি কার্ডে যে-ঠিকানা দেখেছে রানা, সেটা আসলে কোথায়, কাউকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে।

মেণ্ডানা এখান থেকে যথেষ্ট দূরে। হেঁটে ফিরতে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে। তাড়াতাড়ি করতে চাইলে লোকাল বাসই ভরসা।

বুকস্টলটার সামনে আবার দাঁড়াল রানা। আকারে-ইঙ্গিতে জানতে চাইল, বাস স্টপেজটা কোথায় এবং এখান থেকে কতদূরে।

স্টপেজটা কোথায়, সেটা আকারে-ইঙ্গিতে বোঝাতে পারল দোকানি, কিন্তু কতদূরে, সে-প্রশ্নই বুঝল না, কাজেই উত্তরটা বোঝাতে পারার কথা নয়।

ম্যাগাযিন দুটো বগলদাবা করে হাঁটা ধরল রানা।

আনমনা হয়ে হাঁটতে হাঁটতে, হঠাৎ করেই খেয়াল করল ও, সলোমন্স পীস মেমোরিয়াল পার্কের কাছাকাছি চলে এসেছে। কয়েকটা জাপানি শব্দের নিচে ইংরেজিতে তা-ই লেখা আছে। লোহার শিক দিয়ে বানানো একমানুষ সমান উঁচু সীমানাপ্রাচীরের কাছে চলার গতি ধীর করল ও। শেষ বিকেলের নরম আলোয় কেমন থম মেরে আছে পুরো এলাকা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইসাটাবুসহ সলোমন দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটা দ্বীপে দখলদার জাপানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই হয় মার্কিন বাহিনীর। এখানকার যুদ্ধটা পরিচিত "ইসাটাবু ক্যাম্পেইন" নামে, নামটা অবশ্যই আমেরিকানদের দেয়া, এবং বিজয়ীপক্ষ ওরাই। আত্মসমর্পণের আগে যুদ্ধে নিহতদের স্মৃতি হিসেবে এখানে একটা পার্ক বানায় জাপানিরা, যুদ্ধের বেশ কয়েক বছর পরে সেটার খানিকটা সংস্কারও করা হয়। পার্কটার পেছনদিকে মোটামুটি বড় একটা গোরস্তানও আছে।

একই দ্বীপে, এখন পর্যন্ত ভালোমতো না দেখলেও রানা জানে, হেণ্ডারসন ফিল্ডের পাশে, মার্কিনিদের বানানো আরেকটা পার্ক আছে, নাম ইসাটাবু আমেরিকান মেমোরিয়াল—যুদ্ধে বিজয়ীদের স্মৃতির উদ্দেশে নির্মিত।

রানা বুঝল, জাপানিদের পার্কের কোনও ক্ষতি করেনি বিজয়ী

মার্কিনরা, বরং সংস্কারকাজে সহায়তা করেছে।

রানার বাঁ দিকে এখন একটা মার্কেট। তরিতরকারি, মাছমাংস আর গৃহস্থালীর কাজে লাগে এ-রকম জিনিসের অস্থায়ী পসরাই বেশি। জনবহুল জায়গাটা এবং সেটার আশপাশের বিভিন্ন দালানের দেয়াল ছেয়ে আছে সাদাকালো পোস্টারে, চোখে পড়ছে রঙিন ব্যানারও—সামনে কোনও নির্বাচন আছে, অনুমান করল রানা। এসব পেছনে ফেলে আরেকটু এগিয়ে যেতেই বাস স্টপেজটা পেয়ে গেল ও।

কপাল ভালো—বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। রানার আগে লাইন ধরে অপেক্ষা করছিল দুটো মেয়ে আর তিন পুরুষ, বাস চলে আসামাত্র হুড়মুড় করে উঠে পড়ল পাঁচজনই। রানাও উঠল। ড্রাইভারের পেছনের সীটে, নিজের জন্যে জায়গা করে নিল ও। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল বাসটা, কিন্তু আর কোনও যাত্রী না পেয়ে ছেড়ে দিল।

আরাম করে বসতে একটু হেলান দেয়ার চেষ্টা করল রানা, পা দুটো ছড়িয়ে দিল সামনের দিকে, ম্যাগাযিন দুটো নামিয়ে রাখল কোলের ওপর। ঘোলাটে উইণ্ডশিল্ড ভেদ করে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে, কিন্তু তেমন কিছুই দেখছে না। ড্রাইভার লোকটা গাড়ি চালাচ্ছে কীভাবে? আন্দাজের ওপর, নাকি মুখস্থবিদ্যার জোরে? যা-খুশি হোক, চিন্তা করার জন্য আরও বড় সমস্যা আছে রানার।

বুকস্টলের লোকটা চিনতেই পারেনি জালনোটটা। ওকে বোকা বলে মনে হয়নি রানার, তারপরও ধোঁকা খেতে যাচ্ছিল আরেকটু হলে। তারমানে, ধরে নেয়া যায়, একাজে যে বা যারা জড়িত আছে, তারা নিশ্চিন্তে আছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সলোমন দ্বীপপুঞ্জের মতো একটা জায়গায় জালনোটের প্রচলন করে কার কতটা লাভ? নেট ঘাঁটলে জানা যাবে এখানকার অর্থনীতি ঠিক কোন্ অবস্থায় আছে, নিশ্চয়ই সেটা আহামরি কিছু হবে না। এ-রকম একটা জায়গায় নিজের কালো থাবা বিস্তারের সাধ হয়েছে

বইঘর.কম

কার? এবং কেন?

নড়েচড়ে বসল রানা। বাসচালকের ডান পাশে বাসের মেঝের সঙ্গে ঝালাই করে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে কয়েকটা অ্যাঙ্গেল আর ফ্ল্যাটবার, তার ওপরে বসিয়ে দেয়া হয়েছে গদি—হয়ে গেছে মহিলা আসন। জায়গা হতে চায় না, তারপরও ঠাসাঠাসি করে পাঁচটা মেয়ে বসেছে সেখানে; মুচকি হাসি প্রায় সবারই ঠোঁটের কোনায়, একটু পর পর আড়চোখে রানার দিকে তাকাচ্ছে ওরা।

পাত্তা দিল না রানা। নিজের চিন্তায় ডুবে গেল আবার। সর্দিলাগা কণ্ঠের লোকটা কে? ভাউযার মোবাইল ওর কাছে কেন? লোকটা সার্জেন্ট ফুগুইয়ের নাম শুনে একটু থমকে গিয়েছিল বলে মনে হলো না? আর জালনোটের কথা শোনামাত্র লাইন কেটে দেয়ার মানে কী?

হাসির আওয়াজ শুনে ছিঁড়ে গেল রানার চিন্তার জাল, মেয়েগুলোর দিকে ভালোমতো তাকাল। আসলে রানার দিকে না, ওর কোলের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে ওরা বার বার, আর ফুসুরফাসুর করছে নিজেদের মধ্যে। সেইসঙ্গে হাসাহাসি তো আছেই। দৃষ্টি নামিয়ে নিজের কোলের দিকে তাকাল রানা।

সর্বনাশ! প্রায়-উন্মুক্তবক্ষা যুবতীর ছবিওয়ালা ম্যাগাযিন কখন কোলের ওপর নামিয়ে রেখেছিল ও আনমনে?

অপ্রস্তুত হয়ে গেল রানা, একটা ম্যাগাযিনের কভারপেইজ দিয়ে ঢাকল আরেকটার কভারপেইজ, মুখে বিব্রত হাসি নিয়ে মেয়েগুলোর দিকে তাকাল আবার। সঙ্গে সঙ্গে একটা ধাক্কার মতো লাগল ওর বুকের ভেতর।

পাঁচটা মেয়ের মধ্যে একজন হাসছে না, কারও সঙ্গে ফুসুরফাসুর করছে না, এমনকী আড়চোখে বার বার তাকাচ্ছেও না রানার দিকে। বরং নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখছে সে রানাকে।

মেয়েটাকে চেনে রানা, অবশ্যই চেনে। ওকে আজ দেখেছে ও, কোনও সন্দেহ নেই। এবং ভালোমতো দেখেছে। চোখের পলক পড়া বন্ধ হলো রানারও, যেন বাস্তবে ফিরে এল ও।

এই মেয়েরই ছবি আছে ওর কোমরে-পরা ভাউযার বেল্টের ভেতর।

চার

'দুঃখিত বলা ছাড়া আর কিছু বলার নেই আমার,' অপরাধ স্বীকার করার ঢং-এ সেলফোনে বলল লোকটা, কাঁচুমাচু হয়ে গেছে চেহারা।

'কী যেন বলেছিলে আমাকে তুমি নিজের ব্যাপারে?' সেলফোনের অপরপ্রান্ত থেকে শোনা গেল প্রশ্নটা, 'তুমি অতুলনীয়—তোমার সতর্কতা বা পরিকল্পনায় কখনও কোনও ভুল থাকে না, তা-ই না?'

চুপ করে আছে লোকটা, আসলে কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

'তুমি আসলে একটা ছাগল,' চাপা গর্জনের আওয়াজ পাওয়া গেল অপরপ্রান্ত থেকে। 'শুধু ছাগল বললে কম বলা হয়, বলা উচিত রামছাগল।'

'আমি...আমি...'

'চুপ করো! যাচাইবাছাই করা ছাড়াই তোমাকে নিয়োগ দেয়াটা সাংঘাতিক ভুল হয়ে গেছে। এখন পস্তাচ্ছি।'

'আমি সব ঠিক করে ফেলব। সব।'

'কচুটা করবে। যার বুদ্ধি নয়-এ হয় না, নব্বই বছর বয়সেও সে ছাগলই থেকে যায়।'

বকা খেয়ে একটু যেন চটে উঠল লোকটা। 'আমার কী দোষ, বলুন? আপনিই তো তাড়াহুড়ো...'

'আবার কথা বলে! তাড়াহুড়ো কি সাধে করছি আমি?

বইঘর.কম

তাড়াহুড়ো কেন করছি, জানো না? নির্বাচনের আর কয়দিন বাকি? সময় যে আর পেছানো হবে না, ভাল করেই জান। অন্তত আরও এক মেয়াদের জন্য ক্ষমতায় যেতে চাচ্ছেন মানাশেহ সোগাভের। সেজন্যে জোরালো লবিং করছেন তিনি প্রতিটি দাতাদেশের সরকারের কাছে, সেসব দেশের সাদাচামড়ার কূটনীতিকদের কাছে। কোনও সন্দেহ নেই প্রভুরা তাঁর ওপর সন্তুষ্ট। এখন স্বচ্ছ নির্বাচন যদি হয়, সোগাভের যদি আরেকবার ক্ষমতায় যান, আমাদের অবস্থা কী হবে?'

'কিন্তু রাজনীতির ওপর তো কোনও হাত নেই আমার। কথা ছিল আমি দেখব...'

'তোমার মাথা, তা-ই না? যেখানে ভয় দেখিয়ে কাজ হয় না, সেখানে লোভ দেখাতে হয়—এটুকু জ্ঞানও কি তোমার নেই?'

'আছে। কিন্তু...লোভ দেখানোর আগেই ওরা যা শুরু করল...'

'ওরা শুরু করল, নাকি তোমরা শুরু করেছিলে? ঠেলা সামলাও এখন। ...ছেলেটা তো শেষপর্যন্ত তোমার হাতে ধরাই পড়ে গিয়েছিল। ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখলেই হতো। তা হলে সহজেই বাগে আনতে পারতে ভাউযাকে।'

মনে হলো যেন লজ্জা পেয়েছে অপর প্রান্তের লোকটা।

'ভুল হয়ে গেছে আমার আসলে। তখন রাগের মাথায়...এত বেশি রেগে গিয়েছিলাম যে...'

'এখন তা হলে কান খুলে একটা কথা শুনে রাখো। আজকের পর থেকে রেগে যাওয়ার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে রাগ করবে কি করবে না। মনে রেখো পয়সার বিনিময়ে শুধু তোমাকেই না, তোমার রাগও কিনে নেয়া হয়েছে। ...মেয়েটার খবর কী?'

'লোক লাগানো হয়েছে ওর পেছনে। পাকড়াও করার চেষ্টা করবে ওরা মেয়েটাকে। ভাউযা ওকে কী বলেছে, কতখানি বলেছে, জানার চেষ্টা করবে।'

হুবহু এক বলতে যা বোঝায় তা নয়, ফটোগ্রাফের সঙ্গে এ-মেয়েটার সবকিছু মিল না থাকলেও রানা নিশ্চিত, ভুল হয়নি ওর।

নার্সদের ক্যাপটা নেই, চিরুনির শাসন না পেতে পেতে আরও ঝাঁকড়া, আরও কোঁকড়া হয়ে গেছে চুলগুলো। আধুনিক হওয়ার চেষ্টাও অনুপস্থিত—লোম গজিয়ে মোটা হয়ে গেছে ভ্রূ জোড়া, বোধহয় প্লাক করছে না বেশ কিছুদিন। ঠোঁটে লিপস্টিক নেই। আবক্ষ ছবিটাতে শার্ট, টাই আর নার্সকোট পরে ছিল, এখন ঢিলেঢালা ব্লাউয আর পা পর্যন্ত লম্বা মামুলি স্কার্ট। মিষ্টি চেহারাটায় হাসি নেই, বরং উদ্বেগ আছে, আর...বোধহয় হতবিহ্বলতাও আছে। দুই ঠোঁট চেপে বসেছে একটা আরেকটার ওপর।

হচ্ছেটা কী? ইসাটাবুতে শান্তিতে ছুটি কাটাতে এসেছিল রানা, অথচ একের পর এক নাটকীয় ঘটনা ঘটছে কেন?

মেয়েটার দৃষ্টিটা, ওর পাশে বসা অন্য মেয়েদের মতোই, ম্যাগাযিন দুটোর ওপর। কিন্তু একটাবারের জন্যও কৌতুক ঝিলিক দিচ্ছে না ওর চোখে, পাশের কারও সঙ্গে চাপাকণ্ঠে চটুল আলোচনায় যোগ দিচ্ছে না সে, বরং চেহারাটা গম্ভীর থেকে আরও গম্ভীর হচ্ছে যেন। কখনও কখনও সরাসরি তাকিয়ে থাকছে রানার চেহারার দিকে; কী যেন খুঁজছে সেখানে, কী যেন বোঝার চেষ্টা করছে। কখনও দেখছে রানার শার্ট আর জিন্স—বিশেষ করে যে-জায়গাগুলোয় ভাউযার রক্ত লেগেছে সেগুলো; তখন মনে হচ্ছে নিজের বিরুদ্ধেই যুঝছে যেন সে, কোনও একটা সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছে।

ঠিক কী করা উচিত, বুঝতে পারছে না রানা। বাসের ভেতরে এই পরিস্থিতিতে কথা বলা সম্ভব না মেয়েটার সঙ্গে। মাকিরা-উলাওয়া, মানে প্রধান সড়কের যে-জায়গায় নেমে হোটেলের পথ ধরতে হবে রানাকে, সেটাও আর বেশি দূরে নেই। যদি রানা নেমে যায়, আর মেয়েটা বাসে করে চলে যায় আরও দূরে, তা

হলে? অথবা মেয়েটা যদি রানার আগেই নেমে পড়ে, সেক্ষেত্রে?

সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে রানা, এমন সময় বাসের গতি কমিয়ে হাঁক ছাড়ল চালক, 'মাকিরা-উলাওয়া।'

গরিব মানুষের লোকাল বাস, ভেতরে কণ্ডাকটর বা হেল্পারের কোনও বালাই নেই; যেখান থেকে উঠেছিল সেখান থেকে মাকিরা-উলাওয়া পর্যন্ত ভাড়া, ড্রাইভারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে নেমে পড়ল রানা। ভাড়া যখন দিচ্ছে, তখন ওই মেয়েটার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

ওকে দেখছে মেয়েটাও।

রাস্তায় নেমে বাসটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।

আবার চলতে শুরু করেছে ওটা। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই থেমে দাঁড়াল, চেঁচামেচির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে বাসের ভেতর থেকে।

কী হয়েছে ঠিক বুঝতে পারছে না রানা। একটু পর দেখল, স্থানীয় ভাষায় ড্রাইভার বা অন্য কাউকে কিছু বলতে বলতে বাসের দরজা দিয়ে লাফিয়ে নামল মেয়েটা, এদিকেই আসছে। আবারও ছাড়তে যাচ্ছিল বাসটা, কিন্তু পারল না—লাফিয়ে নামল আরও তিনজন লোক।

মেয়েটা কি কিছু বলতে চায় রানাকে? যে-ভঙ্গিতে যেভাবে এগিয়ে আসছে, মনে হচ্ছে ওর টার্গেট রানাই। পেছনের তিনটা লোকও আসছে এদিকেই, কিন্তু চলার গতি ওদের ধীর, কোনও তাড়াহুড়ো নেই যেন।

রানার কাছে এসে যেন আচমকা ব্রেক কষল মেয়েটা, স্থানীয় ভাষায় হড়বড় করে কিছু একটা বলল।

মাথা নেড়ে রানা বলল, 'ইংরেজি, প্লিয।'

'হু আর ইউ?'

আহ্, প্রশ্ন তো নয়, যেন লু হাওয়া। মুচকি হাসল রানা। 'নাম বললে আমাকে চিনতে পারবে তুমি? নিশ্চয়ই পূর্বপরিচয় নেই আমাদের?'

‘ভাউযার মানিবেল্ট আপনার কোমরে কেন?’

ও...এ-ই তা হলে আসল ঘটনা? তারমানে বাসের ভেতরে পর্নো ম্যাগাযিন দুটোর দিকে না, ভাউযার মানিবেল্টের দিকে তাকাচ্ছিল মেয়েটা? স্বাভাবিক—যে-বেল্টের ভেতরে মেয়েটার ফটোগ্রাফ আছে, সেটা সে দেখামাত্র চিনতে পারবে না তো কে পারবে?

‘কী হয়েছে ভাউযার?’ রানার নীরবতা সহ্য হচ্ছে না মেয়েটার।

‘তুমি ভাউযার কে হও?’ পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

এমন সময় কাছাকাছি এসে থেমে দাঁড়াল ওই তিনজন লোক। ওদের দিকে প্রথমবারের মতো ভালো করে তাকাল রানা। একজন হ্যাংলাপাতলা, উচ্চতা মাঝারি, চুল উসুখুসু, গালে চার-পাঁচদিনের না-কাটা দাড়ি। চোখেমুখে স্পষ্ট কামলালসা; মেয়েটার পেছন দিকটা নির্নিমেষ দৃষ্টি দিয়ে যেন চাটছে। থেকে থেকে অশ্লীল ভঙ্গিতে চুলকাচ্ছে তলপেটের কাছটা, সেখানে অকস্মাৎ কোনও যন্ত্রণা শুরু হয়েছে যেন। দু’সঙ্গীর একজন দাঁড়িয়ে আছে ওর বাঁ পাশে, আরেকজন ডান পাশে।

বাঁ পাশের লোকটা পাঁচ ফুট নয়-দশের মতো হবে। দেখলেই মনে হয় শুধু খায় আর ঘুমায়, কারণ আলস্যের চর্বি ওর শরীরের জায়গায় জায়গায়। মোটা আর লম্বা গোঁফের কারণে ওর ওষ্ঠ তো দূরের কথা, অধর দেখতে হলেও দূরবীন লাগবে। খুব সম্ভব টাকা বাঁচানোর নিয়তে গত কয়েকদিন দাড়ি কামাচ্ছে না এই লোকও। এর দৃষ্টিতে কামলালসা নেই, আছে অপেক্ষা আর উপেক্ষা।

তৃতীয় লোকটাকে দেখে বিপদসঙ্কেত বেজে উঠল রানার মনে। কিছুটা কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, তারপরও ওর উচ্চতা ছ’ফুট তিন হবে; বুক চিতালে আরও এক-দেড় ইঞ্চি লম্বা হবে। হাফহাতা শার্টের ওপরের চারটে বোতামই খোলা, ব্যায়ামপুষ্ট নির্লোম বুকের পেশিগুলো দেখাতে চায় সে। কোনও দরকার নেই তবু দু’হাত মুঠ করছে আর খুলছে, বডিবিল্ডারদের

কায়দায় ঝাঁকাচ্ছে হাত দুটো—যেন প্রশংসনীয় বাইসেপ-ট্রাইসেপ দেখতে আহ্বান জানাচ্ছে রানাকে নিঃশব্দে। নোংরা ট্রাউজারটা এঁটে বসেছে ওর মাংসল, শক্তিশালী পায়ে।

বিপদ টের পেল মেয়েটাও, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। কিছুটা আঁতকে উঠে আরেকটু ঘেঁষে এল রানার কাছে—কে জানে কেন। ঘনিয়ে আসা গোধূলিতে মাকিরা-উলাওয়ার মতো নির্জন একটা জায়গায় গুণ্ডাবদমাশের মত দেখতে ওই তিন লোক কী চায় ওর কাছে, এগারো-বারো বছরের খুকিও বুঝতে পারবে।

খপ্ করে মেয়েটার একটা হাত চেপে ধরল রানা, একটানে ওকে সরিয়ে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল নিজের পেছনে, নিজে দাঁড়াল তিন দুর্বৃত্তের মুখোমুখি। কোমর থেকে ভাউযার বেল্টটা খুলে ধরিয়ে দিল মেয়েটার হাতে, এগিয়ে গেল কয়েক পা। তারপর থেমে দাঁড়িয়ে ইংরেজিতে বলল, 'আমার তিন ভাইয়ের শরীর ভালো?'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওই তিনজন। স্থানীয় ভাষায় কী যেন বলল কামলোলুপটা।

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা। 'আসলে দোষ আমারই। আগে যদি জানতাম তোমাদের দেশে এসে তোমাদের ভাষা জানাটা জরুরি হয়ে যাবে, তা হলে অবশ্যই ওটা শিখেপড়ে আসতাম। তা, ভাইয়েরা, এদিকে কোথায় যাবে তোমরা? নাকি ভুল করে ভুল জায়গায় নেমে পড়েছ?'

আবারও কী যেন বলল হ্যাংলাপাতলা। বোঝা যাচ্ছে, ও-ই দলনেতা।

প্রত্যুত্তরে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বুঝতে পেরেছি। আসলে ভুল মানুষেরই হয়। তবে এখন যদি তোমরা উল্টোদিকে হাঁটা শুরু করো, এবং আমার দৃষ্টির বাইরে চলে যাও, কিচ্ছু মনে করব না আমি।'

আর কিছু বলল না হ্যাংলা, ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা ভাঁজকরা ক্ষুর বের করল। সময় নিয়ে, রানার চোখে চোখ রেখে,

খুলল ওটার ভাঁজ, এদিকওদিক ঘুরিয়ে দেখাল ধারালো ফলাটা।

যেন আগে কখনও দেখেনি, যেন আরও ভালোমতো দেখার ইচ্ছে আছে—এমন কায়দায় ধীর গতিতে আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল রানা, তারপর চমকে ওঠার ভঙ্গিতে আলগা করে দিল দু'হাত। পর্নো ম্যাগাযিন দুটো খসে পড়ল ওর বগল থেকে। এবং সে-দুটোর কভারপেইজের সঙ্গে, অন্তত একটা মুহূর্তের জন্য হলেও, চুম্বকের মতো আটকে গেল হ্যাংলার দৃষ্টি।

ওই একটা মুহূর্তই যথেষ্ট ছিল রানার জন্য।

বিদ্যুৎ গতিতে নড়ে উঠল ও, চরকির মতো একবার পাক খেল ওর শরীরটা, ভাঁজখোলা ডান পা-টা যখন মেলে দিল ও তখন কেডসের সোল মুগুরের মতো আছড়ে পড়ল হ্যাংলার নাকেমুখে। ক্ষুরটা আপনাআপনি ছুটে গেল লোকটার হাত থেকে, জোরালো আঘাতের ফলে পেছনের দিকে পড়ে যাচ্ছিল সে; ব্যালেন্স ফিরে পেয়েই আবারও অবিশ্বাস্য রিফ্লেক্স অ্যাকশন দেখাল রানা—এক পা এগিয়ে বাঁ হাতের থাবায় খামচে ধরল হ্যাংলার শার্ট, পড়তে দিল না ওকে। ডান হাত মুঠ করে প্রচণ্ড একটা ঘুষি হাঁকাল লোকটার নাকের ব্রিজে, মনে হলো ভেঙে গেছে ওটা। তারপর, একটু আগে তলপেটের যে-জায়গা চুলকাচ্ছিল লোকটা, হাঁটু ভাঁজ করে জোরে গুঁতো দিল সেখানে। বমি করার ভঙ্গিতে মুখটা হাঁ হয়ে গেছে হ্যাংলার, বেরিয়ে গেল ফুসফুসের সব বাতাস। কাজটা যাতে আরও ভালোমতো করতে পারে সে সেজন্য ওকে চোখের পলকে হিপ থ্রো করে পাঁচ-ছয় হাত দূরে ফেলে দিল রানা। একটা সেকেণ্ড অপচয় করল না, ঘুরে মুখোমুখি হলো বাকি দু'জনের।

দেখা গেল, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে খোদার-খাসি, রানাকে তাকাতে দেখে সংবিৎ ফিরে পেল যেন, ট্রাউজারের পকেট থেকে তাড়াহুড়ো করে বের করল সাইকেলের চেইন। সময় নিয়ে ডান হাতে পেঁচাচ্ছে সেটা, সেই সঙ্গে একটু একটু করে সরে যাচ্ছে একপাশে, গ্যাপ তৈরি করছে নিজের আর বডিবিল্ডারের মাঝখানে, একইসঙ্গে এগিয়ে আসার সুযোগ দিচ্ছে

বডিবিল্ডারকে। গত কয়েক সেকেণ্ড স্তম্ভিত হয়ে রানার কাজ-কারবার দেখছিল বডিবিল্ডার, সে-ও সংবিৎ ফিরে পেয়ে তৈরি হয়ে গেল।

চট করে উবু হয়ে রাস্তা থেকে হ্যাংলার ক্ষুর তুলে নিল রানা বাঁ হাতে।

স্তনভার টের পাওয়ার জন্য উনিশ-বিশ বছর বয়সী অনেক মেয়ে মাঝেমধ্যে যেভাবে নিজেদের বুক ঝাঁকায়, ঊর্ধ্বাঙ্গ সেভাবে ঝাঁকিয়ে আগে বাড়তে শুরু করল বডিবিল্ডার।

এমন ভাব করল রানা, যেন মোটেও পাত্তা দিচ্ছে না লোকটাকে, বরং ক্ষুরটা হাতে নিয়ে মুখোমুখি হতে চাচ্ছে খোদার-খাসির। দু'পা এগিয়েও গেল ও খাসির দিকে, কিন্তু তারপর, দুই প্রতিপক্ষকে একসঙ্গে চমকে দিয়ে, ঝাঁপ দিল বডিবিল্ডারের দিকে। উড়াল দিল শূন্যে, মাথার ওপর তুলে ফেলেছে বাঁ হাত, ব্যালেন্স রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত রেখেছে ডান হাতটাকে, ফ্লাইংকিক মারার জন্য তৈরি আছে দুই পা।

শূন্যে থাকতেই রানার ডান পা-টা দু'হাতে চেপে ধরতে পারল বডিবিল্ডার—এমনটাই আশা করেছিল রানা, বাঁ পা'র জুতোর তলা দিয়ে লোকটার গলার পাশে বেশ জোরেই একটা লাথি মারল ও। লোকটাকে নিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে যাওয়ার আগে পোঁচ মারার কায়দায় চালিয়ে দিল ক্ষুরটা, তবে জায়গামতো না লেগে বেশ নিচে লাগল আঘাত। খুলে গেল বডিবিল্ডারের শার্টের বাকি বোতামগুলো, চাপা গলায় আর্তনাদ করে উঠল লোকটা—গভীর একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে ওর নাভির ইঞ্চি তিনেক ওপরে।

ডান হাতে পতন সামলাল রানা, ক্ষুরটা ধরে রেখে শরীরের ভার ছেড়ে দিল ডান হাত ও ডান পায়ের ওপর, মুহূর্তের মধ্যে মাথাটা বুকের কাছে গুঁজে নিয়ে ডিগবাজি খেল। পিচঢালা রাস্তায় আছড়ে পড়ল, কিন্তু কায়দাটা জুজুৎসু'র বলে ব্যথা পেল না; শুয়ে থাকা অবস্থাতেই চর্চিত দক্ষতায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ততক্ষণে বাতাসের জন্য খাবি খেতে খেতে উঠে দাঁড়িয়েছে বডিবিল্ডারও,

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখছে নিজের পেটের ক্ষতস্থানটা।

দাঁতে দাঁত চেপে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল রানা।

স্থানীয় ভাষায় জঘন্য একটা গালি দিল বডিবিল্ডার, রানাকে নাগালের মধ্যে পাওয়া গেছে ভেবে বিরাশি সিক্কার একটা ঘুসি চালাল। আরও একবার চোখধাঁধানো রিফ্লেক্স অ্যাকশন দেখাল রানা, ডান পায়ে ভর দিয়ে সরে গেল, শরীরটা বাঁকা করে রেখেই বাঁ পায়ে প্রচণ্ড একটা লাথি মারল বডিবিল্ডারের বুকে-পেটে। তারপর ভারসাম্য ঠিক করে চরকির মতো ঘুরল একপাক, ডান পা'র জুতোর সোলটা বসিয়ে দিল খোদাইখাসির ডান পায়ের মালাইচাকিতে। সাইকেলের চেইন হাতে এগিয়ে এসে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল সে। 'কেঁউ' করে একটা ডাক ছেড়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল গুঁফো। ওদিকে প্রচণ্ড ব্যথায় কুঁজো হয়ে গিয়ে ছ'ফুট তিন থেকে চার ফুট তিনে নেমে এসেছে বডিবিল্ডার। ক্ষুরটা হাত থেকে ছেড়ে দিল রানা, দু'হাতে একের পর এক ঘুসি চালাচ্ছে বডিবিল্ডারের নাকেমুখে আর কানের ওপর। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড়েভাঙা গাছের মতো আছড়ে পড়ল বডিবিল্ডার রাস্তার ওপর।

লড়াই শেষ; ঘড়ির কাঁটায় মাপলে মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড, নৃশংসতার বিচারে ভয়াবহ।

ক্ষুরটা আবার তুলে নিয়েছে রানা, হাঁপাচ্ছে, ওটা ভাঁজ করে রেখে দিল জিন্সের পকেটে। টেনেহিঁচড়ে-ছিঁড়ে আলগা করে ফেলল ভূপাতিত বডিবিল্ডারের শার্টটা, সময় নিয়ে বাঁ বাহুতে পেঁচাল ওটা। নিজের মোটা বকলেসের বেল্টটা খুলল, চামড়ার অংশটা ডান হাতে পেঁচিয়ে বকলেসটা রাস্তায় ঘষটাতে ঘষটাতে ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে খোদার-খাসির দিকে।

এতক্ষণে হিপ-থ্রো'র আঘাত সামলে নিয়েছে হ্যাংলা, উঠে বসার চেষ্টা করছে। গতিপথ বদল করে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল রানা, প্রচণ্ড জোরে চালাল বেল্ট, বকলেসটা গিয়ে আঘাত করল হ্যাংলার চাঁদিতে। চোখ উল্টে গেল লোকটার, চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল সে; জ্ঞান হারায়নি, কিন্তু অজ্ঞান হওয়ার মতোই

অবস্থা হয়েছে।

ঘুরে খোদার-খাসির মুখোমুখি হলো রানা, লোকটার দিকে এগিয়ে গেল কয়েক পা। 'লড়াই করার ইচ্ছা আছে এখনও? না থাকলে চেইনটা ফেলে দাও হাত থেকে। না হলে এদের অবস্থা হবে তোমার।'

হাত থেকে চেইন ফেলে দিল খাসি।

'বাহ্, সুবুদ্ধি উদয় হয়েছে তা হলে?' রানার কণ্ঠে বিদ্রূপ।

জবাব দিল না লোকটা।

'চেইনের কাছ থেকে সরে যাও কমপক্ষে দশ হাত,' আদেশ দিল রানা।

কথামতো কাজ করল খাসি।

এগিয়ে গিয়ে চেইনটা তুলে নিল রানা। এমন একটা পজিশনে দাঁড়াল, যেখান থেকে একইসঙ্গে নজর রাখতে পারছে খাসি, হ্যাংলা আর বডিবিল্ডারের ওপর। 'কে তোমরা?' জানতে চাইল খাসির কাছে, 'কী চাও?'

জবাব নেই।

'সন্দেহ নেই আমি তোমাদের টার্গেট ছিলাম না,' বলল রানা। 'যদি হতাম, আমার সঙ্গেই বাস থেকে নামতে। কিন্তু তোমরা নেমেছ ওই মেয়েটার পরে। কী চাও তোমরা ওর কাছে?'

'কিছু না,' মিহি গলা খোদার-খাসির।

'কিছু চাও না, তারপরও একজন বডিবিল্ডার আর ক্ষুর-চেইনসহ হাজির হয়ে গেছ? তা-ও আবার একজন মাত্র অবলা নারীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে?'

লাল হয়ে গেল খাসির চেহারা, মৌনতাকে বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ মনে করে চুপ করে থাকল সে।

দূর থেকে একটা বাসের হর্নের আওয়াজ শোনা গেল; দৃষ্টি সরিয়ে দেখল রানা, আরেকটা লোকাল বাস আসছে মাকিরা-উলাওয়া'র দিকে। 'যাও,' মাথা ঝাঁকাল ও খোদার-খাসির দিকে তাকিয়ে, 'আপাতত জিজ্ঞাসাবাদের পালা শেষ আমার। বেঁচে

গেলে তোমরা। হাত দেখালেই বাসটা থামবে এখানে, আশা করছি দুই সঙ্গীকে নিয়ে ঝটপট উঠে যাবে ওটাতে। যতক্ষণ না আমার চোখের সামনে থেকে বিদায় হচ্ছ তোমরা তিন কাপুরুষ, ততক্ষণ এখান থেকে নড়ছি না আমি।'

ধীর পায়ে এগিয়ে গিয়ে প্রথমে হ্যাংলাকে তুলল খাসি, তারপর গেল বডিবিল্ডারের কাছে; ওই লোকটাকেও তুলল কোনোরকমে। দু'পাশ থেকে ওর গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল হ্যাংলা আর বডিবিল্ডার, বাসের জন্য অপেক্ষা করছে তিনজনই। কিছুক্ষণ পর এসে পৌঁছাল বাসটা, থামল, ওদের তিনজনকে তুলে নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল।

ঘুরে মেয়েটার মুখোমুখি হলো রানা। 'কে তুমি?'

জবাব দিল না মেয়েটা, দিতে পারল না হয়তো; রানা খেয়াল করল অল্প অল্প কাঁপছে বেচারী।

'বাসা কোথায় তোমার?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা, বুঝে গেছে ইংরেজিতে মোটামুটি পারদর্শী মেয়েটা।

জবাবে মেয়েটা কী বলল মিনমিন করে, ঠিক বুঝতে পারল না রানা।

'কী করবে এখন?' আবারও জানতে চাইল ও। 'বাসায় যাবে?'

মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাল মেয়েটা। 'আমি একা থাকি। বাসায় গেলে ওরা আবার গিয়ে হাজির হবে।'

'তোমার বাবা-মা নেই?'

মাথা নাড়ল মেয়েটা।

'তা হলে? কী করবে? কোনও আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে যাবে?'

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'ভাউযার বেল্ট আপনার কাছে কেন?'

'সেসব কথা তো এখানে দাঁড়িয়ে বলার মতো না। তা ছাড়া আমার একটু তাড়াও আছে। যদি কিছু মনে না করো, কাছাকাছি একটা হোটেলে আছি আমি আপাতত। বেশি দূরে না জায়গাটা,

আবার একদম কাছেও না। কাঁচা রাস্তা এড়িয়ে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গেলে বিশ মিনিটের মতো লাগবে। ...যাবে আমার সঙ্গে?'

'যাব,' এবার স্পষ্ট ইংরেজি উচ্চারণে বলল মেয়েটা।

আর কিছু না বলে ঘুরে হাঁটা ধরল রানা।

'তোমাদের তিন-তিনজনকে মেরে শুইয়ে দিয়েছে লোকটা?' সেলফোনের ওপ্রান্তের লোকটা আঁতকে উঠেছে যেন।

'তিনজনকে না, স্যর, দু'জনকে,' চলন্ত বাসের একটা সীটে বসে কোঁকাতে কোঁকাতে বলল হ্যাংলা, 'ভয়ে লোকটার ধারে-কাছে ঘেঁষেনি গুঁফো, তারপরও কীভাবে যেন একটা লাথি খেয়েছে।'

নীরবতা। যা শুনছে, তা কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না ওপ্রান্তের লোকটা। কিছুক্ষণ পর বলল, 'তোমরা তিনটা... জোয়ান-তাগড়া মানুষ পাত্তাই পেলে না লোকটার সামনে?'

'লোকটা মারতে জানে, স্যর। আর যখন মারে, খুব জোরে মারে। মারপিট যেন কোনও ব্যাপারই না ওর জন্যে...ওসব যেন ওর কাছে কোনও খেলা। ...স্যর, যদি কিছু মনে না করেন, আমি রাখি এখন? বমি বমি লাগছে, জানালা দিয়ে মাথা বের করা দরকার।'

জবাব না দিয়ে লাইন কেটে দেয়া হলো।

ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড প্রপার্টি ডেভেলপমেণ্ট বলতে যা বোঝায়, আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, সে-রকম কিছু এখনও হয়নি ইসাটাবুতে; ১৯৭৮ সালে সার্বভৌমত্ব অর্জনের পরও। সাতটা বড় দ্বীপ আর অতি ক্ষুদ্রাকৃতির ন'শ'রও বেশি দ্বীপ নিয়ে গঠিত হয়েছে সলোমন দ্বীপপুঞ্জ; সেগুলোর মধ্যে ইসাটাবু সবচেয়ে বড় এবং রাজধানী শহর হওয়ায় দ্বীপটার উন্নয়ন করতে বাধ্য হয় ইংরেজরা এবং পরবর্তী সময়ে এখানকার নির্বাচিত সরকারগুলো—যতটা না করলেই নয়। মিশনারিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজ-লাইব্রেরি,

বিদেশি পর্যটকদের কথা ভেবে বানানো রাস্তা আর হোটেল-মোটেল এবং হাতেগোনা কিছু হাসপাতাল আর শিশুপার্কের কথা বাদ দিয়ে বললে, ইসাটাবু এখনও জংলি জায়গাই রয়ে গেছে।

মাকিরা-উলাওয়াসংলগ্ন একচিলতে জঙ্গলের পাশে কাঁচা রাস্তা আছে, বন্ধুর পথটা ধরে চার চাকার বাহনে করে গেলে মেণ্ডানায় পৌঁছাতে আধ ঘণ্টার কিছু বেশি লাগে। কিন্তু রানা এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছে, সেটা জনমানবহীন হলেও শর্টকাট; ঝুপ করে নেমেআসা রাতের আঁধারে মাঝেমধ্যে জ্বলজ্বল করে উঠছে নিঃসঙ্গ শেয়াল বা বেজির চোখ, কখনও কখনও ঝরাপাতার ওপর দিয়ে সর্‌সর্ শব্দে দূরে সরে যাচ্ছে সাপ।

ইচ্ছা করলে অন্য কোনও হোটেলে উঠতে পারত রানা, কিন্তু ওঠেনি। সরে থাকতে চেয়েছিল কোলাহল থেকে, ইসাটাবুর প্রাণকেন্দ্র থেকে; চেয়েছিল যে-ক'টা দিন দ্বীপশহরটাতে থাকবে, নিরালায় নিজের মতো করে থাকবে। মেণ্ডানার মালিকও তাঁর খদ্দেরদের সে-সুবিধা দিতে চান বলে জঙ্গলের ভেতরে এ-রকম একটা জায়গায় চালু করেছেন হোটেল।

মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে হোটেলে এসে পৌঁছাল রানা। রিসেপ্‌শন কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে ডিউটি অফিসারের কাছ থেকে রুমের চাবি নিচ্ছে, খেয়াল করল, মুখ টিপে হাসছে লোকটা। সঙ্গে মেয়েমানুষ দেখে যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সে। কিন্তু ওসব কোনও ব্যাপার না ইসাটাবুতে, তাই কারোরই কিছু বলার নেই।

সিঁড়ি বেয়ে ঘরে এসে ঢুকল রানা, বাতি জ্বেলে দরজা আটকে দিল, মুখোমুখি হলো মেয়েটার। 'রেইন ট্রি রেস্টুরেণ্টটা কোথায়, জানো?'

প্রশ্নটার জন্য প্রস্তুত ছিল না মেয়েটা, তাই থতমত খেয়ে গেল একটুখানি। সামলে নিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হেণ্ডারসন ফিল্ডের কাছে। এখান থেকে বেশ দূরে। অনেক টাকা লাগে ওখানে খাওয়াদাওয়া করতে।'

'কীভাবে যাব?'

'যেতেই হবে?'

'হ্যাঁ, দাওয়াত আছে।'

'বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে আবার,' হাতঘড়ি দেখল মেয়েটা। 'লোকাল সার্ভিস বন্ধ হয়নি এখনও, কপাল ভালো থাকলে বাস পেতে দেরি হবে না আপনার। কিন্তু...ফিরবেন কীভাবে?'

'ফিরব কীভাবে মানে?'

'মানে, যতক্ষণে ডিনার শেষ করবেন ততক্ষণে আর কোনও বাস থাকবে কি না...'

'তোমার সঙ্গে মোবাইল আছে?'

'আছে।'

'ব্যবহার করতে পারি?'

স্কার্টের পকেট থেকে সেলফোনটা বের করে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল মেয়েটা।

রেন্ট-আ-রাইড প্রতিষ্ঠানে ফোন করল রানা। জানতে পারল, "উদ্ধার" করা হয়েছে বোট আর জিপটা, তবে মেরামতির কাজ শেষ হয়নি; চুরি-যাওয়া লুকিংগ্লাসের মাশুল আর রিপেয়ারিং চার্জ যদি দিতে রাজি থাকে রানা, তা হলে আগামীকাল সকালে ডেলিভারি দেয়া যাবে ওটা। আর কোনও গাড়িও নেই ভাড়া দেয়ার মত।

লাইন কেটে দিয়ে মোবাইলটা ফিরিয়ে দিল ও মেয়েটার হাতে। বলল, 'খিদে লাগলে রুমসার্ভিসকে ডেকে যা-ইচ্ছে আনিয়ে নিয়ো। রেইন ট্রিতে আমাকে যে দাওয়াত করেছে, তার ফোন নম্বর জানা নেই বলে যেতেই হচ্ছে। আমার মনে হয়, এখন বাসায় ফিরে না গিয়ে তুমি যদি আমার ফেরার জন্য অপেক্ষা করো, তা হলে আমাদের দু'জনের জন্যেই ভালো হয়—কিছু প্রশ্নের জবাব পেতে পারি দু'জনই। তারপর তোমার জন্যে পাশেই একটা রুম বুক করে দেয়া কঠিন কিছুই হবে না।'

কিছু বলল না মেয়েটা, এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল এককোনায়

রাখা দুই গদির একটা সোফায়।

জুতো খুলল রানা, ঘরের এসি ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে গেল ক্লযিটের দিকে, একটা কালচে হাফহাতা শার্ট আর ছাইরঙা গ্যাবার্ডিনের প্যান্ট বের করল। ওগুলো নিয়ে বাথরুমে ঢুকল, দরজা আটকে দিয়ে ফুলস্পীডে ছেড়ে দিল শাওয়ারটা। গা-টা ভিজিয়ে নিয়ে সারা গায়ে সাবান মেখে আবার ঠাণ্ডা পানির কাছে সঁপে দিল নিজেকে, ঠায় দাঁড়িয়ে ভিজছে। মিনিট পাঁচেক পর সরে এল শাওয়ারের নিচ থেকে, তোয়ালে দিয়ে গা-মাথা মুছে নিয়ে চুলগুলো ব্যাকব্রাশ করল। কাপড় পরে বাথরুম থেকে যখন বের হলো, তখন ওর ঝকঝকে শান্ত চেহারাটা দেখে মেয়েটার সন্দেহ হলো, আদৌ পরিচয় হয়েছে কি না ওদের।

জুতো জোড়া টেনে নিয়ে বিছানায় বসে পড়ল রানা, মেয়েটাকে বলল, 'ভাউযা কী হয় তোমার?'

'ভাই।'

জুতো পরা শেষ করে উঠে দাঁড়াল রানা। হেঁটে দরজার কাছে গিয়ে থামল, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে বলল, 'যদি ভালো মনে করো, হোটেল ছেড়ে চলে গেলে কেউ কিছু বলবে না তোমাকে। ...তোমার নাম কী?'

'রেমি তানাঘাই।'

দরজাটা খুলল রানা। 'ছোট্ট একটা উপকার করতে পারবে আমার?'

'কী?'

'আমি চলে যাওয়ার পর ইণ্টারকমে ডাকবে রুমসার্ভিসকে। কামরার নম্বরটা জানিয়ে বলবে, লণ্ড্রিসার্ভিস চাচ্ছেন মিস্টার মাসুদ রানা, তাঁর একটা শার্ট আর একটা ট্রাউজার ধুয়ে ইস্ত্রি করে দিতে হবে যত জলদি সম্ভব। ...পারবে?'

কিছু না বলে মাথা ঝাঁকাল রেমি।

বেরিয়ে যাওয়ার সময় দরজাটা টেনে দিল রানা।

বইঘর.কম

পাঁচ

'দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই—সাত মিনিটের দেরি আর এমন কী?' কোনাকুনিভাবে বসা রানার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল ভেলর। 'তুমি যে এসেছ তাতেই খুশি হয়েছি আমি।' একই টেবিলে তিন নম্বর এবং শেষ চেয়ারটাতে বসা মাঝবয়সী এক লোকের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানার। 'পরিচয় করিয়ে দিই। রাইস রিচার্ড, আমার খুব ভালো বন্ধু। আমাদের আজকের আড্ডাটা যাতে আরও জমে সেজন্য ওকেও আসতে বলেছি।'

'বন্ধু?' মাঝবয়সী লোকটার সঙ্গে ভেলরকে মেলাতে পারছে না রানা।

ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে মোহনীয় হাসি হাসল ভেলর। 'কেন, হতে পারে না?'

রিচার্ডের সঙ্গে হাত মেলাল রানা। 'ভেলরের মতো একটা মেয়েকে বান্ধবী হিসেবে পেয়েছেন—আপনি সৌভাগ্যবান, মিস্টার রিচার্ড।'

হো হো করে হেসে ফেলল রিচার্ড আর ভেলর একসঙ্গে।

ভেলর বলল, 'বান্ধবী বলতে তুমি যা বুঝেছ, আসলে সে-রকম সম্পর্ক না আমার আর রিচার্ডের মধ্যে। ও নিউযিল্যাণ্ডের নাগরিক, পেশায় আর্কিয়োলজিস্ট। অস্ট্রেলিয়ায় যখন পড়ছিলাম, তখন পরিচয় হয় ওর সঙ্গে, বন্ধুত্ব হয়; আমি ইসাটাবুতে চলে আসার পর মাঝেমধ্যে এখানে ছুটি কাটাতে আসে ও। আর্কিয়োলজির জন্য এই দ্বীপ নেহায়েত মন্দ না।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তা হলে আরেকবার সরি বলতে হয়

আমাকে।'

'আরে ধুর! আমরা কিছু মনে করিনি। ...দেখো, শুধু গল্পই করছি, খাবার অর্ডার দেয়ার কথা ভুলে গেছি। ...সীফুডে আপত্তি নেই তো তোমার, রানা?'

'মোটেও না। বরং পূর্ণ সমর্থন আছে।'

ওয়েইটারকে ডাক দিয়ে খাবারের অর্ডার দিতে শুরু করল ভেলর।

একটু ফুরসত পেয়ে এদিকওদিক তাকাচ্ছে রানা।

হালকা নীল রঙ করা আছে রেস্টুরেন্টের ভেতরের দিকের দেয়ালে, প্রতিটা টেবিলের ওপর জ্বলছে অনুজ্জ্বল সোনালি আলো, অদ্ভুত এক আভা তৈরি হয়েছে চারপাশে। সুস্বাদু খাবারের জিভে-জল-আনা সুবাস আসছে কিচেনরুম থেকে। রেমি বলেছে খাবারের দাম নাকি চড়া এখানে, তারপরও খদ্দেরদের কমতি দেখা যাচ্ছে না। তবে ওদের প্রায় সবাই ট্যুরিস্ট।

রিচার্ডের দিকে তাকাল রানা। 'পেশা হিসেবে আর্কিয়োলজি নিশ্চয়ই খুব ইন্টারেস্টিং?'

চেহারায় গাম্ভীর্যের ছাপ পড়ল রিচার্ডের। 'হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে,' ওর কণ্ঠস্বরটা হাস্যকর রকমের, লম্বাচওড়া বেঢপ শরীরের সঙ্গে বেমানান, 'কিন্তু এমন অনেক আর্কিয়োলজিস্ট আছে, পেটের ভাত জোগাতে যাদেরকে উদয়াস্ত খাটতে হয়।'

'ড্রিঙ্ক কোন্‌টা নেবে তুমি, রানা?' জিজ্ঞেস করল ভেলর। 'এখানকার লোকাল বিয়ার কিন্তু মন্দ না, চেখে দেখতে পারো। কিংবা উইস্কি...'

'কোনওটাই না। তুমি বরং আমার জন্য একটা সেভেন-আপের অর্ডার দাও। আর হ্যাঁ, সেটাতে অবশ্যই যেন প্রচুর পরিমাণে বরফ থাকে। কারণ তোমার দিকে যত তাকাচ্ছি, গলা তত শুকিয়ে যাচ্ছে আমার।'

ওর রসিকতায় হেসে ফেলে ভেলর বলল, 'আমি শুধু পানি খাব। মদ ছুঁই না—মানে, স্পর্শ করার উপায় নেই আর কী; কেউ

বইঘর.কম

যদি শোনে ইসাটাবুর একটা মেয়ে মদ খাচ্ছে, তা হলে ছি ছি পড়ে যাবে মেয়েটার নামে। এ-দ্বীপে ছেলেদের মদ খাওয়া জায়েজ, কিন্তু মেয়েদের না।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'অস্ট্রেলিয়ায় কাটানো দিনগুলো খুব মিস করি মাঝেমধ্যে। ওখানে দেদারসে মদ গিললেও কারও কিছু বলার নেই। ...রিচার্ড, তুমি কী নেবে?'

'বিয়ার।'

অর্ডার নিয়ে চলে গেল ওয়েইটার।

'অস্ট্রেলিয়ায় কাটানো দিনগুলোর কথা বলছিলে,' প্রসঙ্গটা ধরে রাখতে চায় রানা।

আরেকবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভেলর। 'আসলে...একসময় ইংরেজদের অধীনে ছিলাম আমরা, মানে ইসাটাবুর আদিবাসীরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ওদেরকে হটিয়ে দিয়ে পুরো সলোমন দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নেয় জাপানিরা। যুদ্ধের শেষেরদিকে পাল্টে যায় পরিস্থিতি, দুর্বল হয়ে পড়ে জাপানিরা, সলোমন জয় করে আবার ইংরেজদের হাতে তুলে দেয় আমেরিকানরা। আরও পরে একসময় স্বাধীনতা পাই আমরা। কিন্তু আশির পর থেকে অশান্ত হতে শুরু করে এখানকার রাজনীতি—অশান্ত করে তোলা হয় আসলে।'

'কী হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'প্রধান দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে শুরু হয়েছিল বিদ্বেষ আর হানাহানি। ছিয়াশি-সাতাশি'র দিকে, মারাত্মক আকার ধারণ করে সেটা। ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় ইসাটাবুতে, মারা পড়তে থাকে শত শত লোক। অস্থির রাজনৈতিক অবস্থার ফায়দা লুটতে চায় বিচ্ছিন্নতাকামী দুটো বিদ্রোহী বাহিনী—মালাইটা ঈগল ফোর্স আর ইসাটাবু ফ্রিডম মুভমেণ্ট। পরে দুটো দলই পরিণত হয় একে অপরের শত্রুতে, ফলে দাঙ্গাটা পরিণত হয় গৃহযুদ্ধে। তার আগে, খেয়েপরে মোটামুটি ভালোই ছিল সবাই, আমার বাবার কাছে শুনেছি। অনাকাঙ্ক্ষিত দাঙ্গাটা এলোমেলো করে দিল সব।'

'কীভাবে?'

'এক রাতে ঈগল ফোর্সের লোকেরা হামলা চালায় বাবা যেখানে থাকতেন সেখানে, মারাত্মকভাবে আহত হন তিনি। তারপরও পালাতে সক্ষম হন—কীভাবে তা তিনি নিজেও ঠিকমতো কখনও বলতে পারেননি আমাকে। শুধু বলেছেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপ, তারপর আরেক দ্বীপ, এবং শেষপর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। দেশটা তখন বাবার মতো আরও শরণার্থীর মানবিক সাহায্যের আবেদনে সাড়া দিয়েছে, তাই তিনি রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ামাত্র তা পেয়ে যান। স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শরীরটা নিয়ে আজ এই রেস্টুরেন্ট তো কাল ওই পেট্রোলপাম্পে কাজ করতে করতে জীবনের বাকি দিনগুলো পার করতে শুরু করেন। নিয়তি—একটা রেস্টুরেন্টে কাজ করতেন আমার মা, বাবার সঙ্গে পরিচয় হয় তাঁর। তারপর আর কী? ভালোলাগা, ভালোবাসা, বিয়ে...এবং একসময় আমি। দুখী মানুষ দুটোর একটাই লক্ষ্য ছিল—আমি যেন পড়াশোনা করে অনেক বড় হতে পারি জীবনে,' চোখের পানি মুছল ভেলর।

রানা কিছু বলল না। চুপ করে আছে রিচার্ডও, অস্বস্তিতে ভুগছে।

এমন সময় ধোঁয়াওঠা ফিশ বারবিকিউ, যথেষ্ট পরিমাণ সালাদ-দেয়া ফিশবল, আর খোসাছাড়ানো চিংড়ির ঝাল ফ্রাই দিয়ে গেল ওয়েইটার, সঙ্গে তিন রকমের ড্রিঙ্ক।

ভেলরের প্লেটে কয়েকটা ফিশবল তুলে দিল রানা, কিছুটা সালাদ দিল। একই আইটেম পরিবেশন করল রিচার্ডকেও, নিজেও নিল। তারপর বলল, 'যদি জানতাম তোমার অতীত যন্ত্রণাদায়ক, প্রসঙ্গটা তুলতাম না।'

মাথা নেড়ে কাঁটাচামচ তুলে নিল ভেলর, খেতে শুরু করল। ওর দেখাদেখি রানা আর রিচার্ডও।

'শুনলাম, অজানা-অচেনা একটা লোককে বাঁচানোর জন্য

কুমিরের বিরুদ্ধে লড়েছেন আপনি, মিস্টার রানা?' অস্বস্তিকর নীরবতা থেকে মুক্তি পেতে চাচ্ছে রিচার্ড।

সালাদসহ একটা ফিশবলের অর্ধেকটা মুখের ভেতরে চালান দিতে যাচ্ছিল রানা, ওটা প্লেটে রেখে বলল, 'ঠিক লড়াই না। ভাগ্যের সহায়তা বলতে পারেন।' ভেলরের দিকে তাকাল। 'ভুলেই গিয়েছিলাম...ভাউযার কী অবস্থা এখন?'

চিবানো খাবারটুকু গিলে ফেলল ভেলর। 'আগের মতোই।'

'জ্ঞান ফেরেনি এখনও?'

'ফিরেছিল, অল্প কিছুক্ষণের জন্য। ডিউটি নার্স ডাক দিল আমাকে, গিয়ে দেখি আবার জ্ঞান হারিয়েছে লোকটা।'

'সে...সেরে উঠবে তো?' রিচার্ডের কণ্ঠে উদ্বেগ।

'চব্বিশ ঘণ্টা পার হওয়ার আগে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে...আমার মনে হয় আহত পা-টা কেটে বাদ দিতেই হবে শেষপর্যন্ত।'

কথাটা শুনে শিউরে উঠল রিচার্ড।

'মিস্টার রিচার্ড,' মুখ খুলল রানা, 'এখানে কি শুধুই ছুটি কাটাচ্ছেন আপনি? ফাঁকে ফাঁকে কি পেশাগত বিদ্যাটা চর্চা করছেন না?'

হাসল রিচার্ড। 'করছি না বললে ভুল বলা হবে—ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। কিন্তু ইসাটাবুতে আর্কিয়োলজির সুযোগ যেমন আছে, সেই সঙ্গে সমস্যাও আছে।'

'সমস্যা? যেমন?'

'প্রথমেই ধরুন এখানকার আদিবাসীদের কথা,' ফিশবল খাওয়া শেষ, নিজের প্লেটে চিংড়ির ফ্রাই তুলে নিল রিচার্ড, 'স্থানীয় একটা লোক পাবেন না এখানে, যার ভেতরে কোনও-না-কোনও কুসংস্কার নেই। জীববৈচিত্র্যে এত সমৃদ্ধ এখানকার রেইন ফরেস্ট, জানার মতো এতকিছু আছে সেখানে, অথচ জঙ্গলটাকে যমের মতো ভয় পায় ওরা। কেন জানেন? বনের ভেতরে নাকি ঘুরে বেড়ায় দৈত্যদেবতারা, কাউকে একলা পেলেই...ব্যস!

শুনেছি প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা একসময় ফকির থেকে বড়লোক বানিয়ে দিয়েছিল এই দ্বীপের বাসিন্দাদের; অথচ বাপ-দাদার ধীবরবৃত্তি বাদ দিয়ে ও-পথে পা বাড়াতে এখন রাজি নয় কেউই। তারপর আসুন এখানকার নদীনালা আর খালগুলোর প্রসঙ্গে। ওগুলোর একেকটা মিষ্টিপানির মাছের অভয়ারণ্য, একবার জাল ফেলে যদি কমপক্ষে এক শ' মাছ ধরতে না পেরেছেন তো আমার নাম রিচার্ড না, কিন্তু কাল্পনিক আর হাস্যকর কুমিরদেবতাদের ভয়ে সেখানে মাছশিকার করে খুব কম মানুষই। এখানকার সব জেলেই সাগরে যায়, হাতেগোনা কেউ কেউ মুক্তো আহরণ করে।'

নিজের প্লেটে চিংড়ি নিল রানাও। 'সরকার কিছু করছে না কেন এসব ব্যাপারে?'

'সরকার?' হাসল রিচার্ড। 'যারা এখানকার...কী বলব...লাইব্রেরিগুলোর মান উন্নত করতে পারল না আজ পর্যন্ত, তারা বদল করবে মানুষের ভাগ্য?'

'লাইব্রেরি?' কাঁটার মাথায় চিংড়ির বড়সড় একটা টুকরো গেঁথেছে রানা। 'ওখানে আবার কী সমস্যা?'

'প্রথম কথা, সংখ্যায় খুব কম। দুই, রেফারেন্স বইয়ের খুবই অভাব—কিছু একটা নিয়ে যে শান্তিমতো গবেষণা করবেন, সে-উপায় নেই।'

'হুঁ,' ভেলরের দিকে তাকাল রানা। 'তোমার ক্লিনিকের ব্যাপারে কিছু শোনা যাক।'

একচিলতে হাসি ফুটল মেয়েটার ঠোঁটের কোনায়। খাওয়ার ফাঁকে বলল, 'ওটা আমার অনেকদিনের স্বপ্ন। ইসাটাবুতে বাচ্চারা অসুস্থ হচ্ছে, ওদেরকে উপযুক্ত চিকিৎসাসেবা দেয়া যাচ্ছে না। প্রসববেদনায় ছটফট করছে গর্ভবতীরা, নিরাপদ প্রসবের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। ভিক্ষা চাওয়ার মতো সাহায্য চেয়েছি আমি সরকারের কাছে বহুবার, বলতে গেলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে আমাকে প্রতিবারই। কিন্তু যতবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছি, আমার জেদ বেড়েছে ততই। ক্লিনিক বানানোটাকে একটা চ্যালেঞ্জ

বইঘর.কম

হিসেবে নিয়েছি শেষপর্যন্ত। পরিচিত যাকেই পাচ্ছি তার কাছেই ডোনেশন চাইছি ক্লিনিকটার জন্যে।'

'সাড়া পাচ্ছ কেমন?'

মাথা নাড়ল ভেলর। 'তেমন একটা না। ইসাটাবুর মানুষরা বাঁচলেই কী আর মরলেই কী—কার ঠেকা পড়েছে ওদেরকে সাহায্য করার? অল্প অল্প করে যা পাচ্ছি, তা ব্যাঙ্কে জমিয়ে সুদেআসলে বাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছি।'

'ঠিক কত টাকা দরকার তোমার?'

প্রশ্নটা শুনে যেন কৌতুক ঝিলিক দিয়ে উঠল ভেলরের চোখেমুখে। 'যদি এই বছরের মধ্যেই আধুনিক সুবিধাসহ কাজ শুরু করতে চাই, তা হলে কমপক্ষে চাই এক মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তারপর থেকে, আমার খরচের-হিসেব যদি ভুল না হয়, প্রতি বছরের জন্য দু'লক্ষ করে।'

'জোগাড় করতে পেরেছ কত?'

'মাত্র পঞ্চাশ-ষাট হাজারের মতো।'

'অনেক কম। ...আচ্ছা, খরচের যে-হিসেবের কথা বললে, ওটা কি দিতে পারবে আমাকে?'

'কেন?'

'ওই যে, আগেই বলেছি, কয়েকটা দাতা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ আছে আমার; ওদের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারি।'

কিছু বলার আগে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ভেলর, অদ্ভুত দৃষ্টি চোখে। তারপর মৃদু গলায় বলল, 'আমার জন্য এতকিছু কেন করবে, রানা?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'হয়তো...তোমাকে আমার ভালো লেগে গেছে, তাই। হয়তো...তোমার অতীত আমাকে স্পর্শ করেছে, তাই। আবার হয়তো...তুমি মেয়ে হয়েও এতবড় একটা প্রজেক্ট একা চালানোর মতো চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছ, তাই। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, এখনও তোমার জন্য কিছুই করতে পারিনি আমি। ...এখানকার কোনও ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে তোমার?'

চুপ করে আছে ভেলর, রানার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকার কারণেই হয়তো উত্তরটা দিতে দেরি হচ্ছে; কিছুক্ষণ পর বলল, ‘আছে।’

‘কোথায়?’

‘এএনযেড।’

‘হেণ্ডারসন ফিল্ড শাখায়?’

মাথা ঝাঁকাল ভেলর।

‘নম্বর?’

ভ্রূ কুঁচকে কী যেন ভাবছে ভেলর, কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করছে বোধহয়। কিছুক্ষণ পর বলল, ‘আসলে...নম্বরটা ঠিক মনে করতে পারছি না। আমার আবার...এসব...খেয়াল থাকে না। অসুবিধা নেই, পরে একসময় জানিয়ে দেব তোমাকে।

‘দিয়ো,’ বলে উঠল রিচার্ড। ‘মিস্টার রানা, অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে আছি, এবার একটু বকবক করার সুযোগ দিন আমাকে। চলুন ফিরে যাই আর্কিয়োলজির প্রসঙ্গে। জোর দিয়ে বলতে পারি, খনিজ সম্পদের ওপর ভাসছে এই দ্বীপদেশ। তেল আছে খানে, সোনা আছে। আছে হীরা, পান্না আর চুনির মতো দামি রত্নপাথর। কিন্তু, শুনলে খারাপ লাগবে আপনার, সেসবের মালিক হতে পারছে না দ্বীপবাসীরা। বার বার ওদের কুসংস্কার, অজ্ঞতা আর রাজনৈতিক হানাহানির সুযোগ নিয়েছে বিদেশিরা এবং নিচ্ছে।’

বিরক্ত হয়ে ওর দিকে তাকাল ভেলর। ‘তোমার এ-ই এক দোষ, রিচার্ড—নিজের পেশাগত বিদ্যা জাহির করার সুযোগ পেলে আর থামতে চাও না। ঈশ্বর তোমাকে কোন্ জায়গার মাটি দিয়ে বানিয়েছেন, বলো তো? রসকষ কি কিছুই নেই তোমার ভেতরে?’

মেয়েটা ভেটো দেয়ার পর বন্ধ হয়ে গেল ভারী কথাবার্তা। এটা-সেটা নিয়ে টুকটাক কথা হলো। প্রশ্ন করে করে ইসাটাবুর ব্যাপারে কিছু কথা জেনে নিল রানা। যেমন, স্থানীয় ভাষায়

ইসাটাবু মানে হলো, পুব-বাতাসের দেশ। কাগজেকলমে এখানকার রাষ্ট্রীয় ভাষা ইংরেজি, কিন্তু ওটা বুঝতে ও বলতে পারে কম লোকই। এখানকার বেশিরভাগ আদিবাসী যে-স্থানীয় ভাষায় কথা বলে সেটার নাম পিজিন। জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ খ্রিস্টান, বাকিদের বেশিরভাগ সনাতন ধর্মাবলম্বী, সামান্য কিছুসংখ্যক মুসলিমও আছে। বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে রেডিয়ো খুব চলে এখানে, জনপ্রিয় কয়েকটা এফএম চ্যানেল আছে। সংবাদপত্রের সংখ্যা মাত্র এক, টেলিভিশন বলে কিছু নেই দ্বীপবাসীদের জন্য। স্যাটেলাইট টিভি'র ব্যবস্থা আছে, তবে তা শুধু ট্যুরিস্টদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। মোবাইল অপারেটর আছে দুটো, দুটোই চালাচ্ছে বিদেশিরা; সার্ভিস ভালো কিন্তু খরচ বেশি, ইন্টারনেট সুবিধাও দিচ্ছে ওরাই। সেনাবাহিনী বলে কিছু নেই এখানে, আইনশৃঙ্খলা ও উপকূলীয় সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে একজন কমিশনারের নেতৃত্বে নিয়োজিত আছে পুলিশ ফোর্সের সদস্যরা। কোথাও আগুন লাগলে ওরাই নেভায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে ওরাই সামাল দেয়ার চেষ্টা করে, এমনকী কোস্টগার্ড বা মেরিটাইম সার্ভেইলেন্সও ওদের তদারকিতে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে সরাসরি রিপোর্ট করতে বাধ্য-থাকা পুলিশ কমিশনারকে নিয়োগ দেন সলোমন দ্বীপপুঞ্জের গভর্নর জেনারেল।

এবং, এক প্রশ্নের জবাবে রানা যখন বলল, মেয়েরা টানে ওকে, কিন্তু সংসার টানে না, তাই বিয়ে করেনি; ভেলরও বলল, এখনও উপযুক্ত জীবনসঙ্গীর অপেক্ষায় আছে।

খাওয়া শেষ করে বিল চুকিয়ে রেস্টুরেন্টের বাইরে এসে দাঁড়াল ওরা তিনজনে।

ভেলর বলল, 'ফিরবে কীভাবে, রানা?'

'জানি না। বাস পাব বলে মনে হয় না, দেখি বলেকয়ে রাজি করাতে পারি কি না কোনও রেন্ট-আ-রাইডকে।'

'আমি যদি লিফট অফার করি তোমাকে হোটেল পর্যন্ত?'

মুচকি হাসল রানা। 'তা হলে বলব, না চাইতেই আকাশের

চাঁদ ধরা দিয়েছে আমার হাতে।'

কথাটা শুনে হাসল রিচার্ড, বিদায় নিয়ে চলে গেল।

রানাকে নিয়ে নিজের ছাদখোলা লক্কড়ঝক্কড় জিপে উঠল ভেলর। এটা-সেটা নিয়ে কথা বলতে বলতে মেণ্ডানায় হাজির হয়ে গেল একসময়। দরজা খুলে নেমে গেল রানা, ওকে গুডনাইট বলে চলে গেল ভেলর।

'ভাউযা ছিল এ-দ্বীপের সেরা ডুবুরি।'

বিছানায় উঠে বসেছে রানা, পিঠ ঠেকিয়েছে দেয়ালে, লম্বা করে দিয়েছে দুই পা। রেমি বসে আছে সোফায়, হেলান দিয়ে। ওর খাওয়া শেষ, এঁটো বাসন-পেয়ালাসহ বিদায় নিয়েছে বেয়ারা। জড়তা অনেকখানি কেটে গেছে ওর। রানাকে নিজের শুভাকাঙ্ক্ষী বিশ্বাস করে নিয়ে ওকে সব খুলে বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাই ওর ফেরার জন্য অপেক্ষা করেছে হোটেলকামরায়।

'থামলে কেন?' তাগাদা দিল রানা।

'আসলে...কোত্থেকে শুরু করব, বুঝতে পারছি না।'

'তুমি তোমার মতো বলতে থাকো। কিছু জানার থাকলে জিজ্ঞেস করে জেনে নেব আমি।'

মাথা ঝাঁকাল রেমি। 'খুব সাহস ছিল ভাউযার। কিছুই ভয় পেত না সে, কিচ্ছু না। বয়স যখন কম ছিল ওর, দ্বীপের অন্য জেলেদের সঙ্গে মাছ ধরতে যেত। কিন্তু একসময় বুঝতে পারে, ধীবরবৃত্তি এদেশে অসম্মানজনক কাজ। ডুব দিয়ে অনেকক্ষণ দম ধরে রাখা, সাগরজলের অনেক নিচে চলে যাওয়া ওর জন্য ডালভাত। বললে বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, বড় একটা ছুরি, হাঙর তাড়ানোর জন্য জংধরা একটা পুরনো বর্শা, আর মামুলি একটা টর্চলাইট নিয়ে ঝিনুকের খোঁজ শুরু করে সে সলোমন সাগরের পানিতে। যা-হোক, মুক্তো তুলে এনে সেগুলো দিয়ে চমৎকার মালা বানাতে পারত ভাউযা। ওগুলো বিক্রি করত ট্যুরিস্টদের কাছে, ভালো আয় হতো। সে যদি সারাদিন খাটুনি

করে মাছ ধরত, তা হলে ওই টাকার চারভাগের একভাগও কামাই করতে পারত কি না সন্দেহ আছে। কারণ ধীবরবৃত্তিতে অনেক ঝামেলা। নৌকার মালিককে টাকা দিতে হয়, মাছের একটা ভাগ দিতে হয়; যে-জায়গায় নিয়ে গিয়ে মাছ বেচবেন আপনি, সেটার মালিককে চাঁদা দিতে হয়। বখরা নিয়ে কোথাও কোনও ঝামেলা হলে পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে টাকা দিতে হয় পুলিশকেই।'

'আচ্ছা।'

'সেজন্যেই ভিন্ন পেশায় চলে গিয়েছিল আমার বাবা। যা-ই হোক, আমার সতেরো-বছর-বয়সী আরেক ভাই ইটেকে নিয়ে দিন ভালোই কাটছিল আমাদের। কিন্তু মানুষের কপালে সুখ বেশিদিন সয় না, এবং সেটা সম্ভবত মানুষের নিজেরই দোষে। ভাউযার সবচেয়ে বড় দোষ: মদের আড্ডায় বসলে হুঁশ থাকে না—গিলতেই থাকে, গিলতেই থাকে। এ-রকম এক আড্ডায়, কয়েকদিন আগে, মাতাল হয়ে বলে ফেলে সে এক জেলের কাছে, পয়েন্ট ক্রুয থেকে দূরে কিছু একটা আবিষ্কার করেছে সাগরের নিচে। সেখানে মহামূল্যবান কিছু থাকার ইঙ্গিত দেয়।'

মৃদু হাসল রানা। 'আবিষ্কারটা কী?'

মাথা নাড়ল রেমি। 'জানি না।'

'তা হলে কিছু একটা যে আবিষ্কার করেছে, জানলে কী করে?'

'ও-ই বলেছিল। সেদিন বার বার ডুব দিচ্ছিল ও পানিতে, বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল ওকে। পরে সন্ধ্যায় যখন ইটেকে নিয়ে ডিনারে বসি, আবিষ্কারের কথাটা জানায়।'

'তুমি সেদিন ছিলে ওর সঙ্গে?'

'না, শরীর খারাপ ছিল আমার, তাই যেতে পারিনি।'

'তা হলে জানলে কীভাবে বার বার ডুব দিয়েছিল ভাউযা?'

'ও-ই বলেছে। জিনিসটা কী, ভালোমতো দেখার জন্য পরের দিনটা আর ডুব দিতে পারেনি ও। কারণ জোরালো ঢেউ ছিল সাগরে, আর আমাদের এখানে সৈকতের কাছেপিঠের পানিতে বড়

ঢেউ উঠলে পানি ঘোলাটে হয়ে যায়। ...মাছ ধরে না, মুক্তো তোলাও বন্ধ—অলস মস্তিষ্কে মদের আড্ডায় বসে কাজ বাড়ায় ভাউযা। এক কান থেকে দু'কান, তারপর আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যায় কথাটা। সাগর কিছুটা শান্ত হয়ে আসার পর আবার ডুব দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল ভাউযা, একসকালে হঠাৎ করেই ওর বাসায় হাজির হয় গুণ্ডামার্কা একদল লোক।'

'ভাউযার বাসায় মানে? তোমরা তিন ভাইবোন একসঙ্গে থাক না?'

'আমাদের বাড়িটা বেশি বড় না। তিনজনের গাদাগাদি হয়ে যায় বলে ভাউযা আলাদা থাকত। যা-হোক, ভাউযার এক বন্ধু দৌড়াতে দৌড়াতে এসে খবর দেয়, ওই লোকগুলো চোটপাট শুরু করেছে ভাউযার ওপর, গায়ে হাত তোলার মতো অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে ছুট লাগাই আমি আর ইটে। গিয়ে দেখি, খুন চেপে গেছে ভাউযার মাথায়, একাই হাতাহাতি শুরু করে দিয়েছে গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে। পেরে ওঠার কথা না, পারছিলও না; আমি আর ইটে না গেলে কী হতো বলা যায় না। বেশিকিছু করেনি লোকগুলো সেদিন, তবে যাওয়ার আগে ইটেকে চড়থাপ্পড় মেরে যায়।'

'কী চাইছিল ওরা ভাউযার কাছে?'

'কতগুলো প্রশ্নের উত্তর: কী আবিষ্কার করেছে ভাউযা। সাগরের ঠিক কোথায় আছে জিনিসটা। ওটা তুলে আনতে হলে ঠিক কতজন লোক লাগতে পারে...ইত্যাদি ইত্যাদি।'

'নিশ্চয়ই কিছু বলেনি ভাউযা?'

'মাথা খারাপ!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেমি। 'আমার বড় ভাইটা যেমন দুঃসাহসী তেমন রাগী, আর ছোটটার সাহস তেমন না থাকলেও সাংঘাতিক একরোখা। ওই লোকগুলোর হাতে মার খেয়ে জেদ চেপে যায় ওর, প্রথমে টের পাইনি আমরা। বুঝতে পারিনি, লোকগুলো কারা, কোথায় থাকে—এসব জানার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ও। ধারণা করেছিল, ইসাটাবুর রেইন ফরেস্টের ভেতরে কোথাও ঘাঁটি গেড়েছে লোকগুলো।'

বইঘর.কম

'তারপর?'

'এক রাতে সেই যে উধাও হলো ইটে, আর কোনও খবর নেই ওর। কেউ জানে না কোথায় গেছে সে, কেউ বলতে পারে না শেষ কোথায় দেখা গেছে ওকে। আমি আর ভাউযা হন্যে হয়ে খুঁজেছি ইটেকে ইসাটাবুর সম্ভাব্য সব জায়গায়।'

'কোথাও না পেয়ে রিপোর্ট করেছ সার্জেন্ট ফুগুইয়ের কাছে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। ইটে যেন স্রেফ মিলিয়ে গেছে বাতাসে। শেষপর্যন্ত ভাউযা ঠিক করে, রেইন ফরেস্টের ভেতরে খুঁজতে যাবে ইটেকে। এ-কাজে আমাদের পরিচিত কয়েকজনের সাহায্য চায়, কিন্তু ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায় ক'জন? আজ সকালে ও গেল জঙ্গলের দিকে, পরে সংসারের কাজ সেরে আমি গেলাম পুলিশ স্টেশনে—সার্জেন্ট ফুগুইয়ের সঙ্গে দেখা করতে।'

'কী বলল সার্জেন্ট?'

'বলল, ইটের কোনও খোঁজ বের করা যায়নি, তদন্তে অগ্রগতি নেই। হতাশ হয়ে ফিরে আসছিলাম, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বাসে। আমার মনে তখন দুশ্চিন্তা—মানিবেল্টটা দেখছি আর ভাবছি, কী হয়েছে ভাউযার? সকালে ও বের হওয়ার পর মোবাইলে দু'-তিনবার কথা হয়েছে আমাদের, দুপুরের পর থেকে আর কোনও খবর নেই ওর। একটু পর পরই কল করছিলাম ওর মোবাইলে, রিং হয় কিন্তু কেউ ধরে না। মাঝখানে একবার অল্প কিছুক্ষণের জন্য ব্যস্ত পেয়েছি নম্বরটা।'

কারণটা জানে রানা, কিন্তু বলল না।

'বিকেলে একটা ফোন এসেছিল আমার মোবাইলে। অপরিচিত নম্বর। অনেক কথা বলা হলো আমাকে, যার সারমর্ম: ভাউযাকে আটক করা হয়েছে, বর্তমানে বন্দি ও।'

'আর কী বলল?'

'আমি কোথায় আছি জানতে চাইল। ভয়ে আমার মাথা তখন খারাপ, তাই বলে দিলাম। তখন বলা হলো, কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন লোক যাবে ওখানে, আমার সঙ্গে নাকি জরুরি কথা

আছে তাদের। কিন্তু লোকগুলোকে দেখে...কাদের কথা বলছি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই...আমার ভয় পরিণত হলো আতঙ্কে।'

'তাই তাড়াহুড়ো করে উঠে গেলে বাসে?'

মাথা ঝাঁকাল রেমি। 'ওই তিনজনও উঠল আমার পিছু পিছু। বসে পড়ে ভাবছিলাম, কী হচ্ছে এসব? ইটে উধাও, ভাউযা বন্দি...কারা কথা বলতে চায় আমার সঙ্গে? কী বলতে চায়? এমন সময় দেখি, আপনার কোমরে ভাউযার মানিবেল্ট। আমার সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। বার বার মনে হচ্ছিল, আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারলে জানা যাবে অনেকগুলো প্রশ্নের জবাব।'

'যে-লোক ফোন করেছিল তোমাকে, তার কণ্ঠ শুনে তোমার কি মনে হয়েছে সর্দি লেগেছে ওর?'

একটু চিন্তা করল রেমি, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ের ছাপ পড়ল ওর চেহারায়। 'আপনি জানলেন কীভাবে?'

কী করে জানল, বলল রানা।

শুনতে শুনতে চেহারা কালো হয়ে গেল রেমির, রানার কথা শেষ হওয়ার আগেই ফোঁপাতে শুরু করল সে, এবং যখন রানা বলল অবস্থা খারাপের দিকে গেলে ভাউযার আহত পা-টা কেটে ফেলা হবে তখন টপ টপ করে পানি পড়তে শুরু করল মেয়েটার চোখ দিয়ে।

ওকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য একটা কথাও বলল না রানা—কোনও দুঃখই চিরস্থায়ী না। এগিয়ে গেল সোফার দিকে, তুলে নিল ভাউযার মানিবেল্ট। ওটা নিয়ে ফিরে এল বিছানায়, বসে পড়ল দেয়ালে হেলান দিয়ে। ব্যাগের ভেতরে যা আছে সব বের করে রাখল বিছানায়। তাকাল রেমির দিকে। এখনও একটু পর পর চোখের পানি-নাকের পানি মুছছে মেয়েটা।

'ভাউযার মানিবেল্টের ভেতরে জালনোট কেন?'

রানার প্রশ্নটা যেন চাবুকের মতো আঘাত করল রেমিকে, কান্না বন্ধ হয়ে গেল মেয়েটার। ভেজা চোখে তাকাল সে রানার

দিকে। ‘কী বললেন?’

‘বললাম, ভাউযার মানিবেল্টের ভেতরে জালনোট থাকার কারণ কী?’

জবাব দিতে পারল না রেমি, হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

ছয়

সলোমন দ্বীপপুঞ্জের প্রধান একটি রাজনৈতিক দল “ইসাটাবু রিপাবলিকান্স”-এর অফিস থেকে বের হয়ে লক্কড়ঝক্কড় একটা গাড়িতে উঠল দলের দুই কর্মী। সামনে নির্বাচন, বেশ খাটুনি যাচ্ছে তাই। অসুবিধা নেই—আরেক বড় দল রিফর্মড্ ডেমোক্রেটিক পার্টি কোনও ঝামেলা না করলে জয়ের সম্ভাবনা রিপাবলিকানদেরই বেশি, সেক্ষেত্রে সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছে এই দলের কর্মীরা। নির্বাচনের পরে দ্বীপরাষ্ট্রটার কোন্ গুরুত্বপূর্ণ পদে কে বসবে, তা নিয়ে প্রায় প্রতিদিন গভীর রাত পর্যন্ত চলছে লবিং-গ্রুপিং।

ড্রাইভারের সীটে বসা লোকটা গাড়ি ছেড়ে দিল, তার পাশে বসা লোকটা ছাড়ল রেডিয়ো। এত রাতেও সামাজিক সংস্কারমূলক হিতোপদেশ বিনামূল্যে বিলি করা হচ্ছে একটা চ্যানেলে, সেটা পাল্টে কিছুক্ষণ রাজনৈতিক খেজুরে-আলাপ শুনল সে। যখন বুঝতে পারল আলোচনাটা ডেমোক্রেটদের পক্ষে যাচ্ছে, একথাবায় ঘুরিয়ে দিল রেডিয়োর নব, চালু হয়ে গেল লোকসঙ্গীত। আরেকটু আরাম করে সীটে বসল লোকটা, বন্ধ করল দু’চোখ।

খানাখন্দে ভরা কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে গাড়িটা। আর কিছুদূর গেলেই প্রধান সড়ক, টায়ারের নিচে পিচঢালা পথ পাওয়ামাত্র স্পিডোমিটারের কাঁটা ষাট-সত্তরের ঘরে নেয়ার ইচ্ছে আছে ড্রাইভারের।

বড় একটা গর্তে পড়ল গাড়ির চাকা, জোরে ঝাঁকুনি লাগল, গালি দিয়ে উঠল ড্রাইভার। গতি কমাতে বাধ্য হলো। গাড়িটার ওপর মেজাজ খারাপ হচ্ছে ওর। আজ এই সমস্যা তো কাল ওই সমস্যা লেগেই আছে। কত আর দৌড়ানো যায় মেকানিকদের কাছে? লোকদেখানো নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হিসেবে এতদিন ধরে দলের সঙ্গে লেগে থেকে যা পেয়েছে, তা দিয়ে কিনতে পেরেছে লক্কড়ঝক্কড়টাকে—সাধের একখানা গাড়ি। কিন্তু এটাকে মাসে মাসে সারাই করানোর মতো টাকা কই? এই যে এখন হেডলাইট দুটো জ্বলছে না, কে জানে ঠিক করাতে নিয়ে গেলে কত চাইবে মেকানিকরা। গলা কাটার জন্য তো বসেই আছে হারামজাদারা!

গতি আরেকটু কমাল সে। দু'পাশে জংলামতো জায়গা, মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেছে রাস্তাটা, সামনে একটা বাঁক। এ-রকম রাস্তায় বাঁক মানে হাজারটা সমস্যা। দেখা যায়, ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে কারও-না-কারও হারিয়ে-যাওয়া গরুছাগল। অথবা, জঙ্গল থেকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় দু'-চারটে লাকড়ি ফেলে গেছে বাওয়ালিরা। বিকল হয়ে গিয়ে অন্য কোনও লক্কড়ঝক্কড়ের দাঁড়িয়ে থাকাটাও বিচিত্র নয়।

ঠিক। বাঁক ঘোরামাত্র ব্রেক কষে গাড়ি থামাতে বাধ্য হলো সে, গালি দিল আরেকবার। সামনে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা ভ্যান, দেখে মনে হচ্ছে কোনও সমস্যা হয়েছে ওটার, ইমার্জেন্সি লাইট দুটো জ্বলছে-নিভছে।

আলতো করে ধাক্কা মারল সে ঘুমন্ত লোকটাকে, পিজিন ভাষায় তুবড়ি ছোটাল কথার, 'অ্যাই, শালা ডিকস্টা, ওঠ্ না। দেখতে পাচ্ছিস না ঝামেলা হয়েছে? একবার গাড়িতে উঠতে পারলেই হলো, না? দীনদুনিয়ার আর কোনও হুঁশ থাকে না?'

ধড়মড় করে জেগে উঠল ডিকস্টা। 'কী হয়েছে, স্যাম?'

'চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি, শালা? সামনে তাকিয়ে দ্যাখ্!'

সামনে তাকাল ডিকস্টা, যা বোঝার বুঝে নিল, তারপর পাল্টা তেজ দেখিয়ে বলল, 'পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা ভ্যান—এতে এত উত্তেজিত হওয়ার কী আছে? নিশ্চয়ই আশপাশেই কোথাও হিশু করছে ড্রাইভার।'

'যা নাম্ তা হলে গাড়ি থেকে। খুঁজে বের কর্ হারামজাদাটাকে। শালা বানচোত মরার আর জায়গা পেল না!'

দরজা খুলে নেমে গেল ডিকস্টা।

রেডিয়োটা বন্ধ করে দিয়ে নেমে পড়ল স্যামও, ইঞ্জিন বন্ধ করল না। খেয়াল করল, আচমকাই টিমটিম করে জ্বলে উঠেছে হেডলাইট দুটো। তারমানে, ভাবল সে, গাড়ির ব্যাটারিতে কোনও সমস্যা হয়েছে, আর কিছু না।

মৃদু আলোয় আলোকিত হয়ে আছে ভ্যানটার পেছনের দিক। ধীর পায়ে পাশাপাশি হেঁটে ওটার ড্রাইভিং সীটের পাশে হাজির হলো ডিকস্টা আর স্যাম। জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাল স্যাম, এদিকওদিক দেখে নিশ্চিত হলো কেউ নেই। ডিকস্টার দিকে তাকাল। 'আমার ইচ্ছে করছে, ড্রাইভার ব্যাটাকে খুঁজে বের করে তার দুই গালে কষে দুটো চড় মারি। কুত্তার বাচ্চা, গাড়ি নষ্ট হয়েছে ভালো কথা, একটু সাইড করে রাখলে অসুবিধা কী ছিল? একটু জায়গা পেলেই তো আমি...'

কথা শেষ করতে পারল না সে, ঝোপ আর লতাপাতা নড়ে ওঠার আওয়াজ পাওয়া গেল; একসঙ্গে চমকে উঠল স্যাম আর ডিকস্টা। কী ঘটছে বোঝার আগেই ওদের দিকে ছুটে এল কালো শার্ট আর কালো ট্রাউজার পরা চারজন লোক, অল্প আলোতেও চকচক করছে ওদের হাতের মাচেটির ফলা।

যা ঘটছে, সেটাকে স্রেফ ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে স্যামের। ছুট লাগাতে চাইল সে, কিন্তু ওর পা দুটোতে শিকড় গজিয়ে গেছে যেন। আত্মরক্ষার সহজাত-প্রবৃত্তির বশে

ডান হাতটা তুলল সে, কিন্তু মাচেটির ইস্পাতফলার কাছে চামড়া-মাংস-হাড় সবই তুচ্ছ। হামলাকারীর কোপে ওর ডান হাতের কব্জি বাহু থেকে প্রায় আলগা হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন হামলাকারীর কোপ পড়ল ওর ক্যারোটিড আর্টারির ওপর। ওর গলা দিয়ে একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসছিল, ওটা মরে গেল সেখানেই, ভিত্তি থেকে খসেপড়া মূর্তির মতো আছড়ে পড়ল সে রাস্তার ওপর।

সবই দেখছিল, কিন্তু আসলে কিছুই যেন দেখছিল না ডিকস্টা, নিজেও হয়তো বলতে পারবে না ছুট লাগানোর জন্য কখন পাঁই করে ঘুরল সে। কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানো পর্যন্তই, ছুট আর লাগাতে হলো না ওকে—তৃতীয় হামলাকারীর ভোজালির ফলা এফোঁড়ওফোঁড় করে দিল ওর পেট। সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথা নিশানা করে মাচেটির কোপ মারল চতুর্থজন, খুলির ইঞ্চিদেড়েক ভেতরে ঢুকে গেল ফলা।

স্যামকে এখনও কোপাচ্ছে দু'জন—লোকটা ইতোমধ্যে মরে গেছে জানার পরও। এদিকে ভূপাতিত ডিকস্টার বুকের ওপর চড়ে বসল একজন, হাতের ভোজালিটা উপর্যুপরি কয়েকবার বসিয়ে দিল লোকটার চোখে-মুখে-গলায়।

'হয়েছে, আর না,' জঙ্গলের ভেতর থেকে বলল একটা লোক, কণ্ঠ শুনলে মনে হয় কড়া সর্দি লেগেছে ওর, 'থামো এবার। কেউ এসে পড়ার আগেই উঠে পড়ো ভ্যানে।'

স্যাম আর ডিকস্টাকে ফেলে রেখে ঝটপট ভ্যানে উঠে পড়ল চার হামলাকারী।

জঙ্গলের ভেতর থেকে বের হয়ে ভ্যানড্রাইভারের জানালায় গিয়ে দাঁড়াল সর্দিলাগা কণ্ঠের মালিক। 'মনে থাকে যেন, যত খুশি মদ খাও, যত খুশি মাতাল হও, কিন্তু আজকের এই অপারেশনের ব্যাপারে ভুলেও একটা কথা বলা যাবে না কাউকে। আমি যদি টের পাই কিছু জানাজানি হয়েছে, সবার আগে তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ব নিজের হাতে।'

কিছু বলল না ড্রাইভার লোকটা, ওর কালো চেহারা আরও কালো হয়ে গেছে, ছেড়ে দিল ভ্যানটা। এক মিনিটের মধ্যে উধাও হয়ে গেল হত্যাকাণ্ডের স্পট থেকে।

দ্রুত পায়ে জঙ্গলের ভেতরে গিয়ে ঢুকল সর্দিলাগা কণ্ঠের মালিক, ঠেলতে ঠেলতে বের করে নিয়ে এল নিজের মোটরবাইক। ধরাশায়ী স্যাম আর ডিকস্টার অবস্থা দেখে ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল। তারপর ছেড়ে দিল বাইকটা।

রাতের নিস্তব্ধতা যেন আবার ঘিরে ধরল বাঁকটাকে। টিমটিম করে জ্বলছে স্যামের লক্কড়ঝক্কড়ের হেডলাইট। কাঁচা রাস্তার ওপর পড়ে আছে লাশ দুটো।

'প্রশ্ন আরও আছে,' বলল রানা। 'ভাউযার মানিবেল্টের ভেতরে তোমার ছবি কেন? ছবিটার উল্টোপিঠে লেখা নান ম্যাডলের মানে কী? ৯টা ২৯ মিনিট ১৩ সেকেণ্ডে কী হয়েছিল? আর যা-ই হয়ে থাকুক, সময়ের হিসেব এত নিখুঁতভাবে লেখা হয়েছে কেন? ১৫৯ পাউণ্ড ৫০ শিলিং ৩৭ পেন্স দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছে তোমার ভাই? এটা কীসের দাম? ব্রিটিশদের যে-মুদ্রাব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগে, সেটা এত বছর পর উল্লেখ করার মানে কী?'

একটা প্রশ্নেরও জবাব দিল না রেমি, এখনও তাকিয়ে আছে রানার দিকে। ওর কান্না থেমেছে, কিন্তু চোখ ছলছল।

'আমার ধারণা, মুক্তো বা মুক্তোর-মালা বেচার পাশাপাশি জালনোটের কারবারের সঙ্গেও যুক্ত ছিল ভাউযা।'

চোখ মুছল রেমি। 'জীবনেও না।'

'তা হলে ওর মানিবেল্টের ভেতরে জালনোট থাকার ব্যাখ্যা কী?'

জবাব না দিয়ে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রেমি। এগিয়ে এল বিছানার দিকে, হাত বাড়িয়ে সবগুলো নোট চেয়ে নিল রানার কাছ থেকে। ওগুলো নিয়ে বসে পড়ল বিছানার আরেককোনায়, রানার থেকে যথেষ্ট দূরে। ভালোমতো দেখছে নোটগুলো। কিছুক্ষণ পর

বলল, 'কই, আমার কাছে তো একইরকম মনে হচ্ছে সবগুলো নোট। পার্থক্য একটাই—কয়েকটা নোট পুরনো, কয়েকটা নতুন।'

সলোমন ডলার আসল না নকল তা চেনার উপায় বলে দিল রানা।

মিলিয়ে দেখার পর আবারও বিহ্বলতা ফুটে উঠল রেমির দৃষ্টিতে। কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না, মিস্টার রানা। তবে...ভাউযাকে যতদূর চিনি, কোনও অন্যায় কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল না ও...কখনও না।'

কিছু বলল না রানা, রেমির ছবির উল্টোপিঠের লেখাগুলো দেখছে।

'ভাউযা এখন কেমন আছে?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

ডক্টর ভেলরের সঙ্গে পরিচয় এবং একসঙ্গে ডিনার করার কথা বলল রানা। ভাউযার ব্যাপারে ভেলর যা বলেছে, বলল সেগুলোও। শেষে যোগ করল, 'লোকটার ব্যাপারে তোমার-আমার মতো সাধারণ মানুষের প্রার্থনা করা ছাড়া আর কিছু করার আছে বলে মনে হয় না। ওর চিকিৎসাখরচ দিচ্ছি আমি, কিন্তু এখন ওর ব্যাপারে যা করার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই করবে।'

'ভাউযার সঙ্গে কি দেখা করা যাবে না? কথা বলা যাবে না? আমি নিজেও নার্সিংকোর্সে ফাইনাল ইয়ারে পড়ছি—ওর সেবা-শুশ্রূষা...'

'যে-লোকের জ্ঞান নেই, যে-লোক কোমার কাছাকাছি চলে গেছে, তার কী সেবা করবে? তাকে দেখতে গেলেই কী আর না-গেলেই কী? আর যতক্ষণ পর্যন্ত না জ্ঞান ফিরছে ভাউযার, ততক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বলার কোনও উপায় নেই। ...আচ্ছা, একটা কথা বলো তো। ওই তিন ষণ্ডা...ওরা তো ইচ্ছে করলেই আগ্নেয়াস্ত্র বের করতে পারত। আর যদি তা করত, বাহাদুরি দেখানো বন্ধ করে হাত-পা গুটিয়ে নিতে হতো আমাকে। কাজটা করল না কেন ওরা?'

বইঘর.কম

'আমাদের এখানে পুলিশ ছাড়া অন্য কারও আগ্নেয়াস্ত্র বহন করা নিষিদ্ধ।'

'সার্জেন্ট বলল, তোমাদের এখানে নাকি প্রায়ই হারিয়ে যায় লোকজন?'

'হুঁ, বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীরা। আমার খেয়াল আছে, কয়েক মাস আগেও ইটেকে নিয়ে সে-রকম দুশ্চিন্তায় ভুগছিলাম আমি আর ভাউযা। সমস্যাটা প্রকট আকার ধারণ করেছিল একসময়, আস্তে আস্তে আবার কমেও গিয়েছিল।'

'কেউ হারিয়ে গেলে পুলিশ কিছু করে না?'

'কী করবে? ভাউযাকে যদি আজ কুমির গিলে খেত, কী করতে পারত পুলিশ? আবার ধরুন, জঙ্গল গিলে নিল কাউকে, তখনই বা কী করার আছে?'

'কী বললে?'

'বললাম, আমাদের জঙ্গল অনেকসময় গিলে খায় কাউকে কাউকে, বিশেষ করে লোকটা যদি একা থাকে।'

'এটা কত সাল চলছে, জানো তো? কুসংস্কারের জমানা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।'

'তা হয়তো হয়েছে, তবে সেটা পৃথিবীর অন্য সব জায়গার জন্যে। ইসাটাবুর জন্যে না। ইসাটাবু এখনও এক অভিশপ্ত দ্বীপ।'

'অভিশপ্ত? কীসের অভিশাপ?'

'দৈত্যদেবতাদের অভিশাপ।'

'দৈত্যদেবতা? রেমি তানাঘাই, তুমি কোন্ ধর্মের মানুষ?'

'খ্রিস্টান। এককালে আমার পূর্বপুরুষরা সনাতন ধর্মের অনুসারী ছিল, পরে মিশনারিরা যিশুর ধর্মে দীক্ষিত করে আমাদের অনেককে। কিন্তু কথা হচ্ছে, ধর্ম যা-ই হোক, পূর্বপুরুষরা যা বলে গেছে তা বিশ্বাস করতে অসুবিধা নেই নিশ্চয়ই?'

'কী বলে গেছে তোমার পূর্বপুরুষরা?'

'ইসাটাবুর পাহাড়ে, জঙ্গলে, নির্জন উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় দৈত্যদেবতারা। যদি বুঝতে পারে ওদের শান্তি নষ্ট করার জন্য

জঙ্গলে ঢুকেছে কেউ, স্রেফ গায়েব করে দেয় তাকে। ওদের ভয়ে, ঠেকায় না পড়লে, জঙ্গলের গহীনে ঢোকে না দ্বীপবাসীরা এখনও।'

'দৈত্যদেবতারা দেখতে কেমন?'

'ঠাট্টা করছেন?'

'না, আসলেই জানতে চাইছি।'

'তাঁরা প্রায় দুই মানুষের সমান লম্বা। গুহায় থাকেন, গায়ে বড় বড় লোম আছে। কখনও কখনও কুমিরের চেয়েও হিংস্র হয়ে ওঠেন। মানুষ তাঁদের শত্রু। মানুষের ওপর যখন যারপরনাই বিরক্ত হয়ে ওঠেন তাঁরা, অভিশাপ দিতে থাকেন, ফলে বিনাকারণে উধাও হয়ে যায় এখানকার লোকজন, অসুখবিসুখ শুরু হয়ে যায় এলাকায়।'

'তোমার পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস, ভাউযার কাজের সঙ্গে মিলছে না কিন্তু।'

'মানে?'

'তোমরা যদি এতই ভয় পাবে দৈত্যদেবতাদেরকে, এতই যদি এড়িয়ে চলবে রেইন ফরেস্টটাকে, তা হলে আজ ভাউযা কেন গিয়ে ঢুকল সেখানে? ইটেকে খুঁজতে? ইটে কেন যাবে সেখানে? যারা ওর গায়ে হাত তুলেছিল তাদেরকে খুঁজে বের করতে? যারা মেরেছে ইটেকে, তারা যদি এ-দ্বীপেরই লোক হয়ে থাকে, তা হলে জঙ্গলের ভেতরে ঘাঁটি গাড়তে যাবে কী কারণে, বলো তো?'

'জানি না। যা ঘটছে, সেসবের কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারছি না আমি...আমার বুদ্ধিতে কুলাচ্ছে না আসলে।'

'জালনোটগুলোর ব্যাপারে কী করবে?' প্রসঙ্গ বদল করল রানা।

'পুলিশের কাছে যাব?' রেমির কণ্ঠে অনিশ্চয়তা।

'কাজটা কি উচিত হবে? সার্জেন্টকে সুবিধার লোক বলে মনে হয়নি আমার।'

বইঘর.কম

মাথা ঝাঁকাল রেমি। 'যে-ক'বার দেখা হয়েছে লোকটার সঙ্গে, আমারও সুবিধার মনে হয়নি ওকে। মেয়েদের বুকের ওপর থেকে ওর নজর যেন সরতেই চায় না। কানাঘুষা আছে, রয়্যাল পুলিশের বেশ কয়েকজন অফিসার ডিযনেস্ট, মনে হয় ফুগুই তাদের একজন।'

'তা হলে কোথাকার পানি কোন্ দিকে গড়াচ্ছে তা না-বোঝা পর্যন্ত রয়্যাল পুলিশকে কিছু জানাব না আমরা, ঠিক আছে? এসো ভাউযার প্রসঙ্গে। জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত হাসপাতালেই থাকুক সে, কাজেকর্মে ডক্টর ওঁলরকে আন্তরিক মনে হয়েছে আমার। এবার এসো তোমার ফটোগ্রাফের কথায়। ছবিতে নার্সের পোশাকে দেখা যাচ্ছে কেন তোমাকে?'

'নার্সিং ট্রেনিং স্কুলে পড়ছি আমি। শখ ছিল, তাই একদিন এক নার্সের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে...। একটা স্টুডিয়োতে তোলা হয়েছিল ছবিটা।'

'ভালো ইংরেজি শিখলে কোথায়?'

'আমি কনভেন্টের ছাত্রী ছিলাম।'

'...নান ম্যাডল মানে কী?'

'জানি না।'

'এটা কি ভাউযাই লিখেছে?'

'হ্যাঁ, ওটা ওরই হাতের-লেখা।'

'সময় আর টাকার হিসেব দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে?'

'জানি না।'

'এগুলো কবে লিখেছে বলতে পারো? আই মীন, ওর সেই আবিষ্কারের আগে না পরে?'

'শিয়োর না। আবিষ্কারটা যখন করল ও, মানে আবিষ্কারের কথাটা যখন জানাল আমাকে, তারপর থেকে শুরু করে আজ ইটেকে খুঁজতে বের হওয়ার আগপর্যন্ত প্রায় পুরোটা সময়ই উত্তেজিত অবস্থায় ছিল। কোন্ ফাঁকে লিখেছে এসব...। এমনিতে লেখাপড়ায় তেমন রুচি নেই আমার ভাইয়ের, কিন্তু আমার মনে

হয় লাইব্রেরিতে যখন গিয়েছিল...'

'লাইব্রেরি?'

'পাবলিক লাইব্রেরি, হেণ্ডারসন ফিল্ডের কাছে।'

'রেমি, সত্যি করে বলো তো, ভাউযা যা আবিষ্কার করেছে সে-ব্যাপারে কি আসলেই কিছু বলেনি তোমাকে?'

'না, কসম। বলার সময় পেল কই? তার আগেই তো হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল।'

'সাগরে ডাইভ দেয়ার জন্য যেসব ইক্যুইপমেন্ট লাগে, সবই কি আছে গউযার?'

'না, সব না, তবে কাজ চালিয়ে নিতে পারত ও। ...কেন?'

'হাতে তেমন কোনও কাজ নেই তো, তাই ভাবছিলাম...'

'ডুব দেবেন কি না?' রানার কথা কেড়ে নিয়েছে রেমি, উত্তেজিত হয়ে গেছে কিছুটা। 'আপনি সী-ডাইভিংও পারেন?'

'পারি। ...ভাউযাকে যেভাবে সাহায্য করতে, তোমার কাছ থেকে সে-রকম সাহায্য যদি চাই, করবে?'

'অবশ্যই করব। ঈশ্বরের কাছে মনেপ্রাণে তিনটে জিনিস চাইছি আমি এখন। এক, কী হয়েছে ইটের তা যেন জানতে পারি। দুই, খারাপ কিছু যাতে না হয় ভাউযার, ওর পা-টা যাতে কেটে বাদ দিতে না হয়। এবং তিন, একটা কূলকিনারা যাতে হয় এই রহস্যের।'

'আমিও তা-ই চাই,' বিছানা ছেড়ে নামল রানা। 'নুমা'র নাম শুনেছ?'

'কীসের নাম?'

'এন ইউ এম এ—ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সি। আমেরিকান প্রতিষ্ঠান, সাগর নিয়ে গবেষণা করা ওদের কাজ। অ্যাডমিরাল হ্যামিল্টন নামের এক লোক ওটার চীফ। আমাকে খুব স্নেহ করেন, আমিও শ্রদ্ধা করি তাঁকে। যদি তোমার আপত্তি না থাকে, ভাবছি, অ্যাডমিরালের কাছে সাহায্য চাইব।'

'আপত্তি নেই। কিন্তু সাহায্য চাইতে হবে কেন?'

'কারণ কেন যেন মনে হচ্ছে, ভাউযা যা আবিষ্কার করেছে, তার সঙ্গে কোনও-না-কোনও গুপ্তধনের সম্পর্ক আছে। সেটা শুধু আমাদের দু'জনের পক্ষে রিকভার করা সম্ভব না। কয়েকটা দিনের জন্য বেড়াতে এসেছি আমি এখানে, তা ছাড়া যেমনটা বলেছি, সবরকমের ইক্যুইপমেন্ট নেইও ভাউযার। অল্প সময়ে রহস্যের সমাধান করতে হলে উন্নত প্রযুক্তির কোনও বিকল্প দেখছি না। আর সে-প্রযুক্তি আমি পেতে পারি একমাত্র নুমা'র কাছ থেকে।'

'আপনি বললেন, প্রতিষ্ঠানটা আমেরিকান। তারমানে অ্যাডমিরালও কি আমেরিকান? যদি তা-ই হয়, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন কীভাবে? আমার মোবাইলে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল কল করার সুবিধা নেই। এই হোটেল থেকেও...' রানাকে ক্লযিটের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে থেমে গেল রেমি।

ক্লযিট খুলল রানা, একটা দেরাজ থেকে বের করল ওর স্যাটেলাইট ফোন। জিনিসটা কী, সংক্ষেপে বলল রেমিকে, তারপর ফোন দিল অ্যাডমিরালের নম্বরে।

'রানা!' কণ্ঠ শুনে বোঝা গেল আশ্চর্য হয়েছেন অ্যাডমিরাল। 'হঠাৎ?'

ইসাটাবুতে ছুটি কাটাতে এসে কীভাবে একটা রহস্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, ব্যাখ্যা করল রানা। কী সাহায্য চায় অ্যাডমিরালের কাছে, তা-ও বলল।

হ্যামিল্টন বললেন, 'এ-মুহূর্তে তোমার সবচেয়ে কাছাকাছি আছে ডারউইন—নুমা'র মাদার রিসার্চ শিপগুলোর একটা, নিউযিল্যাণ্ডের বন্দর শহর টুরাঙ্গায়। ওটার সঙ্গে আছে একটা অগযিলারি ভেসেল, পোসেইডন। তুমি চাইলে পোসেইডনকে পাঠাতে পারি তোমার কাছে।'

'নিউযিল্যাণ্ড, স্যর?'

'আছে বিশেষ একটা কারণ, পরে একসময় বলব তোমাকে।'

‘পোসেইডন নিশ্চয়ই ওয়েল ইক্যুইপ্‌ড, স্যর?’

‘হ্যাঁ, ওয়েল ইক্যুইপ্‌ড, কিন্তু ওয়েল আর্মড্‌ নয়।’

‘অসুবিধা নেই।’

‘তা হলে এখনই বলে দিচ্ছি ভেসেলটার ক্যাপ্টেনকে। তবে ইসাটাবুর সময় অনুযায়ী...আমার মনে হয় না পরশু সকালের আগে তোমার কাছে রিপোর্ট করতে পারবে সে। ওখানকার বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওদের কাছ থেকে অনুমতি নেয়ার ব্যবস্থা করে রাখছি। আর হ্যাঁ, দু'জনের বেশি ডুবুরি দেয়া যাচ্ছে না আপাতত।’

‘চলবে, স্যর। ওদের সঙ্গে হাত লাগানোর ইচ্ছে আছে আমারও।’

‘ঠিক আছে, রাখছি এখন। যোগাযোগ রেখো। একটু ব্যস্ত আছি, নইলে আরও কিছু কথা বলার ছিল তোমাকে। পরে সময় করে ফোন দেব।’ লাইন কেটে দিলেন হ্যামিল্টন।

রেমির দিকে তাকাল রানা। কী কথা হলো অ্যাডমিরালের সঙ্গে, জানাল। তারপর বলল, ‘ভাউযার জিনিসগুলো তোমার কাছেই থাক। আমি আইনের লোক নই, কাজেই ওই জাল নোটগুলোর ব্যাপারে আমার প্রশ্ন থাকলেও অভিযোগ নেই। ...যদি বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি তোমাকে এখন, কী মনে হয়—গুণ্ডারা কি আবার হামলা করতে পারে তোমার ওপর?’

‘জানি না।’

‘তোমার জন্যে এই হোটেলে একটা রুমের ব্যবস্থা করা যায় কি না, দেখি।’

দোতলায় সিঙ্গেলবেডের একটা রুম পাওয়া গেল, সেখানে রেমির থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজের রুমে এসে শুয়ে পড়ল রানা। ভাউযার চেহারাটা ভাসছে ওর চোখের সামনে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো বের হলো লোকটা জঙ্গলের ভেতর থেকে, হাজির হলো খালের কিনারায়, এদিকওদিক দেখে লাফিয়ে পড়ল পানিতে। মৃত্যুভয় দেখেছে রানা লোকটার চেহারায়। কী তাড়া করেছিল

লোকটাকে? দৈত্যদেবতা?

ধেৎ, কী আবোলতাবোল ভাবছে! একদল মানুষ তাড়া করেছিল ভাউযাকে, কারণ বিড়াল গোত্রের বড় কোনও মাংসাশীর বাস ইসাটাবুর রেইন ফরেস্টে আছে বলে শোনেনি ও।

একটু নড়েচড়ে শুল রানা, কোলবালিশের ওপর তুলে দিল একটা পা। নান ম্যাডল মানে কী? জবাবটা...মনে মনে বলল ও নিজেকে...পাওয়া যেতে পারে ইসাটাবুর সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে। চোখ বন্ধ করল। ঘুমিয়ে পড়তে সময় লাগল না।

স্বপ্নে দেখল, লাইব্রেরিতে গেছে ও। ওর হাতঘড়িতে সময় ৯টা ২৯ মিনিট ১৩ সেকেণ্ড। কিন্তু আশ্চর্য, সময়টা দিনের না, রাতের। ওকে দেখে এগিয়ে এসেছেন লাইব্রেরিয়ান, বলছেন, 'বই পড়বেন? ভাউযা যেগুলো পড়েছে সেগুলো? তা হলে কিন্তু ঠিক ১৫৯ পাউণ্ড ৫০ শিলিং ৩৭ পেন্স খরচ পড়বে।'

চোখ খুলল রানা, কয়েকবার পিটপিট করল। সারাজীবনের অভ্যাস—ঘুম ভাঙামাত্র বাঁ কব্জি চোখের সামনে এনে হাতঘড়ির রেডিয়াম ডায়াল দুটো দেখল। তিনটে দশ।

ঘুম ভাঙল কেন? কারণ থেকে থেকে বাজ পড়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। উঠে বসল রানা। এখনও তাকিয়ে আছে হাতঘড়ির ডায়াল দুটোর দিকে, কিন্তু কিছুই দেখছে না আসলে।

ধাঁধার মাধ্যমে একটা কথা লিখেছে ভাউযা, সেটার মানে আন্দাজ করে ফেলেছে ও।

সাত

দ্বিতীয়বার ঘুম ভাঙতে বাঁ কব্জিটা আবার যখন চোখের সামনে ধরল রানা, তখন বাজে সাড়ে সাতটা। ধড়মড় করে উঠে বসল না ও, কারণ ভোর পাঁচটার বদলে আড়াই ঘণ্টা দেরিতে ঘুম ভাঙায় মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়নি। ছুটিতে রয়েছে ও।

রেমি যে-রুমে আছে, বিছানা ছাড়ার পর প্রথমেই সেখানে রিং করল রানা ইণ্টারকমের মাধ্যমে। বাজতে বাজতে একসময় কেটে গেল লাইন, রিসিভ করল না কেউ। ব্যাপার কী? দরজার উদ্দেশে রওয়ানা হলো রানা, ওটা খুলতে যাবে এমন সময় চোখে পড়ল, একটা চিরকুট পড়ে আছে মেঝেতে—দরজার নিচ দিয়ে ঠেলে দিয়েছে কেউ। উবু হয়ে ওটা তুলে নিল রানা।

রেমি লিখেছে: আপাতত চলে যাচ্ছি, কারণ, কিছু কাজ আছে। পয়েণ্ট ক্রুযের সঙ্গের জেলেপাড়ায় গিয়ে জিজ্ঞেস করলে আমার বাসাটা খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে না আশা করি। যদি খোঁজ না করেন, কাজ সেরে দেখা করতে আসব আপনার সঙ্গে।

কী কাজ আছে রেমির? জানে না রানা। আনমনে কাঁধ ঝাঁকাল ও। চিরকুটটা বিছানার ওপর রেখে দিয়ে ঢুকল গিয়ে বাথরুমে। সময় নিয়ে ফ্রেশ হলো। সময় নিয়ে শেভ করল, শাওয়ারের জলধারার নিচে ভিজল অনেকক্ষণ। চুলগুলো ব্যাকব্রাশ করে নিয়ে উদোম গায়েই বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে। কোমরে টাওয়েল পেঁচিয়ে খবর দিল লণ্ড্রিসার্ভিসকে, আনিয়ে নিল গতকালের জিন্স আর শার্ট। ওগুলো পরে সাড়ে আটটার দিকে চলে এল নিচতলার রেস্টুরেণ্টে, একটা টেবিল দখল করে নাস্তার অর্ডার দিল। খেয়াল

বইঘর.কম

করল, রেস্টুরেন্টের ওয়েইটার, ম্যানেজার, এমনকী যে-ক'জন খদ্দের আছে তাদের প্রায় সবার চোখেমুখে চাপা উত্তেজনা। উঁচু ভলিউমে রেডিয়ো চলছে রেস্টুরেন্টের এককোনায়, স্পিকারে যে-কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে তা একটু খেয়াল করলে বোঝা যায় সংবাদ পাঠ করা হচ্ছে। কিন্তু সেটা পিজিন ভাষায় হওয়ার কারণে কিচ্ছু বুঝতে পারছে না রানা।

কী ব্যাপার?

নাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছিল ওয়েইটার, লোকটাকে ডেকে ঘটনা কী জানতে চাইল রানা।

বলবে কি বলবে না, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল লোকটা, রানা চাপাচাপি করায় ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে যা বলল তার সারমর্ম: কাল রাতে কে বা কারা খুন করেছে ইসাটাবু রিপাবলিকান্সের দুই কর্মীকে। অনেকেই দুষছে রিফর্মড্ ডেমোক্রেটিক পার্টিকে, অথচ ডেমোক্রেটদের দাবি, এ-ব্যাপারে কিছুই জানে না তারা। ঘটনা তদন্ত করে দোষীদের খুঁজে বের করা, এবং তাদের বিচারের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেয়ার বদলে, রাগের মাথায় বদলা নেয়ার ঘোষণা দিয়ে জল আরও ঘোলাটে করে ফেলেছেন রিপাবলিকানদের চেয়ারপার্সন এবং সলোমন দ্বীপপুঞ্জের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মানাশেহ সোগাভের। প্রায় সবাই বলাবলি করতে শুরু করেছে, সময়মতো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারবে না; কেউ কেউ বলছে আরেকটা দাঙ্গা অবশ্যম্ভাবী।

খাওয়া শেষ করল রানা, তারপর একটা কফি চেয়ে নিল নিজের জন্য। চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

সন্দেহ নেই, ঘটনাপ্রবাহ মোড় নিয়েছে নতুন দিকে। প্রথমে ভাউযা, তারপর কুমিরের আক্রমণ। মাঝখানে একটা মানিবেল্ট, সেটার ভেতরে কিছু জাল নোট। তারপর রেমি তানাঘাই, আর তিন ষণ্ডা। সবশেষে, আজ সকালে, দুটো হত্যাকাণ্ডের খবর।

প্রশ্ন হচ্ছে, এগুলো কি একইসূত্রে গাঁথা?

ছোট ছোট চুমুকে কফি খেতে খেতে হঠাৎ করেই টের পেল

রানা, অস্থির বোধ করছে। এবারের ছুটিটা কাটানোর জন্য সলোমন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী শহরকে বেছে নিয়েছিল; ভেবেছিল, বলতে গেলে জগৎ-বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপটাতে নির্বিঘ্নে কাটানো যাবে কয়েকটা দিন। কিন্তু কীসের কী? এমন এক রহস্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, ইচ্ছা করলেও সেটা থেকে বের হতে পারবে না, এবং ইচ্ছাটা করছেও না ওর। জালনোটের কারবারি হোক বা না হোক, কোনও অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকুক বা না থাকুক, কেন যেন মায়া পড়ে গেছে ভাউযার ওপর। করুণা জন্মে গেছে রেমির প্রতি, খারাপ লেগেছে মেয়েটার অসহায়ত্ব দেখে। জানতে ইচ্ছে করছে, কী হয়েছে মেয়েটার টিনএজার ভাইটার।

এবং, সবচেয়ে বড় কথা, সলোমন সাগরে কী আবিষ্কার করেছে ভাউযা, তা জানার জন্য গুণ্ডাগুলোর মতই ছটফট করছে ওর মনটাও।

বিল চুকিয়ে হোটেলের বাইরে চলে এল রানা। কাঁচা রাস্তাটা ধরে হাজির হয়ে গেল মাকিরা-উলাওয়ায়, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর উঠতে পারল একটা বাসে। নেমে পড়ল রেন্ট-আ-রাইড প্রতিষ্ঠানটার সামনে। মাশুল দিয়ে বুঝে নিল জিপটা, ওটা চালিয়ে পৌঁছে গেল সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে। একধারে পার্ক করে এগিয়ে গেল সুদৃশ্য লাল রঙকরা সিঁড়ির দিকে।

বেশিক্ষণ হয়নি খুলেছে লাইব্রেরিটা, পাঠক-গ্রাহক নেই বললেই চলে। ভেতরে ঢুকে একটু আশ্চর্যই হতে হলো রানাকে। বেশ প্রশস্ত, রীতিমতো বড়সড় বলা চলে। তবে গড়পড়তা লাইব্রেরি যে-রকম হয়, এটা সে-রকম না। পরিবেশ ঘরোয়া, মনে হয় কারও ব্যক্তিগত স্টাডিরুমে প্রবেশ করেছে যেন। ভবনটা দোতলা, ওপরতলায় যাওয়ার সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে এককোনায়। স্বাভাবিকের চেয়ে উঁচু ছাদ থেকে ঝুলছে পর্যাপ্ত টিউবলাইট। তবে কয়েকটা ছাড়া আরগুলো জ্বালানোর দরকার হয়নি, গ্রিল লাগানো বড় বড় গোটাকয়েক জানালা আছে, সরিয়ে দেয়া হয়েছে সবগুলো পর্দা, বাইরের দিকে খুলে দেয়া হয়েছে সবগুলো পাল্লা। পর্যাপ্ত

সিলিংফ্যানও আছে; বেশিরভাগই বন্ধ—সাগরটা অনতিদূরে; এবং আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, সাগরতীর আর লাইব্রেরির মাঝখানে কোনও স্থাপনাই নেই, তাই মৃদু কিন্তু প্রশান্তিদায়ক প্রাকৃতিক বাতাস টের পাওয়া যায়।

বইয়ের সংগ্রহের দিক দিয়ে বিচার করলে ধনী বলা যাবে না লাইব্রেরিটাকে, কিন্তু অগোছালো বলারও উপায় নেই। এক মানুষ সমান উঁচু, দু'পাল্লার, কাঠের অনেকগুলো আলমারিতে রাখা আছে বইগুলো। কোন্ আলমারিতে কোন্ বিষয়ের বই পাওয়া যাবে তা চওড়া একটা কাগজে, একইসঙ্গে পিজিন আর ইংরেজিতে লিখে, টুকরোটা সাঁটিয়ে দেয়া হয়েছে আলমারির ওপরের দিকে এককোনায়।

আপাতত খালি আছে লাইব্রেরিয়ানের চেয়ার, কোনও কারণে বাইরে গিয়ে থাকতে পারে লোকটা; গত রাতে দেখা স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মুচকি হাসল রানা।

চারদিকের দেয়ালে ফ্রেমে বাঁধাই করে টাঙানো আছে ইসাটাবুর কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, কয়েকজন কীর্তিমান ব্যক্তি আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার বিশেষ কিছু মুহূর্তের ছবি।

ঠিক কোন্ বইগুলো পড়েছিল ভাউযা, অনুমান করা মুশকিল। তবে রেমির কথা যদি ঠিক হয়, মানে বিশেষ সেই আবিষ্কারের পরে যদি লাইব্রেরিতে এসে থাকে পাঠবিমুখ লোকটা, তা হলে ধরে নেয়া যেতে পারে সলোমন সাগর অথবা ইসাটাবুর প্রাচীন স্থাপনা কিংবা দ্বীপশহরটার ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে পড়াশোনা করেছে।

একদিকের আলমারির পাশ দিয়ে হাঁটতে শুরু করল রানা।

প্রথমটাই পদার্থবিজ্ঞানের—কোনও কাজে লাগবে না। এরপর রসায়ন, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান—সময় বাঁচানোর জন্য নাম না দেখেই কয়েকটা আলমারি পাশ কাটাল রানা। সাহিত্য-সংস্কৃতি আলমারিটার সামনে থামল না, ভূগোল আলমারিটাকে দেখে ভ্রূ কোঁচকাল একটুখানি। দাঁড়াল আলমারিটার সামনে, তিন-চারটা

বই ঘাঁটাঘাঁটি করে স্বচ্ছ একটা ধারণা নিল ইসাটাবুর ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে, তারপর চলে গেল ইতিহাস-ঐতিহ্য'র সামনে। এ-আলমারির বইগুলোর পুট দেখছে। নাম মনে ধরায় পাল্লা খুলে বের করল কয়েকটা, উল্টেপাল্টে দেখল। কিন্তু প্রতিবারই ঠোঁট উল্টাল, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না বইগুলো নিয়ে বসবে কি না। শেষে কিছুটা বিরক্ত হয়ে লাগিয়ে দিল পাল্লা, সরে এল আলমারিটার সামনে থেকে। আরও দু'-তিনটে আলমারিকে পাশ কাটানোর পর গিয়ে দাঁড়াল "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ"-এর সামনে। সরে যাচ্ছিল এখান থেকেও, কিন্তু আলমারির ওপরে, দেয়ালে টাঙানো ছবিটা যেতে দিল না ওকে।

একটু খেয়াল করলে বোঝা যায়, ওটা হেণ্ডারসন ফিল্ডের ছবি, খুব সম্ভব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকের। লড়াইয়ে বিজয়ী হয়ে ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মার্কিন বাহিনীর সৈন্যরা, প্রায় সবার মুখেই হাসি। একদল জাপানি সৈন্যকে ঘিরে ধরেছে ওরা। জাপানিদের চেহারা মলিন, মাথা নিচু করে আছে কেউ কেউ, ছেঁড়াফাটা প্রায় সবার ইউনিফর্ম। ধুলোময়লা-লাগা কোনও কোনও চেহারা দেখলে মনে সংশয় জাগে ওরা আসলেই জাপানি কি না।

কী ভেবে আলমারিটার পাল্লা খুলল রানা, একটা বইয়ের পুটে আটকে গেছে ওর দৃষ্টি: "মাই ইসাটাবু ডেইয"। লেখক সিলভেস্টার রোয। ভ্রূ কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করল রানা, লোকটা বিখ্যাত কেউ কি না। কিন্তু মনে করতে পারল না। তবে যেহেতু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আলমারিতে আছে, বইটাতে ওই সময়ের বিশেষ কোনও ঘটনা পাওয়া যেতে পারে।

ওটা নিয়ে একধারের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল রানা।

দু'-একটা পাতা উল্টানোর পরই বোঝা গেল, রোয মোটেও বিখ্যাত কেউ না, বরং খ্যাতির আশায় নিজের দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধকালীন ডায়েরিকে বই হিসেবে ছাপানো এক মার্কিন ক্যাপ্টেন। তারপরও বইটা পড়তে শুরু করল রানা। বর্ণনা, দু'-

বইঘর.কম

এক জায়গায়, যথেষ্ট দুর্বল মনে হলো ওর কাছে, তারপরও পড়া থামাল না। কারণ কোনও কোনও ঘটনা ইণ্টারেস্টিং।

২১ অগাস্ট, ১৯৪৩

ইসাটাবুর রেইন ফরেস্ট যে এত ঘন, আগে জানতাম না। ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই আমাদেরকে ড্রপ করে দিয়ে গেছে এয়ারক্র্যাফট সি-৪৭ ডগলাস। তাড়াহুড়োর কাজ সবসময়ই খারাপ—প্যারাশুটগুলো যে এত ঝামেলা করবে, কল্পনাই করিনি আমরা কেউ। শামিয়ানার মতো ডালপাতা নিয়ে গজিয়ে রয়েছে বনের গাছগুলো, অনেক চেষ্টা করেও ওগুলোর সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে পারেনি আমাদের কয়েকজন। পিটারসেন তো গলায় ফাঁস লেগে মরেই গেল, কীভাবে জানি না। গুরুতর আহত হয়েছে নেলসন, একটু পর পর কাতরাচ্ছে বেচারা, হেণ্ডারসন ফিল্ড অপারেশনের জন্য ওকে সম্পূর্ণ অযোগ্য ঘোষণা করেছেন চীফ। আসলেই, আমরা যারা যুদ্ধ করি, তাদের একেকটা মুহূর্ত, সিভিলিয়ানদের দশটা বছরের সমান।

২১ অগাস্ট, ১৯৪৩

হেণ্ডারসন ফিল্ডের কাছে, বনের ভেতরে অবস্থান নিয়েছি আমরা। জানি, বিকেল ফুরোয়নি, তারপরও রাতের অন্ধকার নেমে এসেছে চারপাশে। অপেক্ষা করছি, ফিল্ড দখল করে থাকা জাপানিদের ওপর ঠিক কখন গোলাবর্ষণ শুরু করবে আমাদের সহযোদ্ধারা। আমাদের প্ল্যানটা হচ্ছে, মার্কিন মেরিন ট্রুপারদেরকে যখন একমাত্র হামলাকারী ভেবে নিয়ে জবাব দেয়ায় ব্যস্ত থাকবে জাপানিরা, তখন পেছন থেকে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব আমরা। ওদেরকে কচুকাটা করার জন্য তর যেন আর সইছে না আমার।

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩

প্রায় একটা মাস ডায়েরি-কলম নিয়ে বসতে পারিনি। বসব কীভাবে? যে-লড়াই হয়েছে! ২১ অগাস্টের সারাটা রাত অপেক্ষা করে ছিল আমাদের রণতরীগুলো, জানি তার ফলে স্নায়ু ছিঁড়ে যায়

মাউন্ট অস্টিনের ওপর ঘাঁটি গেড়ে থাকা থ্যাবড়া নাকের জাপানিদের। ভোর হতে না হতেই শুরু হয় তুমুল গোলাগুলি। চীফের নির্দেশ পাওয়ামাত্র আড়াল ছেড়ে বের হই আমরা একেকজন উদ্ভিদমানব—সামরিক উর্দির জায়গায় জায়গায় বিশেষ কায়দায় লতাপাতা আটকানো প্যারাট্রুপাররা। কিন্তু শালার জাপানিরা বেঁটে হলেও মাথায় মগজ আছে। এত সতর্ক ছিলাম, তারপরও আমাদের পরিকল্পনা টের পেয়ে যায় ওরা। এবং ওদের কাছে যে এত গোলাবারুদ ছিল, ভাবিইনি আমরা। ওদেরকে দু'দিক দিয়ে একসঙ্গে চেপে না ধরলে...ঠিক কী হতো বলা মুশকিল।

ইটের জবাব পাটকেল দিয়ে দিতে শুরু করে ওরা। লড়াই শুরু হওয়ার পর প্রথম তিনটে দিন আমি যে কতবার ভেবেছি কেন মরতে এলাম এই দ্বীপে, বলতে পারব না। দ্বীপের সবচেয়ে বড় নদী মাটানিকাউ সংলগ্ন গভীর জঙ্গলে ট্যাঙ্ক পর্যন্ত মজুদ করে রেখেছিল জাপানিরা। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছি হাজারবার, বার বার কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছি আমাদের দূরদর্শী চীফকে—কী ভেবে ৩৭ মিলিমিটার অ্যান্টিট্যাঙ্ক গানগুলো এনেছিলেন, একমাত্র তিনিই বলতে পারবেন। মোট ন'টা ট্যাঙ্ক ছিল ওদের, তিনদিনের মরণপণ লড়াই শেষে ন'টাই ধ্বংস করে দিই আমরা। ওই তিন দিনে আমাদের মেরিন আর্টিলারি যদি হেণ্ডারসন ফিল্ড আর মাউন্ট অস্টিনের ওপর ছ'হাজার রাউণ্ডের মতো গোলাবর্ষণ না করত, আজ আর ডায়েরি-কলম নিয়ে বসতে হতো না আমাকে।

আমার চোখের সামনে মারা গেছে দুর্ধর্ষ জাপানি লেফটেন্যান্ট-জেনারেল নোমাসু নাকাগুমা। মরেও তেজ যায়নি শালার—মরার পরও ওর চোখ দুটো প্রতিশোধস্পৃহায় জ্বলছিল যেন। অনেক ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হয়েছে আমাদেরকেও। আমরা ছত্রীসেনা ছিলাম ন'শ'র মতো, স্রেফ অর্ধেকে নেমে এসেছে সংখ্যাটা। মেরিন ট্রুপাররা আমাদের মতো মারা না গেলেও আহত হয়েছে প্রচুর, বেশিরভাগই আর কোনওদিন লড়তে

পারবে না। আমাদের বড় অর্জনের কথা যদি বলি, মাউন্ট অস্টিন দখল করতে পেরেছি আমরা, এবং পর্বতটার জিফু, সী হর্স আর গ্যালোপিং হর্স নামের ঢালগুলোর দিকে পালিয়ে গেছে জাপানি সৈন্যরা।

২৪ নভেম্বর, ১৯৪৩,

ইসাটাবুসহ সলোমন দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটা দ্বীপ এখন মার্কিনবাহিনীর দখলে। পুরোপুরি পরাজিত হয়েছে জাপানিরা, ধরা পড়েছে ওদের অনেক সৈন্য। ডায়েরির পাতা উল্টিয়ে যতবার পেছনের দিকে তাকাই, গর্বে বুকটা ভরে যায় আমার। দুই-আড়াই মাস আগেও ভাবিনি এত শান্তিতে লিখতে পারব, অথচ...

২ ডিসেম্বর, ১৯৪৩

হারুকিচি হায়াকুটাকি লোকটাকে যত দেখছি, ততই আশ্চর্য হচ্ছি। ঈশ্বর জানেন, কী ধাতুতে গড়েছেন তিনি লোকটাকে। দিনে দু'বেলা নামকাওয়াস্তে খেতে পায় জাপানি সৈন্যরা, এ-ক'দিনে পাঁজরার হাড় বেরিয়ে গেছে অনেকেরই, কিন্তু হায়াকুটাকি যেন ব্যতিক্রম। কিছু একটা আছে লোকটার ভেতরে, সেটাকে প্রতিশোধস্পৃহা বললে ভুল বলা হবে, আবার নির্লিপ্ততা বললেও উচিত কথা হবে না। কিছু একটা যেন খোঁজে সে; কখনও কখনও ওকে দেখি, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সলোমন সাগরের দিকে—যেন ওখানে হারিয়ে ফেলেছে মূল্যবান কোনওকিছু...

৫ ডিসেম্বর, ১৯৪৩

বন্ধু হিসেবে কোনওদিনই মেনে নিতে পারব না হায়াকুটাকিকে, আবার, এ-ক'দিনে লোকটার সঙ্গে এমন এক অদ্ভুত সম্পর্ক হয়েছে যে, ওকে শত্রু বলতেও কেমন যেন দ্বিধা হয়। সাগর সম্পর্কে অগাধ জ্ঞান লোকটার; জোর দিয়ে বলতে পারি, অন্তত সলোমন সাগরটা চেনে সে হাতের উল্টোপিঠের মতো। ইংরেজির কিছুই জানে না, জাপানি ভাষার একটু-আধটু যা জানি আমি, তা দিয়ে ভাব বিনিময় চলে। এখানকার সাগর সম্পর্কে কী এক রহস্যের ইঙ্গিত দিয়েছে সে আমাকে, ঠিকমতো

বুঝিনি। সময় নিয়ে আরও ভালোমতো কথা বলতে হবে ওর সঙ্গে। তবে সময়টা পাওয়া যাবে কি না সেটাই এখন প্রশ্ন। জাপানিদের সঙ্গে মিত্রবাহিনীর যে বন্দিবিনিময় চুক্তির আশঙ্কা করছিলাম, স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে সেটা; হায়াকুটাকিদেরকে নিয়ে যে-কোনওদিন রওয়ানা দেবে আমাদের একটা জাহাজ।

৮ ডিসেম্বর, ১৯৪৩

হায়াকুটাকি চলে গেল আজ। খারাপই লাগছে লোকটার জন্য। ইসাটাবুতে দিন ফুরিয়ে আসছে আমাদেরও, তল্পিতল্পা গোটানোর নির্দেশ আসতে পারে যে-কোনওদিন, গোছগাছের কাজে একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম তাই। এ-ক'টা দিন সেভাবে আর কথা বলতে পারিনি হায়াকুটাকির সঙ্গে। প্রচণ্ড টাইফুনের ফলে সলোমন সাগরের তলদেশে তৈরি-হওয়া ঊর্ধ্বমুখী ঢেউয়ের কথা বলেছিল সে, আর বলেছিল একটা সোনার-নৌকা অথবা ও-রকম কিছু একটার কথা, ঠিকমতো বুঝতে পারিনি আমি। কেন যেন মনে হচ্ছিল, আসলে আমার অনুগ্রহ পাওয়ার উদ্দেশ্যে গাঁজাখুরি গল্প ফেঁদেছে লোকটা...

বইটা শেষপাতা পর্যন্ত পড়ল রানা, তারপর হেলান দিল চেয়ারের পিঠে। পা দুটো লম্বা করে দিয়েছে, খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে দূরের সাগরটার দিকে।

ঊর্ধ্বমুখী ঢেউ? সোনার নৌকা?

নিজের এগযিকিউটিভ চেয়ারে হেলান দিল অ্যালবার্ট পামার, কনফারেন্স রুমের এদিকওদিকে তাকাচ্ছে। লাঞ্চের সময় হয়ে যাওয়ায় একটু আগে শেষ হয়েছে মিটিংটা। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে কফি খেয়েছে কোম্পানির ডিরেক্টররা, কারও কারও কাপে রয়ে-যাওয়া কফির সুঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে এখনও। কড়া বডিস্প্রে ব্যবহার করেছিল মহিলারা, সে-সুবাসও যেন লেপ্টে আছে এসি রুমটাতে।

মন ভালো না পামারের, একটুখানি হলেও খিঁচড়ে আছে

বইঘর.কম

মেজাজটাও। গত কয়েক বছর ধরেই মন্দা চলছে বিশ্ববাজারে, বড় রকমের ধাক্কা খেয়েছে ওর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটাও। বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশগুলোতে যেসব শাখা খুলেছিল সে, ভর্তুকি দিয়ে চালাতে হচ্ছে সেগুলোর প্রায় সব ক'টাকে; তাই বছরের প্রতি কোয়ার্টার শেষে লাভক্ষতির হিসেব যখন কষছে, লাভের চেয়ে ক্ষতির পাল্লাটাই ভারী হচ্ছে। ন'টা মাস চলে গেল, অথচ কোম্পানির সার্বিক হিসাবে প্রফিট নেগেটিভ। প্রতিযোগী ছোট ছোট কোম্পানি, যাদের নাম শুনলে একসময় নাক সিটকাত পামার, দিন দিন বাড়ছে সেগুলোর শেয়ারের দাম, অথচ পামারের কোম্পানিটার দাম পড়তে পড়তে...

আরও তিনমাস যদি এভাবে চলে, জরুরিভিত্তিতে কয়েকটা শাখা বন্ধ করতে হবে ওকে, ভাবতে হবে কর্মী ছাঁটাইয়ের কথাও।

অথচ পামারের শুরুটা কী চমৎকারই না ছিল। অভাবের সংসারে জন্মেছে এবং বড় হয়েছে; কিন্তু বিবেক আর আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যখন যা দরকার তা অর্জন করে নিয়েছে সে। মেধাবী সে; মেধার সিকিভাগ খরচ করেছে পড়াশোনার পেছনে, বাকিটা নীতিবিরুদ্ধ কাজে। আঠারো পেরুনোর আগেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে ডেবিট কার্ড জালিয়াতির সঙ্গে, স্কুল অভ মেডিসিনের গণ্ডি ছাড়ার আগেই নাম লিখিয়েছে টাকা জাল করার একটা চক্রে। ওই কাজে প্রতিভার প্রায় সবটুকু উজাড় করে দিয়েছে, তাই নিজের জন্য আলাদা ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত একটা জায়গা করে নিতে বেশি সময় লাগেনি ওর। এমন এক ছদ্মপরিচয়ে লুকিয়ে থেকেছে যে, কোনওদিন ওর টিকিটিরও সন্ধান করতে পারেনি পুলিশ, অথচ যাবজ্জীবন দণ্ড মাথায় নিয়ে এখনও জেলে পচছে চক্রের কয়েকজন শীর্ষব্যক্তি। বার বার জায়গা বদল করে নিজেকে আইনের ধরাছোঁয়ার আরও বাইরে নিয়ে গেছে পামার, এখন যেমন আছে নিউযিল্যাণ্ডের গিযবর্ন শহরে। চক্রের প্রয়োজনেই একসময় সেটার নেতৃত্ব তুলে নিয়েছে নিজের কাঁধে। তারপর...উচ্চাকাঙ্ক্ষী জুয়াড়ির মতো মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার

বিনিয়োগ করেছে আজকের এই প্রতিষ্ঠানের পেছনে। একদিক দিয়ে হু হু করে বেড়েছে ওর "এন.যেড. মাইনিং অ্যাণ্ড পেট্রোলিয়াম"-এর শেয়ারের দাম, আরেকদিক দিয়ে কোম্পানির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে সে। কিন্তু এসব যেন জলোচ্ছ্বাস—সমৃদ্ধির স্রোতটা সরে যাওয়ামাত্র পামার বুঝতে পারে, টাকা জাল করাই ভালো ছিল ওর জন্যে। একের পর এক যুদ্ধের আগুন পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যকে, ওদিকে নিজেদের খনিজ সম্পদের ব্যাপারে আগের চেয়ে অনেক সচেতন হয়ে গেছে আফ্রিকার দেশগুলো।

নতুন উপায় বের করা ছাড়া বিকল্প কিছু ছিল না পামারের। এবং সেটা শুধু নিজের জন্য। এন.যেড. আর কোনওদিন দু'পায়ে খাড়া হতে পারবে কি না, সন্দেহ আছে ওর নিজেরই।

আসছে ডিসেম্বর ক্লোযিং-এর কথা মাথায় রেখে কোম্পানির ব্যালেন্স শীটে কিছু এদিকওদিক করার প্রস্তাব দিয়েছিল সে আজকের মিটিং-এ, কিন্তু রাজি হননি বেশিরভাগ ডিরেক্টর। শেয়ারের মূল্যমান ধরে রাখতে যতটা উদ্গ্রীব তাঁরা, প্রচলিত আইনকে তারচেয়ে বেশি ভয় তাঁদের। আণ্ডারপারফর্মিং ইনভেস্টমেন্টগুলোর ডেপ্রিসিয়েশন নিয়েও আজ কিছু অনৈতিক প্রস্তাব ছিল পামারের, নাকচ হয়ে গেছে সেগুলোও।

কনফারেন্স রুমের কাঁচদরজায় টোকা পড়ল এমন সময়, কিছুটা চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল পামার। ছাব্বিশ বছর বয়সী, সুন্দরী এক যুবতী দাঁড়িয়ে আছে—পামারের পিএস। মেয়েটাকে ভেতরে আসার ইঙ্গিত জানাল সে।

'আপনার প্রাইভেট লাইনে কল এসেছে, স্যর,' ভেতরে ঢুকে বলল মেয়েটা।

একটুখানি খুশির ছাপ পড়ল পামারের চেহারায়। 'ওহ্, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আমাকে ফোন করার কথা ছিল একজনের।' উঠে দাঁড়াল, পিএস-এর গায়ে গা ঘষে বেরিয়ে এল বাইরে, হল ধরে হেঁটে গিয়ে ঢুকল নিজের সুসজ্জিত অফিসকামরায়। ডেস্ক

বইঘর.কম

পেরিয়ে বসে পড়ল সুইভেল চেয়ারে, হ্যাণ্ডসেট তুলে নিয়ে ঠেকাল কানে। 'হ্যালো?'

'প্রথম পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।'

আরাম করে চেয়ারে হেলান দিল পামার। 'কী মনে হয়, নির্বাচন পেছাবে?'

'পরের অপারেশনটা ঠিকমতো করতে পারলে, পেছাতে বাধ্য।'

'তারমানে, নতুন একটা দাঙ্গার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারি?'

'হুঁ।'

'শিকারের খবর কী?'

'না, এখনও মুঠোর ভেতরে নেয়া হয়নি ওকে। তাড়াহুড়োর কিছু দেখছি না, কারণ পালাতে পারবে না সে।'

'যদি কাউকে কিছু বলে দেয়?'

'তা-ও পারবে না। জায়গামতো লোক আছে।'

'যদি তোমাদের কাছে মুখ না খোলে?'

'তা হলে আর কোনওদিনও যাতে মুখ খুলতে না পারে, সে-ব্যবস্থা করা হবে।'

'তাতে লাভ?'

'আমাদের গোপন কথা গোপন থাকবে।'

'আর ওর গোপন কথা জানা যাবে কীভাবে?'

'একদল ডুবুরি পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ইসাটাবুসংলগ্ন সলোমন সাগর তন্ন তন্ন করে খুঁজবে ওরা।'

'আমি পারব না। অন্তত এই মুহূর্তে না। কোম্পানির অবস্থা নিশ্চয়ই নতুন করে বলতে হবে না?'

'সেক্ষেত্রে শিকারের মর্জিমতো চলতে হবে আমাদেরকে।'

বিরক্ত হলো পামার। 'এবং সেটার জন্য নিশ্চয়ই আমি দায়ী নই?'

'দায় চাপানো হচ্ছে না, দায় চাপানোর কিছু নেইও। একটা

প্রস্তাব দেয়ার ছিল, দিয়েছি।'

'ভালো করেছ। আর কিছু?'

'ছোট্ট একটা সমস্যা হয়েছে।'

কী সমস্যা জানানো হলো তাকে। প্রয়োজনে ট্যুরিস্ট লোকটা ঘাপলা বাড়াবার আগেই ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ দিল পামার।

'বেশ, তাই হবে।'

'ঠিক আছে। রাখছি তা হলে।' লাইন কেটে দিল পামার। রিসিভারটা রেখে দিল জায়গামতো, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেটার দিকে। না, ওর এজেন্টকে নিয়ে ভাবছে না সে। ভাবছে না ইসাটাবু, ডাউযা, অথবা মাসুদ রানার কথা।

কল্পনার দৃষ্টিতে দেখছে ওর পিএস মনিকার সেক্সি শরীরটা।

আট

সকাল থেকেই কালো হয়ে ছিল আকাশটা; কখন বৃষ্টি নামল, টেরই পেল না রানা। জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল উদাস দৃষ্টিতে, হঠাৎ বুঝতে পারল, ভারী বৃষ্টিপাতের চাদরটা ঝাপসা করে দিয়েছে দূরের সৈকত আর সাগরটাকে। সচকিত হলো ও। "মাই ইসাটাবু ডেইয" যেন চুম্বকের মতো আটকে রেখেছিল ওকে।

উঠে দাঁড়াল রানা, লাইব্রেরিয়ানের কাছে গেল। প্রশ্ন করে জানতে পারল, লাইব্রেরির পেছনেই একটা সাইবার ক্যাফে আছে। বৃষ্টি উপেক্ষা করে সেখানে গিয়ে ঢুকল ও, গুগলের সাহায্য নিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল ইন্টারনেটের জগতে। সন্তুষ্ট মনে সেখান থেকে বের হয়ে ধীরেসুস্থে যখন পৌঁছাল জিপের কাছে,

বইঘর.কম

ততক্ষণে অনেকখানি ভিজে গেছে। দরজার লক খোলার সময় আশঙ্কা হলো ওর, আবারও কিছু চুরি হয়েছে কি না। এদিকওদিক তাকিয়ে মোটামুটি নিশ্চিত হলো, এবার কিছু খোয়া যায়নি। ড্রাইভিং সীটে উঠে বসে জিপ ছেড়ে দিল ও।

ধীর গতিতে এগোতে হচ্ছে। প্রধান সড়কের জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা ঢাকার চেয়েও খারাপ, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। কতক্ষণই বা বৃষ্টি হয়েছে—ছোটখাটো একটা নদী যেন বয়ে যাচ্ছে আশপাশ দিয়ে।

একটা ফুটওভার ব্রিজ এগিয়ে আসছে, সেটার নিচে বাঁ পাশে দেখা যাচ্ছে একটা প্রাচীরচিত্র—নীল সাগরজলে একটা টাইগার শার্ক। যে এঁকেছে তার আঁকার হাত প্রশংসনীয়; হাঙরটাকে প্রায় ত্রিমাত্রিক করে তুলেছে সে, মনে হচ্ছে দেয়াল ছেড়ে এই বুঝি রাস্তার পানিতে নেমে পড়বে ওটা।

ম্যুরালটার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে রিয়ারভিউমিররের দিকে তাকাল রানা। সঙ্গে সঙ্গে খটকা লাগল। ঠিক বিশ গজের দূরত্ব বজায় রেখে একটা শিপট্রাক লেগে আছে পেছনে, লাইব্রেরির সিঁড়ি দিয়ে নেমে সাইবার ক্যাফেতে যাওয়ার সময় রাস্তার আরেকধারে পার্ক করা অবস্থায় দেখেছিল না ওটাকে? ও-রকম ট্রাক দিয়ে সাধারণত খামার থেকে হাটে ভেড়া পরিবহন করে খামারিরা।

প্রশ্ন হচ্ছে, হঠাৎ করেই রানার প্রতি কৌতূহল বোধ করতে শুরু করল ইসাটাবুর কোন্ খামারি? জিপের গতি বাড়াল ও, একইসঙ্গে বাড়িয়ে দিল ওয়াইপারের গতি।

পেছনের ট্রাকটারও গতি বাড়ল। শক্তিশালী বডি ওটার, ইঞ্জিনও শক্তিশালী; বিশ গজের দূরত্বটা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নেমে এল দশে।

লর লুঙ্গা নামের একটা কৃত্রিম ঝরনাকে পাশ কাটাল রানা, হাতের বাঁয়ে এখন হেণ্ডারসন ফিল্ড। সামনে অনেকখানি রাস্তা প্রায় যানবাহনশূন্য। সুযোগ পেয়ে অ্যাকশনে গেল পেছনের

ট্রাকটা। আচমকা গতি বাড়ানোর কারণে গর্জে উঠল ওটার ইঞ্জিন, জিপের সবগুলো জানালার কাঁচ তুলে রাখার পরও আওয়াজটা রানার কান এড়াল না। রাস্তায় জমে-থাকা একদিকের পানিতে একটুখানি ঘূর্ণির মতো হচ্ছে, ওটা কোনও গর্ত হবে ভেবে ওটাকে পাশ কাটানোর জন্য গতি কমিয়ে স্টিয়ারিং বাঁ দিকে ঘোরাল রানা, এমন সময় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে জিপের পেছনদিকে নাক দিয়ে জোরে আঘাত করল ট্রাকটা।

ঝাঁকুনি লাগল জোরে, স্টিয়ারিং আরেকটু হলে ছুটে গিয়েছিল রানার হাত থেকে। ট্রাকের এক গুঁতোতেই রাস্তা থেকে অর্ধেক নেমে গেছে জিপ, এখন ঈদের আগেই কোলাকুলি করার উদ্দেশ্যে ছুটে যাচ্ছে অখ্যাত ম্যুরালিস্টের আরেক প্রাচীরচিত্রের দিকে।

নাগালে পেলে শিকারের গায়ে যেভাবে থাবা দেয় বাঘ, স্টিয়ারিংটা সেভাবে আঁকড়ে ধরল রানা; সাঁই সাঁই করে ঘোরাচ্ছে সেটা, সংঘর্ষ এড়াতে। সরু একটা কাঁচা রাস্তা নেমে গেছে দেয়ালটার পাশ দিয়ে—কোন্‌দিকে গেছে জানে না রানা, ওদিকে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই আপাতত।

বৃষ্টির বেগ আরও বেড়েছে। বুড়ো ওয়াইপার দুটো কাজ করার সময় ঘটঘট আওয়াজ করছে; তবে কিছুটা হলেও, কাজ করছে। ভারী যানবাহন নিয়মিত চলে কাঁচা রাস্তাটা দিয়ে, বৃষ্টির চাদর ভেদ করে সামনে তাকালে চোখে পড়ে ওটার বুকে গভীর-হয়ে-বসা চাকার দাগ; দাগগুলো যেদিকে এগিয়ে গেছে, দেয়ালের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়ানোর পর জিপের নাক সেদিকে সোজা করল রানা, চোখ তুলে তাকাল রিয়ারভিউমিররের দিকে।

দশ গজের দূরত্ব বজায় রেখে পেছনে লেগে আছে শিপট্রাক। প্রধান সড়ক ছেড়ে মোড় নিয়ে কাঁচা রাস্তায় নামতে একটু সময় লেগেছে ওটার, তা না হলে আরও কাছে থাকত। এদিকওদিক তাকাল রানা।

বাঁ পাশে জংলামতো একটা জায়গা, গাছের চেয়ে ঝোপ আর আবর্জনার পরিমাণ বেশি সেখানে। ডান পাশে...খুব সম্ভব

একটা কারখানা, সীমানাপ্রাচীর ছাড়িয়ে ফুট দশেক উঁচুতে উঠেযাওয়া টিনের চালার সঙ্গে লাগানো বড়সড় একযস্ট ফ্যান ঘুরছে। আরেকটু দূরে তাকালে চোখে পড়ে ইংরেজি এল আকৃতির চিমনি, বৃষ্টির চাদর গিলে খেয়েছে ওখান দিয়ে বেরনো ধোঁয়াকে।

অচেনা রাস্তা, তারপরও ঝুঁকি নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল রানা। রাস্তার এবড়োখেবড়ো অবস্থা উপেক্ষা করে গতি বাড়াল ও। জিপটা যেন চলছে না, একজায়গায় স্থির থেকে লাফাচ্ছে বেয়াড়া ঘোড়ার মতো। কারখানাটা অদৃশ্য হওয়ামাত্র দৃশ্যপটে হাজির হলো সুবিস্তৃত এক সরষেক্ষেত। রাস্তার দু'পাশে, কয়েক বর্গমাইল জুড়ে বিস্তার সেটার। বোঝা গেল, পেছনে ফেলেআসা কারখানাটা সরষের তেল উৎপাদনের। বেশ কিছুটা দূরে, ক্ষেতের জমিনে দাঁড়িয়েথাকা প্রাকৃতিক কাকতাড়ুয়ার মতো, দেখা যাচ্ছে কয়েকটা টিলা। জংলামতো জায়গার বিস্তার ঘন থেকে আরও ঘন হচ্ছে ক্রমশ।

রিয়ারভিউমিররের দিকে তাকাল রানা আবার। ট্রাক দূরের কথা, পেছনে একটা মাছিও নেই। একটুখানি স্বস্তি অনুভব করল ও, এতক্ষণে যেন ছাড়ল চেপে রাখা দম। ঠিক করল, ক্রমশ নিচু হওয়া পথটা ধরে এগিয়ে যাবে; এটা ওকে শেষপর্যন্ত কোন্‌দিকে নিয়ে যায়, দেখা যাক। জিপের গতি কমাল ।

অনেকদূর এগোল রানা; আশপাশে বার বার তাকাচ্ছে, এবং বার বারই খটকামতো লাগছে ওর কাছে, মনে হচ্ছে কী যেন মিলছে না ঠিক। এখন যেখানে আছে ও, সন্দেহ নেই দু'পাশে জঙ্গল ছিল এককালে, দেখলে মনে হয় অতিকায় কোনওকিছু যেন তাণ্ডব চালিয়েছে সেটার ওপর, ফলে গাছপালা বলতে যা ছিল সব উধাও হয়ে গেছে নিমেষে, রয়ে গেছে শুধু নগ্ন মাটি। পথের একপাশের অনেকখানি জায়গা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরাও করা, সিকিউরিটি গেটও আছে, তবে ভেঙে পড়ে আছে একদিকের পাল্লা। ভেতরে কাঠের দু'-তিনটে বাড়ি, যে-ক'টা জানালা চোখে

পড়ে সেগুলোর বেশিরভাগেরই কাঁচ ভাঙা। অতিকায় কনভেয়র সিস্টেম, ওর-ক্র্যাশার আর কয়েকটা বাতিল ওরট্রাক দেখে বোঝা গেল, এটা বন্ধ হয়ে-যাওয়া একটা স্বর্ণখনি।

পথটা সামনে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একটা বাঁক নিয়ে চলে গেছে সামনের দিকে, আরেকটা নেমে গেছে আরও। গতি আরও কমাল রানা, দ্বিধায় ভুগছে। কোন্দিকে যাবে?

স্টিয়ারিং ডানে ঘোরাল ও—ডানের পথটা ধরে এগোলে প্রধান সড়কে ফেরত যেতে পারে হয়তো। কিন্তু শিপট্রাকের ভারী গর্জন কানে আসামাত্র মুহূর্তের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীতদিকে ঘুরিয়ে নিল স্টিয়ারিং। এবং বেঁচে গেল সে-কারণেই।

রিয়ারভিউমিরর থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিল ট্রাকটা, বিকল্প পথটা সুপরিচিত ছিল ওটার ড্রাইভারের কাছে, রানা কোন্দিকে যাচ্ছে বুঝে নিয়ে এগিয়ে এসেছে সে। জিপটাকে পথের মোড়ে দেখামাত্র গতি বাড়িয়ে ছুটে এসেছে, ইচ্ছে ছিল আগেরবারের মতো ট্রাকের সামনের বাম্পার দিয়ে জিপটার একপাশে জোরে ধাক্কা দিয়ে উল্টে দেবে ওটাকে। সময়মতো স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে নেয়ার কারণে সংঘর্ষটা এড়াতে পারল রানা, কিন্তু পুরোপুরি না। জিপের পেছনে, ডান দিকের চাকার ওপরের বডিতে, জোরে বাড়ি মারল ট্রাকটা।

অসহায় বোধ করল রানা, পিচ্ছিল কাদার কারণে সামাল দিতে পারছে না ধাক্কাটা। গোঁ গোঁ আওয়াজ করছে জিপের ইঞ্জিন, চরকির মতো একপাক ঘুরে গেছে সেটা। ডানদিকের রাস্তা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ট্রাকটা, ব্যাকগিয়ার দিয়েছে ড্রাইভার, রানাকে আবারও গুঁতো দেয়ার জন্য সোজা করছে ট্রাকের নাক।

চরকির ঘূর্ণন শেষ হওয়ার আগেই ব্রেক প্যাডাল চেপে ধরল রানা, ব্যাকগিয়ারে দিল জিপটাকে। ট্রাকের সঙ্গে এখন মাথাবিচ্ছিন্ন ইংরেজি "টি"-এর মতো অবস্থান নিয়েছে ওর জিপ। ট্রাকের ইঞ্জিন আরেকবার গর্জন করে ওঠামাত্র এক্সিলারেটর চেপে ধরল ও। পথের দু'পাশে একগাদা কাদা ছিটকে দিয়ে পিছিয়ে এল

জিপটা, ঢুকে পড়ল খনির পাশের রাস্তায়, মাত্র একটা সেকেণ্ডের জন্য ওকে মিস করল ট্রাকটা। সাঁই করে নিচের দিকে ছুটে গেল ওটার বিশাল বডি।

জিপটাকে ব্যাকগিয়ারে রেখেই বেশ কিছুদূর গেল রানা। সুযোগ বুঝে মোচড় দিল স্টিয়ারিং-এ, কাঁটাতারের বেড়ার বারোটা বাজিয়ে দিল ওর জিপের পেছনদিকটা, স্টিয়ারিং-এর আরেক মোচড়ে ওটার নাক সোজা করে নিল রানা। কোনও মায়া দেখাল না ইঞ্জিনের ওপর, গিয়ার বদল করে চেপে ধরল অ্যাক্সিলারেটর। পেছনে আবারও শোনা গেল ট্রাকের গর্জন। গতি বাড়াল রানা, যা হওয়ার হবে। এবং যখন হবে, তখন দেখা যাবে।

হাতের ডান পাশে এখন খনিটা, বাঁ পাশে জঙ্গল। যত এগোচ্ছে রানা, জঙ্গলটা পাতলা হচ্ছে তত। একদিক দিয়ে শেষ হলো খনির সীমানা, সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকেও শুরু হলো জংলামতো জায়গা, বাঁ দিকের জঙ্গল উধাও হয়ে গেল নিমেষে। সামনে একটা সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে—একটা চওড়া কাষ্ঠফলকে সাদা রঙে তীর চিহ্ন এঁকে ডান দিকে যাওয়ার নির্দেশ করা হচ্ছে, ওটার নিচে পিজিন ভাষায় কিছু একটা লেখা, বুঝতে পারল না রানা। ব্রেক চাপল ও, স্টিয়ারিং ঘোরাল ডানে। কিন্তু ওকে সরে যাওয়ার সুযোগ দিল না ট্রাকটা। গতি বাড়িয়ে ছুটে এসে আবারও সামনের বাম্পার দিয়ে গুঁতো দিল জিপের পেছনে। পিচ্ছিল কাদার কারণে ধাক্কাটা সামলাতে পারল না রানা। আগেরবারের মতো চরকির কায়দায় ঘুরল না ওর জিপ, সোজা এগিয়ে গেল সাইনবোর্ডটার দিকে, চুরমার করে দিল ওটাকে, তারপর খাড়া ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল নিচে।

এখন ব্রেক চাপলে উল্টে যেতে পারে জিপ, জানে রানা। স্টিয়ারিং আঁকড়ে ধরে বসে আছে ও, কী করা যায় ভাবছে। ঢালটার নিচে, শেষমাথায়, একটা সরু নদীর তীর। তারমানে...

ড্রাইভিং সীটের পাশের দরজা খুলল রানা, এদিকওদিক দেখে

নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাইরে।

নদীর তীরে, অলস ভঙ্গিতে শুয়ে বৃষ্টিতে ভিজছিল একটা কুমির, আজ এখন পর্যন্ত শিকার জোটেনি ওটার কপালে। নিজের ওপরে, ঢালের গায়ে নড়াচড়া টের পেল ওটা, মুহূর্তের মধ্যে ঝেড়ে ফেলল সব আলস্য, বিশাল শরীর ঘুরিয়ে মুখটা যেন তাক করল ঢালের দিকে। দেখল, কিছু একটা গড়িয়ে নামছে ঢাল বেয়ে, ওটার ভেতর থেকে লাফিয়ে বের হলো একটা মানুষ।

কয়েক মুহূর্তমাত্র, তারপরই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কুমিরটা। নিজের পেটটাকে আলগা করল তীরের মাটি থেকে, চার পায়ে ভর দিয়ে এগোচ্ছে, এগোনোর তালের সঙ্গে মিল রেখে নাড়াচ্ছে লেজটা।

লাফিয়ে একটা ঝোপের ওপর পড়েছে রানা, খানিকটা গড়িয়ে নামার পর একটা গাছ দেখতে পেয়ে হাত বাড়িয়ে দিল, আঁকড়ে ধরল একটা ডাল। সামলাতে পারল পতন, ডালটা ধরল দু'হাতে। কিন্তু ওর ওজন সহ্য করতে পারল না ডালটা—মট করে ভেঙে গেল, পিচ্ছিল ঢাল বেয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে নামতে শুরু করল আবার।

প্রমাদ গুনল রানা...দেখতে পেয়েছে কুমিরটাকে।

কেবিনের দরজার কাছে পরিচিত একটা চেহারা দেখতে পাওয়ামাত্র ঘুমের ভান করে একভাবে শুয়ে আছে ভাউযা। যে-হসপিটাল বেডে শুইয়ে রাখা হয়েছে ওকে, সেটা থেকে কিছুটা দূরে একটা চেয়ারে বসে আছে একজন নার্স। কিছু একটা পড়ছে মেয়েটা, সম্ভবত কোনও ম্যাগাযিন, কিছুক্ষণ পর পর পাতা উল্টানোর শব্দ শুনছে ভাউযা।

ভাউযা ঠিক করেছে, একটা কথাও বলবে না সে ওই লোকটাকে। লোকটা জালনোটের কারবারি, এবং ইটের খুনি। শুধু তা-ই নয়, সলোমন সাগরে কী আবিষ্কার করেছে ভাউযা, বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তা জেনে নিতে চায়। কিন্তু এত সহজে

আত্মসমর্পণ করবে কেন সে?

জ্ঞান ফিরেছিল কাল রাতে, তখন ডক্টর ভেলর দেখে গেছে ওকে। দুর্বল বোধ করছিল সে, কথা বলতে পারছিল না ঠিকমতো, কেমন জড়িয়ে আসছিল জিভটা। ঠিক কী হয়েছিল, ওই খালসংলগ্ন জঙ্গলে কেন গিয়েছিল ভাউযা, ইত্যাদি কিছু কথা জানতে চাইছিল ডক্টর, জবাবে কী বলেছে সে তা এখন আর মনে করতে পারছে না। ওর অবস্থা দেখে আর কিছু জানতে না চাওয়াটাই উচিত বলে মনে করে ডক্টর, তরল খাবার খাওয়ানোর কথা বলে নার্সকে। খাওয়ানো শেষ হলে ঘুমের ইনজেকশন পুশ করে ভাউযার হাতে, সেই ঘুম ভেঙেছে আজ দুপুরে।

ভাউযা জানে, নার্স মেয়েটা আসলে ওই লোকের হয়ে কাজ করছে। সকালে, ঠিক কখন জানে না ভাউযা, ফিকে হয়ে এসেছিল ওর ঘুম, তখন লোকটা এসেছিল ওর কেবিনে, নার্সের সঙ্গে কথা বলেছিল। ওদের দু'জনের কথোপকথন এখনও যেন বাজছে ওর কানে।

নার্সকে বলেছিল লোকটা, 'কী অবস্থা?'

'এখনও ঘুমাচ্ছে। কাল রাতে ঘুমের ইনজেকশন দিয়েছেন ডক্টর, ওটার প্রভাব শেষ হয়নি। ক্ষত শুকাতে সময় লাগবে। আর হাড়ে চিড় ধরেছে বলে, পা-টা যদি কেটে বাদ দিতে না-ও হয়, আগামী অন্তত পাঁচ মাস ক্রাচের সাহায্য ছাড়া হাঁটাচলা করতে পারবে না লোকটা।'

'খুব ভালো। আশা করছি আগামী পাঁচ মাসের আগেই আমাদের হাতে মারা পড়বে ব্যাটা, যেমনটা মরেছে ইটে—গুলি খেয়ে।'

ভাউযার মনে এখন একইসঙ্গে শোক, শঙ্কা আর প্রশ্ন।

ইটেকে মেরে ফেলেছে ওরা! কী দোষ ছিল ছেলেটার? নৌকায় করে ভাউযার সঙ্গে সাগরে যাওয়া, মুক্তো তোলার কাজে সাহায্য করা, সেসব মুক্তো দিয়ে মালা গাঁথা, বিদেশিদের কাছে মালাগুলো বিক্রি করা...

রেমি...এখন কোথায় আছে সে? কী করছে? গুণ্ডাগুলোর হাতে ধরা পড়েনি তো? ওকে যদি তুলে নিয়ে যেতে পারে গুণ্ডারা তা হলে...। তা হলে কী হতে পারে, ভাবতে চায় না ভাউযা।

ওর নিজেরই বা কী হবে? এভাবে ঘুমের অভিনয় করে কতদিন চলবে? বড়জোর আজকের দিনটা, কিংবা বেশি হলে আর একটা দিন। তারপর?

কে সাহায্য করতে পারে এখন ভাউযাকে? কার কাছে বলা যেতে পারে সব কথা? ডক্টর ভেলর? উঁহুঁ, মেয়েটা ভালোমানুষ, কিন্তু ওকে সব কথা বললে সে পুলিশের কাছে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও পরামর্শ দিতে পারবে না। পুলিশ মানে সার্জেন্ট ফুগুই; ওই লোকটাকে দু'চোখে দেখতে পারে না ভাউযা। প্রশ্ন হচ্ছে, তা হলে কাকে দিয়ে হবে? বাদামি চামড়ার ওই লোকটার কথা কেন যেন মনে পড়ে গেল ভাউযার, ওর জীবন বাঁচিয়েছে যে।

কিছু একটা করতে হবে, সিদ্ধান্ত নিল সে, এমন কিছু, যার ফলে ওর মানসিক সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ করবে সবাই। তাতে আর কিছু না হোক, একটুখানি হলেও সময় পাওয়া যেতে পারে। সময় ও সুযোগের খুব দরকার এখন ভাউযার।

চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল ওর—কেবিনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকছে ডক্টর ভেলর।

ঢালের নিচে পৌঁছে গেছে কুমিরটা, হাঁ করে আছে এখন। মনে হচ্ছে হাসি এসে গেছে; ধরেই নিয়েছে, রানা গড়িয়ে পড়ে সোজা ঢুকে যাবে ওটার মুখের ভেতর।

একহাত দিয়ে ডালটা ধরে আছে রানা, আরেকহাত দিয়ে বার বার খামচে ধরার চেষ্টা করছে ঢালের মাটি—চেষ্টা করছে পতন সামলানোর। কিন্তু লাভ হচ্ছে না দেখে বিকল্প কিছু করার সিদ্ধান্ত নিল। দু'হাতে আঁকড়ে ধরল ডালের ভাঙা অংশটা, অন্য প্রান্ত বাড়িয়ে দিল সামনের দিকে। শরীরটাকে মোচড় দিল একটুখানি; এখন যে-ভঙ্গিতে নামছে, ওর পা দুটো আগে পৌঁছাবে কুমিরের

বইঘর.কম

হাঁ-করা মুখের সামনে। বুকের কাছে দু'পা ভাঁজ করে নিল ও।

হাতেধরা ডালটা ফুট সাতেক লম্বা; নদীতীরের মাটিতে ল্যাণ্ড করার আগেই কুমিরটার মুখের ভেতরে সেঁধিয়ে দিল রানা ওটা; ডালের গুঁতো খাওয়ামাত্র কামড় বসিয়ে দিল কুমিরটা, শক্তিশালী একজোড়া চোয়ালের আঘাতে দু'টুকরো হয়ে গেল ডালটা। হাতেধরা ডালের টুকরো ছাড়ল না রানা; ভাঁজ করে রাখা দুই পা দিয়ে জোরে লাথি মারল কুমিরের বন্ধ চোয়ালে, থেমে গেল ওর পতন। একটা সেকেণ্ডও নষ্ট করল না, গড়ান দিয়ে পিঠ সোজা করল, ততক্ষণে ওর দিকে মুখ ঘুরিয়েছে কুমিরটা। সঙ্গে সঙ্গে হাতেধরা ডালের সাহায্যে দড়াম করে মারল ওর নাকের ওপর। গড়ান দিল আরও দু'বার, ওটার নাগাল থেকে সরে যেতে চাইছে যত দূরে সম্ভব, চেষ্টা করছে উঠে দাঁড়াতে।

একে তো খোঁচা খেয়েছে মুখের ভেতর আলজিহ্বায়, তার ওপর নাকটা ফাটিয়ে দিয়েছে ব্যাটা; এক চোখের কোণে বিঁধে গেছে ডালের চলটা—ব্যথা পেয়েছে ভীষণ, এখন আবার শিকার চলে যাচ্ছে নাগালের বাইরে—ভীষণ রেগে কাঁই হয়ে গেল কুমিরটা, লেজ দিয়ে বাড়ি মারার চেষ্টা করল রানাকে। এ-রকম কিছু ঘটতে পারে, আগেই অনুমান করে নিয়েছে রানা; সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই লাফ দিল বাচ্চাদের দড়িখেলার কায়দায়, ওর দু'পায়ের নিচ দিয়ে চলে গেল কুমিরের লেজ। কেডস-এর সোল মাটি স্পর্শ করামাত্র ঝেড়ে জান-প্রাণ নিয়ে দৌড় দিল ও। কুমিরটা যতক্ষণে ঘুরল ওর দিকে, যতক্ষণে তাড়া করে ছুটে আসতে শুরু করল ওর পিছু পিছু, ততক্ষণে রানা চলে গেছে দশ-বারো গজ দূরে।

তীর ধরে খিঁচে দৌড়াতে থাকলে অনেকদূরে চলে যেতে পারত হয়তো, কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হলো—গজ বিশেক সামনে, পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে মনে হয়, এইটার মিসেস। দিক বদল করল রানা, উঠতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। হাত, হাঁটু আর পায়ের ওপর ভরসা করে এবং শক্ত কিছু কাঁটাঝোপ বার বার

খামচে ধরে উঠে গেল বেশ কিছুটা ওপরে। হাঁপাচ্ছে; না দেখেও টের পাচ্ছে, কাঁটার খোঁচায় দুই হাতের তালু আর কয়েকটা আঙুল রক্তাক্ত হয়ে গেছে, কারণ জ্বালা করছে তালু দুটো। থামল একটুখানি, বাতাস দিয়ে ভর্তি করে নিল নিজের দুই ফুসফুস, উঠতে শুরু করল আবার। হাঁচড়েপাঁচড়ে ঢালের মাথায়, আরও কয়েকটা কাঁটাঝোপ আর বিশাল বপুর একটা গাছের মোটা শেকড়ের আড়ালে হাজির হতে পারল ও।

কথা বলছে ওরা। অর্থাৎ, আক্রমণকারীরা একাধিক।

দুটো ঝোপের আড়াল থেকে সাবধানে উঁকি দিল রানা।

পনেরো-বিশ গজ দূরে, ঢালের কিনারা থেকে একটু ভেতরের দিকে, স্থির দাঁড়িয়ে আছে শিপট্রাক। ঢালের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক। দুটো দরজাই খোলা, তারমানে ট্রাকের ভেতরে ওই দু'জনই ছিল। কথা বলছে ওরাই; এবং ওদের আলোচনার বিষয়বস্তু যে রানা, তা ওদের ভাষা না বুঝলেও ঠাহর করা যায়।

দাঁত বের করে হাসল ওদের একজন, একটা হাত ঢুকিয়ে দিল প্যাণ্টের পকেটে, হাসতে হাসতেই বের করে আনল একটা বেরেটা পিস্তল। একটা বড় পাথরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে নদীর তীরে একপাশে উল্টে রয়েছে রানার জিপ, ওটা নিশানা করে গুলি করল।

শেকড়গুলো টপকাল রানা সন্তর্পণে, এখনও ঝোপের আড়াল ছাড়েনি, আশপাশে পড়েথাকা টেনিসবলের সমান কয়েকটা পাথর কুড়িয়ে নিল দ্রুত। আড়াল থেকে দেখল দুই শয়তানকে। নিজেদের মধ্যে এখনও হাসাহাসি করছে ওরা। ওদের অসতর্কতার সুযোগ নিল রানা, চট করে বেরিয়ে এল আড়াল ছেড়ে, দৌড় দিল ওদের দিকে। পায়ের শব্দে ফিরে তাকিয়েই চমকে উঠল লোক দুটো। ওদের হতবিহ্বলতার সুযোগ নিল রানা, দৌড়াতে দৌড়াতেই ছুঁড়ে মারল একটা পাথর বেরেটাওয়ালাকে নিশানা করে। লোকটার ডান চোখের একটু নিচে গিয়ে লাগল

ওটা।

চিৎকার করে উঠল লোকটা, হাত থেকে আপনাআপনি ছুটে গেছে বেরেটা। ততক্ষণে ওদের যথেষ্ট কাছে চলে গেছে রানা, থেমে দাঁড়াল ও, আরও একটা পাথর ছুঁড়ে মারল আগের লোকটাকেই। কুঁজো হয়ে গেল বেরেটার মালিক, সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় পিছিয়ে যাচ্ছে। ব্যথার চোটে লোকটার খেয়ালই নেই, ঢালের কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিল সে; ওটা বেয়ে গড়িয়ে পড়ার সময় টের পেল পিছাতে গিয়ে কত বড় ভুল করেছে। আর্তচিৎকার করে উঠল, কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে।

হাতের শেষ পাথরটা ছুঁড়ে মারল রানা বেরেটাওয়ালার সঙ্গীর দিকে। লোকটার মুখে গিয়ে লাগল ওটা, ভয়ার্ত চোখ মেলে তাকাল রানার দিকে, চোটপাওয়া ঠোঁটে হাত রাখতে গিয়ে টের পেল, জায়গাটা থেঁতলে গিয়ে রক্ত ঝরছে। ওকে চমকে দিয়ে আবারও ছুট লাগাল রানা, একদৌড়ে হাজির হলো বেরেটার কাছে, ঢালের কিনারা থেকে তুলে নিল অস্ত্রটা। সোজা হলো, মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার চোখে চোখ রাখল। ইংরেজিতে বলল, 'কে তোমরা? কেন পিছু নিয়েছ আমার? কার আদেশে ধাক্কা দিয়ে ঢালের নিচে ফেলে দিয়েছো আমাকে?'

জবাব দিল না লোকটা, পাঁই করে উল্টো ঘুরল। একদৌড়ে হাজির হলো ট্রাকের পাশে, হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে বসল ড্রাইভিং সীটে। ব্যাকগিয়ার দিয়ে ঘুরিয়ে নিল ট্রাকটা, তারপর ছুটে চলে গেল খনির দিকে। আধ মিনিটেই চলে গেল দৃষ্টিসীমার বাইরে, ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল ওটার ইঞ্জিনের গর্জন।

ঢালের নিচ থেকে শোনা গেল আর্তচিৎকার, কিনারায় গিয়ে নিচে তাকাল রানা। বেরেটার প্রাক্তন মালিকের একটা পা কামড়ে ধরেছে কুমির, দ্বিতীয় কুমিরটা কামড়ে ধরেছে ওর পেটের একপাশে। না দেখলে বিশ্বাস হয় না—পা কামড়ে ধরে মাত্র দু'বার মাথা ঝাড়া দিল কুমিরটা, সঙ্গে সঙ্গে লোকটার শরীর থেকে আলগা হয়ে গেল পা-টা। মরার আগে একবার মাত্র কেঁদে উঠল

লোকটা। দেহটা ছিন্নভিন্ন করে ফেলছে কুমির দুটো। তারপর ওকে টেনে নিয়ে গেল পানির কিনারে। ওদের "ভোজে" যোগ দিতে নদী থেকে উঠে এল আরও একটা কুমির।

একপাশে উল্টে থাকা জিপটার নাক চ্যাপ্টা হয়ে গেছে, দেখতে না পেলেও অনুমান করে নিল রানা। বেরেটাটার দিকে তাকাল ও, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। অস্ত্রটা পয়েন্ট থ্রি টু ক্যালিবারের, নিকনেইম টমক্যাট; এটা দিয়ে কী করবে রানা? ইসাটাবুতে আগ্নেয়াস্ত্র বহন করা নিষিদ্ধ।

আসলেই, কী করবে এখন রানা? গিয়ে হাজির হবে সার্জেন্ট ফুগুইয়ের কাছে? সব কথা বলবে লোকটাকে? তাতে লাভ হবে কোনও? পিস্তলটা শার্টের নিচে জিন্সের কোমরের কাছে গুঁজে রাখল ও। দুই তালুর জ্বলুনি টের পেল আবার, চোখের সামনে তুলল রক্তাক্ত হাত দুটো।

দুটো নাম মনে পড়ে গেল ওর: নাম্বানা ভেলর এবং সেণ্ট্রাল হাসপাতাল।

নয়

সোনার একটা চেইনের সঙ্গে ছোট্ট একটা রিং-এর সাহায্যে ঝুলছে "লাভ" আকৃতির লকেটটা, পেণ্ডুলামের মতো দুলে উঠছে থেকে থেকে; ওটার দিকে যতবার তাকাচ্ছে রানা, ঝুঁকেপড়া ভেলরের ব্লাউজের ফাঁক দিয়ে ততবারই দেখতে পাচ্ছে মেয়েটার স্তনভাঁজ।

হাসপাতালে, ভেলরের প্রাইভেট রুমে একটা চেয়ারে বসে আছে রানা; ক্ষত গুরুতর না জানিয়ে ওর এক হাতের তালুতে

বইঘর.কম

অ্যাণ্টিসেপ্টিক ওষুধ লাগিয়ে দিয়েছে মেয়েটা, অন্যটাতে লাগাচ্ছে এখন, কী ঘটেছে মোটামুটি জানতে পেরেছে রানার কাছ থেকে। কাজ শেষ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'রানা, সত্যি করে বলো তো, তুমি কে।'

'বলেছি না...একজন ট্যুরিস্ট?'

'উঁহুঁ, মানতে পারছি না। আরও শত শত ট্যুরিস্ট আছে ইসাটাবুতে। পারলে তোমার মতো আর একজনকে এনে হাজির করো দেখি, যে কুমিরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে রাজি আছে। এমন একজনকে দেখাও, যে সরল বিশ্বাসে ডোনেশনের ব্যবস্থা করতে রাজি হয়ে যাবে। এমন আর একজনের কথা বলো, যার জিপের পিছু ধাওয়া করে কোনও শিপট্রাক, তারপর তাকে ধাক্কা দিয়ে ঢালের নিচে ফেলে দেয়। ...কার কী ক্ষতি করেছ তুমি, রানা?'

'বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারছ না, নাকি বলতে চাইছ না? মাকিরা-উলাওয়ায় মারামারি করেছ গতকাল, সেটাও কিন্তু বলোনি আমাকে।'

'তুমি জানলে কীভাবে?'

'বোকার মতো কথা বলছ, রানা, অথচ আমি নিশ্চিত তুমি বোকা না। আমি এ-হাসপাতালের চীফ মেডিকেল অফিসার। আহত হয়ে কেউ যদি চিকিৎসাসেবা নিতে আসে এখানে, তা হলে ঘটনাটা কীভাবে ঘটল তা আমি জানব না তো কে জানবে?' হেঁটে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল ভেলর। 'কী করতে চাও এখন? পুলিশ স্টেশনে যাবে? রিপোর্ট লেখাবে? তোমার জায়গায় আমি হলে তা-ই করতাম।'

'কিন্তু আমি করব না। কারণ তাতে কোনও লাভ হবে না।'

'তুমি সবজান্তা নাকি?'

'পুলিশে রিপোর্ট করে কোনও লাভ হবে কি না তা জানার জন্য সবজান্তা হতে হয় না। প্রথমেই জানতে চাইবে পুলিশ, ট্রাকটার নম্বরপ্লেট দেখেছেন? আমাকে বলতে হবে, না। যারা

হামলা করেছিল আপনার ওপর, তাদেরকে চেনেন? না। কেন হামলা করেছিল, বলতে পারবেন? না। ট্রাকটা কোন্‌দিকে উধাও হলো, জানেন? না। ট্যুরিস্ট ব্যুরোকে জানিয়েছেন ঘটনাটা? না। ...ভেলর, "না" ছাড়া যখন আর কোনও জবাব নেই আমার কাছে, তখন পুলিশের কাছে গিয়ে লাভটা কী, বলতে পারো?'

'লাভ?' রানার বক্তব্য বুঝতে পেরেছে ভেলর। 'ঠিকই বলেছ, নেই। তবে এটা ঠিক, ইসাটাবুর অবস্থা ভালো না।'

'রিপাবলিকানদের দুই কর্মী নিহত হওয়ার কারণে বলছ?'

'জানো তা হলে। কিন্তু ওটাই শেষকথা নয়। মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে সোগাভের সরকারের, সময় হয়েছে নতুন নির্বাচনের। আমরা অনেকেই আশঙ্কা করছিলাম, সঠিক সময়ে হবে না নির্বাচনটা—হতে দেয়া হবে না আর কী। ঠিক তা-ই হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলো যখন জোরেশোরে প্রস্তুতি নিচ্ছে, প্রচার-প্রচারণা চালানোর দিন যখন ঘনিয়ে এসেছে, তখনই জঙ্গলের ভেতরে পাওয়া গেল দুই রিপাবলিকানের লাশ। এমনিতেই মাথা-গরম বলে বদনাম আছে সোগাভেরের, তার ওপর তিনি বলে বসেছেন বদলা নেয়ার কথা। জানো, তাঁর ওই এককথাতেই গা ঢাকা দিয়েছে অনেক ডেমোক্রেট? সম্ভাব্য আরেকটা দাঙ্গার আশঙ্কায় পুলিশ ফোর্সকে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা প্রস্তুত থাকতে বলেছেন কমিশনার। দ্বীপের সাধারণ নাগরিকরা যখন নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন, তখনই অপহরণ করা হয়েছে দুই বিদেশি এইড-ওয়ার্কারকে।'

'অপহরণ? কই, শুনলাম না তো?'

'আসলে খবরটা ঘটা করে প্রচার করতে নিষেধ করা হয়েছে এফএম চ্যানেলগুলোকে। কিন্তু ইসাটাবু বিশাল কোনও দ্বীপ নয়, তা ছাড়া মোবাইল সুবিধা আছে এখানে। খবর ছড়িয়ে গেছে: আজ সকাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না দু'জন এইড-ওয়ার্কারকে। বার বার ফোন করা হচ্ছে ওদের মোবাইলে, কিন্তু বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কে বা কারা কিডন্যাপ করেছে ওদেরকে, সে-

বইঘর.কম

ব্যাপারে কোনও ক্লু নেই কারও কাছে। অনেকেই বলাবলি করছে, মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে একটা মিলিশিয়াগ্রুপ; যদিও অনেক আগে থেকেই ওদের অস্তিত্ব নিয়ে কানাঘুষা চলছিল, কিন্তু আমাদের দুর্বল পুলিশ ফোর্স বরাবরের মতোই ছিল নির্বিকার।'

'মিলিশিয়া? কী চায় ওরা?'

'দেখো, আমি কিন্তু নিশ্চিত নই কাজটা আসলেই মিলিশিয়াদের কি না—অনেকেই বলাবলি করছে, তাই আমিও বললাম, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে দায় স্বীকার করেনি কেউ এখন পর্যন্ত। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ওদের কোনও দাবির কথাও আসেনি।'

চুপ করে আছে রানা, কী যেন ভাবছে।

ওর মনের কথাটা যেন পড়তে পেরে ভেলর বলল, 'কী ভাবছ—আজ যারা পিছু নিয়েছিল তোমার, তারা ওই মিলিশিয়ার সদস্য কি না?'

'যদি হয়ে থাকে, তা হলে আমার ওপর গুলি চালানোর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।'

'কী সেটা?'

'আমার মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্যই পাঠানো হয়েছিল লোকগুলোকে।'

হেসে ফেলল ভেলর। 'তুমি ট্যুরিস্ট, ইসাটাবুতে তোমার মৃত্যু চাইতে যাবে কে, বলো?'

'মিলিশিয়া।'

'কেন?'

'যে-কোনও কারণেই হোক ওদের বিরাগভাজন হয়েছি আমি। আমাকে বাঁচিয়ে রাখাটা ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে ওদের কাছে।'

'যাক, নিজেকে নিয়ে ভাবতে শুরু করেছ তুমি—ভালো লাগল। তোমার জায়গায় আমি হলে তল্পিতল্পা গুটিয়ে দেশের পথ ধরতাম।'

'আপাতত তল্পিতল্পা গোটাতে পারছি না। কারণ এখানে কিছু

কাজ আছে আমার।'

'কাজ? যেমন?'

'ভাউযার বোনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার।'

'কার সঙ্গে?'

'ভাউযার বোন...রেমি তানাঘাই। কথাটা বলা হয়নি তোমাকে।'

'ইন্টারেস্টিং,' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল ভেলর।

'হ্যাঁ, আসলেই ইন্টারেস্টিং।' মাকিরা-উলাওয়ায় কী হয়েছিল গতকাল, বলল রানা। তারপর বলল, 'আমি ঠিক করেছি, একটু-আধটু ডুব দেব সলোমন সাগরে, জানার চেষ্টা করব ঠিক কী আবিষ্কার করেছিল ভাউযা।'

'তুমি...ডুব দেবে?' একটা ভ্রূ ওপরে উঠে গেছে ভেলরের। 'তুমি সী-ডাইভিং জানো?'

'ওই যে বললাম, একটু-আধটু,' বিনয় করার চেষ্টা করল রানা।

'কেন করবে কাজটা?'

'ভাউযার আবিষ্কার নিয়ে হুমকি দেয়া হয়েছে ওকে, কথা আদায় করার চেষ্টা করা হয়েছে ওর কাছ থেকে। উধাও হয়ে গেছে রেমির আরেক ভাই, ধর্ষণ বা অপহরণের অ্যাটেম্পট্ নেয়া হয়েছে মেয়েটার ওপর। ওকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ভেলর। 'দেখা যাচ্ছে, যতটা সহজসরল ভেবেছিলাম ভাউযাকে, ততটা সহজসরল না ওর জীবনটা। আর কী কী জানতে পেরেছ লোকটার সম্পর্কে?'

'আর তেমন কিছু না। তবে জানার ইচ্ছা আছে। তুমি কিছু জানো নাকি?'

মাথা নাড়ল ভেলর। 'লাইব্রেরিতে গিয়েছিলে কেন?'

'পড়াশোনার বাতিক আছে আমার। যেখানেই যাই না কেন, হাতের কাছে লাইব্রেরি থাকলে একটু ঢুঁ না মেরে পারি না।

...ভাউযার কী খবর? ওর সঙ্গে দেখা করাটা জরুরি ছিল।'

'সরি, রানা, ওর সঙ্গে দেখা করতে দেয়া যাচ্ছে না আপাতত। ওর অবস্থা...কী বলব...ডাক্তারি ভাষায় বললে হয়তো বুঝবে না...ঠিক ভালো না। খেতে পারছে সে, কোনওরকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাথরুমেও যেতে পারছে। কিন্তু যখন-তখন বিনানোটিশে সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়ে উঠছে, তখন কী করছে নিজেও বলতে পারবে না হয়তো। আজ দুপুরে দেখতে গিয়েছিলাম ওকে, আমার সামনেই জ্ঞান ফিরে পেল সে, আমার সামনেই খপ্ করে চেপে ধরল কর্তব্যরত নার্সের চুল। মেয়েটার মাথা আরেকটু হলেই ঠুকে দিয়েছিল হসপিটাল বেডের সঙ্গে, সময়মতো আরও কয়েকজন নার্স চলে আসায় রেহাই পেয়েছে বেচারী। টানা বারো ঘণ্টা ঘুমিয়ে মাথাটা যাতে ঠাণ্ডা হয় ওর, সেজন্য ইনজেকশন পুশ করতে হয়েছে ওকে।'

'ওর ইনফেকশন?'

'অবস্থার কোনও উন্নতি দেখছি না। তবে ওর সেবাযত্নে কোনও ত্রুটি নেই আমাদের পক্ষ থেকে।'

উঠে দাঁড়াল রানা, ইঙ্গিতে দেখাল ভেলরের ডেস্কে রাখা টেলিফোনটা। 'যদি কিছু মনে না করো, একটা ফোন করা যাবে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে বুঝিয়ে দিল ভেলর অসুবিধা নেই।

রেণ্ট-আ-রাইড প্রতিষ্ঠানে ফোন করল রানা, দুর্ঘটনার খবরটা যতটুকু না জানালেই নয়, ঠিক ততটুকুই সংক্ষেপে কিন্তু গুছিয়ে বলল। যখন বুঝতে পারল ওর কথা শুনে তেতে উঠতে যাচ্ছে ম্যানেজার লোকটা, লাইন কেটে দিয়ে তাকাল ভেলরের দিকে। 'একগাদা টাকা গচ্চা দিতে হবে আমাকে এখন। রেণ্ট-আ-রাইডওয়ালারা সহজে ছাড়বে না আমাকে। ...এখন যাই তা হলে।'

'সাবধানে থেকো।'

ঘরের বাইরে, আধ খোলা জানালার পাশে কান খাড়া করে, একটা ম্যাগাযিনে মুখ গুঁজে দাঁড়িয়ে ছিল লোকটা; রানা যখন

হাসপাতালে ঢুকছে তখন ওকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে হাজির হয়ে গিয়েছিল জায়গামতো।

লোকটাকে খেয়াল করল না রানা।

প্রধান সড়কের কোনও কোনও জায়গায় জটলা পাকিয়েছে অনেক দ্বীপবাসী, সবাই উত্তেজিত। কারও কারও হাতে লাঠিসোঁটা। কোথাও আবার রোডব্লক দিয়েছে পুলিশ; চার চাকার ব্যক্তিগত বাহন, অর্থাৎ যেগুলোতে করে বহন করা যেতে পারে অপহৃত কাউকে, সেগুলো থামিয়ে থামিয়ে চেক করছে। লোকাল বাসে চেপে মাকিরা-উলাওয়ায় ফিরে যাচ্ছে রানা; বাসটাকেও থামানো হবে কি না, হলে চেক করার নামে বাসে উঠবে কি না পুলিশ, উঠলে ওর সামনে কেউ হাজির হবে কি না ইত্যাদি ভাবতে গিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল ও। টের পেল, কোমরে গুঁজেরাখা বেরেটাটা ভোগাতে পারে ওকে। কিন্তু সে-রকম কিছু ঘটল না। বাস স্টপেজে নেমে জঙ্গলের পথ ধরে পায়ে হেঁটে মেগুনায় পৌঁছে গেল ও।

ওকে দেখে চমকে উঠল মেগুেনার রিসিপশন কাউন্টারের লোকটা। 'কোনও সমস্যা, স্যর?'

'অ্যাক্সিডেন্ট,' সংক্ষেপে সারতে চাইল রানা, বাড়িয়ে দিল হাতটা। 'চাবি।'

ওর হাতে ঘরের চাবি ধরিয়ে দিল রিসিপশনিস্ট। 'আরেকটু আগে এলেই দেখা হয়ে যেত সার্জেন্ট ফুগুইয়ের সঙ্গে।'

কাউন্টারের সামনে থেকে চলে যেতে গিয়েও থমকে গেল রানা। 'আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সার্জেন্ট?'

মাথা ঝাঁকাল রিসিপশনিস্ট। 'ঠিক দেখা করতে না, আসলে আপনাকে খুঁজছেন তিনি।'

রানাকে খুঁজছে ফুগুই? একটা বিপদসঙ্কেত শুনতে পেল যেন ও। জানতে চাইল, 'আমাকে খুঁজছে কেন?'

'জানি না, স্যর। আপনার অপেক্ষায় বেশ কিছুক্ষণ বসে

বইঘর.কম

ছিলেন তিনি লবিতে। না পেয়ে, আপনি আসার পাঁচ-সাত মিনিট আগে কোথায় যেন গেছেন। তবে আবার আসার কথা বলে গেছেন। আমার মনে হয় একটু ধোঁয়া গেলার জন্য কাছাকাছি কোথাও গেছেন।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক আছে। আপাতত রুমেই আছি আমি।'

'আরও একজন খুঁজছিল আপনাকে, স্যর। একটা মেয়ে...আই মীন একজন ম্যাডাম...'

'রেমি? কখন এসেছিল মেয়েটা?'

'সার্জেন্ট ফুগুই তখন বসে ছিলেন লবিতে। ম্যাডাম যখন আপনার ব্যাপারে কথা বলছিলেন আমার সঙ্গে, নিঃশব্দে তাঁর পেছনে এসে হাজির হন সার্জেন্ট। কিছুক্ষণ ম্যাডামের কথা শোনার পর জানান দেন নিজের অস্তিত্বের। ম্যাডাম মনে হয় ভয় পান লোকটাকে, দেখলাম কেমন কুণ্ঠা বোধ করছিলেন। কিন্তু এককথায়-দু'কথায় উত্তেজিত হয়ে ওঠেন তিনি, "আমি কোথায় যাব না-যাব, কাকে খুঁজব না-খুঁজব, তা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার," বলে তেড়েফুঁড়ে বেরিয়ে যান।'

'ঠিক আছে,' ঘুরল রানা, দ্রুত এগোল সিঁড়ির দিকে। একেকবারে কয়েকটা ধাপ করে টপকে চটজলদি হাজির হয়ে গেল তিন তলায়। তালা খুলে ঢুকে পড়ল রুমের ভেতরে, আটকে দিল দরজাটা। এগিয়ে গেল ড্রেসিংটেবিলের দিকে, শার্ট আর জিন্সের পকেটে-থাকা জরুরি জিনিসগুলো বের করে রাখল ওটার ওপর। কেডস খুলতে খুলতে এদিকওদিক তাকাচ্ছে। বোঝার চেষ্টা করছে, বেরেটাটা ঠিক কোন্ জায়গায় লুকিয়ে রাখলে সবচেয়ে ভালো হয়।

বাইরে থেকে বন্ধ দরজায় থাবা দিল কেউ এমন সময়। 'মিস্টার রানা?'

এসে গেছে সার্জেন্ট ফুগুই।

দশ

রানা দরজাটা খোলামাত্র জোর করে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল ফুগুই, সঙ্গে দুই সহযোগী।

'আপনার নাম ধরে তিনবার ডাকতে হয়েছে আমাকে,' ফুগুইয়ের কণ্ঠে অভিযোগের সুর স্পষ্ট, 'এবং প্রথমবার আপনার দরজায় ধাক্কা দেয়ার ঠিক ছাব্বিশ সেকেণ্ড পরে খুলেছেন দরজাটা।'

সার্জেন্টের ওপর যারপরনাই বিরক্তি বোধ করছে রানা, একটু রাগও হচ্ছে। 'নিশ্চয়ই আশা করেননি আপনার অপেক্ষায় দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকব আমি? সবে ঢুকেছি বাথরুমে, জামাকাপড় ছাড়তে শুরু করেছি, অমনি...। ছাব্বিশ সেকেণ্ড কেন, ছাব্বিশ মিনিট পর যদি খুলতাম দরজাটা, অথবা যদি না-ই খুলতাম, কী করতে পারতেন?'

একটা ভ্রূ উঁচু করল ফুগুই। 'আপনি মনে হয় আমার সঙ্গে তর্কে যেতে চাচ্ছেন, মিস্টার রানা?'

'হ্যাঁ, চাইছি। আপনাকে ঘরে আসতে বলিনি আমি, তা হলে জোর করে কেন ঢুকে পড়লেন?'

'পুলিশ সার্জেন্ট হিসেবে সে-অধিকার আছে আমার।'

'সার্চ ওয়ার্‌র্যান্ট দেখান।'

'নেই। কিন্তু ইসাটাবুর আইন বলছে, জরুরি পরিস্থিতিতে, জরুরি মনে করলে, হানা দিতে পারি আমি যে-কোনও লোকের যে-কোনও অবস্থানে।'

'এমনকী একজন বিদেশি ট্যুরিস্টের হোটেলরুমেও?'

বইঘর.কম

'হ্যাঁ। এখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আমাদের মাননীয় কমিশনার মনে করছেন, সম্ভাব্য একটা দাঙ্গা ঠেকানোর জন্য শুরুতেই কঠোর হওয়া উচিত পুলিশবাহিনীকে। জানেন কি না জানি না, ইসাটাবুতে জরুরি অবস্থা জারি করতে পারেন দু'জন—প্রধানমন্ত্রী ও গভর্নর জেনারেল, তাঁদের যে-কোনও একজনের অনুপস্থিতিতে পুলিশ কমিশনার। বাইরের দেশে সেনাপ্রধান যে-রকম পদমর্যাদা আর ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন, আমাদের কমিশনারের বেলাতেও তেমনই।'

'তিনি কখন জরুরি অবস্থা জারি করেছেন?'

'করেননি, তবে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে ভাষণ দিয়েছেন রেডিয়োতে—না শুনে থাকলে সে-দোষ নিশ্চয়ই তাঁর অথবা রয়্যাল পুলিশের না? চলাচলের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে বলেছেন তিনি বিদেশিদের, বিনা প্রয়োজনে যে-কোনও ধারালো অস্ত্র বহন করতে নিষেধ করেছেন আদিবাসীদেরকে। এবং যদি কারও কাছে আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া যায় তা হলে সে দেশি-বিদেশি যা-ই হোক, বিনা ওয়ার‍্যান্টে গ্রেপ্তার করার কথা বলেছেন। ...মিস্টার রানা, আমাকে দেয়া ইনফর্মেশন যদি ভুল না হয়ে থাকে, অন্তত একটা ফায়ারআর্ম ক্যারি করছেন আপনি এবং সেটা আপনার কাছে অথবা এ-ঘরেই কোথাও আছে ধারণা করে তল্লাশি করতে চাইছি।'

'করুন,' কথা আর না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল রানা।

দুই সহযোগীর দিকে ইঙ্গিত করল ফুগুই।

বলতে গেলে আপাদমস্তক কাদায় মাখামাখি হয়ে আছে রানা, ঘেন্নার দৃষ্টিতে ওকে দেখল ফুগুইয়ের দুই সহযোগী, কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে এগিয়ে গেল ওর দিকে। শরীরের বিশেষ কয়েকটা জায়গা হাতিয়ে দেখে নিশ্চিত হলো, কোনও আগ্নেয়াস্ত্র নেই রানার কাছে। সরে গেল দু'জনই, বাথরুম থেকে হাত ধুয়ে ফিরে এল। ওদেরকে ড্রেসিংটেবিলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করল ফুগুই।

‘আমার বিরুদ্ধে কে ইনফর্মেশন দিয়েছে আপনাকে, জানতে পারি?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘গোপন সংবাদ,’ ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল ফুগুই, ‘তারপরও যখন জানতে চাচ্ছেন...কলটা এসেছিল আমার মোবাইলে, আপনার নাম বলা হলো, আর বলা হলো একটা বেরেটা টমক্যাট আছে আপনার কাছে।’

‘যে কল দিয়েছিল আপনার মোবাইলে, তাকে চেনেন?’

কিছু বলল না ফুগুই।

‘কখন ফোন করেছিল সে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা আমার, মিস্টার রানা, আপনার না।’

‘জিজ্ঞাসাবাদ করছি না আমি, জানতে চাইছি। কে, কেন, কীভাবে ফাঁসিয়ে দিতে চায় আমাকে, জেনে রাখা কি উচিত না আমার?’

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ফুগুই, ড্রেসিংটেবিলের কাছ থেকে আওয়াজ দিল ওর এক সহযোগী, ‘একটা মাল্টিপারপাস নাইফ ছাড়া আর কিছু নেই, স্যর।’

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে ছিল, এবার রানার চোখে চোখ রাখল ফুগুই। ‘মাল্টিপারপাস নাইফ, মিস্টার রানা?’

‘কোথাও বেড়াতে গেলে বেশিরভাগ সময়ই ওটা সঙ্গে রাখি আমি। ...কেন, কোনও সমস্যা, সার্জেন্ট? আপনি নিশ্চয়ই একটা বেরেটা খুঁজছিলেন, মাল্টিপারপাস নাইফ না? আপনাদের কমিশনার নিশ্চয়ই ধারালো অস্ত্র বলতে কাঁচি, স্ক্রুড্রাইভার, নেইলকাটারসহ মাল্টিপারপাস নাইফ বোঝাননি?’

আবারও বাঁকা হাসি হাসল ফুগুই, রানার একটা প্রশ্নেরও জবাব দিল না। দুই সহযোগীর উদ্দেশে বলল, ‘এবার ক্লযিটটা। এবং পাশে-রাখা মিস্টার রানার ট্রাভেলিং ব্যাগটাও।’

খোলা হলো ক্লযিট। প্রথমেই রানার সবগুলো কাপড় উল্টেপাল্টে দেখল ওরা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল রানার পাসপোর্ট।

খুলে ফেলল সবগুলো ড্রয়ার, পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বালিয়ে আলো ফেলে ফেলে দেখল দেরাজগুলোর ভেতরের ফাঁকা জায়গায়। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে ক্লযিটের নিচটা ভালোমতো দেখল একজন, তারপর পিঠ খাড়া করে খুলল রানার ট্রাভেলিং ব্যাগ, শেষে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ল ফুগুইয়ের উদ্দেশে।

অন্যজন এগিয়ে এল সার্জেন্টের দিকে, ক্লযিটের একটা দেরাজের ভেতর থেকে পাওয়া স্যাটেলাইট ফোন বাড়িয়ে ধরল। ওটা হাতে নিল ফুগুই, ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখল। তারপর তাকাল রানার দিকে। 'স্যাটেলাইট ফোন? আমাকে আশ্চর্য করলেন আপনি, মিস্টার রানা।'

'কী কারণে আশ্চর্য হলেন, বুঝলাম না, সার্জেন্ট। এই প্রথম স্যাটেলাইট ফোনসহ দেখলেন কাউকে? নাকি এই প্রথম দেখলেন জিনিসটা?'

'এই প্রথম স্যাটেলাইট ফোনসহ দেখলাম ইসাটাবুতে বেড়াতে-আসা একজন ট্যুরিস্টকে।'

'ওটা আপনাদের দ্বীপে নিষিদ্ধ নাকি? এয়ারপোর্ট ইমিগ্রেশন কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে আমাকে।'

'না, নিষিদ্ধ না। কিন্তু...যতদূর মনে পড়ে, প্রথমবারের আলাপের সময় বলেছিলেন, আপনি বড়লোকের ছেলে, দেশেবিদেশে ঘুরে বেড়ান। আমি শুনেছি এসব ফোন ব্যবহার করে ইন্টারপোল অথবা বড় বড় আন্তর্জাতিক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ কর্তাব্যক্তিরা। আপনি কেন...'

'দেশেবিদেশে যেসব বন্ধু আর পরিচিত লোক আছে আমার, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য।'

"সেণ্ড কল" বাটনে চাপ দিল ফুগুই, আলো জ্বলে উঠল স্ক্রীনে। কল হিস্টরিতে গিয়ে রিসিভড় কলগুলোর প্রথম রেকর্ডটা দেখল। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিল্টন, মিস্টার রানা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সির চীফ। আমার খুব কাছের একজন মানুষ। ...তাঁকে

ফোন করবেন নাকি, সার্জেন্ট? আমার ব্যাপারে জানতে চাইবেন?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ফুগুই, ফোনটা বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে। দুই সহযোগীর দিকে তাকাল। 'এবার খাটটা। বালিশ, তোষক-জাজিম সব উল্টেপাল্টে দেখবে।'

হাসল রানা।

বিরক্ত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল ফুগুই, কিন্তু কিছু বলল না। এগিয়ে গিয়ে হাত লাগাল দুই সহযোগীর সঙ্গে। ওরা তিনজনে মিলে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল খাট। দশ মিনিট পর হাঁপাতে হাঁপাতে সরে গেল খাটের সামনে থেকে।

'বারান্দায় যাও একজন,' হুকুম দিল ফুগুই, 'আরেকজন গিয়ে ঢোকো বাথরুমে। ভালোমতো খুঁজে দেখবে।'

'বারান্দায় কয়েকটা ফুলের টব ছাড়া আর কিছু নেই,' নিরীহ গলায় মনে করিয়ে দিল রানা।

'গাছগুলো টেনে তুলে ফেলো টব থেকে,' যে-সহযোগী বারান্দায় গেছে, তাকে উঁচু গলায় বলল ফুগুই, 'হয়তো ভেতরের মাটিতে ঢুকিয়ে রাখা আছে পিস্তলটা।'

আরও দশ মিনিট পর দুই সহযোগী এসে দাঁড়াল ফুগুইয়ের পাশে, কিছু না বলেও চোখের ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছে ওরা: যা খুঁজছিল তা পায়নি।

একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে রানার দিকে তাকাল ফুগুই। 'আপনার কাপড়চোপড়ের এই অবস্থা কেন?'

কারণটা জানাল রানা, তবে বাদ দিল ওর জিপে গুলি চালানো থেকে শুরু করে ট্রাক নিয়ে একজনের পালিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে নদীতীরে, তার সব।

ভ্রূ কুঁচকে গেছে ফুগুইয়ের। 'ওরা ধাওয়া করেছিল আপনাকে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'তারপর ট্রাক দিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে?'

'দিয়েছে।'

‘কেন?’

‘জানি না।’

রানাকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখল ফুগুই। ‘আপনি আমার কাছে কিছু একটা গোপন করছেন।’

‘অবশ্যই করছি। এ-জীবনে ক’টা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেছি, তাদের কার কার সঙ্গে শুয়েছি—কিছুই বলিনি আপনাকে, বলবও না।’

চোয়াল শক্ত হলো ফুগুইয়ের। ‘আপনি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছেন, মিস্টার রানা।’

জ্বলে উঠল রানার দু’চোখ। ‘ঠিক এই অভিযোগটা করা উচিত ছিল আমার। ট্রাক দিয়ে ধাক্কা মেরে জিপসহ ফেলে দেয়া হয়েছে আমাকে, কোথায় ঘটনাটার তদন্ত করবেন, উল্টো হয়রানি করছেন আমাকেই। ...সার্জেন্ট, যদি এভাবে চলতে থাকে, তা হলে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে গিয়ে হাজির হব আপনাদের ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে, প্রয়োজনে আপনাদের চীফের কাছে।’

গম্ভীর হলো ফুগুই। ‘কাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করব? কী তদন্ত করব? ওরা কারা? আপনি কী ক্ষতি করেছেন ওদের? বুঝেশুনে জবাব দিলে ভালো হয়, কারণ গতকাল বিকেলে মাকিরা-উলাওয়ায় কী ঘটেছে, তা জানি আমি।’

‘যে জানে সে জ্ঞানী, এবং আমি জ্ঞানী লোকদেরকে সম্মান করি।’

‘কথা পেঁচাবেন না, মিস্টার রানা, সেটা আপনার জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। কেন বাঁচাতে গেলেন আপনি মিস রেমি তানাঘাইকে? নিজেকে ট্যুরিস্ট দাবি করছেন বার বার, অথচ তিন দুর্বৃত্তের দু’জনকে ফিল্মি কায়দায় পিটিয়ে নাস্তানাবুদ করলেন কেন? কেন আমাকে ফোন করে জানানো হচ্ছে, আগ্নেয়াস্ত্র বহন করছেন আপনি? কই, ইসাটাবুর আর কোনও ট্যুরিস্টের বেলায় তো ও-রকম অভিযোগ শুনিনি?’

'চারটা প্রশ্নের প্রথমটার জবাব হলো, রেমিকে বাঁচানোটা কর্তব্য মনে করেছি, তাই বাঁচিয়েছি। দুই, আপনার দৃষ্টিতে যা মারামারি, আমার দৃষ্টিতে তা বিপদে-পড়া কাউকে সাহায্য করা। তিন, জানি না। চার, হবে হয়তো। ...সার্জেন্ট, আপনার কি আরও সময় কাটানোর ইচ্ছা আছে এখানে? সাফসুতরো হতে চাইছিলাম আমি। ব্রেকফাস্টের পর কিছু খাইনি, খিদেও লেগেছে।'

'আপাতত চলে যাচ্ছি,' বিছানার ওপর থেকে পাওয়া চিরকুটটা পড়ছে ফুগুই, 'কারণ কিছু কাজ আছে। পয়েন্ট ক্রুযের সঙ্গের জেলেপাড়ায় গিয়ে জিজ্ঞেস করলে আমার বাসাটা খুঁজে পেতে অসুবিধা হবে না আশা করি। যদি খোঁজ না করেন আমাকে, কাজ সেরে দেখা করতে আসব আপনার সঙ্গে।' রানার দিকে তাকিয়ে ভ্রূ উঁচু করল। 'মিস তানাঘাই কাল রাতে হোটেলে ছিল কেন?'

'বাড়ি ফেরাটা নিরাপদ মনে করেনি, তাই...'

'তাই চেনা নেই জানা নেই এমন একটা লোকের সঙ্গে একই হোটেলে দিব্যি কাটিয়ে দিল সারাটা রাত? মেয়েটার জন্য আপনাকে বোধহয় খুব বেশি খরচ করতে হয়নি, মিস্টার রানা?'

রক্ত উঠে গেল রানার মাথায়, কিন্তু জোর করে নিজেকে শান্ত রাখল ও। 'আপনি যা বললেন, একজন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন পুলিশ সার্জেন্টের মুখে তা মানায় না।'

'এবং আপনি যা বলছেন, তা নিছক বেড়ানোর উদ্দেশ্যে ইসাটাবুতে আসা কারও মুখে মানায় না,' হাঁটা ধরল ফুগুই, দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় যোগ করল, 'এখন থেকে আপনার ওপর একটা চোখ রাখার চেষ্টা করব, মিস্টার রানা।'

'সেক্ষেত্রে সম্মানিত বোধ করব আমি,' এগিয়ে গিয়ে দরজাটা আটকে দিল রানা।

স্যাটেলাইট ফোনটা বিছানার ওপর রেখে দিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে সোজা বাথরুমে চলে এল ও, ভালোমতো গোসল করল;

কেডস রেখে দিল পায়ের কাছে, জলস্রোতে ধুয়ে চলে গেল কাদাময়লা। কোমরে টাওয়েল পেঁচিয়ে ঘরে এল, শুকানোর উদ্দেশ্যে কেডস রেখে দিল বারান্দায়।

পুরো ক্লযিট তছনছ করে ফেলেছে ফুগুইয়ের দুই সহযোগী, দ্রুত হাতে সব গুছিয়ে নিল রানা। একটা নীল হাফহাতা শার্ট আর সাদা রঙের একটা গ্যাবার্ডিন প্যান্ট বেছে নিল ও। পায়ে চপ্পল গলিয়ে স্যাটেলাইট ফোনটা নিয়ে চলে এল একতলায়, গিয়ে ঢুকল রেস্টুরেন্টে। লাঞ্চের অর্ডার দিল। ওয়েইটার বলল খাবার সার্ভ করতে সময় লাগবে, বেকার বসে না থেকে ফোন করল রানা-এজেন্সির সবচেয়ে কাছের শাখায়, ওর জন্য টাকা পাঠাতে বলল এএনযেড ব্যাংকের হেণ্ডারসন ফিল্ড শাখায়। তারপর মনে মনে টুকে নিল গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য:

এক, হারুকিচি হায়াকুটাকি।

দুই, তথাকথিত মিলিশিয়া।

তিন, ইসাটাবুর ব্যাপারে আন্তর্জাতিক মিডিয়ার কভারেজ।

চার, দ্বীপটার প্রাচীন ইতিহাস, বিশেষ করে এমন কিছু, যে-ঘটনার সঙ্গে কোনও-না-কোনওভাবে যোগসূত্র আছে সলোমন সাগরের।

কিছু বাদ পড়েছে কি না ভাবছিল রানা, লাঞ্চ এসে পড়ায় খেতে শুরু করল।

কে ফোন করেছিল ফুগুইকে? কে বলেছে, একটা বেরেটা টমক্যাট আছে রানার কাছে? ভেলর? মনে হয় না। বেরেটা পাওয়ার কাহিনি ভেলরকে বলেনি রানা। এমনকী, রানার মনে আছে, হাসপাতালে যখন ছিল ও, ওষুধ লাগানোর জন্য শুধু ওর দু'হাত স্পর্শ করেছে মেয়েটা, কোমরের কাছটা ধরেনি। আর ধরলেই বা কী হতো? শার্টের ওপর দিয়ে শুধু ধরে বোঝা সম্ভব না, কোনও ফায়ারআর্ম বেরেটা টমক্যাট, নাকি অন্যকিছু। না, ভেলর ফোন করতে পারে না ফুগুইকে।

তা হলে আর কার জানা থাকতে পারে, একটা বেরেটা

টমক্যাট থাকতে পারে রানার কাছে?

কুমিরের পেটে গেছে যে-লোক, তার সঙ্গীর। ওকে কি চেনে ফুগুই? তারমানে...একটা খারাপ লোকের সঙ্গে জানাশোনা ও যোগাযোগ আছে সার্জেন্টের? কোনও কারণে ওদের সঙ্গে হাত মেলায়নি তো সে? নইলে তাকে কিছু না বলে রানার পেছনে লেগেছে কেন ব্যাটা?

'এখন থেকে আপনার ওপর একটা চোখ রাখার চেষ্টা করব, মিস্টার রানা,'—মানে কী কথাটার? কাজটা কি আসলেই করতে পারবে সে? সময় ও সুযোগ পাবে? খুন হয়ে গেছে দু'জন রিপাবলিকান, অপহৃত হয়েছে দুই বিদেশি এইড ওয়ার্কার, পাগলাটে আচরণ করছেন প্রধানমন্ত্রী সোগাভের, ঘোলাটে হয়ে উঠেছে ইসাটাবুর রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অনিশ্চিত হয়ে গেছে নির্বাচন, খেপেছে সাধারণ জনগণ, নতুন দাঙ্গার কথা বলছে কেউ কেউ...এতকিছুর পরও রানার ওপর চোখ রাখা...বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না সার্জেন্টের জন্যে?

কিছু একটা আছে ওই লোকের কথায় আর কাজে, খাওয়া শেষ করে কফির কাপটা টেনে নেয়ার সময় ভাবল রানা, এমন কিছু, যা খাপছাড়া মনে হচ্ছে ওর কাছে বার বার।

কী সেটা?

মনিকার মতো একটা মেয়ে, যে পামারের কাছে ধরা দেয়ার জন্যই পিএসের চাকরিটা নিয়েছিল বলে ওর অনুমান, যদি গিয়ে দাঁড়ায় কোনও ঋষির সামনে, তা হলে তাঁর ধ্যানও ভাঙতে বাধ্য বলে বিশ্বাস পামারের।

মেয়েটাকে পটিয়ে নিজের বাসায় নিয়ে এসেছে সে; দু'রাউণ্ড শেরি খেয়েছে দু'জনে, তারপর পামার নিজেও বলতে পারবে না ঠিক কখন আদর করতে শুরু করেছে মেয়েটাকে, বলতে পারবে না মেয়েটার পক্ষ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পেয়ে ওকে কখন নিয়ে এসেছে বেডরুমে। মাত্র শুয়েছে দু'জনে বিছানায়, এমন সময়

বইঘর.কম

বেজে উঠল ওর সেলফোন।

বিরক্তি, রাগ আর হতাশার একটা মিশ্র আবেগ টের পেল সে। ঘাড় ঘুরিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল খুলে-মেঝেতে-ফেলে-রাখা কোটের দিকে, ওটার পকেটে আছে মোবাইলটা। লাফ দিয়ে নামল বিছানা থেকে, দাঁতে দাঁত চেপে এগিয়ে গেল কোটটার দিকে, বের করল সেলফোন। নম্বরটা দেখে আরও বাড়ল ওর বিরক্তি। 'হ্যালো?'

'অফিসে ফোন করেছিলাম,' বলা হলো ও-প্রান্ত থেকে।

'আমার কি শরীর খারাপ লাগতে পারে না? দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা অফিসে পড়ে থাকার জন্যই জন্মেছি নাকি আমি?'

'মেজাজ খারাপ?'

'না, এত ভালো মেজাজ কোনওদিন ছিল না আমার। কাঁচা ঘুম থেকে লাফ দিয়ে উঠে ফোন ধরার অভ্যাস নেই আমার। ...কী বলবে জলদি বলো।'

'পরিকল্পনায় একটু পরিবর্তন করা হয়েছে। আপাতত কয়েকটা দিন হাসপাতালেই থাকুক ভাউযা। দরকার হলে যে-কোনও সময় গুম করে ফেলা যাবে ওকে।'

'যদি নিশ্চিত থাকো কারও সঙ্গে দেখা করতে পারবে না লোকটা...'

'পারবে না।'

'শুধু এই কথা জানানোর জন্য ফোন করেছ?'

'না। মাসুদ রানা বলেছে, সলোমন সাগরে ডুব দেবে। খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে, কী আবিষ্কার করেছিল ভাউযা।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল পামার, বিছানায় আধশোওয়া হয়ে থাকা মনিকার দিকে তাকিয়ে আছে, ওর আকর্ষণ প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। বলল, 'ভালো তো। ভাউযা যখন কোনও ইনফর্মেশন দিতে পারছে না, আমরা যখন ডুবুরির ব্যবস্থা করতে পারছি না, এবং মাসুদ রানা যখন ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে চাইছে, তখন একটু অপেক্ষা করলে লাভ ছাড়া ক্ষতি

দেখি না। দেখ কতদূর কী করতে পারে লোকটা, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিয়ো। ভাউযাকে হাতে রেখো, কারণ মাসুদ রানা সফল হয় কি না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। ...রাখি।'

লাইন কেটে দেয়া হলো ও-প্রান্ত থেকে।

সেলফোনটা কোটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখল পামার, হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে যেন। দ্রুত হেঁটে আবার গিয়ে উঠল বিছানায়। বুকের জড়িয়ে ধরল মনিকাকে, চুমু খেতে শুরু করেছে। 'ডার্লিং,' আদর করতে করতেই বলল, 'বিনোদনের সময় অকাজের ফোনগুলো কেন যে আসে, বুঝি না!'

"বিনোদন" শেষ হলে বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে গেল সে, লাগিয়ে দিল দরজা।

চট্ করে বিছানা ছাড়ল মনিকা, প্রায় ছুটে গিয়ে দাঁড়াল পামারের কোটটার সামনে। বের করল সেলফোনটা, কল-রেকর্ড চেক করছে। যে-নম্বর থেকে শেষ কলটা এসেছে, ভালোমতো দেখল সেটা, তারপর জায়গামতো রেখে দিল ফোন, দ্রুত পায়ে হাজির হলো নিজের পার্সের কাছে। এবার বের করল নিজের সেলফোন। একটু আগে দেখা নম্বরটা এসএমএস করে পাঠিয়ে দিল বিশেষ একটা নম্বরে।

একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় ইংরেজিতে "ফোন" ও "নাম্বার" শব্দ দুটো লিখে আরেকটা মেসেজ পাঠাল।

সগর্জনে বেলাভূমিতে এসে আছড়ে পড়ছে সলোমন সাগরের ঢেউ। জলোচ্ছ্বাস ঠেকানোর জন্য বালির বিশাল বিশাল বস্তা ফেলা আছে সাগরতীরে। ওগুলোর থেকে এক শ' গজ ভেতরে জেলেপাড়ার বিস্তার। এটা ঠিক পয়েন্ট ক্রুয বন্দরের সঙ্গে না, বরং আধ মাইল পুবে। বন্দর থেকে যে-রাস্তা ঢালু হয়ে নেমে এসে প্রবেশ করেছে এখানে, সেটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে রানা ভাবছে, কক্সবাজার বা কুয়াকাটার কোনও জেলেপল্লীর সঙ্গে তেমন ফারাক নেই পাড়াটার। তবে এখানে বেশ কিছু পাকা

বইঘর.কম

বাড়িও আছে।

একনজর তাকালেই বোঝা যায়, এখানকার বাসিন্দারা গরিব। ঘিঞ্জি পরিবেশ, লাগালাগি করে আছে কুঁড়েঘরগুলো; বেশিরভাগ ঘরেরই দেয়াল বেড়া দিয়ে বানানো, ছাদে ছন-ছাওয়া। টিনের চালওয়ালা একটা-দুটো ঘর নজরে পড়ে। বাসিন্দারা যে যেখানে জায়গা করে নিতে পারছে, ধরে আনা ছোট মাছ শুঁটকি বানাচ্ছে; বাতাসে উৎকট গন্ধ। ছোটাছুটি করতে থাকা পুরো নগ্ন বাচ্চাদের চেঁচামেচি এবং মাছলোভী অসংখ্য পাখির চিৎকারের নিচে মাঝেমধ্যেই চাপা পড়ে যাচ্ছে ঢেউয়ের ধেয়ে আসার একটানা আওয়াজ। একটা বাতিল ভেলা উল্টো করে ফেলে রাখা হয়েছে একধারে, সেটা নিয়ে খেলায় মেতেছে তিন শিশু। লজ্জাশরম কাকে বলে জানেই না এখানকার মহিলারা—আদিবাসী কায়দায় বানানো খাটো স্কার্ট বাদে পোশাক বলতে কিছু নেই তাদের শরীরে। কারও কারও গলায় বিচিত্র মালা, সেখান থেকে ঝুলছে গাছের পাতা। কোনও না কোনও কাজে ব্যস্ত ওরা সবাই, রানার দিকে ভালোমতো তাকানোর ফুরসত নেই। পুরুষদের প্রায় সবাই জীবিকা অন্বেষণে সাগরে গেছে। গৃহস্থালীর বর্জ্যের স্তূপ এখানেসেখানে। বালির বস্তাগুলো ছাড়িয়ে সাগরের দিকে তাকালে দেখা যায়, পানিতে ভাসছে জীর্ণ কয়েকটা নোঙরফেলা সাম্পান, আজকের মতো মাছ ধরা শেষ করে ফিরে আসতে দেখা যাচ্ছে আরও অনেকগুলোকে। পাড়ার একমাত্র দর্শনীয় স্থাপনা একটা গির্জা; বেশ কিছুটা জায়গা জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছে; আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাম্প্রতিক সময়ে নতুনভাবে রঙ করায় রীতিমতো ঝকঝক করছে বিকেলের আলোয়। দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। ঈশ্বরের ঘরে রঙ দেয়ার মতো লোক আছে, গরিব মানুষের সেবা করার কেউ নেই।

হুটোপুটি করতে থাকা একদল কিশোর দেখিয়ে দিল রানাকে, কোথায় থাকে রেমি তানাঘাই। বোঝা গেল, দু'একপুরুষ আগেই পেশা পরিবর্তন করেছিল রেমির পরিবার। জেলেপাড়ার শেষ

সীমানাতেই আছে এখনও, কিন্তু দুটো ঘরই পাকা।

ভেতর থেকে বন্ধ দরজায় টোকা দিল রানা। বারকয়েক টোকা দেয়ার পর দরজা খুলল রেমি, চোখ কচলাচ্ছে।

'ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম?' বলল রানা।

রেমির চোখে ঘুম ঘুম ভাবের চেয়ে বিস্ময় বেশি—ভাবেনি এভাবে হঠাৎ হাজির হয়ে যাবে রানা। একটুখানি হেসে বলল, 'অসুবিধা নেই। ভেতরে আসুন।'

ঢুকল রানা।

প্রথমে একটা ঘর, একটা খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে দেখা যাচ্ছে আরেকটা—রান্নাঘর সম্ভবত। দুটো খাট, একটা ছোট টেবিল, একটা চেয়ার আর একটা বুকশেল্‌ফ্‌ ছাড়া কোনও আসবাব নেই। শেলফে কিছু বই আছে, সেগুলোর বেশিরভাগই নার্সিং-এর ওপর।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তাতে বসে রানা বলল, 'সকালে ওভাবে উধাও হয়ে গেলে কেন?'

'যেমনটা লিখেছিলাম—কিছু কাজ ছিল আমার। তা ছাড়া...আপনাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতে দ্বিধা বোধ করছিলাম, ইচ্ছাও করছিল না।'

'রিপাবলিকানদের দুই কর্মী নিহত হওয়ার খবরটা শুনেছ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু ওটা তো গতরাতের ঘটনা। আজ কিডন্যাপ করা হয়েছে বিদেশি দুই এইড ওয়ার্কারকে। ঘুমিয়ে পড়ার আগে শুনলাম, "দ্য মিউটিনিয়ার্স" নামের একটা মিলিশিয়া গ্রুপের কথা বলা হচ্ছে রেডিয়োতে। দুই এইড ওয়ার্কারকে কিডন্যাপ করার দায় স্বীকার করেছে ওরা। দাবি জানিয়েছে, এখানে যেসব বিদেশি কোম্পানি আছে, বিশেষ করে খনিজসম্পদ উত্তোলন ও বিপণনের সঙ্গে যারা জড়িত, অবিলম্বে ইসাটাবু ছাড়তে হবে তাদের—দেশের সম্পদ ভিনদেশে পাচার হতে দেবে না মিউটিনিয়াররা। নইলে ও-রকম কিডন্যাপিং চলতেই থাকবে একের পর এক, রক্তের বন্যা বয়ে যাবে দ্বীপে। প্রধানমন্ত্রী

সোগাভের বুঝতে পারছেন না কীভাবে দর কষাকষি করবেন মিউটিনিয়ারদের সঙ্গে।'

'নতুন কোনও অ্যাটেম্পট্ নেয়া হয়েছিল তোমার ওপর? আই মীন, কেউ পিছু নিয়েছিল? অথবা অন্য কোনোভাবে...'

'না।'

'আগামীকাল সকালে পয়েন্ট ক্রুযে হাজির হচ্ছে অগযিলারি রিসার্চ শিপটা,' প্রসঙ্গ বদল করল রানা, 'সলোমন সাগরে কী খুঁজে পেয়েছিল ভাউযা, জানতে চাই আমি; বলেছিলে আমাকে সঙ্গ দেবে তুমি, সাহায্য করবে।'

'আপত্তি নেই,' একটু যেন দ্বিধায় ভুগছে রেমি, 'কিন্তু ভাউযার কী হবে?'

'কিছু হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বাভাবিক হচ্ছে সে, ততক্ষণ দেখা করতে দেয়া হবে না ওর সঙ্গে, সে-চেষ্টা করে লাভও নেই। সময়টুকু কাজে লাগাতে চাই আমি।'

'কিন্তু...' আবারও ইতস্তত করছে রেমি, 'এত বড় সাগরের ঠিক কোথায়...মানে, আমি আসলে জানি না...'

'আমি জানি।'

কিছু বলছে না রেমি, আশ্চর্য হয়ে গেছে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'ভাউযাই বলে গেছে, আই মীন, লিখে রেখেছে। তোমার ছবির পেছনে।'

'কোন্টার কথা বলছেন? নান ম্যাডল?'

'না, অন্যটা।'

'কী মানে কথাটার?'

'দিন ৯টা ২৯ মিনিট ১৩ সেকেণ্ড মানে অক্ষাংশ ৯ ডিগ্রি ২৯ মিনিট ১৩ সেকেণ্ড। আর ১৫৯ পাউণ্ড ৫০ শিলিং ৩৭ পেন্স মানে দ্রাঘিমাংশ ১৫৯ ডিগ্রি ৫০ মিনিট ৩৭ সেকেণ্ড। সলোমন সাগরের ঠিক ওখানেই ডুব দিতে হবে আমাদেরকে।'

'দিক বুঝবেন কীভাবে?'

‘ভাউযার ধাঁধাটা মিলিয়ে নিয়েছি ইসাটাবুর ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে।’

চুপ করে আছে রেমি, কী বলবে বুঝতে পারছে না।

‘ভাউযার সেক্সট্যান্ট আছে, না?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল রেমি। ‘নান ম্যাডল মানে কী?’

মনে মনে গুগলকে ধন্যবাদ দিয়ে রানা বলল, ‘পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে, ফেডারেটেড স্টেটস অভ মাইক্রোনেশিয়ার টেমওয়েন দ্বীপে, অনেক আগে সডেলুর নামের এক সাম্রাজ্য ছিল। ওখানে একটা লেগুনের ওপর বানানো হয়েছিল নান ম্যাডল নামের একটা শহর, যা আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত। স্থানীয় ভাষায় শব্দটার মানে “মাঝখানের জায়গা”। প্রায় এক বর্গ কিলোমিটার আয়তনের শহরটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কতগুলো কৃত্রিম দ্বীপ নিয়ে তৈরি করা হয়েছিল ওটা, দ্বীপগুলো একটা আরেকটার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল কয়েকটা প্রণালীর মাধ্যমে, ভেতরের সব স্থাপনাই পাথরের তৈরি, বেশিরভাগ দ্বীপেই থাকত সডেলুরের প্রভাবশালী পুরোহিতরা। ১৬২৮ সালে পতন ঘটে সডেলুর সাম্রাজ্যের, আস্তে আস্তে জনশূন্য হতে শুরু করে নান ম্যাডল, শেষপর্যন্ত পুরোপুরি পরিত্যক্ত এবং একসময় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। যা-হোক, আমি যা বলতে চাইছি তা হলো...’

‘নান ম্যাডলের মতো কোনও ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছে ভাউযা,’ রেমির চেহারায় তীব্র কৌতূহল।

এগারো

সলোমন সাগর সম্পূর্ণ শান্ত এখন।

বইঘর.কম

শেষবিকেলের আকাশে আস্তে আস্তে মরে যাচ্ছে রোদ। সাম্পানটা যেহেতু মাছ ধরার নয়, ধারেকাছে মাছলোভী পাখিদের ভিড় আর কর্কশ চিৎকার নেই। তবে অনেক দূরের কয়েকটা বড় নৌকা ঘিরে ঠিকই চক্কর দিচ্ছে ওগুলো। এত দূর থেকে কানে লাগে না ওদের ডাঁক। জায়গামতো হাজির হয়েছে ওরা, সাম্পানের ডিজেল ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে নোঙর ফেলেছে রানা; ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালে ইসাটাবুকে ছবির মতো সুন্দর একটা সবুজ দ্বীপ বলে মনে হচ্ছে এখন, খেয়াল করে না দেখলে সাদা সৈকতে আলাদাভাবে ঠাহর করা যায় না বালির বস্তাগুলোর অস্তিত্ব, জেলেপাড়াটাকে মনে হয় শান্ত, সৌম্য একটা গ্রাম।

সূর্য ডুবতে তখনও ঘণ্টা দুয়েক বাকি, হাতে আর কোনও কাজও নেই, তাই রানা যখন প্রস্তাব দিল "ভাউযার আবিষ্কারটা" একনজর দেখবে কি না, সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায় রেমি। ঝটপট ফ্রেশ হয়ে নেয় সে, পথ দেখিয়ে রানাকে নিয়ে যায় ওদের সাম্পানে। দিক নির্ণয়ের দায়িত্ব পালন করে রানা, আর সাম্পানটাকে জায়গামতো নিয়ে আসে মেয়েটা।

রেমি বলেছে, পরনের টিশার্ট আর শর্টসসহই ডুব দিতে পারবে, অসুবিধা হবে না। ওকে উল্টো ঘুরতে বলে কাপড় ছাড়ল রানা, পরে নিল ভাউযার একটা শর্টস। ওয়েটস্যুট এবং অন্যান্য আধুনিক ডাইভিং সরঞ্জাম নেই ভাউযার, যা আছে তা যৎসামান্য বলা যায়; মাস্ক, এয়ারসিলিণ্ডার, ফিন আর ডাইভিংল্যাম্প ইত্যাদি চেক করছিল রানা, খেয়াল করল, একদৃষ্টিতে ওকে দেখছে রেমি।

'ভাউযার সঙ্গে তা হলে তুমিও ডুব দিতে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কখনও কখনও। বেশিরভাগ সময় ইটেই নামত। আমি সাম্পানে থাকতাম, হাল সামলাতাম, কোনও প্রয়োজন দেখা দিলে সাহায্য করার চেষ্টা করতাম। যদি কখনও সাম্পান সামলানোর দায়িত্ব নিত ইটে, তা হলে আমি শখের বশে নামতাম ভাউযার সঙ্গে।'

‘সলোমনের তলদেশ এখানে ঠিক কতটা নিচে, বলতে পারো?’

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রেমি। ‘আনুমানিক এক শ’ ফুট।’

মুখ তুলে আকাশটা দেখে নিল রানা। ‘দুপুরে বৃষ্টি হওয়ার পর মেঘ কেটে গেছে। পানি যথেষ্ট পরিষ্কার, ঢেউও তেমন বড় না। আশা করছি দেখতে কোনও সমস্যা হবে না নিচে।’ মাস্ক পরে নিল ও, স্ট্র্যাপেবাঁধা এয়ারসিলিণ্ডার পরল ঠিকমতো। ফিন আর সিলিণ্ডার পরতে সাহায্য করল রেমিকে, তারপর নিজের রেগুলেটর ঢোকাল মুখে।

‘যদি সমস্যা হয়,’ বিব্রত হাসি হাসল রেমি, ‘তা হলে ডাইভিং ল্যাম্প তো আছেই।’

মাথা ঝাঁকিয়ে স্টার্নের দিকে এগিয়ে গেল রানা, ওখানে কায়দা করে লাগানো আছে একটা মেটাল ডাইভ ল্যাডার। কোনওরকম দ্বিধা না করে লাফিয়ে পড়ল পানিতে। মুহূর্তের মধ্যে যেন আশ্চর্য নিস্তব্ধতা গিলে নিল ওকে।

পানি ঈষদুষ্ণ, মনে হচ্ছে যেন কুসুম গরম পানিতে গোসল করতে নেমেছে রানা। কিছুদূর নামার পর ডিগবাজি খেল, মাথা চলে গেল নিচের দিকে, ফিন দুটো ওপরে। গভীরে ঢুকতে পারেনি শেষবিকেলের রোদ, আশপাশের পানিতে কেমন হলুদাভ আভা। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

দশ ফুট ওপরে আছে রেমি, মাস্কের কারণে অদৃশ্য হয়ে গেছে চেহারা, শুধু চোখ দুটো দেখা যায়। ইতোমধ্যেই জ্বালিয়ে দিয়েছে ডাইভিং ল্যাম্প, অদ্ভুত লাগছে ওর ভাসমান কোঁকড়া চুলগুলো।

মেয়েটাকে অভয় দেয়ার জন্য বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা উঁচু করল রানা, তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে নিয়ে ধীরেসুস্থে নামতে শুরু করল আবার।

পঞ্চাশ ফুট মতো নামার পর ডাইভিং ল্যাম্প জ্বালাতে হলো রানাকেও। আরও পনেরো ফুট নামার পর হঠাৎ করেই দেখা

গেল, সাগরের তলদেশে একটা বিশাল ঢিবির মতো পড়ে আছে কিছু একটা। পাশাপাশি নামছিল রানা আর রেমি, মেয়েটার কাঁধ স্পর্শ করল রানা, ইঙ্গিতে তাকাতে বলল ডানদিকে। তাকাল রেমি, একটু যেন থমকাল, তারপর নামতে শুরু করল আগের মতো।

সন্দেহ নেই, বিশাল ওই ঢিবি যা-ই হোক, মানবনির্মিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সাগরজলে নিমজ্জিত থাকায় সাগরেরই একটা অংশ হয়ে গেছে সেটা। সামুদ্রিক আগাছা আর উদ্ভিদ দিয়ে ঢেকে গেছে কোনও কোনও জায়গা, কোথাও পুরু প্রলেপ পড়েছে শৈবালের। কোথাও আবার ঘাঁটি গেড়েছে হাজার হাজার গুগলি-শামুক। রঙবেরঙের শত শত ছোট মাছ ছুটে বেড়াচ্ছে ঢিবিটাকে ঘিরে, ল্যাম্পের শক্তিশালী আলো দেখামাত্র হুটোপুটি শুরু করে দিল ওগুলো—কে কার আগে পালাবে সেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে যেন। আশপাশের পানিতে ভাসছে অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণিকণা।

নামার গতি একটু ধীর করল রানা, সমস্ত মনোযোগ ওই ঢিবির দিকে। ওটার আকার, সিমেট্রিক গঠন নিঃশব্দে বলে দিচ্ছে, ওটা কৃত্রিম, এবং খুব সম্ভবত বড় কোনও দালানের অংশ।

ওটার একদম কাছাকাছি পৌঁছে গেল রানা আর রেমি, সাগর তলের বালিতে দাঁড়াল। কোমরে বাঁধা ছুরিটা খুলে ডান হাতে নিল রানা, বাঁ হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে স্পর্শ করল অস্ত্রটার চোখা প্রান্ত; কসাইরা যেভাবে তাদের চাপাতি দিয়ে তক্তা চাঁছে সে-কায়দায় চেঁছে সরিয়ে দিচ্ছে দালানটার একদিকের কিছু বার্নাকল ও শ্যাওলা। বেশ কিছুক্ষণ একটানা কাজ করার পর থামল ও, সরে জায়গা করে দিল যাতে দেখতে পায় রেমি।

এগিয়ে এল মেয়েটা।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, গুগলি সরিয়ে দেয়ার ফলে উন্মুক্ত হয়ে গেছে কোনও একটা সন্ধিমুখ—দুটো ব্লকের মাঝখানের জয়েন্ট।

রানার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে কিছু একটা বোঝাতে যাচ্ছিল রেমি, চলমান একটা ছায়ার উপস্থিতি টের পেয়ে বরফের মতো জমে গেল ওরা দু'জনই।

আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরাল রানা, ডান হাতে শক্ত করে চেপে ধরেছে ছুরির বাঁট। ধীর গতিতে সাঁতরে এগিয়ে আসছে বড়সড় একটা হাঙর। গ্রেট হোয়াইট না, টাইগার হবে সম্ভবত, তবে লম্বায় ন'ফুটের কম না। রানা-রেমির রেগুলেটর থেকে বের হওয়া বুদ্‌বুদ্‌ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ওটার।

নিজের ল্যাম্প নিভিয়ে দিল রানা, রেমির কাঁধে টোকা দিয়ে ওর ল্যাম্পও নিভিয়ে দেয়ার ইঙ্গিত জানাল। বুঝতে পারল রেমি, ল্যাম্প নেভাল।

অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা যেন গিলে খেল ওদের দু'জনকে।

ঢিবিটাকে ঘিরে দু'বার চক্কর দিল মাংসাশী দানবটা; যখন নিশ্চিত হলো মুখরোচক কিছু পাওয়া যাবে না এখানে, চলে গেল আরেকদিকে।

হাঁপ ছাড়ল রেমি।

আবার ল্যাম্প জ্বালাল রানা, আলোটা তেরছা করে ফেলল রেমির চেহারায়। বড় বড় হয়ে গেছে মেয়েটার চোখ, চেহারাটা মাস্কের আড়ালে থাকার পরও বোঝা যাচ্ছে ভয় পেয়েছে সে। রানা টের পেল, ওর নিজের হৃৎস্পন্দনও বেড়ে গেছে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই সামলে নিল ও। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল রেমিকে, পর্যাপ্ত আলোর অভাব, হাতে সময়ও নেই, হাঙরের মতো কোনও মাংসাশী যদি হামলা করে তা হলে মোকাবেলা করার মতো অস্ত্রও নেই, কাজেই আজ আর না, ঢিবিটাকে একবার চক্কর দিয়ে উঠতে চায় ওপরে।

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রেমি।

চক্করটা দেয়া শেষ করল ওরা, তারপর দিক অনুমান করে নিয়ে উঠতে শুরু করল। বাঁ হাতে রেমির একহাত ধরে রেখেছে রানা, ডান হাতে প্রস্তুত অবস্থায় রেখেছে ছুরিটা। নির্দিষ্ট সময় পর

পর আলো জ্বালানোর ইঙ্গিত করছে রেমিকে, দেখে নিচ্ছে ওদের আশপাশে আবার হাজির হয়ে গেছে কি না কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথি।

না, সে-রকম আর কোনও ঘটনা ঘটল না।

তবে অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথি অপেক্ষায় ছিল ঠিকই—পানির ওপরে, আরেকটা সাম্পানে। রেমিকে সঙ্গে নিয়ে ভুস্ করে ভেসে উঠেছে রানা, চেহারা থেকে সরিয়েছে মাস্ক, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল লোকটা, 'ওয়েলকাম ব্যাক, মিস্টার রানা।'

চমকে উঠল রানা, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল কণ্ঠের মালিকের দিকে।

সার্জেন্ট ফুগুই।

টুরাঙ্গা, নিউযিল্যাণ্ড।

এমন নয় যে, জুয়া না খেললে প্রাণ বেরিয়ে যায় অ্যালেক্স হ্যালি'র। কিন্তু ওটা ছাড়তে পারে না সে। ওটা ওর জন্যে নেশার মতো—একটানা অনেকদিন বিরত থাকলে কেমন যেন আকুলিবিকুলি করতে থাকে মন, অদ্ভুত এক ছটফটানি টের পায় সে নিজের ভেতরে। জানে নুমা'র রিসার্চ শিপ ডারউইনের ক্যাপ্টেন হিসেবে কত গুরুত্বপূর্ণ একটা দায়িত্ব পালন করছে, তারপরও মানাতে পারে না নিজেকে। জানে, ওর এই নেশার খবর যদি পৌঁছায় অ্যাডমিরাল হ্যামিল্টনের কানে, তা হলে কী হতে পারে, তবুও সংযত হতে পারে না। কী করবে—যে-কাজ সে করে তা কখনও কখনও উত্তেজনাপূর্ণ হলেও বেশিরভাগ সময়ই একঘেয়েমিতে ভরা, আর ওটা কাটাতে হলে হ্যালির চাই জুয়ার মতো উত্তেজনাপূর্ণ বিনোদন।

আজও জুয়া খেলছিল সে একটা ক্যাসিনোতে; একটা একটা করে মিনিট কেটে গিয়ে সময়ের হিসেবটা কখন যে তিন ঘণ্টায় এসে ঠেকেছে, সে-হুঁশ ছিল না ওর। হুঁশ না থাকারই কথা—আজ ভাগ্যবিধাতা দু'হাতে দিচ্ছেন ওকে, চারটা খারাপ দানের কথা

বাদ দিয়ে বললে আজ জিতেই চলেছে সে একটানা। হাতঘড়ির দিকে চোখ পড়ল ওর একসময়, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল, সিদ্ধান্ত নিল এই দানের পর আর খেলবে না। দানটা শেষ করে উঠে দাঁড়াল, একচুমুকে খালি করে ফেলল উইস্কির ছোট গ্লাসটা, জিতে নেয়া চিপসগুলো টানল নিজের দিকে, মনে মনে ধন্যবাদ দিল যিশুকে। ক্যাসিনো ম্যানেজারের কাছে জমা দিল সব চিপস, ক্যাশ বুঝে নিল। খুশিতে কী করবে বুঝতে না পেরে আরেক রাউণ্ড উইস্কি খেল, তারপর বেরিয়ে এল রাস্তায়, দ্রুত গতিতে হাঁটা ধরল বন্দরের উদ্দেশে। নোঙর করে রাখা ডারউইনে পৌঁছাতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

জাহাজে কেবল উঠেছে, এমন সময় মনে হলো প্যান্টের পকেটে রাখা মোবাইলটার কথা। ইস্‌স্, আরও আগেই মনে হওয়া উচিত ছিল কথাটা। কোনও কল আসেনি, নিশ্চিত হ্যালি, কিন্তু এসএমএস তো এসে থাকতে পারে।

হ্যাঁ, যা ভেবেছিল ঠিক তা-ই—মেসেজ পাঠিয়েছে মনিকা। অনেকক্ষণ আগের সময়টা দেখল হ্যালি, সঙ্গে সঙ্গে দাঁত দিয়ে জিভ কাটল; নিজের জুয়ার নেশার কথা মনে করে দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল আনমনে। ভুলে গিয়েছিল, গুপ্তচরবৃত্তিতে একেকটা মুহূর্ত হীরার টুকরোর সমান দামি হতে পারে কখনও কখনও। মনিকার মেসেজ দুটো অ্যাডমিরাল হ্যামিল্টনের কাছে ফরোয়ার্ড করে দিল সে, তারপর ফোন করল তাঁকে।

লাইন কেটে দিয়ে কিছুক্ষণ পর কলব্যাক করলেন অ্যাডমিরাল। 'দেখেছি।'

'মনিকা পাঠিয়েছে,' ঘাবড়ে গেছে হ্যালি, ওকে যদি সময়ের কথা জিজ্ঞেস করেন অ্যাডমিরাল তা হলেই হয়েছে।

'এটা কোন্ জায়গার ফোন নম্বর?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল, সত্যি হলো না হ্যালির আশঙ্কা।

হাঁপ ছাড়ল হ্যালি। 'আমি শিয়োর না, স্যর। তবে অস্ট্রেলিয়া বা নিউযিল্যাণ্ডের যে না, সে-ব্যাপারে আমি শিয়োর। পাপুয়া

বইঘর.কম

নিউগিনি বা সলোমন দ্বীপপুঞ্জের কোনও জায়গার হতে পারে। কাণ্ট্রি কোড পরিচিত বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে। ...খোঁজ করব, স্যর?'

'দরকার নেই। যা করার আমিই করাচ্ছি। ...মনিকার সঙ্গে আর কোনও কথা হয়েছে?'

'না, স্যর। লাঞ্চ আওয়ারের আগে একবার ফোন করেছিল মেয়েটা, তারপর আর যোগাযোগ হয়নি।'

'কী বলেছে?'

'বলল, "ড্যাডি, চাকরিটা তেমন ভালো লাগছে না আমার কাছে। প্রাণ খুলে কথা বলার মতো একটা লোকও নেই অফিসে। বেশিরভাগ সময় মনমরা হয়ে থাকে আমার বস। কী যেন ভাবতে থাকে অন্যমনস্ক হয়ে। তবে এখন একটু ভালো মনে হচ্ছে তাঁর মেজাজ—অফিসের প্রাইভেট লাইনে কথা বলছেন কারও সঙ্গে।' "

'ড্যাডি?' একটুখানি হাসলেন অ্যাডমিরাল। 'তোমাকে ডাকার জন্য ভালো সম্বোধনই বেছে নিয়েছে মনিকা। ...সাবজেক্টের প্রাইভেট লাইনে কি ঘন ঘন ফোন আসে?'

'জিজ্ঞেস করিনি মেয়েটাকে। সুযোগ পাইনি আসলে। তা ছাড়া...ওই লাইনে ঘন ঘন ফোন আসে কি না তা দেখার মতো যথেষ্ট সময় মনিকা পেয়েছে বলে মনে হয় না। ওকে ওই চাকরিতে ঢোকানোর পর ক'দিনই বা গেছে?'

'এবং যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে আমাকে কাজটা করার জন্যে। ...ঠিক আছে,' আবারও একটুখানি হাসলেন অ্যাডমিরাল, 'ড্যাডি, চোখকান খোলা রেখে কাজ করে যাও। নতুন কিছু জানতে পারামাত্র জানাবে আমাকে। আমি দেখছি কী করা যায় এই ফোন নম্বরের।'

ইসাটাবু, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ।

'রেন্ট-আ-রাইড প্রতিষ্ঠান থেকে ফোন করে আমাকে বলল,'

রেমি সাম্পানে উঠে রানার পেছনে “আশ্রয়” নিয়েছে বলে ওকে দেখতে পাচ্ছে না ফুগুই, তবে দেখার চেষ্টা করে যাচ্ছে, ‘ক্রকোডাইল নদীর ধারে নাকি ওদের একটা জিপ পড়ে আছে—অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। কোথায় কার গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ল না-পড়ল তাতে আমার কী? কিন্তু ওরা যখন জানাল, জনৈক মিস্টার মাসুদ রানা ভাড়া নিয়েছিলেন জিপটা, তখন রওনা হতে বাধ্য হই। জায়গামতো গিয়ে একটু খোঁজাখুঁজির পর দেখি, আসলেই একদিকে কাত হয়ে পড়ে আছে জিপটা। চলে আসতাম, এবং এখন এভাবে হঠাৎ এসে আপনাদের...’ দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল, ‘লীলাখেলায় বাধা দিতাম না, যদি না...’ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নাক টানল জোরে, ‘একটা বুলেটের ছিদ্র দেখতে পেতাম জিপের পেছনের গ্লাসে।’

সার্জেন্টের চোখে চোখ রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর রানা বলল, ‘আমরা এখানে আছি জানলেন কীভাবে?’

‘বুলেটের ছিদ্রটা তড়িঘড়ি করে মেগুনায় যেতে বাধ্য করল আমাকে। শুনলাম, আপনি নেই। জেলেপাড়ায় গেলাম তখন। ছেলেছোকরারা বলল, মিস তানাঘাইকে নিয়ে একটা সাম্পানে করে রওনা দিয়েছেন আপনি। এই সন্ধ্যাবেলায় জেলেদের বেশিরভাগ সাম্পান যখন ফিরে গেছে অথবা যাচ্ছে, তখন দূর থেকে ও-রকম একটাকে স্থির ভাসতে দেখলে অনুমান করতে কষ্ট হয় না কোথায় আছেন আপনি। ...কাজের কথায় আসুন। বুলেটটা জিপের গ্লাস ভেদ করে ভেতরে ঢুকেছে। তারমানে বাইরে থেকে গুলি চালানো হয়েছে আপনার ওপর। বলুন, কেন করা হলো কাজটা? এবং কেন কথাটা গোপন করেছিলেন আমার কাছে?’

‘আমার মনে হয় যারা মার খেয়েছে আমার হাতে, শিপট্রাকে যারা ছিল তারা ওদের দোস্ত—শোধ নিতে চেয়েছে।’

‘তা হলে কথাটা আগে বলেননি কেন?’

‘খেয়াল ছুটে গিয়েছিল।’

রানার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ফুগুই বলল, 'ইসাটাবুর নিরাপত্তার স্বার্থে আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারি আমি, জানেন?'

'জানি, আই মীন, এই মাত্র জানলাম। কিন্তু কথা হচ্ছে, ঠিক কী অভিযোগে গ্রেপ্তার করবেন আমাকে? ঠিক কোন্ প্রমাণটা উপস্থাপন করবেন আমার বিরুদ্ধে? যদি গ্রেপ্তার করেন, কথা দিচ্ছি, সার্জেন্ট, আমি নিশ্চিত করব ব্যাপারটা যাতে আপনাদের কমিশনার হয়ে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত গড়ায়। সেটা কি ভালো হবে আপনার জন্যে?'

রানার হুমকি ফাঁকা না-ও হতে পারে, ভেবে নিয়ে একটু যেন নরম হলো ফুগুই। 'ফায়ারআর্ম ছিল ওদের কাছে, আপনার কাছে না?'

'না, আমার কাছে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না, এবং এখনও নেই।'

'ট্রাক নিয়ে চলে গেল কেন ওরা? একটু চেষ্টা করলেই পরপারের টিকিট ধরিয়ে দিতে পারত আপনার হাতে; করল না কেন কাজটা?'

'কথা দিচ্ছি, আবার যদি দেখা হয় ওদের সঙ্গে, সবার আগে এ-প্রশ্নটাই জিজ্ঞেস করব।'

'ওদের বর্ণনা দিন।'

'দু'জন লোক। চেহারাসুরতে মনে হয় এখানকার আদিবাসী। মাঝারি উচ্চতার। জিন্সের শর্টস আর ময়লা টি-শার্ট ছিল পরনে। পায়ে...উঁ...পায়ে কেমন জুতো ছিল, খেয়াল করতে পারিনি। একজনের টি-শার্ট ছিল লালচে বাদামি, আরেকজনেরটা ধূসর নীল রঙের। কোঁকড়ানো চুল উসুখুসু।'

দাঁত দেখা গেল ফুগুইয়ের। 'ইসাটাবুর দুই তৃতীয়াংশ পুরুষের বর্ণনা দিয়ে ফেললেন, মিস্টার রানা। ...ট্রাকটা কীরকম?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর রানা বলল, 'বড়সড়ই বলা যায়। ও-রকম ট্রাকে করে ভেড়া পরিবহন করতে দেখেছি আমি

এখানে। ইঞ্জিনের ওপর চালক আর তার সহকারীর বসার জায়গা বাদ দিয়ে বললে ছাদ নেই, কোনও হুডও নেই; লম্বা পাটাতনের দু'পাশে মজবুত স্টিলের পাল্লা—ছিটকিনির সাহায্যে খোলা ও লাগানো যায়। চলটা উঠে গেছে বডির জায়গায় জায়গায়, কোথাও আবার মরচে ধরেছে।'

'নম্বরপ্লেট?'

'দেখিনি।'

'আসল জিনিস বাদে অনেককিছুই খেয়াল করেছেন। কিন্তু তাতেও খুব একটা লাভ হবে বলে মনে হয় না। কারণ আমি নিশ্চিত, যদি খুঁজি তা হলে ও-রকম অন্তত পঞ্চাশটা ট্রাক পাব।' নিজের সাম্পানের মাঝিকে একটা লণ্ঠন জ্বালানোর আদেশ দিল ফুগুই। 'এই সন্ধ্যাবেলায় সাগরের নিচে কী করছিলেন আপনারা?'

'ডুব দিচ্ছিলাম। রেমি কথা দিয়েছে, ওকে বাঁচানোর বিনিময়ে আমাকে সী-ডাইভিং শেখাবে।'

আবারও দাঁত দেখা গেল ফুগুইয়ের, আবারও রেমিকে দেখার চেষ্টা করল। 'স্বীকার করলেন তা হলে—মিস তানাঘাই বিনিময়ে কিছু দিচ্ছেন আপনাকে?'

মন্তব্যটার প্রতিবাদে কড়া কথা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল রানা।

'ঠিক আছে, ডুব দিতে থাকুন তা হলে,' বলে চলল ফুগুই। 'মিস তানাঘাইয়ের সঙ্গে ডুবে ডুবে জল খেতে থাকলে আমার কোনও আপত্তি নেই, যারা গুলি চালিয়েছে আপনার জিপে তাদেরও আপত্তি থাকার কথা নয়। আশা করছি আর যে-ক'দিন আছেন ইসাটাবুতে, শান্তিতে থাকবেন এবং থাকতে দেবেন। ...আসি।'

ডিজেল ইঞ্জিন চালু করল ফুগুইয়ের মাঝি, নাক ঘুরিয়ে নিল সাম্পানের। ঘনায়মান রাতের আঁধারে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল নৌকাটা।

রানার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ওর মুখোমুখি দাঁড়াল

বইঘর.কম

রেমি। অভিযোগের সুরে বলল, ‘এত ঘটনা ঘটে গেছে, অথচ আমাকে সে-সবের কিছুই বলেননি আপনি।’

‘বলার সময় পেলাম কই?’ এয়ারসিলিণ্ডারের স্ট্র্যাপ খুলছে রানা। ‘চলো ফিরে যাই মেণ্ডানায়। রেস্টুরেন্টে ডিনার করব, তারপর কিছু কথা বলব তোমাকে।’

‘ডিনারের পর একটু হাসপাতালে যেতে চাইছিলাম আমি।’

‘কিন্তু...ওখান থেকে ফিরে আসার সময় বাস পাওয়া যাবে?’

‘গতকাল রাতে রেইন ট্রি থেকে ফেরার সময় পেয়েছিলেন কিন্তু।’

‘না, পাইনি...তোমাকে বলা হয়নি আসলে...গতরাতে আমাকে মেণ্ডানায় পৌঁছে দিয়ে গেছে ডক্টর নাম্বানা ভেলর। চেনো ওকে?’

চোখমুখ শক্ত হলো রেমির। ‘দেখা যাচ্ছে, আমার থেকে অনেক কথাই জেনে নিচ্ছেন আপনি, কিন্তু বিনিময়ে অনেক কথাই চেপে যাচ্ছেন আমার কাছে।’

‘ভুল বুঝছ আমাকে, রেমি। একটার পর একটা ঘটনা এত দ্রুত ঘটে যাচ্ছে যে, ঠিকমতো কথা বলার মতো সময়ও পাচ্ছি না। তা ছাড়া, এসব কথা কোন্ প্রসঙ্গে বলব তোমাকে, বল তো?’

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রেমি, তারপর বলল, ‘হাসপাতাল থেকে কীভাবে ফিরব সে-ব্যাপারে যদি শঙ্কা থাকে আপনার...ভাউযার একটা ভটভটি আছে, ইচ্ছা করলে ব্যবহার করতে পারেন ওটা।’

একটা কথা মনে পড়ে গেল রানার। ‘আমার একটা ল্যাপটপ আর ইন্টারনেট কানেকশনের জন্য পোর্টেবল মোডেম দরকার। কোথায় পাব বলতে পারো?’

‘আমার আছে, চাইলে কাজে লাগাতে পারেন।’

‘এত চেষ্টার পরও লোকটার ইনফেকশন ঠেকানো গেল না মনে

হয়,' ভেলরের চেহারায় বিষাদ, কণ্ঠে হতাশা।

অজ্ঞান ভাউযাকে একনজর দেখার সুযোগ পেয়েছে রানা-রেমি, মেয়েটা আবেগতাড়িত হয়ে পড়ছে টের পেয়ে ওদেরকে ভাউযার কেবিনে বেশিক্ষণ থাকতে দেয়া হয়নি, ওরা তিনজনে এখন বসে আছে ভেলরের প্রাইভেট রুমে।

মাথা নিচু করে রেখেছে রেমি, চুপ করে আছে, নিঃশব্দে কাঁদছে, চোখ মুছছে একটু পর পর।

'আজ বিকেলে হঠাৎ করেই অবস্থার অবনতি হলো লোকটার,' বলে চলল ভেলর। 'সারা গা কাঁপিয়ে জ্বর এল, মাথায় বার বার পানি ঢেলে আর শরীর বার বার স্পঞ্জ করেও এক শ' চারের নিচে নামানো যাচ্ছে না। আরও ঘণ্টাখানেক দেখি, তাপমাত্রা কমানো না গেলে সাপোযিটরি দিতে হবে শেষপর্যন্ত।'

'ওর পায়ের কী অবস্থা?'

'ওটাই বেশি দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে আমাকে। ক্ষতস্থানগুলোর আশপাশে অনেকগুলো হলুদ-সাদা ফুস্কুড়ি দেখা দিয়েছে, আমার ধারণা পুঁজ জমতে শুরু করেছে। জ্বর এক শ' দুই ছাড়ানোমাত্র জ্ঞান হারিয়েছে লোকটা, তারপর আর সংজ্ঞা ফিরে পায়নি, আমাদের হাতে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ থাকার পরও খাওয়ানো যাচ্ছে না ওকে। সমস্যাটা প্রতিরোধের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশনও পাওয়া যায়, কিন্তু আমাদের এখানে নেই, ওটা আনতে লোক পাঠিয়েছি ন্যাশনাল রেফারেল হাসপাতালে।' ইঙ্গিতে রেমিকে দেখাল ভেলর। 'রানা, ব্যয়বহুল হয়ে যাচ্ছে ভাউযার চিকিৎসা; শেষপর্যন্ত...'

'আমি আছি,' ভেলরকে আশ্বস্ত করল রানা। 'যদি ইনজেকশনেও কাজ না হয় তা হলে কি...' কথা শেষ না করে থেমে গেল।

'ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে? থাকলে প্রার্থনা করতে পারো হতভাগা লোকটার জন্য। এর বেশি কিছু বলার নেই আমার।'

যা বোঝার বুঝে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'খরচপাতি কি

আরও কিছু দিতে হবে এখন?'

'এখনই লাগবে না। আগামীকাল এসো, জানাব তখন।'

রেমিকে নিয়ে হাসপাতালের বাইরে চলে এল রানা, মোটরসাইকেলে উঠল। মেণ্ডানায় ফেরার সময় খেয়াল করল, কেঁদেই চলেছে ওর পেছনে-বসা মেয়েটা।

রেমিকে ওর বাসায় নামিয়ে দিয়ে, মেয়েটার ল্যাপটপ আর ইণ্টারনেট মোডেম নিয়ে হোটেলের পার্কিংলটে ঢুকেছে রানা, এমন সময় বেজে উঠল স্যাটেলাইট ফোন। স্ক্রিনের নামটা দেখে আশ্চর্য হলো ও। অ্যাডমিরাল হ্যামিল্টন। কলটা রিসিভ করল।

'স্যর?'

'কো-ইনসিডেন্স আর কাকে বলে, রানা!'

'পার্ডন, স্যর?'

'গতকাল জানতে চাইছিলে, নুমা নিউযিল্যাণ্ডে কেন। আসলে অনেকদিন ধরেই কাজ করছে আমাদের একটা উইং তাসমান সাগরে—নজর রাখছে নিউযিল্যাণ্ডের ওপর। সলোমন দ্বীপপুঞ্জের সরকার সাহায্য চেয়েছিল ইণ্টারপোলের কাছে: কারা যেন জালনোটের ব্যবসা চালু করেছে ওখানে। ইণ্টারপোল তেমন একটা গা করেনি, এফবিআইয়ের সাহায্য চাইতে বলে ওরা।'

'নিশ্চয়ই এফবিআইও এড়িয়ে গেছে ব্যাপারটা?'

'হ্যাঁ। তখন যেহেতু সাগর নিয়ে কারবার আমাদের, কেসটা চলে আসে নুমা'র কাছে। আমরা জানতে পেরেছি, একটা আন্তর্জাতিক অপরাধচক্র জড়িত আছে এবং সে-চক্রের মাস্টারমাইণ্ড ছদ্মপরিচয়ে লুকিয়ে আছে নিউযিল্যাণ্ডের গিযবর্নে।'

'পরিচয়টা কী?'

'খনিজসম্পদ উত্তোলন ও বিপণনে নিয়োজিত একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এন.যেড. মাইনিং অ্যাণ্ড পেট্রোলিয়ামের চেয়ারম্যান।'

'কী নাম লোকটার?'

'অ্যালবার্ট পামার। ওকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছে এনসিসি—নিউযিল্যাণ্ড ক্রাইম কমিশন, একই অপরাধে ওরাও অনেকদিন থেকে খুঁজছে পামারকে। এনসিসি'র সঙ্গে অফিশিয়াল আলোচনা করেছি আমরা, কেসটার মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত ওদেরকে টেকনিকাল সাপোর্ট দিয়ে যাওয়ার কথা বলেছি।'

'কীভাবে?'

'মনিকা নামের আমাদেরই এক এজেন্টকে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে লোকটার পিএসের চাকরিতে, মেয়েটাকে বলা হয়েছে সে যেন সম্ভাব্য সবরকমভাবে মনোরঞ্জন করে পামারের, লোকটার যত কাছে যাওয়া সম্ভব যায়, শয়তানটার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইনফর্মেশন জোগাড় করে। এবং এতদিনে একটা ব্রেক পেয়েছি বলে মনে হচ্ছে আমাদের কাছে।'

'ব্রেক, স্যর?'

'একটা ফোন নম্বর। মনিকার ধারণা, নম্বরটা থেকে নিয়মিত ফোন করা হয় পামারকে। নম্বরটা ইসাটাবুর। এজন্যই শুরুতে বলেছি, কো-ইনসিডেন্স।'

'আমার কাছেও কাকতালীয় মনে হচ্ছে সবকিছু।'

'রাহাত খানের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। ওদিকে আগামীকাল সকালে তোমার কাছে রিপোর্ট করছে পোসেইডনের ক্যাপ্টেন। আমি কী বলতে চাইছি, বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই?'

দুইয়ে দুইয়ে চার মেলানো হয়ে গেছে রানার। বলল, 'বুড়ো খোকা নিশ্চয়ই বলেছেন, আমি হাজার বললেও একদিনও ছুটি বাড়াতেন না আমার, কিন্তু আপনি অনুরোধ করায় ব্যাপারটা বিবেচনা করতে রাজি আছেন? আর আপনার কথা হচ্ছে, ভাউযা কী আবিষ্কার করেছে, পোসেইডনের সহায়তায় তা রি-ডিসকভার করার পাশাপাশি জালনোটের ব্যাপারটাও যাতে দেখি। মানে, এখানে পামারের এজেন্ট কে, তা যেন জানার চেষ্টা করি।'

'ঠিক তা-ই। তোমার সাহায্য চাইছি আমি, রানা।'

'পাবেন। ...টেলিফোন নম্বরটা বলুন তো।'

নম্বরটা বললেন অ্যাডমিরাল।

'মনে থাকবে আমার। ...আচ্ছা, স্যর, পামার আর ওর জালিয়াত চক্রের ব্যাপারে কিছু জানিয়েছেন এখানকার পুলিশ কমিশনারকে?'

'না। কারণ ওখানকার পুলিশের বড় একটা অংশ দুর্নীতির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। ঠিক কাকে বিশ্বাস করা উচিত, বুঝতে পারছি না আমরা এখনও। তাই এমন কাউকে দরকার, যে রয়্যাল পুলিশ ফোর্সের না, অথচ আমাদের হয়ে তথ্য জোগাড় করে দিতে পারবে।'

'আপনাদের পক্ষ থেকে কি কল দেয়া হয়েছে নম্বরটাতে?'

'না, হয়নি। আমরা জানি না ওটা গোপন কোনও নম্বর কি না। জানি না, জালিয়াতরা নম্বরটা শুধু ফোন দেয়ার কাজে ব্যবহার করে কি না। হঠাৎ যদি ফোন যায় ওই নম্বরে, এবং ওরা যদি আঁচ করতে পারে সন্দেহ করা হচ্ছে ওদের, ডুব দেবে জলের গভীরে। অন্তত পামার যে করবে কাজটা, সে-ব্যাপারে সন্দেহ নেই। অনেক চেষ্টার পর নাগালে পেয়েছি লোকটাকে, চাইছি না কোনও ভুলের কারণে আমাদের হাত ফস্কে বেরিয়ে যাক।'

'ঠিক আছে, চেষ্টা করব আমি। ...স্যর, পামারের কোনও ছবি পাঠাতে পারবেন আমার কাছে?'

'পারব। তোমার ই-মেইল চেক কোরো। এখন তা হলে রাখি,' লাইন কেটে দিলেন হ্যামিল্টন।

বাইকটা জায়গামতো পার্ক করে রুমে চলে এল রানা। ল্যাপটপের ব্যাগ নামিয়ে রাখল বিছানার ওপর, মোডেমটাও রাখল। ড্রেসিংটেবিলের সামনে থেকে ছোট্ট টুলটা নিয়ে গেল সিলিংফ্যানের নিচে। টুলে উঠে দাঁড়াল, মোটা মোটা চার ব্লেডের ফ্যানটার একটা ব্লেডের ওপর থেকে নামিয়ে নিল বেরেটা টমক্যাটটাকে। ফুগুই অনুমানই করতে পারেনি কোথায় থাকতে পারে পিস্তলটা। সারা ঘর তছনছ করেছে, অথচ সারাটা সময় ওর মাথার ওপরেই ছিল জিনিসটা। ওটা আগের জায়গায় রেখে দিয়ে

সরে এল রানা, রেলিং ঘেঁষে দাঁড়াল। বিক্ষিপ্ত চিন্তাভাবনা পেয়ে বসল ওকে।

সন্দেহ নেই, সলোমন সাগরের নিচে যা দেখেছে আজ বিকেলে তা বড় কোনও কিছুর ধ্বংসাবশেষ। কী সেটা? কোনও ভবন? ব্লক কন্সট্রাকশনগুলো কীসের ইঙ্গিত বহন করছে? কোনও প্রাসাদ? প্রশ্ন হচ্ছে, যা দেখেছে ও, ভাউযাও কি ততটুকুই দেখেছে? নাকি ভেতরে ঢুকে আরও কিছু দেখেছে সে? নইলে পাঠবিমুখ হওয়ার পরও লাইব্রেরিতে যাবে কেন? আর গুণ্ডার দলই বা কেন লাগতে যাবে ওর পেছনে?

অ্যাডমিরালের দেয়া ফোন নম্বরটা কার?

টের পাচ্ছে, ধ্বংসাবশেষটা চুম্বকের মতো টানছে ওকে। মদের নেশা যেভাবে পেয়ে বসে মদখোরদের, অ্যাডভেঞ্চারের নেশাও যেন সেভাবে পেয়ে বসেছে ওকে।

ফিরে আসতে যাবে রুমে, এমন সময় একটা ব্যাপার লক্ষ করে আপনাআপনি শক্ত হয়ে গেল ওর শরীর। মেগুনার পার্কিংলট থেকে বেশ কিছুটা দূরে, জঙ্গলের যে-বাঁক ঘুরে কাঁচা রাস্তাটা এগিয়ে এসেছে হোটেলের দিকে, সেটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটা সেডান।

তিন তলার বারান্দা থেকে গাড়িটা দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না রানার, এমনকী এত রাতেও না। রেলিং-এ পেট ঠেকিয়ে ঝুঁকে পড়ল কিছুটা, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে গাড়িটার দিকে। যে বা যারা বসে আছে ওটার ভেতরে, তারা বুঝে গেল রানা দেখে ফেলেছে ওদের; হেডলাইট না জ্বালিয়েই স্টার্ট দেয়া হলো ইঞ্জিন। ব্যাকগিয়ারে বেশ কিছুদূর পিছিয়ে গেল গাড়িটা, আড়াল হলো রানার দৃষ্টির, তারপর উধাও হয়ে গেল একসময়।

রুমে ফিরে এসে বিছানায় বসে পড়ল রানা। সন্দেহ নেই, ওর হোটেলরুমের ওপরই নজর রাখছিল গাড়িটা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ল্যাপটপ্ আর মোডেমটা নিজের দিকে টেনে নিল ও। মগজে টুকে রাখা পয়েন্টগুলো খোঁচাচ্ছে।

বইঘর.কম

বারো

পরদিন সকালে প্রথমেই সেন্ট্রালে ফোন করল রানা।

ওকে বলা হলো, আগের মতোই আছে ভাউযার শারীরিক অবস্থা...না, ডক্টর ভেলরকে দেয়া যাচ্ছে না এ-মুহূর্তে—রুটিন ভিযিটে গেছেন তিনি ওয়ার্ডগুলোতে, ফিরতে সময় লাগবে...না, তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর মোবাইল নম্বর কাউকে দেয়া যাবে না।

নাস্তা খেয়ে জেলেপাড়ায় চলে এল রানা, রেমির সঙ্গে দেখা করে ওকে জানাল যোগাযোগ করা যায়নি ভেলরের সঙ্গে, তারপর মেয়েটাকে নিয়ে চলে এল পয়েন্ট ক্রুযে। বন্দরে পৌঁছেছে মাত্র, এমন সময় ওর স্যাটেলাইট ফোনে কল দিল পোসেইডনের ক্যাপ্টেন রাল্‌ফ্‌ কটন, জানাল পৌঁছাতে আর বেশি সময় বাকি নেই ওদের।

শত শত সামুদ্রিক পাখির চিৎকারে মুখরিত হয়ে আছে বন্দরের সকাল। বাতাসে কেমন একটা নোনতা গন্ধ। কংক্রিটের ডকইয়ার্ডে মৃদু স্রোতের সঙ্গে তাল রেখে আন্দোলিত হচ্ছে হরেক রকমের কার্গো জাহাজ, মাল ওঠানো-নামানোর কাজ শুরু হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। কিছু ছোট লাইটারও দেখা যাচ্ছে; ওগুলো মাল নিয়ে খুব সম্ভবত মোহনা দিয়ে ঢুকে পড়বে দ্বীপের গভীরে। বহু পুরনো জলযানগুলো থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় তেল চুইয়ে পড়ে মিশে যাচ্ছে সাগরের পানিতে, অদ্ভুত এক নীলচে সবুজ ফেনায় ভরে আছে ডকইয়ার্ডের কাছটা। মেরিন লাইফের বারোটা বাজাচ্ছে লাইটারগুলো, কিন্তু সেটা দেখার কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না।

স্যাটেলাইট ফোনটা বেজে উঠল এমন সময়।

রানা এজেন্সির এজেন্ট, যার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল রানা। কল রিসিভ করল ও। 'কী খবর?'

'আপনার নামে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের মাধ্যমে টাকা পাঠানো হয়েছে।'

'ঠিক আছে, সময়-সুযোগমতো কালেক্ট করে নেব।' লাইন কেটে দিয়ে রেমির দিকে তাকাল রানা। 'ইসাটাবুর ব্যাপারে নেট ঘাঁটলাম কাল রাতে। বেশিরভাগ তথ্যই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, খনিজ সম্পদ, অথবা ট্যুরিযম সম্পর্কিত। প্রাচীন অভিশাপ আর সলোমন সাগরের নিচে থাকা ধ্বংসাবশেষের ব্যাপারেও একটা লোককাহিনি জানতে পারলাম।'

কৌতূহল দেখা দিল রেমির চেহারায়।

'স্যাম বারাক নামে নিউযিল্যাণ্ডের এক প্রফেসর একটানা অনেক বছর ছিলেন এখানে,' বলছে রানা, 'বেশ কয়েকজন আদিবাসীর সাক্ষাৎকারের ওপর ভিত্তি করে কয়েকটা প্রবন্ধ লেখেন তিনি, যেগুলো পরে প্রকাশ করেন একটা অনলাইন জার্নালের বিভিন্ন সংখ্যায়। তাঁর কয়েকটা প্রবন্ধ থেকে জানতে পেরেছি লোককাহিনিটা। গল্পটা কয়েক শ' বছর আগের। তখনও সাদা চামড়ার মানুষদের পা পড়েনি ইসাটাবুতে। শামান নামের এক রাজা ছিলেন এখানে, জাদুবিদ্যায় যাঁর ক্ষমতা ছিল অসাধারণ।'

'কী ক্ষমতা?'

'তিনি নাকি সাগর, আকাশ, আগুন আর মাটির দেবতাদের আদেশ দিয়ে ইচ্ছামতো কাজ করিয়ে নিতে পারতেন। তাঁর সেই ক্ষমতার ফলে প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় অনেক সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে ইসাটাবু। একই কারণে সবাই ভয় পেত তাঁকে; আবার তাঁর মহত্ত্ব, উদারতা আর প্রজ্ঞার কারণে ভালোও বাসত,' দম নেয়ার জন্য থামল রানা।

রেমি কিছু বলল না।

বইঘর.কম

'যে সময়ের কথা বলছি,' বলে চলল রানা, 'তখন শামান রাজত্বের স্বর্ণযুগ। একদিন তিনি ঘোষণা করলেন, এমন কিছু একটা নির্মাণ করাবেন, যা কেউ কখনও দেখেনি, যা তাঁর নাম লিখে রাখবে ইতিহাসের পাতায়। জোগাড় করা হলো শত শত সেবাদাস, বছরের পর বছর ধরে শ্রম দিতে থাকল তারা, যে-রেইন ফরেস্টকে ভয় পায় আদিবাসীরা সেখানকারই পাহাড়-পর্বত থেকে সংগ্রহ করা হলো লাইমস্টোনের বড় বড় ব্লক, সেগুলো নিয়ে যাওয়া হলো দ্বীপের একদিকের সৈকতে। নির্মাণ করা হলো একটা রাজপ্রাসাদ এবং মন্দির। ওটা বানানোর কাজ যখন শেষেরদিকে, তখন রাজা বিয়ে করলেন অনিন্দ্যসুন্দরী এক মহিলাকে—তিনি নাকি মালাইটার এক সর্দারের মেয়ে, পুরো সলোমন দ্বীপপুঞ্জের সেরা সুন্দরী। তাঁর রূপের বর্ণনায় বলা হয়েছে, তাঁর দিকে তাকানো আর ভরদুপুরের সূর্যের দিকে তাকানো সমান কথা।'

'গাঁজা। তারপর?'

'নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পরের দিনটার কথা। দাওয়াত পৌঁছে গেছে প্রতিবেশী সবগুলো দ্বীপের পুরোহিত ও সর্দারদের কাছে, সপ্তাহব্যাপী উৎসবে যোগ দিতে তাঁরা সবাই জড়ো হয়েছেন ইসাটাবুতে। রাজপ্রাসাদে গোপন চেম্বার বানিয়ে নিয়েছেন শামান, সেখানে রেখেছেন তাঁর সব সম্পদ; তাঁকে খুশি করতে প্রতিদিনই দেয়া হচ্ছে সোনা আর রত্নপাথরের মতো মূল্যবান উপঢৌকন, সেগুলোও রাখা হচ্ছে সেখানে। দ্বীপের উন্নতি আর নিজের সমৃদ্ধিতে শামান গর্বিত, কিন্তু তথাকথিত দেবতারা রুষ্ট। ফলে যেদিন উৎসব শুরু হওয়ার কথা, সেদিন ঘটল ভয়াবহ এক ভূমিকম্প; নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল শামানের সব কীর্তি, প্রচণ্ড সুনামিতে ডুবে গেল প্রাসাদ, মন্দির—সব।'

বিড়বিড় করে কী যেন বলল রেমি, ঠিক বোঝা গেল না।

'আমন্ত্রিত সর্দারদের অনেকেই মারা গেলেন, মারা পড়ল অনেক দ্বীপবাসীও। যারা বেঁচে গেল তারা বুঝতে পারল সমাপ্তি

ঘটেছে শামান রাজত্বের, আবার নতুন করে শুরু করতে হবে ওদেরকে, খনিজসম্পদ আহরণ বাদ দিয়ে ধীবরবৃত্তিকে বেছে নিতে হবে পেশা হিসেবে, নইলে আবার ক্রুদ্ধ হবেন দেবতারা। তাঁদের অভিশাপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন শামান, তাই যে-পথে হেঁটেছেন তিনি সে-পথে যাওয়া তো পরের কথা, তাঁর নামটাও যদি উচ্চারণ করে কেউ তা হলে অভিশাপ নামবে তার ওপরও। ভুলে যেতে হবে তাঁকে, ভুলে যেতে হবে যা তিনি বানিয়েছিলেন সেটা, এবং ভুলেও যাওয়া যাবে না যে-সৈকতে প্রাসাদটা ছিল তার কাছেপিঠে। ঘটনাটার পর থেকে দ্বীপসংলগ্ন সাগর অভিশপ্ত হয়ে আছে ইসাটাবুর বাসিন্দাদের জন্যে।'

'মানুষের কৌতূহল আর লোভের কাছে সংস্কার-কুসংস্কার হার মেনেছে সবসময়,' মুখ খুলল রেমি, 'তা হলে শামানের সেই গুপ্তধনের পেছনে লাগল না কেন কেউ?'

'দ্বীপবাসীরা যদি আসলেই ভুলে গিয়ে থাকে শামানকে, তা হলে ধরে নেয়া যায় তাঁর গুপ্তধন নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি আর। তা ছাড়া এখন যে-প্রযুক্তি আছে ডুবুরিদের কাছে, আগে সেটার কিছুই ছিল না। আরও বড় কথা হচ্ছে, প্রত্যেকটা লোককাহিনিতে আসলের চেয়ে বানোয়াট গল্প থাকে বেশি; শামানের ইতিহাস কতটা অতিরঞ্জিত সে-ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। ...প্রফেসর বারাক কিন্তু তাঁর প্রবন্ধে অভিশাপের ব্যাপারটার ওপর জোর দিয়েছেন বেশ কয়েকবার।'

'সেজন্যই কি ভাউযার আবিষ্কারের কথাটা জানাজানি হওয়ার পরও জেলেদের কেউ ডুব দিচ্ছে না সলোমন সাগরে?'

'হতে পারে। অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন জেলেরা হয়তো সাধ করে নিজেদের ঘাড়ে নিতে চাইছে না কয়েক শ' বছরের প্রাচীন অভিশাপ।'

স্যাটেলাইট ফোনটা বেজে উঠল আবার।

'মিস্টার রানা, আমরা পৌঁছে গেছি,' রানা কলটা রিসিভ করতেই বলল ক্যাপ্টেন কটন।

বইঘর.কম

চোখ তুলে তাকাল রানা সাগরের দিকে।

ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে অগযিলারি ভেসেল পোসেইডন। সারা বডিতে উজ্জ্বল লাল রঙ করা, বোও-এর কাছে হলুদ রঙে আঁকা হয়েছে একটা হাঙরের দাঁতওয়ালা মুখ। পাইলটহাউসে ‘আবছামতো দেখা যাচ্ছে একজনকে, আরও দু’জন লোক দাঁড়িয়ে আছে ডেকে, রেলিং ঘেঁষে। ওদের উদ্দেশে হাত নাড়ল রানা।

পোসেইডনের মতো কোনওকিছু কখনও দেখেনি সম্ভবত রেমি, তাই চাপা গলায় বলল, ‘সাংঘাতিক! আপনি ডাকলেন, ব্যস, চলে এল?’

বন্দর থেকে দূরে নোঙর করা নৌযানে যাওয়ার জন্য পয়েন্ট ক্রুযে ছোট নৌকা পাওয়া যায়, ও-রকম একটা ভাড়া নিয়ে রানা আর রেমি রওয়ানা হলো পোসেইডনের উদ্দেশে। ভেসেলটার কাছাকাছি গেছে, এমন সময় একদিকের রেলিং সরিয়ে একটা ধাতব মই নামিয়ে দেয়া হলো। ওটা বেয়ে ওপরে উঠে গেল রানা ও রেমি।

ইতোমধ্যে বন্ধ করা হয়েছে পোসেইডনের ইঞ্জিন, পাইলটহাউস থেকে বেরিয়ে এসেছে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সী হাস্যোজ্জ্বল ক্যাপ্টেন রাল্ফ্ কটন। রানার দিকে হেঁটে এল লোকটা, হ্যাণ্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, দৃষ্টিতে সম্ভ্রম। ‘গুড ডে, মিস্টার রানা। আপনার কথা অনেক শুনেছি।’

‘সেগুলোর সবই আশা করি ভালো?’ হাত মেলানোর সময় হাসল রানা।

সাড়ে ছ’ফুটের মতো লম্বা আর বলিষ্ঠদেহী দুই ডুবুরিও ঘিরে ধরেছে রানাকে, হাত মেলাচ্ছে। একজনের নাম ফক্স হেক্টর, আমেরিকান। আর অপরজন মেক্সিকান-আমেরিকান, পাওলো রিকার্ডো। নোঙর নামিয়ে দিয়ে দেখা করতে এল কটনের সহযোগী টনি প্রিটোও।

ওদের সঙ্গে রেমির পরিচয় করিয়ে দিল রানা। তারপর ছোট করে বলল ভাউযার ঘটনাটা। শেষে যোগ করল, ‘আমাদের হাতে

সময় কম। কাজেই আপনাদের কোনও অসুবিধা না থাকলে দেরি করতে চাইছি না আমি।'

মাথা ঝাঁকাল কটন। 'আমাদের অসুবিধা নেই। অ্যাডমিরাল হ্যামিল্টনের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে, তাড়া আছে আপনার। তাই টুরাঙ্গা থেকে রওনা দেয়ার সময়ই শুকনো খাবার বেশি করে নিয়েছি ভেসেলে, পালা করে বিশ্রাম নিয়েছি যাতে আপনি বলামাত্র কাজে নামতে পারি। ...চলুন তা হলে, প্রথমেই পরিচয় করিয়ে দিই পোসেইডনের সঙ্গে। আর, তার আগে একটা কথা, আমাদের তুমি করে বললে খুশি হব।'

'তা হলে আমাকেও তুমি করে বলবে তোমরা। রাজি?'

সরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল টনি, হেক্টর আর রিকার্ডো, রানার কথা শুনে চওড়া হাসি হেসে আবার হ্যাণ্ডশেক করল। এই লোক তা হলে হুকুম দেবে না, বন্ধুর মত অনুরোধ করবে!

'তবে,' বলল টনি, 'তোমার নামের আগে মিস্টার বলব। ঠিক আছে?'

রানা আর রেমিকে নিয়ে চলল কটন জাহাজ দেখাতে।

সাগরে সাগরে ঘুরে বেড়াতে হয় বলে পোসেইডন বেশ মজবুতভাবে বানানো। বোও-টা সাগরের পানি থেকে যথেষ্ট ওপরে। এখন জোয়ারের সময়, বড়সড় ঢেউ উঠছে সাগরে, তারপরও স্টীলের হাল যেন অনড়। পাইলটহাউসের ছাতে অ্যান্টেনা দেখা যাচ্ছে কয়েকটা।

'সাগরই আমাদের ঘর,' বলল কটন, 'সাগরই আমাদের বাড়ি। নিজেদের প্রজেক্ট তো আছেই, কখনও কোনও কোনও দেশের আবেদনে সাড়া দিয়ে ওদের প্রাণিবিজ্ঞানীদের নিয়েও বেরোতে হয় রিসার্চের কাজে। তাই তিনটে ছোটখাট গেস্ট কেবিন আছে পোসেইডনে, প্রয়োজন মনে করলে ব্যবহার করতে পার তোমরা।'

ওগুলোর দিকে এগিয়ে গেল রেমি, দরজা খুলে উঁকি দিয়ে দেখল সবগুলো। তেমন আহামরি কিছু না, বরং সাধারণ মানেরই

বলা চলে। প্রতিটা কেবিনে দেখা যাচ্ছে ফোল্ড-করে-রাখা দুটো করে বাঙ্ক বেড, স্টিলের সাপোর্টিং বিমগুলো মেঝে থেকে উঠে গেছে ছাদের দিকে।

'ইক্যুইপমেন্ট রুমটা এখানে,' ডাক দিল কটন, 'এই প্যাসেজ ধরে ভেসেলের পেছনদিকে যেতে হবে।'

ব্রিজের দিকে এগিয়ে গেল রানা আর রেমি। পাইলটহাউসটাকে পাশ কাটানোর সময় খেয়াল করল, চওড়া একটা কনসোলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে রিকার্ডো, মনোযোগ দিয়ে দেখছে জিপিএস আর চার্ট প্লটার।

'আসতে কোনও সমস্যা হয়েছে?' কটনের কাছে জানতে চাইল রানা।

'তেমন একটা না। ক্ষণস্থায়ী একটা ঝড় মোকাবেলা করতে হয়েছে, একেকটা ঢেউ তখন বিশ-ত্রিশ ফুট উঁচু হয়ে গিয়েছিল। ওই সময়ের তুলনায় এখনকার সলোমনকে পুকুর বলা যায়।'

'অ্যাডমিরাল হ্যামিল্টন বলেছেন পোসেইডন ওয়েল ইক্যুইপ্‌ড।'

মাথা ঝাঁকাল কটন। 'কম্প্রেসর আছে আমাদের, আছে রিব্রিদার্স। কম্প্লিট ওয়েট অ্যাণ্ড ড্রাই স্যুট আছে কয়েক জোড়া। সাবমার্সিবল, রোবটিক ক্যামেরা, সব আছে। ...পোসেইডনকে আনুমানিক কত দিন লাগতে পারে তোমাদের?'

'বলা মুশকিল। আমাদের কাজের অগ্রগতির ওপর নির্ভর করছে সেটা। ...কেন?'

নিঃশব্দে হাসল কটন। 'ফল আর শাক-সব্জির টাটকা মজুদ রাখতে হয় ভেসেলে। ওয়াটারমেকার আছে আমাদের, আছে মাছ ধরার উন্নত সরঞ্জাম। বেশিদিন থাকতে হলে আর সবকিছুর স্টক বাড়িয়ে নিতে হবে আমাদেরকে।'

ব্রিজের দু'পাশের অন্যান্য স্পেশালাইয্‌ড ইক্যুইপমেন্টগুলো দেখাল কটন। ইলেক্ট্রনিক্সগুলো কাটিং-এজ টেকনোলজির। আর্কিয়োলজির ওপর কিছু রেফারেন্স বইও পাওয়া গেল,

স্যাটেলাইট ইন্টারনেট ও কমিউনিকেশন ব্যবস্থা আছে। সব মিলিয়ে পোসেইডনকে একটা ভাসমান ল্যাবরেটরি বলা যেতে পারে।

খুশি হলো রানা। কটনের দিকে তাকাল ও। 'তোমার রিসার্চ ভেসেলের প্রশংসা না করে পারছি না।'

হাসল কটন। 'যত গুড় তত মিষ্টি। মাদার শিপ ডারউইন, এটার চেয়ে অনেক বেশি উন্নত।'

অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশের হিসেবটা কটনকে জানাল রানা, জায়গামতো পোসেইডনকে নিয়ে গেল কটন। ধ্বংসাবশেষটা কোথায় আছে অনুমান করে নিয়ে একটা কল্পিত বৃত্তের পরিধি ধরে চক্কর দিল একবার। কনসোলের মনিটরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হেক্টর আর রিকার্ডো, নিজেদের অবস্থান আর ধ্বংসাবশেষের ডিটেইলস বুঝে নিচ্ছে। চক্কর দেয়া শেষ হলে ইঞ্জিন বন্ধ করল কটন, নোঙর ফেলতে বলল টনিকে। কাজটা করতে টনিকে গাইড করল হেক্টর আর রিকার্ডো—ওরা চাচ্ছে নোঙরটা যাতে বেশি দূরে না থাকে, আবার কাজ শেষে চলে যাওয়ার সময় যখন টানা হবে ওটা তখন যেন কোনও ক্ষতি না হয় ধ্বংসাবশেষের।

নোঙর ফেলা হলে ওদের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল টনি, ওর দিকে তাকিয়ে ডান হাতের বুড়ো আঙুল তুলল দু'জনই, ইনিশিয়াল এক্সপ্লোরেশনের জন্য ইতোমধ্যেই পরতে শুরু করে দিয়েছে ডাইভিংস্যুট।

ওরা দু'জনে পানিতে নামামাত্র ওদের প্রোগ্রেস দেখার জন্য রেমিকে নিয়ে কনসোলের মনিটরের কাছে চলে এল রানা। ডাইভিং ল্যাডারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে টনি—হেক্টর বা রিকার্ডোর কোনও সাহায্য লাগলে ব্যবস্থা করবে, হুইলের কাছ থেকে সরে এসে রানার গা ঘেঁষে দাঁড়াল কটন।

হেক্টর আর রিকার্ডোর হেলমেট-মাউন্টেড ক্যামেরা রিয়েল টাইম রঙিন ইমেজ পাঠাচ্ছে, ওগুলো সেইভ্‌ড হয়ে যাচ্ছে

বইঘর.কম

হার্ডডিস্কে—পরে দরকার হলে ভালোমতো দেখা হবে। রানা আর রেমি ডুব দিয়েছিল শেষবিকেলে, তখন পর্যাপ্ত আলো ছিল না, আর সময়টা ভাটার হওয়ায় সাগরজলে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আবর্জনার পরিমাণ ছিল বেশি; তাই ভিযিবিলিটি ছিল কম। এখনকার অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। এখন আলো অনেক বেশি, জোয়ারের কারণে সাগরজল তুলনামূলকভাবে অনেক স্বচ্ছ। তাই ধ্বংসাবশেষটার অবয়ব দেখা যেতে বেশি সময় লাগল না—ভুতুড়ে একটা শহর বলে মনে হচ্ছে ওটাকে, কম্পমান আলোয় থেকে থেকে দুলে উঠছে যেন।

একদৃষ্টিতে মনিটরের দিকে তাকিয়ে ছিল কটন, বলে উঠল, 'ধ্বংসাবশেষ তো কয়েকটা দেখা যাচ্ছে। সবচেয়ে বড়টা আছে মাঝখানে। ওটাকে ঘিরে ছড়িয়েছিটিয়ে আছে আরও কয়েকটা।'

'মিলছে,' মন্তব্য করল রানা।

ওর দিকে তাকাল কটন, দৃষ্টিতে প্রশ্ন।

রাজা শামানের ব্যাপারে যা জানতে পেরেছে, বলল রানা কটনকে। তারপর বলল, 'মাঝখানেরটা মনে হয় প্রাসাদ। বাকিগুলো আউটবিল্ডিং। ওগুলোর মধ্যে মন্দির থাকতে পারে, রাজদরবার থাকতে পারে, এমনকী অমাত্যদের বাড়িও থাকতে পারে।'

মনিটরের ওপর ঝুঁকে পড়ল কটন। 'স্ট্রাক্চারের সংখ্যা মোট কত হবে? ত্রিশ?'

'কমপক্ষে। বেশিও হতে পারে।'

সোজা হলো কটন। 'আমার কাছে কী আশ্চর্য লাগছে, জান? এত বছর ধরে এখানে পড়ে আছে ওটা, কেউ কিছু জানল না? এমনকী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও না?'

'জাপানি বাহিনী দখল করে নিয়েছিল এই দ্বীপ, আর আমেরিকানরা ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইছিল। দ্বীপের কাছেই পানির নিচে কী আছে না-আছে, খুঁজে দেখার মতো সময় ছিল ওদের? তা ছাড়া তখন প্রযুক্তিও এত উন্নত ছিল না যে,

পানির নিচের কোনও আর্কিয়োলজিকাল স্ট্রাক্‌চারের অবস্থান বুঝতে পারা যাবে চট্‌ করে।'

'কীভাবে কী করতে চাও তোমরা, সে-সম্বন্ধে কোনও আইডিয়া আছে?' জিজ্ঞেস করল কটন।

'আছে,' বলল রানা, তারপর ব্যাখ্যা করল ওর পরিকল্পনা।

সব শুনে কটন বলল, 'মিস্টার রানা, আর্কিয়োলজির ছাত্র নও তুমি, তারপরও চিন্তা কর একজন ফার্স্টরেইট আর্কিয়োলজিস্টের মতো। ...ঠিক আছে, যেভাবে চাইবে, সব সেভাবেই হবে।'

এমন সময় ডাইভিংল্যাডারের কাছ থেকে উঁচু গলায় জানান দিল টনি, দুটো হাঙর দেখা যাচ্ছে।

পাইলটহাউস থেকে তাড়াহুড়ো করে বের হলো ওরা তিনজনে, গিয়ে দাঁড়াল টনির পাশে। অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে দুটো পৃষ্ঠপাখনা, ধীর গতিতে চক্কর দিচ্ছে হাঙর দুটো।

'হাঙররা সাধারণত ডুবুরিদের এড়িয়ে চলে,' বলল কটন। 'রেগুলেটর থেকে বের হওয়া বুদ্‌বুদের আওয়াজ ঠিক সহ্য করতে পারে না ওরা, দশবারের মধ্যে ন'বারই যত দ্রুত পারে চলে যায় অন্যদিকে।'

'কিন্তু দশমবার কী হয়?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

'দশমবার?' দাঁত দেখা গেল কটনের। 'তখনই স্নায়ুর পরীক্ষা দিতে হয় একজন ডাইভারকে। দেখা গেছে, একদল ডুবুরি যখনই একসঙ্গে নেমেছে সাগরজলে, কারও না কারও প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে কোনও না কোনও হাঙর। তখন নিজের বুদ্ধি আর স্পিয়ারগান ছাড়া আসলে আর কিছু থাকে না ডুবুরির।'

'স্পিয়ারগানে কাজ হয়?' আবারও জিজ্ঞেস করল রেমি।

'কখনও কখনও হয়, কখনও আবার হয় না। একটু ব্যাখ্যা করে বলি। জিয়োগ্রাফিক চ্যানেলে প্রচার-করা একটা ডকুমেণ্টারি দেখেছিলাম একবার। দশ-বারোটা সিংহ মিলে একটা মহিষ মেরেছে, খাচ্ছে। কিছুটা দূরে চাপাতি, ভোজালি আর বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন আফ্রিকান আদিবাসী, সঙ্গে ন্যাশনাল

বইঘর.কম

জিয়োগ্রাফি'র ক্যামেরা টীম। হঠাৎ সিংহের পালের উদ্দেশে হাঁটা ধরল তিন আদিবাসী। আচমকা মানুষ আসতে দেখে খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল সিংহদের, ব্যাপার কী বুঝতে চাইল ওরা, বেশিরভাগই দৌড়ে সরে গেল দূরে। ভয়ডর বলে কিছু নেই যেন ওই তিনজনের, ওরা সোজা গিয়ে হাজির হলো মৃত মহিষটার কাছে। দক্ষ হাতে ভোজালি দিয়ে কেটে আর চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে আলগা করে নিল জন্তুটার পেছনের একটা রান। দু'জনে কাঁধে তুলে নিল ওটা, তৃতীয়জন নজর রাখল সিংহের পালের ওপর, তারপর সবাই চলে এল নিরাপদ দূরত্বে। ...হাঙরের ব্যাপারটাও অনেকটা এ-রকম। ওরা যদি হঠাৎ মানুষের দেখা পায়, ঘাবড়ে যাবে। কিন্তু যদি মানুষের ওপর হামলা করার নিয়তে হাজির হয়, তা হলে খবর আছে।'

'চিন্তা কোরো না, রেমি,' বলল রানা, 'আমাদের রিব্রিদার অ্যাপারেটাস থাকায় ওদের আকর্ষণের জন্যে একটা বুদ্‌বুদও উঠছে না; আর এখনকার স্পিয়ারগানগুলোও আধুনিক হয়েছে। তীরের মতো যেটা বের হয় গান থেকে, সেটার মাথায় কায়দা করে লাগানো থাকে এক্সপ্লোসিভ গ্যাস। সুতরাং তীরটা যদি ঠিকমতো ছোঁড়া যায়, এবং গ্যাস যদি ঠিকমতো কাজ করতে পারে, বিস্ফোরণের কারণে হাঙরের মতো বিশাল প্রাণীও মুহূর্তে কাবু হয়ে যাবে।'

সাইরেনের আওয়াজ পাওয়া গেল এমন সময়, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ওরা।

পোঁ পোঁ আওয়াজ করতে করতে ছুটে আসছে একটা স্পিডবোট। যদিও এখনও দূরে আছে, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, পোসেইডনই ওটার লক্ষ্য। ছোট্ট একটা কেবিনের মতো দেখা যাচ্ছে বোটের উপরিভাগে, বোঝা গেল কায়দা করে বানিয়ে নেয়া হয়েছে সেটা। ওটার ছাদে, একটা দণ্ডের সঙ্গে আটকানো অবস্থায়, পতপত করে উড়ছে সলোমন দ্বীপপুঞ্জের জাতীয় পতাকা। বোটের নাকের কাছে কালো আর লম্বা নলের মতো কিছু

একটা দেখা যাচ্ছে; বোটটা আরও কাছে আসার পর বোঝা গেল, ওটা একটা মেশিনগান।

রানার সঙ্গে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল কটন।

আরও কাছে এল বোটটা, ওটার বডিতে নীল-সাদা রঙে নিখুঁতভাবে এবং বড় করে আঁকা রয়্যাল সলোমন আইল্যাণ্ডস পুলিশ ফোর্সের লোগো চিনতে অসুবিধা হচ্ছে না। লোগোর নিচে, বড় বড় করে লেখা কথাটাও পড়া যায়: ওয়ার্কিং ইন পার্টনারশিপ উইদ দ্য কমিউনিটি। ওটার নিচে ছোট করে লেখা: কোস্ট গার্ড।

পোসেইডনের ডাইভিংল্যাডারের কাছে এসে থামল বোটটা। মেশিনগানের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল রয়্যাল পুলিশের একজন সদস্য, পাশে আরেকজন। দ্বিতীয়জনকে দেখামাত্র রানার পেছনে গিয়ে দাঁড়াল রেমি।

'হ্যালো, ক্যাপ্টেন,' রানাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে কটনকে সম্ভাষণ জানাল লোকটা, 'আমি মোফাট ফুগুই, সার্জেন্ট। আমাকে বলা হয়েছে, আপনার ভেসেল নিয়ে আমাদের সমুদ্রসীমায় প্রবেশ করেছেন আপনি, অথচ পয়েন্ট ক্রুয কর্তৃপক্ষের কাছে অ্যারাইভাল রিপোর্ট করেননি। শুধু তা-ই না, দেখতে পাচ্ছি ইসাটাবুর জলসীমাতেই আছেন, কিন্তু আমার জানামতে আপনার ভেসেল একটা রিসার্চ শিপ। ...ঘটনাটার ব্যাখ্যা দাবি করছি আমি।'

তেরো

রানা বলল, 'আপনাকে আশা করিনি আমরা, সার্জেন্ট।'

এমনভাবে রানার দিকে তাকাল সার্জেন্ট যে, লোকটার ভঙ্গি দেখে মনে হলো, এতক্ষণে দেখতে পেয়েছে রানাকে। বলল,

বইঘর.কম

‘প্রতিবার নতুন নতুন জায়গায় দেখা হয় আমাদের, নতুন নতুন পরিস্থিতি থাকে তখন, আশা-নিরাশার কথা আসতেই পারে, তা-ই না?’

মাথা নাড়ল রানা। ‘ব্যর্থতা আমারই—কথাটা বোঝাতে পারিনি আপনাকে। বলতে চেয়েছিলাম, কোস্ট গার্ডের স্পিডবোটে আশা করিনি আপনাকে।’

দাঁত দেখা গেল ফুগুইয়ের। ‘সলোমন দ্বীপপুঞ্জে পুলিশই সেনাবাহিনী, পুলিশই দমকলবাহিনী, আবার পুলিশই কোস্ট গার্ড।’ কটনের দিকে তাকাল। ‘জবাব পাইনি কিন্তু।’

‘আপনাদের জলসীমায় প্রবেশের এবং ডক এরিয়ায় নোঙর করার মৌখিক অনুমতি আছে আমার ভেসেলের,’ বলল কটন। ‘আমাকে বলা হয়েছে, আনুষ্ঠানিক কাগজপত্র হাতে পেতে একটু দেরি হতে পারে। সমস্যাটা নিশ্চয়ই আমার না?’

হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর মতো ভঙ্গি করল ফুগুই। ‘আমি কিন্তু আপনার অনুমতি থাকা না-থাকা নিয়ে কোনও কথা বলিনি। আমি বলেছি, অ্যারাইভালের পরও কেন রিপোর্ট করেননি বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছে? এবং,’ আশপাশের সাগরটা একটু জরিপ করল, ‘এখানে কেন?’

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রানা, হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিয়ে ফুগুই বলল, ‘মিস্টার রানা, ভেসেলটার ক্যাপ্টেন আপনি না।’

চুপ হয়ে গেল রানা।

‘সার্জেন্ট,’ মুখ খুলল কটন, ‘স্বীকার করছি ভুল হয়ে গেছে আমার। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে রিপোর্ট করার কথা মনে ছিল না, অথচ কাজটা করা উচিত ছিল। আর যেহেতু ডক এরিয়ায় প্রবেশই করিনি, ছেড়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। হ্যাঁ, এখানে পৌঁছানোর সংবাদটা বন্দর কর্তৃপক্ষকে আমার জানানো উচিত ছিল। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ব্যাপারটা অনিচ্ছাকৃত।’

‘তাড়াহুড়ো?’ কথা ধরল ফুগুই, ‘কীসের তাড়াহুড়ো?’

‘ভেসেলটা কত জোরে চলতে পারে সেটা জানার জন্য তাড়াহুড়ো,’ বলল রানা।

উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মেশিনগানটাকে আদর করল ফুগুই। ‘কথার মাঝখানে হাত ঢুকিয়ে দেয়াটা বোধহয় আপনার বদভ্যাস, মিস্টার রানা।’

‘কী করব, বলুন? পয়েন্ট ক্রুযে কত ভেসেল আসছে-যাচ্ছে, খোঁজ করলে দেখা যাবে কোনওটা রিপোর্ট করছে, কোনওটা করছে না; খোঁজ করলে আরও দেখা যেতে পারে এতদিন কারও ব্যাপারেই কোনও এনকয়রি করেননি আপনি, অথচ আজ...’

‘আপনার অনুমান ঠিক, মিস্টার রানা। তবে, যদি ভুলে গিয়ে না থাকেন, আমি বলেছিলাম একটা চোখ রাখার চেষ্টা করব আপনার ওপর। দুই, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সময়ে সময়ে রিপোর্ট করতে হয় আমাকে। এবং যতদূর মনে পড়ছে, নিজেকে বড়লোকের বখে যাওয়া সন্তান বলেছিলেন আপনি।’

‘তো?’

‘ও-রকম কাউকে কি আপনি আশা করতে পারেন একটা অগযিলারি রিসার্চ শিপে?’

‘আর্কিয়োলজি আমার হবি, সার্জেন্ট।’

‘চমৎকার! বিশ্বাস করুন, আপনার সঙ্গে যত আলাপ করছি, আপনার ব্যাপারে তত নতুন নতুন তথ্য জানতে পারছি। এভাবে চলতে থাকলে আপনার ভক্তে পরিণত হতে বেশিদিন লাগবে না আমার। ...জন্মের পর থেকে দেখে আসছি সলোমন সাগরটা, কোথাও কোনও আর্কিয়োলজিকাল সাইট আছে বলে শুনিনি।’

‘আপনার জানাশোনায় যদি কোনও ঘাটতি থেকে থাকে তা হলে সে-দোষ নিশ্চয়ই আমাদের না?’ হাত তুলে দূরের সৈকতটা দেখাল রানা, ওখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমলের একটা যুদ্ধজাহাজ একপাশে কাত হয়ে আছে বিধ্বস্ত অবস্থায়, এত দূর থেকে দেখলে বড় একটা বাক্সের মতো মনে হয়। ‘জাহাজটা বলে দিচ্ছে কী ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল এখানে আমেরিকান আর জাপানি বাহিনীর

মধ্যে। যুদ্ধের সময়কার আরও অনেক নজির ছড়িয়েছিটিয়ে আছে সারা দ্বীপের জায়গায় জায়গায়। যদি অনুমান করে নিই সলোমনের তলদেশেও কিছু না কিছু আছে, তা হলে কি ভুল হবে?'

'সেসব খোঁজার জন্য ইসাটাবুতে আসার দু'দিনের মাথায় খবর দিয়ে নিয়ে এসেছেন একটা অত্যাধুনিক ভেসেলকে?'

স্যাটেলাইট ফোনটা বের করে ফুগুইকে দেখাল রানা। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিল্টন—মনে আছে নিশ্চয়ই? মানুষটা আমার বন্ধু এবং সাহায্যকারী। তারচেয়েও বড় কথা হচ্ছে, আপনাদের বন্দর কর্তৃপক্ষ যে-জলযানকে যে-উদ্দেশ্যে মৌখিক ছাড়পত্র দিয়েছে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন না আপনি। পয়েন্ট ক্রুয থেকে যদি কোনও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করা হয়ে থাকে আমাদের বিরুদ্ধে, উপস্থাপন করুন সেটা; আমাদের উভয়পক্ষের সময়ই বাঁচবে তাতে।'

চুপ হয়ে গেল ফুগুই, বোঝা গেল বন্দর কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি ওকে। নিছক সন্দেহের বশে অথবা হয়রানি করার উদ্দেশ্যে হাজির হয়েছে সে এখানে।

'কোস্ট গার্ডের বোটে মেশিনগান...' সার্জেন্টকে রানা কিছুটা হলেও কাবু করতে পেরেছে দেখে সাহস পেল কটন, 'জরুরি অবস্থা নাকি, সার্জেন্ট?'

ল্যাডারের কাছে ছড়িয়েছিটিয়ে রাখা ডাইভিং গিয়ার আর ডুফেল ব্যাগগুলোর ওপর নজর বুলাচ্ছিল ফুগুই, অবস্থাটা আসলে কী জানিয়ে বলল, 'আপনারা বিদেশি মানুষ, ডক এরিয়াতেই যদি থাকেন আগামী কয়েকটা দিন, আমার মনে হয় ভালো করবেন। পারতপক্ষে যাবেন না শহরে, যদি যানও এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবেন আদিবাসীদের। আমাদের কাছে খবর আছে, ওদেরকে কে বা কারা যেন খেপিয়ে তুলছে বিদেশিদের বিরুদ্ধে। অবস্থা শেষপর্যন্ত কোন্দিকে গড়ায়, বলতে পারছি না। আর হ্যাঁ, এখনই যোগাযোগ করুন পয়েন্ট ক্রুয়ের সঙ্গে, আপনাদের অ্যারাইভালের

খবর জানান, ঠিক কোথায় আছেন এখন সেটাও জানান।'

'কিন্তু...' হিসেবটা যেন ঠিক মেলাতে পারছে না কটন, 'বিদেশি এইড ওয়ার্কাররা তো আপনাদেরকে সাহায্য করার জন্যই এসেছিল?'

আবারও হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করল ফুগুই, বোঝা গেল বিরক্ত হলে কাজটা করা ওর মুদ্রাদোষ। 'পাগলে কী না করে আর ছাগলে কী না খায়। ওই পাগলছাগলদের জন্যই তো দেশটার এই অবস্থা। আরে, বাবা, এতই যদি দেশপ্রেম থাকবে তোদের, তা হলে লেখাপড়া কর্, মানুষের মতো মানুষ হ, তারপর দেশের কাজে লেগে যা। কিন্তু তা তো করবেই না, উল্টো দাবি জানিয়ে বেড়াবে, আমাদের খনিজসম্পদ আমাদের কাছেই থাকতে হবে। মনে কর্ সব সম্পদ তোদেরই থাকল, একটা বিদেশিও এল না এখানে, তুলতে পারবি ওগুলো? বেচতে পারবি কারও কাছে?' মাথা নাড়ল। 'এই সামান্য কথাটা ওদের মাথায় কেন যে ঢোকে না, বুঝি না। আপনারাও আর সময় পেলেন না, আর্কিয়োলজিকাল কাজকর্ম করার জন্য এখনই হাজির হলেন ইসাটাবুতে!'

'চিন্তা করবেন না, সার্জেন্ট,' আশ্বাস দিল কটন, 'সাবধান থাকব আমরা। আপনি যেভাবে বললেন সেভাবেই চলাফেরা করার চেষ্টা করব। তা ছাড়া বেশিরভাগ সময় তো জাহাজেই থাকতে হবে। আর...এখনই যোগাযোগ করছি পয়েন্ট ক্রুযের সঙ্গে।'

সহকারীকে স্পিডবোটের নাক ঘুরিয়ে নিতে বলল ফুগুই।

'সার্জেন্ট,' বলে উঠল রানা। 'একটু দাঁড়ান। যদি কোনও অসুবিধা না থাকে, বন্দর পর্যন্ত লিফট দিতে পারবেন আমাকে? একটু ব্যাংকে যেতে হবে, এএনযেডের হেণ্ডারসন ফিল্ড শাখায়। কিছু টাকা পাঠানো হয়েছে আমার নামে, তুলতে হবে সেগুলো। বোঝেনই তো, বড়লোকের বখে যাওয়া...'

হাত তুলে রানাকে থামিয়ে দিল ফুগুই। 'ওই গল্পটা যদি আর

না বলেন আমাকে, খুশি হব। ...আসুন।'

ভাউযার ভটভটি বাইকটা চালাচ্ছে রানা, পয়েন্ট ক্রুয থেকে হেণ্ডারসন ফিল্ড পর্যন্ত রাস্তায় মোট তিনবার থামানো হলো ওকে—জায়গায় জায়গায় রোডব্লক দিয়েছে পুলিশ। স্যাটেলাইট ফোন, মাল্টিপারপাস নাইফ, রুমাল আর মানিব্যাগ ছাড়া আর কিছু নেই রানার কাছে; তাই পুলিশেরও আপত্তি জানানোর কিছু নেই। ইসাটাবুতে আসার পর কোনও ট্যুরিস্ট যদি এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন কাউন্টারে অ্যাপ্লাই করে, তা হলে যে-কোনও ভেহিকেল চালানোর জন্য স্পেশাল ড্রাইভিংপাস দেয়া হয় তাকে, প্রত্যেকবার খুঁটিয়ে দেখা হলো রানার পাসটা। তারপর, কাঠপুতুলের মতো দাঁড়িয়ে-থাকা পুলিশরা তিনবারই চলে যেতে বলল ওকে হাতের ইশারায়।

এএনযেড ব্যাংকের হেণ্ডারসন ফিল্ড শাখা সেটার দৈনন্দিন কার্যক্রম শুরু করেছে বেশিক্ষণ হয়নি, কিন্তু গ্রাহকদের ভিড় জমে গেছে ইতোমধ্যেই। সম্ভাব্য দাঙ্গার কথা চিন্তা করে স্পেশাল সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা হয়েছে ব্যাংকের ভেতরে-বাইরে, রানার মাল্টিপারপাস নাইফটা জমা রাখল একজন গার্ড। উচ্চবাচ্য করল না রানা।

বেশিরভাগ গ্রাহক দাঁড়িয়ে আছে ক্যাশ ডিপার্টমেন্টের সামনে, "পেমেন্ট" লেখা কাউন্টারটা ঘিরে—সংসার চালানোর খরচ আগেভাগেই তুলে রাখতে চায়; দাঙ্গা বেধে গেলে ব্যাংক আদৌ খুলবে কি না তার কোনও নিশ্চয়তা নেই।

রেমিটেন্স ডেস্কে চলে এল রানা, কী চায় জানাল।

তেমন সুন্দরী না হলেও স্মার্ট একটা মেয়ে সার্ভিস দিচ্ছে এখানে, রানাকে বসতে বলল সে। এককথায়-দু'কথায় মেয়েটার সঙ্গে খাতির জমাল রানা, কাজের ফাঁকে ফাঁকে রানার বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবও দিল মেয়েটা।

পাঠানো টাকাটা সলোমন আইল্যাণ্ড ডলারে ভাঙিয়ে এবং মানিব্যাগটা ঢাউস বানিয়ে যতক্ষণে বাইরে বের হলো ও, ততক্ষণে গ্রাহকদের ঠেলা-ধাক্কা আর কনুইয়ের গুঁতোয় গলদঘর্ম হয়ে গেছে।

রেণ্ট-আ-রাইড কোম্পানির মালিককে আগেও ভালো লাগেনি রানার, আর এখন তো বিষের মতো লাগছে। কারণ রানাকে দেখামাত্র লোকটা বলেছে, 'ক্ষতিপূরণ দেয়া-নেয়া পরে হবে, আগে বলুন আপনাকে ড্রাইভিংপাস দিয়েছে যে-লোক, সে কি মানুষের-বাচ্চা নাকি অন্যকিছুর? মাল খেয়ে গাড়ি চালানোর অভ্যাস নেই তো আপনার? আমার এত চমৎকার জিপটা...'

ক্ষতিপূরণ দিয়ে রেণ্ট-আ-রাইডের অফিস থেকে বেরিয়ে এল রানা, মোটরসাইকেলে উঠল। টের পাচ্ছে, যত দ্রুত সম্ভব ফিরে যাওয়া উচিত পোসেইডনে। একবার হাসপাতাল হয়ে যাবে কি না ভাবল, কিন্তু বাতিল করে দিল চিন্তাটা। কটন আর ওর সঙ্গীরা যদিও নুমা'র এজেন্ট, কিন্তু ওরা রেমির জন্য অপরিচিত। মেয়েটা মুখে না বললেও রানা জানে, ও না ফেরা পর্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে থাকবে সে।

মোটরসাইকেলটা আগেরবারের মতোই ডক এরিয়াতে পার্ক করল রানা, তারপর একটা নৌকা ভাড়া করে চলে এল পোসেইডনে। ব্রিজের কাছে দাঁড়িয়ে আছে কটন, একটা ফটো দেখছে। রেমিকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

কটনের দিকে এগিয়ে গেল রানা। 'রেমি কোথায়?'

আঙুলের ইশারায় একটা গেস্ট কেবিন দেখিয়ে দিল কটন। 'বলল গতকাল রাতে নাকি ঠিকমতো ঘুমাতে পারেনি, ঘুম পাচ্ছে। শুয়ে পড়তে বললাম আমি।'

'তোমাদের খবর কী?'

'দু'বার ডাইভ দেয়া হয়েছে এখন পর্যন্ত। লে-আউটটা

বইঘর.কম

মোটামুটি ম্যাপিং করে ফেলা গেছে। হেক্টর আর রিকার্ডোর পাঠানো ইমেজ থেকে কয়েকটা ফটো প্রিণ্ট করে নিয়েছি। আমার মনে হয় এখন একেকটা বিল্ডিং নিয়ে সিস্টেমেটিকালি কাজ করতে পারব আমরা।'

হাতেধরা ফটোর গায়ে আঙুল দিয়ে টোকা দিল রানা। 'দেখে মনে হচ্ছে এটাই সবচেয়ে বড় স্থাপনা। এখান থেকেই কাজ শুরু করা উচিত হবে।'

'কেন?' জানতে চাইল রেমি।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা আর কটন। গেস্ট কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে মেয়েটা, তবে এখনও ঘুম লেপ্টে আছে দু'চোখে।

পাইলটহাউসে ঢুকল রেমি।

'কারণ এটা অন্যগুলোর চেয়ে কমপক্ষে দ্বিগুণ হবে আকারে,' হাতেধরা ফটোটা নাড়াল রানা। 'তারমানে, এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

রানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রেমি, ওর হাতে ফটোটা দিয়ে রানা বলে চলল, 'তা ছাড়া, এটা মোটামুটি ভালো অবস্থায় আছে। ...আমরাও নামব পানিতে, নিজ চোখে দেখব ভেতরে কী আছে।'

'তোমরা নামবে?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল কটন।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'রাত নামার আগেই পরিষ্কার একটা ধারণা পেতে চাইছি ধ্বংসাবশেষটা সম্পর্কে। রেমিও ডাইভিং জানে, সে-হিসেবে চারজন ডুবুরি আমরা। সংখ্যাটা যত বেশি হবে, তত কাজ এগোবে। ...মোট ক'টা সার্ফেস সাপ্লাইড এয়াররিগ আছে আমাদের?'

'দুটো,' বলল কটন। 'সাধারণত সাগরসৈকত থেকে বেশি দূরে কাজ করে না পোসেইডন, তাই গভীর পানিতে থাকতে হয় না আমাদের। তবে যেহেতু ডুবুরির মোট সংখ্যা চার, দুটো এয়াররিগ দিয়েই কাজ চলে যাবে আশা করি। লম্বা একটা সময় ধরে পানির নিচে থাকতে পারবে অন্তত দু'জন। স্কুবা ডাইভার

হিসেবে কাজ করবে যারা, একটু ম্যানেজ করে নিতে হবে তাদেরকে।'

'সতর্ক থাকতে হবে আমাদের,' রেমির উদ্দেশে বলল রানা, 'নিজেদের ব্যাপারে যেমন, ধ্বংসাবশেষটার ব্যাপারেও তেমনই।' কটনের দিকে তাকাল। 'ফিল্মে রেকর্ড করতে হবে আমাদের প্রতিটা পদক্ষেপ।'

মাথা ঝাঁকাল কটন।

আধঘণ্টা পর।

একটানা ঘটঘট আওয়াজ করে যাচ্ছে ডেকের ওপর রাখা কম্প্রেসরটা, হোসের মাধ্যমে জোরালো বাতাসের ক্রমাগত জোগান দিয়ে চলেছে হেক্টর আর রিকার্ডোর কাজের সুবিধার্থে। লাঞ্চের আগে হালকা নাস্তা আর কফি খেয়ে নিয়েছে ওরা চারজন, টনি বাদে বাকিরা আছে পাইলটহাউসে, মনিটরের সামনে।

সবচেয়ে বড় ধ্বংসাবশেষটার একদিকের দেয়ালের কাছে এগিয়ে গেল একজন, হোসের ভাল্‌ভ ধরে মোচড় দিল, সঙ্গে সঙ্গে তীব্র গতির বাতাস গিয়ে ধাক্কা মারল দেয়ালের গায়ে লেগেথাকা সামুদ্রিক আগাছার ওপর। দেয়ালের সঙ্গে বেশিক্ষণ আটকে থাকতে পারল না অনাকাঙ্ক্ষিত জিনিসগুলো, পানিতে একটা ঘূর্ণি তুলে উৎপাটিত হলো সমূলে, ঝাপসা হয়ে গেল মনিটরের ছবি। যেহেতু আর্কিয়োলজিকাল সাইট, এবং যেহেতু কটনকে দেয়া মৌখিক অনুমতিতে পয়েণ্ট ক্রুয কর্তৃপক্ষ বলছে কোনও স্থাপনা বা নিদর্শনের কোনওরকম ক্ষতি করা যাবে না, সেহেতু রানার পরামর্শে ধাতব ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার বদলে কম্প্রেসরের শক্তিশালী বাতাস ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এতে সময় যে বেশি লাগছে, তা নয়। তবে অসুবিধা একটাই—বার বার ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে মনিটরের ছবি।

ধ্বংসাবশেষটার আশপাশে দৃষ্টিসীমা নেমে এসেছে এক ফুটের কাছাকাছি, পুরো এলাকা যেন পরিণত হয়েছে বাদামি

থকথকে কাদার রাজত্বে। বেশ কয়েক মিনিট পর আস্তে আস্তে থিতিয়ে এল কাদামাটি আর সামুদ্রিক আগাছার মিশ্রণ, বড় বড় কতগুলো ব্লক দেখা যাচ্ছে এখন মনিটরে। সন্দেহ নেই, ওগুলো লাইমস্টোনের।

আরও দু'ঘণ্টা পর, যথেষ্ট পরিষ্কার করে ফেলা একটা দেয়ালের ছবি ফুটে উঠল মনিটরে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, দেয়ালটার দৈর্ঘ্য কম করে হলেও এক শ' ফুট।

'বিশাল,' মন্তব্য করল কটন। 'বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, ইসাটাবুর মতো প্রযুক্তিবিদ্যায় পিছিয়ে থাকা একটা দ্বীপের আদিবাসীরা বানিয়েছে ওটা।'

ওর দিকে তাকাল রানা। 'হেক্টর আর রিকার্ডোর সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনও উপায় আছে?'

'আছে। টনির কাছে বিশেষ কমিউনিকেশন ডিভাইস আছে, একই জিনিস আছে হেক্টরদের কাছেও। জরুরি প্রয়োজনের কথা বলার জন্যে...'

'তা হলে ওদের যে-কোনও একজনকে, দেয়ালটার যতটা কাছে পারে, যেতে বলো। খুব কাছ থেকে দেখতে চাই আমি ওটা।'

মুখের কাছে একটা মাইক্রোফোন তুলল কটন, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জানিয়ে দিল। সেটা টনির মাধ্যমে পৌঁছে গেল হেক্টরদের কাছে।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, স্লো মোশন মুভির মতো কাছে এগিয়ে আসছে দেয়ালটা। আরও কাছে...আরও কাছে...শেষপর্যন্ত একটা ব্লকের ঠিক ওপরে স্থির হলো ক্যামেরার লেন্স।

মনিটরের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে পালাক্রমে তাকাল রেমি আর কটনের দিকে।

'কী?' জানতে চাইল রেমি।

'হায়ারোগ্লিফিক্স,' এককথায় জবাব দিল রানা।

'হায়ারোগ্লিফিক্স?' ভ্রূ কুঁচকে গেছে রেমির, মনিটরের দিকে তাকিয়ে আছে সে কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছে না রানার কথা।

'হুঁ। এ-বিষয়ে যেহেতু কিছু পড়াশোনা আছে আমার, তাই বুঝতে পারছি। কী দেখা যাচ্ছে মনিটরে, খেয়াল করো ভালোমতো। সমান আকার ও আকৃতির কতগুলো খোদাইকর্ম আছে একসারিতে, কোনও কোনওটার গায়ে বার্নাকল আটকে থাকার কারণে স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে না যদিও; কিন্তু অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না, ওগুলো আসলে মানুষের সারি। কিছুটা দূরে একটা পাথরের ওপর কিছু একটা বসে আছে...দেখতে পাচ্ছ? ওটাও খোদাইকর্ম...আর্কিয়োলজির ভাষায় বলা হয় টোটেম—মানে মানুষের দেহাবয়বে কোনও প্রাণীর মাথাটা জুড়ে দিয়ে কল্পনা করা দেবতা। প্রাচীন মিশর আর উত্তর আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এর প্রচলন ছিল, এখন দেখছি ইসাটাবুর সনাতন ধর্মাবলম্বীরাও মানত একসময়। যা-হোক, আমার ধারণা, টোটেমটা কোনও সমুদ্রদেবতার। ...দেখো...তোমাদের কাছে হয়তো অতিকল্পনা মনে হবে...কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, সারির প্রতিটা মানুষ যেন ঘাড়ে করে বস্তার মতো কিছু একটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেবতার উদ্দেশে।'

গলা খাঁকারি দিল কটন। 'তারমানে...মিস্টার রানা...তুমি বলতে চাইছ...'

'নৈবেদ্য!' উঁচু গলায় বলে উঠল রেমি, উত্তেজিত হয়ে গেছে হঠাৎ। 'নৈবেদ্য নিয়ে যাচ্ছে ওরা সমুদ্রদেবতাকে খুশি করার জন্যে। আর ইসাটাবুর সনাতনী ধর্মে নৈবেদ্য মানে সোনাদানা, হীরা-জহরত, রত্নপাথর।'

'গুপ্তধন,' শান্ত গলায় বলল রানা, যদিও অদ্ভুত এক দ্যুতি খেলা করছে ওর দু'চোখে। 'রাজা শামানের গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছি আমরা।'

চোদ্দ

শেরির গ্লাসে ছোট করে একটা চুমুক দিল আনমনা পামার, নামিয়ে রাখল গ্লাসটা। সামনের কাঁচটেবিলের ওপর রাখা অ্যাশট্রেতে পুড়ে পুড়ে নিঃশেষিত হচ্ছে একটা সিগারেট, পাতলা ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে বেডরুমের ছাদের দিকে, তাকিয়ে তাকিয়ে সেটা দেখছে সে। পুরু গদির সোফায় বসে আছে দুই পা তুলে, দৃষ্টি তন্দ্রাচ্ছন্ন।

আজও মনিকাকে বাসায় নিয়ে এসেছিল সে। আজও শুয়েছে ওরা। একটু আগে চলে গেছে মেয়েটা, পামারের জন্য রেখে গেছে অবসাদ।

মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল এমন সময়। বিরক্তি আর আলস্য নিয়ে সেটটা হাতে নিল পামার, স্ক্রিনের নম্বরটা দেখামাত্র দ্বিগুণ হলো বিরক্তি। 'এতবার বলেছি, মোবাইলে কল দিয়ো না। আমার অফিসের স্পেশাল লাইন ট্র্যাক করা যত কঠিন, এই লাইন ট্র্যাক করা ততটাই সহজ।'

'লাঞ্চের সময় থেকে চেষ্টা করছি ওই নম্বরে। কেউ না ধরলে কী করব?'

কী আর করবে, মনে মনে বলল পামার, হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদো। মুখে বলল, 'কয়েকদিন ধরে ভালো যাচ্ছে না শরীরটা। লাঞ্চের সময় হলেই কেমন কাহিল লাগতে থাকে। জিরিয়ে নেয়ার জন্য আগেভাগে চলে আসি বাসায়। ...কোনও খবর আছে?'

'নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছে ডেমোক্রেট আর রিপাবলিকানরা। একমত হয়েছে পরস্পরের প্রতি কাদা

ছোঁড়াছুঁড়ি থামাতেও। কিন্তু মিলিশিয়াদের নিয়ে কী করবে, সে-সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না। বিদেশি সাহায্য চাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল কেউ কেউ।'

পিঠ খাড়া হয়ে গেল পামারের। 'রয়্যাল পুলিশের সঙ্গে টক্কর দেয়ার মতো অস্ত্রপাতিই ঠিকমতো জোগাড় করা গেল না এখনও, মাঝখান থেকে যদি বাগড়া দিয়ে বসে বিদেশি ট্রুপাররা তা হলে...'

'কাজেই কিছুতেই থামতে দেয়া যাবে না রিপাবলিকান আর ডেমোক্রেটদের পরস্পরের প্রতি কাদা ছোঁড়াছুঁড়িটা।'

'কী করতে চাও?'

মোবাইলের অন্যপ্রান্ত থেকে দেয়া হলো উত্তরটা।

শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল পামার। তারপর বলল, 'সেটার ফলে হাতে সময় পাব আমরা?'

'পাওয়া উচিত। কারণ দাঙ্গা ঠেকাতে সরকার যদি সফলও হয়, ডেমোক্রেটদের সঙ্গে সহজে বনিবনায় আসতে পারবে না।'

'মাসুদ রানার খবর কী?'

'ভাউযার আবিষ্কারের পেছনে ঠিকমতোই লেগেছে লোকটা। খবর দিয়ে আনিয়ে নিয়েছে একটা আধুনিক ভেসেল। আর্কিয়োলজিকাল রিসার্চের নামে কাদা খোঁড়াখুঁড়ি করছে।'

'নজর রেখো লোকটার ওপর।'

'রাখছি। সে এখন আমাদের জন্যে তুরুপের তাস। আর ভাউযা হার্টসের গোলাম।'

'তুরুপের তাস ঠিকমতো খেলতে না পারলে দান হারতে হয়, জানো নিশ্চয়ই?'

'জানি। এবং সেজন্য জাল বিছিয়ে রাখা হয়েছে মাসুদ রানার আশপাশে। সময় হলেই গুটিয়ে নেব।' বিদায় না জানিয়েই লাইন কেটে দেয়া হলো ওপ্রান্ত থেকে।

মোবাইল নামিয়ে রেখে শেরির গ্লাসটা আবার তুলে নিল পামার।

বইঘর.কম

লাঞ্চব্রেকের আধ ঘণ্টা সময় বাদ দিয়ে বললে একটানা কাজ করে গেল ওরা। বিশাল স্ট্রাক্চারটার ওপরের বেশিরভাগ অংশই মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেল বিকেল নাগাদ। ছাদ ধসে পড়েছে ওটার, কিন্তু দেয়ালের যেটুকু বাকি আছে তার সঙ্গে কাঠামোটা জুড়ে দিলে বিল্ডিংয়ের নকশা অনুমান করা যাচ্ছে।

রাতে কাজ করা লাগতে পারে ভেবে আণ্ডারওয়াটার ফ্লাডলাইটগুলো ঠিক আছে কি না চেক করেছে রানা, তারপর ছোট্ট একটা ঘুম দিয়েছে।

ঘুম থেকে যখন উঠল ও, তখন চারজনের জন্য কফি বানাল রেমি; ডেকের ওপর চারটে ফোল্ডিংচেয়ার পেতে ডাকল রানা, কটন আর টনিকে। ধূমায়িত কফির কাপ নিয়ে বসে পড়ল ওরা চারজন।

'আপনি যখন ঘুমিয়ে ছিলেন,' রানার দিকে তাকাল রেমি, 'রেডিয়োতে খবর শুনেছি। অপহৃত এইড ওয়ার্কারদের খুন করা হয়েছে।'

'খুন করা হয়েছে!' আশ্চর্য হয়ে গেছে কটন।

মাথা ঝাঁকাল রেমি। 'সরকার এখনও চেপে রাখতে চাইছে খবরটা আদিবাসীদের কাছে, সেজন্যই ইংরেজিতে যে-খবর প্রচারিত হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে ওটা ছোট করে। পিজিনে প্রচারিত খবরে কিন্তু উল্লেখ করা হচ্ছে না ঘটনাটা এখনও। তাতে অবশ্য খুব একটা লাভ হয়নি—ইণ্টারনেটে দেখলাম ইণ্টারন্যাশনাল মিডিয়া ইতোমধ্যেই দুষতে শুরু করেছে সোগাভের সরকারকে, তাদের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে। ওই খুনের ঘটনাটা...গরিব আদিবাসীদের জন্য ভালো হলো না। ওদের জন্য যা কিছু করার, এইড ওয়ার্কাররাই করে।'

'এখন তা হলে স্বাভাবিকভাবেই ফুঁসে উঠবে আদিবাসীরা,' বলল টনি। 'কারণ এইড ওয়ার্কারদের হারাতে চাইবে না তারা। আর বিদেশি লোকগুলোও নিশ্চয়ই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ

করতে চাইবে না এখানে?'

'আদিবাসীরা ফুঁসে উঠেছে ইতোমধ্যেই,' গতকাল দুপুরে মেণ্ডানায় ফেরার পথে ইসাটাবুর প্রধান সড়কে উত্তেজিত জনতার সমাবেশের কথা জানাল রানা।

'অপহরণের খবর শুনেই যারা উত্তেজিত হয়ে ওঠে,' বলল কটন, 'খুনের খবর জানতে পারলে কী করবে তারা?'

'আজ সকাল থেকেই শহর থেকে দূরে আছি আমরা,' রেমির কণ্ঠে উৎকণ্ঠা, 'না জানি কী হচ্ছে সেখানে!'

ওর দিকে তাকাল রানা। 'ফুগুই বলছিল কে বা কারা যেন বিদেশিদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে চাইছে আদিবাসীদের। আসলেই কি সম্ভব সেটা?'

মাথা ঝাঁকাল রেমি। 'সম্ভব। ওরা সহজসরল মানুষ, বাস্তববুদ্ধির চেয়ে আবেগ বেশি। বিদেশিবিরোধী কোনও মন্ত্র যদি ভালোমতো গেঁথে দেয়া যায় ওদের মগজে, তা হলে কী হতে পারে বলা যায় না। ...শেষপর্যন্ত দাঙ্গা যদি লেগেই যায়, সেটা থামার আগপর্যন্ত সলোমন দ্বীপপুঞ্জে থাকাটা বোধহয় নিরাপদ হবে না আপনাদের জন্য। যারা আবেগতাড়িত তাদের কথা বাদ দিলাম, এ-রকম কেউ কেউ কিন্তু থাকবে যারা পরিস্থিতির সুযোগ নিতে চাইবে। এবং ওরা জানে, লুটতরাজ চালানোর জন্য বিদেশিরাই সবচেয়ে ভালো টার্গেট।'

'তুমি কী করবে তখন?' জানতে চাইল রানা।

আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেলল রেমি। 'জানি না।'

কাপে শেষ চুমুক দিয়ে ওটা ফোল্ডিংচেয়ারের পায়ার কাছে নামিয়ে রাখল রানা। 'চলো রেডিয়ো ছেড়ে শুনে দেখি লেটেস্ট কোনও খবর আছে কি না।'

পাইলট হাউসে গিয়ে ঢুকল ওরা চারজন। এখন কোন্ চ্যানেলে খবর হতে পারে জানে রেমি, ওটা চালু করল সে।

খবরে যা বলা হলো তার সারমর্ম হচ্ছে: বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা বাদে ইসাটাবু, অর্থাৎ পুরো দ্বীপপুঞ্জের পরিস্থিতি সরকারের

বইঘর.কম

নিয়ন্ত্রণে।

কী মনে হওয়ায় কম্পিউটারের সামনে বসে গেল রানা, লগইন করল বিবিসি'র ওয়েবসাইটে। ব্রেকিং নিউয সেকশনে ইসাটাবুর ব্যাপারে কিছু পাওয়া গেল না, কিন্তু লেটেস্ট আপডেট্স থেকে জানা গেল, হেণ্ডারসন ফিল্ডের কাছে উত্তেজিত জনতার সঙ্গে থেমে থেমে সংঘর্ষ চলছে পুলিশের। ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বিমানবন্দরের রাস্তা, বিদেশি প্লেনগুলো অবতরণের অনুমতি না পেয়ে ইমার্জেন্সি ল্যাণ্ডিং-এর জন্য চলে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া বা নিউযিল্যাণ্ডের দিকে। যেসব পুলিশ অফিসার ছুটিতে ছিল তাদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে, কর্মস্থলে ডেকে পাঠানো হয়েছে তাদেরকে। জঙ্গি সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে দ্য মিউটিনিয়ার্সকে। ডেমোক্রেটরা দাবি করছে বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব আছে, ওদিকে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, কোনও অবস্থাতেই আলোচনা হবে না জঙ্গিদের সঙ্গে। ব্রিটিশ সরকার তার নাগরিকদের পরামর্শ দিচ্ছে, তারা যেন আতঙ্কিত না হয়, এবং যেন নিজ নিজ হোটেল ছেড়ে বাইরে না যায়। সমস্যার বাস্তবমুখী সমাধানের জন্য অতি শীঘ্রি দূতিয়ালি শুরু করা হবে সোগাভের সরকারের সঙ্গে।

কম্পিউটারটা বন্ধ করে দিয়ে সঙ্গীদের দিকে ঘুরল রানা। 'ইসাটাবুর রাজনীতির ব্যাপারে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই আমাদের। কাজ চালিয়ে যাই আমরা।' মনিটরের দিকে তাকাল, দেখল কিছুক্ষণ। 'মনে হচ্ছে পরিচ্ছন্নতার কাজ অনেকখানি এগিয়ে নিয়েছে হেক্টর আর রিকার্ডো।'

রানার দিকে তাকাল কটন। 'আপনি যখন ঘুমিয়ে ছিলেন, রিকার্ডো যোগাযোগ করেছিল আমার সঙ্গে। ওর ধারণা, পুরো কাঠামোটার ভিত্তি হিসেবে যা ব্যবহৃত হয়েছিল, সেটার ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পেয়েছে সে। বিশেষ কারিগরি প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে, ছোট ছোট পাথর আর নুড়ির সংমিশ্রণে নাকি গড়ে তোলা

হয়েছিল একটা কৃত্রিম দ্বীপ, সেটার ওপর দাঁড় করানো হয়েছিল কাঠামোটা। তখন বেশি হলে দশ কি পনেরো ফুটের মতো গভীর ছিল সৈকতসংলগ্ন সাগর, পরে ভূমিধ্বসের কারণে সেটা বেড়ে প্রায় এক শ' ফুটে দাঁড়ায় '

'প্রায়ই ছোটখাটো ভূমিকম্প হয় সলোমন দ্বীপপুঞ্জে,' বলল রেমি। 'সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ টাইফুন তো আছেই।'

ছোট্ট একটা স্পিকার খড়খড় করে উঠল এমন সময়। 'ক্যাপ্টেন, আছেন আপনি?'

হেক্টর।

এগিয়ে গিয়ে মাইক্রোফোনটা তুলে নিল কটন। 'হ্যাঁ। কী হয়েছে?'

'এখনও ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছি না, তারপরও মনে হচ্ছে, অন্যরকম কিছু একটা খুঁজে পেয়েছি আমরা। মিস্টার রানা যদি একটু নিচে আসতো, ভালো হতো।'

রানার সঙ্গে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল কটন। 'অন্যরকম কিছু?'

'আমি...আসলে নিশ্চিত না,' হেক্টরের কণ্ঠের দ্বিধা টের পাওয়া গেল স্পিকারেও। 'আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা একটা এণ্ট্রি, রিকার্ডো বলছে দেয়ালের গায়ে ফাটল ছাড়া কিছুই না। কিন্তু...'

'কিন্তু?'

'আমার কাছে কেন যেন মনে হচ্ছে, এণ্ট্রি বা ফাটল যা-ই হোক, কেউ একজন কিছুদিন আগে ঢুকেছে এখান দিয়ে।'

ঘাড় ঘুরিয়ে রেমির দিকে তাকাল রানা।

ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটা।

পনেরো

রুব'র কাছে জীবনটা একটা অ্যাডভেঞ্চার ছাড়া আর কিছু না।

স্রষ্টায় বিশ্বাস করে সে, একইসঙ্গে এ-ও বিশ্বাস করে, এত মহাযজ্ঞের মাধ্যমে এত বিশাল ব্রহ্মাণ্ড না বানালেও পারতেন তিনি। সৃষ্টির মাঝে যেমন কোনও উদ্দেশ্য খুঁজে পায় না সে, তেমনই পায় না মানুষের জীবনের ধারাবাহিকতায়। গর্ভধারিণীকে যারপরনাই কষ্ট দিয়ে জন্ম নিচ্ছে বাচ্চারা, অভাব-অনটন আর অসুখবিসুখে ভুগে বড় হচ্ছে, যৌবনকালে একটু মৌজফুর্তি করছে, তারপর একসময় ধুঁকে ধুঁকে মারা যাচ্ছে।

এসবের মানে কী?

জানে না রুব। আর জানে না বলেই, আর দশজন গড়পড়তা লোক যে-দৃষ্টিতে দেখে জীবনটাকে, ঠিক তার উল্টো চোখে দেখে সে। ওর কাছে ওর ধীবরবৃত্তি একটা অ্যাডভেঞ্চার—নৌকা নিয়ে সাগরের যে-জায়গায় যেতে দশবার ভাবে আর সবাই, সেখানে সে যায় নিঃশঙ্কচিত্তে। মহাজনের চোখ ফাঁকি দিয়ে মাছ সরায় নৌকার খোল থেকে, এবং কাজটা করতে একটুও খারাপ লাগে না—যারা জোঁকের মতো শুষে নিচ্ছে গরিবের রক্ত তাদেরকে ঠকানোটা উচিত কাজ বলে মানে; পরে চুরি-করা মাছগুলো গোপনে বিলিয়ে দেয় অভাবীদের মাঝে।

রিফর্মড্ ডেমোক্রেটিক পার্টির হয়ে রাজনীতি করাটাও ওর জন্য একটা অ্যাডভেঞ্চার। এখানে পেটমোটা স্বার্থপর রাজনীতিবিদ যেমন আছে, তেমন আছে বেশ কয়েকজন ত্যাগী কর্মী; সবচেয়ে বড় কথা ওদের কল্যাণে বামপন্থি আদর্শের চর্চা

আছে পার্টিঅফিস থেকে শুরু করে সারা সলোমন দ্বীপপুঞ্জে। এককালে যা ছিল নিখাদ সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদী ভোগতন্ত্রের ক্রমাগত সুড়সুড়িতে তা এখন হয়ে গেছে রিফর্মড্ ডেমোক্রেসি; তাই কার্ল মার্কস্, ফ্রেডারিক অ্যাঙ্গেলস, জোসেফ স্টালিন, ভ্লাদিমির লেনিনের নামে যেমন শিহরিত হয় রুব, তেমনই বুঁদ হতে পারে দ্বীপবাসীদের সস্তা মদের আড্ডায়, স্থানীয় কায়দায় বানানো জঘন্য বেহালায় তুলতে পারে সুরের মূর্ছনা, আবার ওই একই হাত নিয়ে সামিল হয়ে যায় মারপিটে।

এবং সৃষ্টিরহস্য নিয়ে বিভ্রান্ত, গরিবদুঃখীদের ভালোমন্দ নিয়ে চিন্তিত আর রূপান্তরিত সমাজবাদ নিয়ে উদ্বেলিত মনে ভাবতে পারে, বছর বছর দু'-একটা করে গার্লফ্রেণ্ড বদলানোটাও অ্যাডভেঞ্চার। ওর মতো নব্য রবিনহুডের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে উপায়ও নেই বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো কিশোরী বা যুবতীদের, কখনও আবার স্বামীপরিত্যক্তা বা বিধবা রমণীদের।

মোট কথা, রুব একজন সুখী মানুষ। এবং আজ রাতে ওর সুখ বাড়িয়ে দেয়ার জন্য, সাগরপাড়ে, ওর নিঃসঙ্গ কুটিরে, ওর সঙ্গে রাত কাটাতে আসবে জম্বি—রুবর বর্তমান হার্টথ্রব। নিজেকে সেজন্যে প্রস্তুত করছে রুব।

জম্বির বাপ-মা কেউই খেদায়নি মেয়েটাকে, স্বামীও ঘরছাড়া করেনি ওকে। তবুও মেয়েটাকে পটিয়ে ফেলেছে রুব। যেদিন প্রথম দেখেছে ওকে, সেদিনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ওই মেয়েকে ওর চাই। কেন চায়? ভাবতে গিয়ে মুচকি হেসে ফেলল রুব। মেয়েটা ইসাটাবুর অনেক পুরুষের চেয়ে লম্বা, এমনকী রুবর চেয়েও। ওই কারণেই মেয়েটার প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করেছে সে। জানতে চায়, নিজের চেয়ে লম্বা একটা মেয়ের সঙ্গে শুতে কেমন লাগে। জানতে চায়, একজন স্বামীর কাছ থেকে তার স্ত্রীকে চুরি করতে কেমন লাগে।

নতুন একটা চাকরি পেয়েছে জম্বির স্বামী, প্রায় প্রতি রাতই বাড়ির বাইরে থাকতে হচ্ছে তাকে, আজ রাতেও থাকবে; সেই

বইঘর.কম

সুযোগে মেয়েটা আসবে গোপন অভিসারে।

আসলে পরকীয়াও একধরনের অ্যাডভেঞ্চার।

খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রুব। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, প্রকৃতিতে ছায়া ছায়া অন্ধকার। নীড়ে ফিরতে শুরু করেছে পাখিরা, কলকাকলিতে চারদিক মুখর। এ-সময় সাগরের দিক থেকে জোরালো বাতাস প্রবাহিত হয়, এখনও হচ্ছে; স্রোতের গর্জনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া নারকেল পাতার সড়সড়ানি বাড়িয়ে দিচ্ছে রুবর মিলনাকাঙ্ক্ষা।

কেরোসিন তেলের একটা প্রদীপ জ্বালাল সে, ওটা উঁচু করে ধরে এগিয়ে গেল একদিকের বেড়ার সঙ্গে আটকানো ছোট একটা আয়নার দিকে। নিজের অ্যাডভেঞ্চারাস চেহারাটা দেখল সময় নিয়ে। তারপর মুচকি হাসল আবারও।

ওর দরজায় টোকা পড়ল তখনই।

ডাইভিংমাস্কটা মাথা দিয়ে গলিয়ে দিল রানা, তাকাল পাশে দাঁড়ানো ওয়েটস্যুট-পরা রেমির দিকে। 'মানিয়েছে তোমাকে।'

একটুখানি হাসল রেমি। 'আমি জানি ওয়েটস্যুটটা ঢলঢল করছে আমার গায়ে। তবে...মানিয়ে নিতে পারব। ...আপনি রেডি?'

'সবসময়,' ডাইভিংল্যাডারের কাছে গিয়ে পানিতে লাফিয়ে পড়ল রানা।

রেগুলেটরটা পরিষ্কার করে নিয়ে মুখে ঢোকাল রেমি। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল ডাইভিংল্যাডারের দিকে। ইতস্তত করছে, মনে পড়ে যাচ্ছে প্রাচীন অভিশাপের কথা। ভাবছে, নিচে কী আছে তা জানাটা যেমন জরুরি তেমনই বিপজ্জনক। ওই অভিশপ্ত ধ্বংসাবশেষ কি ওর জীবনটাও বদলে দেবে আমূল? ইটের মতো সে-ও কি হারিয়ে যাবে? নাকি ভাউযার মতো কোনও দুর্ঘটনা ঘটবে ওর বেলাতেও? গুণ্ডাবাহিনী...আচ্ছা, ওই লোকগুলোর আর কোনও খবর নেই কেন?

এসব ভাবতে ভাবতে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল রেমি। কিছুদূর নামার পর দেখল, ধীর গতিতে নেমে চলেছে রানা। রেমি আসছে টের পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা, সব ঠিক আছে কি না জানতে চেয়ে প্রথমে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা দেখাল, তারপর দেখাল ডান হাতের গ্লাভপরা তালু।

জবাবে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা উঁচু করল রেমি।

ডানদিকে তাকাল রানা, ইঙ্গিতে কী যেন দেখাল, তারপর দিক বদল করল। ওকে অনুসরণ করল রেমি।

আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে ধ্বংসস্তূপটা। রেমি টের পাচ্ছে, কেমন যেন অস্থির লাগছে ওর; হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানিটা যেন টের পাচ্ছে সে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই হেক্টর আর রিকার্ডোর কাছে গিয়ে হাজির হলো ওরা। হাতের ইশারায় দেয়ালের সেই ফাটলটা দেখিয়ে দিল হেক্টর। আরও কাছে এগিয়ে গেল রানা।

ডাইভিংল্যাম্পটা নিচু করে ফাটলের কাছে ধরল হেক্টর। অন্য হাতের তর্জনীর ইশারায় ফাটলের গায়ের কিছু একটা দেখাচ্ছে। ভালোমতো তাকাল রানা। ধাতব কোনওকিছু দিয়ে বারংবার আঘাতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে হেক্টরের দিকে তাকাল রানা। জবাবে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল হেক্টর, কাজটা ওর বা রিকার্ডোর না।

পেছনে কারও অস্তিত্ব টের পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা। কাছে এসে দাঁড়িয়েছে রেমি। ডাইভব্যাগ থেকে একটা শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইট বের করল রানা, জ্বালাল। ওর দেখাদেখি একই কাজ করল রেমি। নিজের রিস্টওয়াচে টোকা দিয়ে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল রিকার্ডো, তর্জনীর ইশারায় দেখাল ওপরের দিকে। অর্থাৎ অক্সিজেন ফুরিয়ে আসছে ওর, এবার ওপরে না গেলেই নয়। জবাবে রেমির একটা কাঁধ স্পর্শ করল রানা, আর ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা দেখাল—মানে হেক্টর আর রিকার্ডোকে ছাড়া বাকি কাজ চালিয়ে নিতে পারবে। মাথা ঝাঁকাল রিকার্ডো, হেক্টরকে

বইঘর.কম

নিয়ে উঠতে শুরু করল ওপরে।

ফাটলটার ওপর মনোযোগ দিল রানা। ফ্ল্যাশলাইটটা কাছে নিয়ে গিয়ে আলো ফেলল ওটার গায়ে; যে-ধাতব জিনিসের সাহায্যে বার বার আঘাতের মাধ্যমে বড় করা হয়েছে ফাটলটা, সেটা কী হতে পারে অনুমান করার চেষ্টা করল। ফ্ল্যাশলাইটের মুখ ঘোরাল, আলো ফেলল ফাটলের ভেতর। অন্ধকার একটা প্যাসেজের মতো দেখা যাচ্ছে; গুগলি, সামুদ্রিক আগাছা আর লালচে বাদামি বালিকণার মিশ্রণ ভেতরের পানিতে। এবার ফ্ল্যাশলাইটের আলো নিচের দিকে ফেলল রানা। বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে লাইমস্টোন ব্লকের ছোটবড় টুকরো, সেগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ছুটে বেড়াচ্ছে পুঁচকে কিছু মাছ, কোনও কোনওটার গায়ে নিথর বসে আছে স্টারফিশ।

প্যাসেজের ভেতরে পা রাখল রানা।

কিছুদূর এগোনোর পর বোঝা গেল, বাইরে থেকে যতটা মনে হয়, প্যাসেজটা আসলে তারচেয়ে চওড়া। পাশাপাশি এগোচ্ছে রানা আর রেমি, অথচ তেমন অসুবিধা হচ্ছে না ওদের। মেয়েটা বার বার এদিকওদিক আলো ফেলে আশপাশের দেয়াল আর মাথার ওপরের ছাদ দেখছে, ব্যাপারটা লক্ষ করে রানার মনে হলো, হয়তো ঘাবড়ে আছে সে, তাই এগোনোর গতি আরও ধীর করল ও। প্যাসেজটার শেষমাথায় পৌঁছাতে বেশি সময় লাগল না ওদের।

বড় একটা ব্লক পড়ে আছে সামনে বাঁ দিকে, তারমানে শরীরটা মুচড়ে ডান দিক দিয়ে এগোতে হবে। শরীরটাকে পাক খাওয়াতে যাচ্ছিল রানা, এমন সময় চার ফুটি একটা ছায়া কোত্থেকে যেন এগিয়ে এল ওর দিকে, ধড়াস করে উঠল ওর বুকের ভেতরে।

মস্ত এক বান মাছ, ইংরেজিতে বলে মোরে ইল। বেশ মোটাতাজা। রানাকে কেন্দ্র করে চক্কর দিল দু'বার, বোঝার চেষ্টা করল মুখরোচক কোনও খাবার হাজির হয়েছে কি না, কিন্তু রানা

যখন ফ্ল্যাশলাইটের জোরালো আলো ফেলল ওটার চোখের ওপর, ওদের আত্মা চমকে দিয়ে তীরবেগে পালাল যেদিক থেকে ওরা এসেছে সেদিকে।

আলো ফেলে ওটাকে দেখার চেষ্টা করছিল রেমি, কাঁধের ওপর রানার হাতের আলতো স্পর্শ টের পেয়ে চমকে উঠল আরেকদফা, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখল, ওকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত দিচ্ছে রানা। বুঝতে পেরেছে—জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা।

ডাইভব্যাগ থেকে একটা ট্রেইলমার্কার বের করল রানা, তারপর এগিয়ে গেল একদিকের দেয়ালের কাছে। মার্কারটা ঠেসে ধরল দেয়ালের গায়ে, এগিয়ে চলল। দাগ তৈরি হচ্ছে দেয়ালে—যদি দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায় ওরা তা হলে কোথা দিয়ে বের হতে হবে তার চিহ্ন রয়ে যাচ্ছে। রানার পেছন পেছন, বলতে গেলে গায়ে গা ঘেঁষে এগোচ্ছে রেমি।

ব্লকটাকে বিশ্বাস নেই—সামান্য একটু ধাক্কা লাগলেই আরও কয়েকটা ব্লকসহ ধসে পড়তে পারে। ওটাকে সাবধানে পাশ কাটাল ওরা, এদিকওদিক তাকিয়ে বুঝতে পারল বড়, আংশিকভাবে বিধ্বস্ত একটা চেম্বারে হাজির হয়েছে; ওদের ফ্ল্যাশলাইটের আলো নেচে বেড়াচ্ছে চেম্বারটার মেঝে আর দেয়ালের ওপর, এখন কোন্ জায়গায় যাওয়া উচিত বুঝতে পারছে না ঠিক। এমন সময় রানার একটা হাত ধরে মৃদু টান দিল রেমি—দৃষ্টি আকর্ষণ করছে রানার, নিজের ফ্ল্যাশলাইটের আলো স্থির ধরে রেখেছে মেঝের আরেকটা ফাটলের ওপর।

আরও একবার এদিকওদিক দেখে নিয়ে শরীরটাকে পাক খাওয়াল রানা, এগিয়ে যাচ্ছে মেঝের ফাটলটার দিকে। কাছাকাছি গিয়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়ল সাবধানে, ফাটলটার কাছে নিয়ে গেছে ফ্ল্যাশলাইট, ভেতরে আলো ফেলে উঁকি দিয়ে দেখছে। আরেকটা চেম্বার দেখা যাচ্ছে, ভেতরের অন্ধকার যেন আরও গাঢ় হলো ফ্ল্যাশলাইটের আলোয়।

বইঘর.কম

রেমির দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারায় সব ঠিক আছে কি না জানতে চাইল রানা। জবাবে হাতের ইশারাতেই জানিয়ে দিল মেয়েটা, ঠিকই আছে সব। নিচে নামতে চায় কি না জানতে চাইল রানা, মেয়েটা বলল রাজি আছে সে। দেরি না করে ফাটলের ভেতরে মাথা গলিয়ে দিল রানা।

এটা আরেকটা চেম্বার, প্রথমটার তুলনায় ছোট। এখানকার পানিতে ভাসমান প্রাণিকণার পরিমাণ বেশি, চারপাশের দেয়ালে যেন জড়াজড়ি করে আছে গুগলি-শামুক আর সামুদ্রিক আগাছা। ট্রেইলমার্কারটা রেখে দিয়ে ছুরি বের করল রানা, এগিয়ে গেল সবচেয়ে কাছের দেয়ালটার দিকে। ছুরি দিয়ে সাবধানে ঘষা দিল দেয়ালের গায়ে। ঘন তেলের মতো, সবুজাভ বাদামি রঙের একজাতের তরল বেরিয়ে এল দেয়ালের গা থেকে; চেম্বারের প্রায় স্থির পানিতে মেঘের মতো ভেসে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর পাতলা হতে শুরু করল আস্তে আস্তে।

"মেঘটার" দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর মনোযোগ দিল বার্নাকল আর আগাছার স্তরে ঢাকা দেয়ালটার ওপর। এক ইঞ্চির চার ভাগের এক ভাগ পুরু একটা লম্বা, কৃত্রিম রেখা দেখা যাচ্ছে দেয়ালের গায়ে, চলে গেছে একপাশ থেকে আরেকপাশে। ছুরি নিয়ে আবার কাজে লেগে গেল রানা, টানা দু'মিনিট চাঁছার পর দেয়ালের ফুট তিনেক জায়গা পরিষ্কার করে ফেলতে পারল। আঁকাবাঁকা রেখাটা আরও ভালোমতো দেখা যাচ্ছে এখন। ফ্ল্যাশলাইটটাকে দেয়ালের যতটা কাছে সম্ভব নিয়ে গেল রানা, জ্বলজ্বল করে উঠে নিজের অস্তিত্ব আরও ভালোমতো জানান দিচ্ছে রেখাটা। এবার ও নিজেই এগিয়ে গেল দেয়ালের যতটা কাছে সম্ভব। অখণ্ড মনোযোগে দেখছিল রেখাটা, চমকে উঠল এমন সময়—ওর হাত ধরে টান দিয়েছে কেউ অথবা কিছু একটা।

ঘুরল রানা।

ওর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে আছে রেমি, ফ্ল্যাশলাইটের

উজ্জ্বল আলো ধরে রেখেছে মেঝের দিকে, জড়াজড়ি করে থাকা বার্নাকল আর আগাছা ভেদ করে কিছু একটা দেখতে বলছে রানাকে।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানাও, নিচু করল নিজের ফ্ল্যাশলাইট। লম্বা একটা ছুরির মতো কী যেন পড়ে আছে, আবছামতো দেখা যাচ্ছে।

হাত বাড়িয়ে দিল রানা—মেঝে থেকে আলগা করতে চায় ব্লেডটা। কিন্তু পারল না—ব্লেডটা হাতে নেয়ামাত্র টুকরো টুকরো হয়ে গেল ওটা। রানার হাতে রয়ে গেল কেবল জীর্ণ এক টুকরো কাঠ।

সময় নিয়ে কাঠের টুকরোটা দেখল রানা, তারপর ওটা ঢুকিয়ে রাখল নিজের ডাইভব্যাগে। উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল দেয়ালের দিকে, আঁকাবাঁকা রেখাটার কাছাকাছি। হাতের ইশারায় ডাকল রেমিকে। সাঁতরে রানার কাছে চলে এল মেয়েটা। দু'জনে মিলে আরও কিছুটা জায়গা পরিষ্কার করল দেয়ালের, রেখাটা কী সে-সম্বন্ধে এখন মোটামুটি স্পষ্ট একটা ধারণা জন্মে গেছে দু'জনের মনেই।

রেমির কাঁধে টোকা দিল রানা, মেয়েটা ওর দিকে তাকানোর পর নিজের হাতঘড়ি দেখিয়ে টোকা দিল সেটাতেও। বুঝিয়ে দিল, ওপরে যাওয়ার সময় হয়েছে। মাথা ঝাঁকিয়ে জানিয়ে দিল রেমি, রাজি আছে সে।

ট্রেইলমার্কারের দাগ ধরে প্রথম চেম্বারে হাজির হয়েছে ওরা, বড় পাথরটার দিকে এগোতে যাবে, ঠিক এমন সময় ঘটল দুর্ঘটনা।

সাঁতার কাটছিল বলে অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো রানার আর রেমি দু'জনেরই। মনে হলো হঠাৎ যেন নড়ে উঠেছে চারপাশ, দুলে উঠেছে পানি, অস্পষ্ট কিন্তু সন্দেহাতীত একটা গুড়গুড় শব্দ শোনা যাচ্ছে কাছেই কোথাও।

ভূমিকম্প হচ্ছে, টের পেয়ে ভয়ে রেমির হাত থেকে ছুটে গেল

ওর ফ্ল্যাশলাইট, সাঁতার কাটা বন্ধ হয়ে গেল মেয়েটার, পেছনদিক থেকে জড়িয়ে ধরল সে রানাকে।

সাঁতার কাটা বন্ধ হয়ে গেছে রানারও, কারণ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ধসে পড়ছে একটার পর একটা লাইমস্টোন ব্লক, স্তূপাকারে জমা হচ্ছে একটার ওপর আরেকটা, নিয়তি গড়ে দিচ্ছে পাথরের অলঙ্ঘনীয় দেয়াল।

দেখতে দেখতে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল চেম্বার থেকে টানেলে বের হওয়ার ফাটলটা।

জম্বি এসেছে ভেবে দরজাটা খোলার জন্য এগোচ্ছিল রুব, তীব্র একটা ঝাঁকুনি অনুভব করল এমন সময়, মাথাটা টলে উঠল ওর। হাত বাড়িয়ে কিছু একটা ধরতে গিয়ে ছুটে গেল কাঁচের প্রদীপটা, মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেল। বসে পড়তে বাধ্য হলো রুব, ওর পায়ের কাছে ছড়িয়ে-পড়া কেরোসিনে আগুন ধরে গেছে। দু'বার গড়ান দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল সে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে মেঝের আগুন।

বাইরে নারকেল গাছগুলোতে বাসা-বাঁধা পাখিগুলো পাগল হয়ে গেছে যেন, তারস্বরে চেঁচাচ্ছে একসঙ্গে। ঢেউয়ের গর্জন আরও বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে। আরও ঘন হয়েছে সন্ধ্যার অন্ধকার, তবে রুবর কুঁড়েঘরের ভেতরটা যথেষ্ট আলোকিত।

দরজায় টোকা পড়ল আবারও, আগের চেয়ে জোরে। উঠে দাঁড়াল রুব, ভুলেই গিয়েছিল জম্বির কথা। দ্রুত পায়ে রওয়ানা হলো দরজার দিকে, প্রেয়সীকে ঘরের বাইরে অপেক্ষা করিয়ে রাখাটা খাঁটি প্রেমিকের লক্ষণ না। কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে সে জম্বির যৌবনপুষ্ট শরীরটা।

হুড়কো সরিয়ে দরজাটা খোলামাত্র স্বপ্নের রঙিন জগৎ থেকে বাস্তবের নিষ্ঠুর পৃথিবীতে অবতরণ করল যেন রুব।

গুণ্ডামার্কা দুটো লোক দাঁড়িয়ে আছে। এবং একনজর দেখেই বলে দেয়া যায়, নেশা করেছে দু'জনই। ঘরের ভেতরের উজ্জ্বল

আলোর কারণে ওদের ঘোরলাগা রক্তলাল চোখগুলো দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না রুবর। এবং একই কারণে, ওকে চিনতে পারামাত্র, লোক দুটোর হাতে ভোজবাজির মতো বেরিয়ে-আসা ভোজালি দুটো দেখতেও অসুবিধা হলো না ওর।

রুবর বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হলো, জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নটা দেখছে এখন।

প্রথম ভোজালিটা আমূল ঢুকে গেল ওর পেটে, এক মুহূর্ত পরই দ্বিতীয়টা নামল ওর চাঁদি বরাবর; কিন্তু একটু নড়ে যাওয়ায় কপাল চেঁছে নেমে দ্বিখণ্ডিত করে দিল নাকটা, কেটে ঝুলিয়ে দিল নিচের ঠোঁট। একটা চিৎকার আপনাআপনি বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল ওর গলা দিয়ে, তলপেটে প্রচণ্ড একটা লাথি খেয়ে তিন-চার হাত পিছিয়ে গেল সে, মরে গেল চিৎকারটা।

ঘরে ঢুকল দুই গুণ্ডা।

এবার দু'জনে একসঙ্গে ভোজালি চালাল ওরা রুবর শরীরে এখানেওখানে, উপর্যুপরি কয়েকবার। প্রতিবারই চেঁচাতে গিয়ে শুধু গুঙিয়ে উঠতে পারল রুব, প্রতিবারই বাধা দিতে গিয়ে পরিণত হলো জোড়া ভোজালির নিষ্ঠুর শিকারে। শেষপর্যন্ত যখন লুটিয়ে পড়ল মেঝের আগুনের ওপর, ভোজালির ক্ষত আর লেলিহান অগ্নিশিখার মধ্যে কোন্‌টা বেশি বেদনাদায়ক তা বোঝার মতো বোধশক্তি থাকল না ওর।

'হয়েছে,' জড়ানো গলায় এক গুণ্ডা বলল তার সঙ্গীকে, 'শুয়োরের বাচ্চা মরবে এখনই।'

'হুঁ, এখনই মরবে,' আগেরজনের চেয়েও বেশি জড়ানো গলায় জবাব দিল অন্যজন, খিকখিক করে হাসল। 'সোগাভেরের হুমকি সত্যি হলো—প্রতিশ্রুতিশীল এক রিফর্মড্ ডেমোক্রেটকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়ে নিজেদের দুই কর্মী হত্যার বদলা নিল রিপাবলিকানরা।' হাসল আবারও।

'কেটে পড়ি, চল্।'

দ্রুত বাইরে চলে এল ওরা দু'জনে, এদিকওদিক দেখে নিয়ে

বইঘর.কম

রাতের আঁধারে মিলিয়ে গেল দ্রুত।

আধ ঘণ্টা পর, ওদের মতোই চোরা চাহনিতে এদিকওদিক দেখতে দেখতে রুবর দরজায় হাজির হলো জম্বি। আশ্চর্য লাগছে মেয়েটার—ঘরের দরজা তো এভাবে খোলা থাকার কথা না!

ঘরের ভেতরে রুবর মৃতদেহটা দেখামাত্র একটা আর্তচিৎকার উঠে আসছিল জম্বির গলা দিয়ে, দু'হাতে নিজের মুখ চেপে ধরে থামাল সে চিৎকারটা। বমি বমি লাগছে ওর, কিন্তু মানসিক শক্তি খাটিয়ে দমন করল বিবমিষা—কিছুতেই বমি করা যাবে না এখন, অন্তত এখানে তো না-ই। ওকে বলেছিল রুব, 'চুপিসারে এসো, যাতে কেউ কিছু না জানে,' যতটা চুপিসারে এসেছে সে, তারচেয়েও বেশি চুপি চুপি পালাতে হবে এখন।

পরকীয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে, যাতে কেউ কিছু না জানে।

দৌড় দিয়ে রুবর ঘর থেকে বের হলো জম্বি, পাগলপারা হয়ে ছুটছে ফিরতি পথে।

আফটার শক আসবে কি না ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল রানা, কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও সে-রকম কিছু হলো না। আলোড়ন জেগেছে আশপাশের পানিতে, আশ্চর্যজনকভাবে বেড়ে গেছে প্রাণিকণা আর আগাছার পরিমাণ। আরও কিছুক্ষণ পর থিতিয়ে এল সব।

রানাকে ছেড়ে দিয়েছে রেমি, কাঠপুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে ওর পেছনে। কী করতে হবে, বুঝতে পারছে না।

ওর দিকে তাকাল রানা। ফ্ল্যাশলাইট ছুটে গেছে মেয়েটার হাত থেকে, মেঝেতে পড়ে জ্বলছে, নিচু হয়ে ওটা তুলে নিল রানা, ধরিয়ে দিল রেমির হাতে। দৃষ্টি আকর্ষণ করল মেয়েটার, হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিল সব ঠিক আছে, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। আরও জানাল, এখান থেকে বের হওয়ার জন্য বিকল্প পথ খুঁজতে হবে ওদেরকে; রেমির কাজ হচ্ছে সাহস রাখা এবং রানার সঙ্গে থাকা।

বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রেমি।

এদিকওদিক আলো ফেলছে রানা। কেন যেন মেনে নিতে পারছে না, এই চেম্বারে ঢোকার জন্যে একটা মাত্র ফাটল ছিল এত লম্বা একটা দেয়ালের গায়ে। রানাদের আগে যে বা যারা ঢুকেছে এখানে, হয়তো ওই একটা ফাটলই নজরে এসেছে ওদের, যন্ত্রপাতির সাহায্যে বড় করেছে ওটা পরে। লাইমস্টোনের ব্লক পড়ে আটকে যাওয়া জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেল ও, কিন্তু বেশি কাছে গেল না। একবার ভাবল ব্লক সরানোর চেষ্টা করে দেখবে কি না, কিন্তু পরমুহূর্তে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। কাজটা করতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। ওপর থেকে নতুন কোনও ব্লক খসে পড়লে চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে যাবে দু'জনই।

আর ভাবতে চাইল না রানা। হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিল রেমিকে, ডানদিকে এগোবে ও। দেয়াল থেকে নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব বজায় রেখে এগোতে শুরু করল, দেয়ালটা থাকল হাতের বাঁয়ে। একটা চিন্তা খেলা করছে ওর মাথায়, সেটা যদি সত্যি হয় তা হলে এ-যাত্রা বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ওদের।

কথায় আছে, নদীর এ-কূল ভাঙে তো ও-কূল গড়ে। ভূমিকম্পের কারণে ব্লক ধসে আটকে গেছে একদিকের ফাটল, একই কারণে দেয়ালের অন্য কোথাও নতুন ফাটলও তো তৈরি হয়ে থাকতে পারে? হয়তো ওপরের দিকে ব্লকের চাপে নিচের বালিতে দেবে গেছে কোনও ব্লক, সেখান দিয়ে শরীরটাকে কোনওরকমে মুচড়ে হয়তো বের হতে পারবে একটা মানুষ...

যা ভেবেছিল, ঠিক তা-ই। পনেরো-বিশ গজের মতো এগোনোর পর অনেকটা ত্রিকোণাকৃতির একটা ফাটল দেখা গেল; একনজরেই বলে দেয়া যায় সদ্য তৈরি হয়েছে। ওটার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা, ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল বাইরে।

কিশোরীরা চুলে বেণী করার কাজে যে-রকম ফিতা ব্যবহার করে, সে-রকম ফিতার মতো সবুজ রঙের লম্বা, সামুদ্রিক শ্যাওলা ভাসছে ও-প্রান্তের পানিতে। দিগ্‌ভ্রান্তের মতো কিছু মাছ ছুটে

বইঘর.কম

বেড়াচ্ছে ওগুলোর আশপাশে, উজ্জ্বল আলো দেখামাত্র ছুটে পালাল সবগুলো।

পিঠ সোজা করল রানা, চিন্তিত হয়ে তাকিয়ে আছে ফাটলটার দিকে। ওটা এত সরু যে, ওখান দিয়ে রেমির মতো ছোটখাটো আর হালকাপাতলা একটা মেয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে হয়তো, কিন্তু রানার মতো চওড়া কাঁধওয়ালা কেউ পারবে না। কী করা যায় ভাবল ও কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল।

হাতের ইশারায় জানাল রেমিকে, ফাটলটা দিয়ে বের হতে পারবে না ও, কিন্তু রেমিকে করতে হবে কাজটা। ওপরে গিয়ে খবর দিয়ে নিয়ে আসবে সে হেক্টর আর রিকার্ডোকে, ওরা পরে উদ্ধার করবে রানাকে।

ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রেমি, চেহারায় মাস্ক থাকার পরও বোঝা যাচ্ছে হতাশা ও অনিচ্ছা একসঙ্গে খেলা করছে মেয়েটার দু'চোখে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করল না সে। হাতের ইশারায় রানাকে কিছু একটা জানাতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে, এগোচ্ছে ফাটলটার দিকে।

কিন্তু পেছন থেকে ওর একটা পা চেপে ধরল রানা। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রেমি।

এগিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে লম্বা করে দম নিতে ইশারা করল রানা, জানাল চেপে ধরে রাখতে হবে সেটা। ওর কথামতো কাজ করল রেমি। দ্রুত আর অভ্যস্ত হাতে মেয়েটার এয়ার সিলিণ্ডার খুলে নিল রানা, তারপর হাতের ইশারায় বেরিয়ে যেতে বলল ফাটল দিয়ে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে রেমি, কিন্তু মাত্র একটা সেকেণ্ড, তারপরই শরীরটা মুচড়ে বেরিয়ে গেল ফাটল দিয়ে। বুঝতে পেরেছে, এয়ার সিলিণ্ডারসহ ওখান দিয়ে বের হওয়া সম্ভব হতো না এমনকী একটা কিশোরীর পক্ষেও। ফাটলের ওপাশে গিয়েই উঁকি দিল সে, সঙ্গে সঙ্গে ওর এয়ার সিলিণ্ডার আর ফ্ল্যাশলাইট ফেরত দিল রানা। দু'হাতের ইশারায় তাড়াতাড়ি ওপরে ওঠার জন্যে তাগাদা দিল।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ গেল না রেমি, এখনও দেখছে রানাকে—কী দেখছে সে-ই জানে। আবারও আগাদা দিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে গেল মেয়েটার মাস্কপরা মুখটা।

দেয়াল থেকে একটুখানি সরে গিয়ে চেম্বারের মেঝেতে আরাম করে বসে পড়ল রানা, ফিনপরা পা দুটো মেলে দিল সামনে। জ্বলন্ত ফ্ল্যাশলাইটটা নামিয়ে রাখল হাতের নাগালে। হাতঘড়ি দেখল, অনুমান করার চেষ্টা করল আর কতক্ষণ ওকে ব্যাকআপ দিতে পারবে ওর এয়ার সিলিণ্ডার। রেমির ওপরে যেতে কত সময় লাগবে, হেক্টর আর রিকার্ডোকে নিয়ে ফিরে আসতেই বা কতক্ষণ লাগবে, অনুমিত সময়ের সঙ্গে মিলিয়ে নিল হিসেবটা।

আপাতত অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই ওর।

না, ঠিক হলো না কথাটা। অপেক্ষা করা ছাড়াও কিছু কাজ আছে রানার।

মাথাটা ঠাণ্ডা করতে পারে ও, ধরে নিতে পারে ওপরে উঠতে গিয়ে হঠাৎ কোনও হাঙরের আক্রমণের শিকার হবে না রেমি, আশা করতে পারে ওর অনুমিত সময়ের মধ্যেই হাজির হয়ে যাবে হেক্টর আর রিকার্ডো, বিশ্বাস করতে পারে আবারও মুক্তবায়ুতে বুক ভরে দম নিতে পারবে ও। এবং, বাইরের সাহায্য আসার আগপর্যন্ত, কাজে লাগাতে পারে মগজটাকে।

ইসাটাবুতে আসার পর থেকে শুরু করে এই চেম্বারে আটকা পড়ার আগ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, সব দেখতে শুরু করল রানা স্মৃতির পর্দায়, একে একে, স্লো মোশনে।

বাড়ির উঠোনে ঢোকামাত্র হড়হড় করে বমি করল জম্বি।

একটু আগে ভূমিকম্প হয়েছে, আর প্রাকৃতিক ওই দুর্যোগকে যমের চেয়েও বেশি ভয় পায় মেয়েটার শাশুড়ি, তাই ঘর থেকে বের হয়ে, নারকেলপাতার দড়ি দিয়ে স্থানীয় কায়দায় বানানো খাটিয়ায় শুয়ে ছিল বুড়ি; ছেলের বউকে উঠোন ভাসিয়ে বমি করতে দেখে যা বোঝার বুঝে নিয়ে মুচকি হাসল, বিড়বিড় করে

বইঘর.কম

ধন্যবাদ দিল যিশুকে।

শাশুড়িকে দু'চোখে দেখতে পারে না জম্বি, শুধু সে কেন, পৃথিবীর অনেক মেয়েই হয়তো পারে না; তাড়াহুড়ো করে কুলি করে নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা ভিড়িয়ে দিল। প্রায় ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিল ঘরের একমাত্র খাটে।

কী করা যায় এখন? কী করলে ওর এ-কূল ও-কূল দু'কূলই রক্ষা হয়?

যিশু ওকে বাঁচিয়েছেন হাতেনাতে ধরা পড়া থেকে, কিন্তু একইসঙ্গে একটা অসহ্য দায়িত্ববোধ ঢুকিয়ে দিয়েছেন ওর মনে। এবং সময় যত যাচ্ছে, সেটা তত বেশি করে খোঁচাচ্ছে জম্বিকে। আসলে সেভাবে কখনোই ভালোবাসেনি সে রুবকে—পরকীয়া প্রেমকে আর যা-ই বলা যাক ভালোবাসা বলা যায় না, স্বামীর কাছে সুখ পেত না বলে মুখ ফিরিয়েছে পরপুরুষের দিকে, ওকে সুন্দর অনেকগুলো মুহূর্ত উপহার দিয়েছে রুব। এবং এ-কথাও সত্যি, খুন করা হয়েছে লোকটাকে।

কী করা যায় তা হলে?

মাকানু'র কথা মনে পড়ে গেল জম্বির।

মাকানু—জম্বির প্রাণের সখী, যে মেয়ে জানে জম্বির সব গোপন কথা, এবং যার সব গোপন কথা জানে জম্বি। মাকানু—সার্জেন্ট ফুগুইয়ের বোন। মাকানু—যাকে যদি সার্জেন্ট মারতে মারতে মেরেও ফেলে, তবুও বলবে না কীভাবে জানতে পেরেছে রুবর হত্যাকাণ্ডের খবর।

বালিশের নিচ থেকে নিজের মোবাইল ফোন বের করল জম্বি।

পোসেইডনের ডেকে এখন ছ'টা ফোল্ডিংচেয়ার পাতা। খাটানো হয়েছে একটা ফোল্ডিংটেবিলও, সেখানে পরিবেশন করা হয়েছে ডিনার—সাগর থেকে ধরা টাটকা মাছের বারবিকিউ, ঝাল ঝাল করে রান্নাকরা গলদা চিংড়ি, জলপাই তেলে মাখানো লেটুস পাতা-গাজর-টমেটোর সালাদ, আর ঠাণ্ডা বিয়ার। ওদের মাথার

ওপর তারাজ্বলা আকাশ, আর একফালি চাঁদ। টেবিলের ওপরে, মাঝামাঝি জায়গায়, মাথার ওপর জ্বলছে কম পাওয়ারের একটা বাল্‌ব্‌। খাচ্ছে ওরা সবাই, টুকটাক কথা বলছে।

"উদ্ধার" করা হয়েছে রানাকে। ওর সিগনাল ঠিকমতোই বুঝতে পেরেছিল রেমি, ওপরে উঠে এসে হড়বড় করে সব বলে সে কটনকে। তখন কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল হেক্টর আর রিকার্ডো, রেমির কথা শেষ হওয়ামাত্র প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্রপাতিসহ লাফিয়ে নামে ওরা পানিতে। একটা বাড়তি এয়ার সিলিণ্ডার নিয়ে পানিতে নামে রেমিও। হেক্টর আর রিকার্ডো পৌঁছে যায় প্রথম ফাটলটার কাছে, আর রেমি যায় যে-ফাটল দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল সে সেটার কাছে, বাড়তি এয়ার সিলিণ্ডারটা দেয় রানাকে। হেক্টর আর রিকার্ডো ততক্ষণে তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজে লেগে গেছে, অভিজ্ঞ ও দক্ষ হাতে জায়গা বানাতে শুরু করেছে ধসেপড়া ব্লকগুলোর মাঝে। কাজটা শেষ করতে ঘণ্টাখানেক লেগে যায় ওদের, তারপর রানাকে নিয়ে সবাই উঠে আসে ওপরে।

রানার দিকে তাকাল কটন। 'নিচে অনেকক্ষণ ছিলে তোমরা। দুটো চেম্বার দেখলে। কিন্তু শামানের তথাকথিত গুপ্তধনের কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল না অন্যকিছুও।'

চিংড়ির বাকি টুকরোটাও মুখে ঢোকাল রানা। ওটা ভালমত চিবিয়ে নিয়ে বলল, 'কিছুই পাওয়া যায়নি, তা কিন্তু ঠিক নয়।'

ওর দিকে তাকাল বাকি সবাই।

'মানে?' জানতে চাইল টনি।

'মানে, প্রথমেই পরিষ্কার জানিয়ে দেয়া দরকার, কী পাওয়া যায়নি। নিচের ধ্বংসাবশেষে কোনও গুপ্তধন নেই।'

কারও মুখে কোনও কথা নেই।

'প্রথমে বড় একটা ঘরে গিয়েছিলাম আমরা,' বলে চলল রানা। 'সেটার নিচে ছোট একটা চেম্বার আছে। ওটা দেখে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে, এককালে রাজকীয় সিন্দুক হিসেবে ব্যবহৃত হতো ওটা।'

‘কেন বললে কথাটা?’ জিজ্ঞেস করল কটন।

‘ওটার দেয়ালে, লাইমস্টোনের ব্লকে, আঁকাবাঁকা খাঁজ আছে—খোদাইকরা। বার্নাকল আর সামুদ্রিক আগাছা ভালোমতো পরিষ্কার করার আগে নিশ্চিতভাবে বলার উপায় নেই যদিও, তারপরও আমার মনে হয়, ওগুলোও হায়ারোগ্লিফিক্স। যেহেতু রাজা শামানের আমলে সনাতনী ধর্ম প্রচলিত ছিল ইসাটাবুতে, সেহেতু খোদাইকর্মগুলো ইঙ্গিত দিচ্ছে, প্রাসাদের সঙ্গে একটা মন্দিরও বানানো হয়েছিল, এবং সেখানে নৈবেদ্য সঞ্চয় করে রাখার ব্যবস্থা ছিল।’

‘পুরোটাই কি অনুমান?’

‘হ্যাঁ, অনুমান; কিন্তু ওই যে বললাম, কারণ আছে—খাঁজগুলো পূরণ করা হয়েছে সোনা দিয়ে।’

‘সোনা!’ তাজ্জব হয়ে গেছে রিকার্ডো।

‘কিন্তু...’ হিসেবটা মেলাতে পারছে না টনি, ‘এই মাত্র না বললে নিচে কোনও গুপ্তধন নেই?’

‘বলেছি। আমার কথাটার মানে হলো, নিচে গুপ্তধন নেই, কিন্তু গুপ্তধন থাকার ইঙ্গিত আছে। যেগুলো সরানো সম্ভব ছিল, সরিয়ে ফেলা হয়েছে আগেই; আর যা সরানো সম্ভব হয়নি, সরানো সম্ভব নয়, সেগুলো রয়ে গেছে। বার্নাকল আর আগাছা পরিষ্কার করে ব্লকের গা থেকে খোদাইকরা সোনা আলাদা করা প্রায় অসম্ভব, কারণ ব্লকগুলো পানির নিচে আছে। একটুখানি সোনা আলাদা করামাত্র তা গুঁড়ো হয়ে ভেসে চলে যায় পানির সঙ্গে, দেখেছি আমি।’

‘সরিয়ে ফেলা হয়েছে?’ কটনের কণ্ঠে দ্বিধা। ‘কারা করল কাজটা? আমাদের আগে কারা হাজির হলো ওই মন্দিরে?’

রেমির দিকে তাকাল রানা। ‘ভাউযা?’

ঠোঁট উল্টিয়ে জানিয়ে দিল মেয়েটা, নিশ্চিত না সে ওই ব্যাপারে।

কটনের দিকে তাকিয়ে রানা বলল, ‘একা একটা লোকের

পক্ষে সঙ্গীদের অজান্তে গুপ্তধনের সামান্য অংশ সরানোর কাজ অসম্ভব নয়, কিন্তু খুব কষ্টসাধ্য। আমার মনে হয় ভাউয়া করেনি কাজটা, কারণ অত সময় পায়নি সে। আমার মনে হয়...একদল ডুবুরি জড়িত ছিল কাজটার সঙ্গে। আধুনিক যন্ত্রপাতির বদলে মান্ধাতার আমলের জিনিসপত্র ছিল ওদের সঙ্গে, তাই দেয়ালের ফাটল যেমনতেমনভাবে বড় করতে হয়েছে ওদেরকে। সম্ভবত সার্ফেস ব্রিদিং ইক্যুইপমেন্ট ব্যবহার করছিল ওরা, কাজ করার সময় দেয়ালের জায়গায় জায়গায় ঘষা খেয়েছে হোসপাইপ, খেয়াল করলে দেখা যায় সে-দাগও। নিজেদের উপস্থিতি গোপন করার কোনও চেষ্টাই করেনি ওরা।'

'কিন্তু...' মাথা নাড়ছে টনি, 'ওরা কারা?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল রানাও। 'নতুন একটা ধাঁধার মধ্যে পড়লাম বলে মনে হচ্ছে। তবে ধাঁধাটা সমাধান করার জন্য আমাদের হাতে একটা সূত্র আছে মনে হয়।'

'সূত্র?'

"গুপ্তধনের সিন্দুকে" পাওয়া কাঠের টুকরোটা, পায়ের কাছে রাখা ডাইভব্যাগ থেকে বের করল রানা; দেখল কিছুক্ষণ। তারপর ওটা ধরিয়ে দিল টনির হাতে, একে একে দেখতে লাগল বাকিরাও।

'কী এটা?' কিছুই বুঝতে পারছে না টনি। 'পাওয়ার কথা ছিল গুপ্তধন, অথচ পাওয়া গেল একটুকরো কাঠ?'

মাথা নাড়ল রানা, দৃষ্টিতে হতাশা। 'এটা যদি মামুলি একটুকরো কাঠই হবে, তা হলে কি ব্যাগে ঢুকিয়ে ওপরে নিয়ে আসতাম? এটা নিয়ে আলোচনা করতাম?'

'ঠিকই তো!' বিব্রত ভঙ্গিতে হাসল টনি। 'খেয়াল করিনি ব্যাপারটা। কিন্তু...এটা আসলে কী?'

'একটা বেয়োনেটের সাপোর্টিং হ্যাণ্ডেল।'

'বেয়োনেট! কোথায় সেটা?'

'উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে

বইঘর.কম

পানির নিচে থাকতে থাকতে মরচে ধরে গিয়েছিল পুরো জিনিসটাতে, চেম্বারের মেঝে থেকে ওটা তোলামাত্র টুকরো টুকরো হয়ে গেল।'

'তারমানে...' এবার হিসেব মেলাতে পারছে না কটনও, 'আমাদের আগে যারা হাজির হয়েছে ওই চেম্বারে, তাদের সঙ্গে বেয়োনেট ছিল?'

মুচকি হাসল রানা। 'বিভ্রান্তিকর মনে হচ্ছে, না? কিন্তু যদি বলি, বেয়োনেটওয়ালা লোকগুলো ইদানীংকার না, বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমলের, তা হলে কেমন লাগবে?'

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ!' চোখ পিটপিট করছে রিকার্ডো। 'তারমানে...তুমি বলতে চাচ্ছো...'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'পুরনো বেয়োনেটের ব্যাপারে নিজেকে বিশেষজ্ঞ বলে দাবি করব না আমি, ভালোমতো দেখতেও পারিনি সেটা, কিন্তু যতটুকু দেখেছি, আমার কাছে তা-ই মনে হয়েছে। ...একটু ভেবে দেখো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকের কথা। দখলদার জাপানি বাহিনী আর আমেরিকানদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলছে ইসাটাবুতে। যে-কোনও একটা বাহিনী, অথবা যে-কোনও একটা বাহিনীর একদল লোক যেভাবেই হোক জেনে গেছে, দ্বীপটার সৈকতের কাছেই সাগরের নিচে পড়ে আছে প্রাচীন গুপ্তধন। বেশি সময় ছিল না ওদের হাতে, তাই খুব তাড়াহুড়ো করতে হয়েছিল। যেভাবে পেরেছে গিয়ে ঢুকেছে ওই চেম্বারে, সরিয়ে ফেলেছে সব গুপ্তধন।'

'কিন্তু...কাজটা কাদের? জাপানি, নাকি আমেরিকানদের?'

'নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছি,' কটনের দিকে তাকাল রানা। 'তোমার ইন্টারনেট কম্পিউটারটা চাই আমার।'

মাথা ঝাঁকাল কটন। 'অবশ্যই।'

ষোলো

একটানা অনেকক্ষণ নেটে কাজ করার পর পিছনদিকে পিঠ বাঁকিয়ে আড়মোড়া ভাঙলো রানা, ডাকল রেমিকে, মেয়েটা আসার পর বলল, 'যা ভেবেছিলাম—জাপানিজ আর্মি টাইপ বেয়োনেট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার।'

'রাইফেলের ধরন কী?' জিজ্ঞেস করল রেমি।

'আরিসাকা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানি সৈন্যদের ব্যবহৃত সবচেয়ে কমন রাইফেল। যুদ্ধের সময় আমেরিকান সৈন্যরা যে-রকম রাইফেল ব্যবহার করত, সেগুলোর বেয়োনেটের হ্যাণ্ডেল এই হ্যাণ্ডেল থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। এটার একপ্রান্তে হালকা মার্কিং আছে, দেখেছ? এটা একরকম জাপানি প্রতীক, ওদের ভাষায় বলে আওবা।'

'মানে কী শব্দটার?'

'ওটা আসলে একটা জাপানি রেজিমেন্টের সাঙ্কেতিক নাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, কৌশলগত কারণে, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ গুরুত্বপূর্ণ ছিল জাপানিদের কাছে। ওসব দ্বীপ দখল করে রাখার মাধ্যমে ওরা আসলে ওদের নৌবাহিনীকে চমৎকার সাপোর্ট দিতে পারছিল। পরে মিত্রবাহিনী বুঝতে পারে, জাপানি নৌবাহিনীকে কাবু করতে হলে আগে সলোমন দ্বীপপুঞ্জের দখল নিতে হবে। যা-হোক, দ্বীপপুঞ্জের একেক দ্বীপে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর একেকটা দলের আলাদা আলাদা নাম ছিল। ইসাটাবুর বাহিনীটার নাম আওবা রেজিমেন্ট—চতুর্থ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের তিন নম্বর ব্যাটেলিয়ন।'

বইঘর.কম

'কবে নাগাদ ইসাটাবুর দখল নেয় ওরা?'

'উনিশ শ' একচল্লিশের মাঝামাঝি সময়ে।'

'ছিল কতদিন?'

'আড়াই বছরের মতো।'

ঘাড় ঘুরিয়ে পাইলটহাউসের খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রেমি। চাঁদ নেই, কয়েকটা তারা মিটমিট করছে; অন্ধকারের পটভূমিতে একটা বাতিঘর আর বন্দরটার কৃত্রিম আলোয় আলোকিত হয়ে আছে পয়েন্ট ক্রুয, কিন্তু তারপর যত ভেতরের দিকে নজর যায়, অন্ধকার তত ঘন।

হাই তুলে আরও একবার আড়মোড়া ভাঙল রানা। 'রেমি, চলো রেডিয়ো শুনে দেখি নতুন কোনও খবর আছে কি না।'

পিজিন ভাষায় খবর প্রচারিত হচ্ছে, যার মানে জানা গেল রেমির কাছ থেকে: উত্তেজিত জনতার সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ থেমেছে বিকেলের দিকে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে পুলিশ। পরবর্তী ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত ইসাটাবুর যে-কোনও সড়কে সবধরনের সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে জনা চল্লিশেক বিশৃঙ্খলা-সৃষ্টিকারীকে, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হয়েছে আরও প্রায় পঞ্চাশজনের মতো। দ্বীপের নাজুক জায়গাগুলোর ওপর কড়া নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। বিদেশিদের নিরাপদ প্রস্থানের ব্যাপারে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, চাইলে পুলিশপ্রহরায় বিমানবন্দর পর্যন্ত যেতে পারবে যে-কোনও ভিনদেশী নাগরিক।

রানা খেয়াল করল, দ্য মিউটিনিয়ার্সের ব্যাপারে কিছু বলা হলো না খবরে। ওদের ব্যাপারে সরকারের মনোভাব কী, জানা গেল না।

বিবিসি'র ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া অন্য একটা খবর গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো রানার কাছে: আব্রাহাম রুব নামের এক রিফর্মড় ডেমোক্রেট কর্মীকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে লোকটার নিজ ঘরে, কেউ কেউ বলছে এটা প্রধানমন্ত্রী

সোগাভেরের হুমকির ফল, কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে একটা শব্দও উচ্চারণ করা হচ্ছে না এ-ব্যাপারে। উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে ডেমোক্রেটরা; হুমকি দিয়ে বলেছে, রুবর হত্যাকাণ্ডের কোনও সুরাহা যদি না করেন প্রধানমন্ত্রী, রক্তগঙ্গা বইয়ে দেয়া হবে সারা দ্বীপে।

তেমন বিশেষ কিছু জানা গেল না আর।

আগামীকাল সকাল থেকে আবার শুরু হবে খাটুনি, আপাতত করার মতো কিছু নেই; তাস নিয়ে বসে গেল কটন, টনি, হেক্টর আর রিকার্ডো। রানাকে ডাকল ওরা, কিন্তু ভোরে উঠতে হবে জানিয়ে নিজের কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়ল ও। বেশ কিছুক্ষণ এপাশওপাশ করার পর ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

ঘুম ভাঙার পর প্রথমেই হাতঘড়ি দেখল। রাত সাড়ে বারোটা।

কেবিনের ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার—সাধারণত আলো জ্বালিয়ে ঘুমায় না রানা, এমনকী ডিমলাইটও না। এবং সাধারণত ভোর পাঁচটার আগে ভাঙে না ওর ঘুম। তা হলে এখন ভাঙল কেন?

কারণ, অদ্ভুত একটা আওয়াজ হচ্ছে।

মনে হচ্ছে, কাছেই কোথাও ধ্বস্তাধ্বস্তি হচ্ছে যেন। মনে হচ্ছে, ওর বাঙ্কের পাশের দেয়ালটা ওপাশ থেকে নখ দিয়ে খামচাচ্ছে কেউ। এবং, মনে হচ্ছে, কেউ একজন অতি সন্তর্পণে ঘোরাচ্ছে ওর কেবিনের লক-করা দরজার হ্যাণ্ডেল।

অভ্যাসবশত বালিশের নিচে ডান হাত ঢুকিয়ে দিল রানা।

না, ওয়ালথার পিপিকে-টা নেই, থাকার কথাও না।

একটা গড়ান দিয়ে বিছানা ছাড়ল ও, বিড়ালের মতো নিঃশব্দে পা নামাল মেঝেতে, চলে এল দরজার কাছে। কেবিনের এদিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল বুক চিতিয়ে।

পাশের কেবিনটা রেমির, কী হচ্ছে সেখানে? মেয়েটাকে একলা পেয়ে কি কটন, টনি, হেক্টর বা রিকার্ডোর কেউ, অথবা

বইঘর.কম

কয়েকজন মিলে...

ছি, এসব কী ভাবছে রানা? ওরা জানে রানার সামান্য ইঙ্গিত পেলেই চাকরি নট করে দেবেন অ্যাডমিরাল হ্যামিল্টন।

তা হলে?

আবারও ঘোরানো হলো রানার দরজার হ্যাণ্ডেল।

বিদ্যুৎ-গতিতে ঘুরল রানা, বাঁ হাতে পুশবাটন লকের বোতাম টিপেই মোচড় দিয়ে খুলে ফেলল সেটা মুহূর্তের মধ্যে। হ্যাঁচকা টান মারল পাল্লায়, হাঁ হয়ে খুলে গেল সেটা। পরমুহূর্তে দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিশালদেহী লোকটার তলপেটে ডানপায়ের জোরালো লাথি মারল একটা।

আঘাতটা আশা করেনি বিশালদেহী, গুটিয়ে উঠল সে, পিছিয়ে গেল কয়েক কদম। পাইলটহাউসে জ্বলছে একটামাত্র বাল্ব্, ওটার অনুজ্জ্বল আলো ছায়ামূর্তি গড়ে দিয়েছে বিশালদেহীর, তারপরও লোকটাকে চিনতে অসুবিধা হলো না রানার।

মাকিরা-উলাওয়া'র সেই ছয়-ফুট-তিন-ইঞ্চি বডিবিল্ডার।

দাঁতে দাঁত পিষল রানা, বুঝে গেছে কী হচ্ছে পোসেইডনে।

খুনে একটা আবেগে থরথর করে কেঁপে উঠল ওর বুকের ভেতরটা। একলাফে বেরিয়ে এল পোসেইডনের ডেকে।

সামলে নিয়েছে বডিবিল্ডার, ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে আগে বাড়ল সে। ডান পায়ে ভর দিয়ে বিরাশি সিক্কার একটা ঘুসি হাঁকাল রানার চোয়াল লক্ষ্য করে। মাথাটা একপাশে সামান্য সরিয়ে নিল রানা, ফলে বডিবিল্ডারের ঘুসিটা চলে গেল ওর কাঁধের ওপর দিয়ে বাম কান ঘেঁষে। চট্ করে বডিবিল্ডারের ব্যায়ামপুষ্ট ট্রাইসেপ চেপে ধরল রানা দুইহাতে, তারপর সর্বশক্তিতে টান মারল নিচের দিকে। প্রথমে মড় মড় আওয়াজ শোনা গেল, পরমুহূর্তে মড়াৎ শব্দে কনুই ভেঙে উল্টে গেল বডিবিল্ডারের হাত। ব্যথায় আরেকবার গুটিয়ে উঠল বডিবিল্ডার। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ডেকের ওপর।

একটুও সময় না দিয়ে কিক মারল রানা বডিবিল্ডারের ঊরুসন্ধিতে—প্রেম আর যুদ্ধে সব জায়েজ। কাতল মাছের মতো হাঁ হয়ে গেল বডিবিল্ডারের মুখ, একই ভঙ্গিতে খাবি খাচ্ছে। আবছা অন্ধকারেও লোকটার বড় হয়ে-যাওয়া দুই চোখ দেখতে পাচ্ছে রানা। এত ভয়ঙ্কর মার খেয়েও আত্মরক্ষার তাগিদে উঠে দাঁড়াল লোকটা, টলমল করছে। একটা হাত সম্পূর্ণ অকেজো, অপর হাতটা সামনে বাড়িয়ে রেখেছে রানার পরবর্তী মার ঠেকাবে বলে। রানা এল একপাশ থেকে। খপ্ করে বাড়ানো হাতটা ধরে সেঁটে গেল ওর গায়ের সঙ্গে, পরমুহূর্তে নিখুঁত হিপ-থ্রো করল।

পুরো পোসেইডন কাঁপিয়ে ডেকের ওপর ধড়াস করে পড়ল বডিবিল্ডার। ততক্ষণে দু'পা পিছিয়ে গেছে রানা, এবার সামনে বেড়ে বডিবিল্ডারের বুক, পেট ও গলায় একের পর এক লাথি মারছে।

কাত হয়ে পড়ে থাকল বডিবিল্ডার, আগেই নড়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল, এবারের লাথিতে জ্ঞানটুকুও হারাল। এবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা রেমির দরজার দিকে।

খুলে গেছে সেটা, দরজায় দেখা দিয়েছে আরও দুটো ছায়ামূর্তি; এবং ওরাও রানার পূর্বপরিচিত।

খোদার-খাসি আর হ্যাংলাপাতলা।

রানাকে দেখল ওরা একনজর, দেখল বডিবিল্ডারকে, তারপর দু'জনেই বেরিয়ে এল ডেকে। হ্যাংলার শার্টের কয়েকটা বোতাম খোলা, প্যান্টের হুক আটকাচ্ছে সে, কাজটা শেষ হলে টান দিয়ে লাগাল জিপার।

খুনে আবেগে আরেকবার কেঁপে উঠে আগে বাড়ল রানা। যে-কোনও একটা অস্ত্রের খুব অভাব বোধ করছে ও। কটন আর ওর লোকদের কোনও খবর নেই কেন?

রানাকে আগে বাড়তে দেখে নিজের কোমরে থাবা চালাল খাসি, প্রায় এক হাত দীর্ঘ একটা ভোজালি বের করল। পায়ে পায়ে সরে যাচ্ছে হ্যাংলার কাছ থেকে।

বইঘর.কম

‘কী ভেবেছিলে?’ বাজে উচ্চারণে ইংরেজিতে রানাকে জিজ্ঞেস করল হ্যাংলা, ‘এত সহজে ছেড়ে দেব?’

‘না,’ উত্তরটা দিল টনি, পাইলটহাউসের দরজায় উদয় হয়েছে সে, হাতে একটা স্পিয়ারগান। ‘আমার হাতের এই জিনিসে এক্সপ্লোসিভ আছে, মিস্টার বাস্টার্ড। শুধু এক চুল নড়ো, ট্রিগারে টান দিতে দাও আমাকে, কসম খোদার টুকরো টুকরো হয়ে যাবে তুমি।’

পাথরের মতো স্থির হয়ে গেল হ্যাংলা।

এবং নিজের বাঁ চোখের ওপর রানার পাথরকঠিন মুঠির ঘুসিটা যখন খেল সে, মনে মনে স্বীকার করল, এই ভেসেলে আসাটা মস্ত ভুল হয়েছে।

ইচ্ছেমতো পেটাচ্ছে রানা হ্যাংলাকে, স্পিয়ারগান হাতে খাসিকে কভার দিচ্ছে টনি। রানার একের পর এক পাঞ্চ হজম করছে হ্যাংলা নিজের নাকে, মুখে, চোয়ালে। রক্তাক্ত এবং অর্ধেক সংজ্ঞাহীন অবস্থায় যখন লুটিয়ে পড়ল লোকটা ডেকের ওপর, তখনও রাগ কমেনি রানার। চড়ে বসল ও হ্যাংলার বুকের ওপর, ডান হাতে আরও কতগুলো ঘুসি মেরে বুজিয়ে দিল ও লোকটার দুই চোখ; তারপর উঠে দাঁড়িয়ে একের পর এক লাথি মারতে লাগল সারা শরীরে যেখানে খুশি। হুঁশ যখন ফিরল, তখন টের পেল কারা যেন টেনে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে ওকে। ঝাড়া মেরে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল ও লোকগুলোকে, না পেরে সবচেয়ে কাছের লোকটার কোমরে লাথি মারার জন্য পা তুলল। কিন্তু যখন বুঝল লোকটা রিকার্ডো, নিবৃত্ত হলো।

হাঁপাচ্ছে রানা।

হাঁপাচ্ছে ওকে জাপ্টে ধরে রাখা কটন, হেক্টর আর রিকার্ডোও। ফোঁপানির আওয়াজ আসছে রেমির অন্ধকার কেবিনের ভেতর থেকে।

রানার খুনে রূপ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছে টনি।

সুযোগটা নিল খাসি।

হাত থেকে ছেড়ে দিল সে ভোজালিটা, ভোঁতা আওয়াজ তুলে ডেকে আছড়ে পড়ল সেটা, সঙ্গে সঙ্গে উল্টো ঘুরে দৌড় দিল সে। লাফ দিয়ে পেরিয়ে গেল রেলিং, পরের লাফে সোজা গিয়ে পড়ল পানিতে। একটু পরই শোনা গেল ওর সাঁতার কাটার আওয়াজ।

শোনা গেল পিজিন ভাষায় কী যেন বলছে সে, তার কিছুক্ষণ পরেই গর্জন তুলে স্টার্ট নিল একটা ইঞ্জিনবোট। অন্ধকারে ঠিক বোঝা গেল না কোন্দিকে উধাও হয়ে গেল সেটা।

ধীর পায়ে হেঁটে রেমির দরজায় গিয়ে দাঁড়াল রানা।

'প্লিয, মিস্টার রানা,' রানাকে চিনতে পেরে কান্নায় ভেঙে পড়ল মেয়েটা, কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'প্লিয লাইট জ্বালাবেন না। ওরা আমার কাপড় ছিঁড়ে ফেলেছে।'

অ্যাডাম্স অ্যাপল খুব সংবেদনশীল একটা জায়গা, সেখানে রানার লাথি খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল বডিবিল্ডার, জ্ঞান ফিরে পেয়ে দু'বার বমি করল সে, মারা গেল রাত দুটোর দিকে।

এমনিতেই উত্তেজিত হয়ে আছে পুরো ইসাটাবু, মারমুখী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে পুলিশ, এই অবস্থায় যদি রটে যায়, বিদেশিদের একটা ভেসেলে যে-কোনও কারণেই হোক নিহত হয়েছে একজন দ্বীপবাসী, তা হলে ফলাফল কী হতে পারে সহজেই অনুমেয়। নিজেদের মধ্যে আলোচনা সেরে নিল ওরা, তারপর পানিতে নেমে ধ্বংসাবশেষটার কাছ থেকে একখণ্ড ব্লক নিয়ে এল রানা, ওটা দড়ি দিয়ে বডিবিল্ডারের পায়ে কায়দা করে বেঁধে ডুবিয়ে দিল লাশটা। কাজটা যখন করছে ও, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাইবেলের কয়েকটা মুখস্থ শ্লোক আউড়াল রিকার্ডো।

প্রচণ্ড মার খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে হ্যাংলা; টেনেহিঁচড়ে লোকটাকে একদিকের রেলিং-এর কাছে নিয়ে গেল রানা, বসিয়ে দিল সংজ্ঞাহীন অবস্থাতেও, তারপর রেলিং-এর সঙ্গে পিছমোড়া করে কষে বাঁধল দু'হাত।

পোসেইডনের পাঁচজন পুরুষের মধ্যে কটন সবার থেকে ছোটখাটো, ওর একটা টি-শার্ট আর একটা শর্টস দেয়া হয়েছে রেমিকে। ওগুলো পরে ডেকে এল মেয়েটা, ধাতস্থ হতে পেরেছে কিছুটা। ফোল্ডিংচেয়ারগুলো পেতে দিয়েছে টনি, প্রত্যেকের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে একটা করে ঠাণ্ডা বিয়ারের-ক্যান, নিজে নিয়েছে একটা।

'ঘুম আসছিল না আমার,' কী ঘটেছিল বলতে শুরু করল রেমি। 'একসময় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি, বারোটার কিছু বেশি বাজে। ক্যাপ্টেন কটন আর তাঁর সঙ্গীদের কথাবার্তা আর হাসাহাসির আওয়াজ পাচ্ছিলাম, বন্ধ হয়ে গেল সেটাও। কেবিনের দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম ডেকে। একদিকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম, আচমকা মনে হলো, কেউ যেন এসে দাঁড়িয়েছে আমার পেছনে।

'ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। চমকে উঠতে হলো সঙ্গে সঙ্গে—দাঁড়িয়ে আছে তিন গুণ্ডা। ওদের একজনের হাতে ভোজালি দেখামাত্র কুঁকড়ে গেলাম আমি; তাই লম্বাচওড়া লোকটা যখন আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে রওনা হলো আমার কেবিনের দিকে, তখন কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারার পরও বাধা দিতে পারলাম না, চেঁচাতেও পারলাম না।

'আমাকে নিয়ে কেবিনে ঢুকে দরজা আটকে দিল ওরা। ওদের দলনেতা, মানে দুবলাপাতলা লোকটা আমাকে বলল, "ভাউযা যা পেয়েছিল, আর তোমরা যা পেয়েছ, তা কি একই জিনিস?"

'কোনওরকমে বললাম, "ভাউযা কী পেয়েছিল, আমি জানি না।"

'পাতলা লোকটা বলল, "কিন্তু তোমরা কি পেয়েছ তা নিশ্চয়ই জানো? ...মুখ খোলো, নইলে ইজ্জত হারাবে।"

'ক্ষোভেদুঃখে আর নিজের অসহায়ত্বে চোখে পানি চলে এল আমার। কিছু বলতে পারলাম না।

'"মাসুদ রানা কোথায়?" জিজ্ঞেস করল পাতলা লোকটা।

‘“পাশের কেবিনে,” জানিয়ে দিলাম।

‘প্যান্টের হুক খুলল চিকন লোকটা। “এবার বলো কী পেয়েছ তোমরা।”

‘ইচ্ছের বিরুদ্ধেও বলে ফেললাম: একটা ধ্বংসাবশেষ পেয়েছি।

‘“কীসের ধ্বংসাবশেষ?”

‘রাজা শামানের প্রাসাদ আর মন্দিরের।

‘“ভেতরে গুপ্তধন ছিল?”

‘“না। ভেতরে কিছুই নেই।”

‘খিকখিক করে হাসল পাতলা লোকটা। “রাজকীয় কোনওকিছু পাওয়া যাবে, অথচ সেখানে গুপ্তধন থাকবে না—এটা হতে পারে না। শেষবার সুযোগ দিচ্ছি, কী পেয়েছ, বলো।”

‘কিছু পাইনি, বললাম। ততক্ষণে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে আমার—অভিশপ্ত একটা গুপ্তধনের জন্য নিজের ইজ্জত হারাব কেন? ওরা যা যা জানতে চাইবে সব বলে দেব। বললাম, আমাদের আগেই কেউ তুলে নিয়ে গেছে সবকিছু।

‘“তুলে নিয়ে গেছে! তোমাদের আগে? কারা?”

‘“জাপানি সৈন্যরা।”

‘ঠাস্ করে আমাকে একটা চড় মারল পাতলা লোকটা। “রূপকথার গল্প শুনতে আসিনি আমরা।”

‘কেঁদে ফেললাম আমি। কাকুতিমিনতি করতে শুরু করলাম। নাদুসনুদুস লোকটাকে ইঙ্গিত করল তখন পাতলা লোকটা, সঙ্গে সঙ্গে আমার গলায় ভোজালি ধরল লোকটা। আর...আমার ওপর...ঝাঁপিয়ে পড়ল পাতলা লোকটা। তবে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে আমার কাপড় ছিঁড়ে ফেলা পর্যন্তই, তার বেশি এগোতে পারেনি, যথেষ্ট সময় পায়নি আসলে। কারণ লম্বাচওড়া লোকটা বোধহয় থাকতে চাইছিল না এসবের মধ্যে, মিস্টার রানা কোথায় আছেন শোনার পরই আমার কেবিনের দরজা খুলে বের হয়ে যায় সে। কিছুক্ষণ পরই জোরালো একটা শব্দ পাওয়া যায় ডেক থেকে।

তখন আমাকে ছেড়ে দিয়ে দরজার দিকে দৌড় দেয় ভোজালিওয়ালা আর চিকন লোকটা।'

চুপ করে আছে ওরা সবাই।

'একটা ইঞ্জিনবোট নিয়ে এসেছিল লোকগুলো,' কিছুক্ষণ পর নীরবতা ভাঙল টনি, 'অথচ ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেলাম না কেন আমরা?'

'কারণ নিশ্চয়ই ইঞ্জিন চালিয়ে আসেনি ওরা,' বলল কটন। 'দাঁড় বেয়ে এসেছে। পালানোর সময় নিজেদের অস্তিত্ব গোপন করার দরকার ছিল না ওদের, তাই ইঞ্জিন চালু করেছে।'

'কিন্তু...ওরা ডেকে উঠল কীভাবে?' আবারও জিজ্ঞেস করল টনি।

'ডাইভিংল্যাডার,' বলল রানা। 'আমাকে তুলে আনার পর ওটা উঠিয়ে নেয়ার কথা মনে ছিল না কারও, আমারও না। একটু আগে ব্লক আনতে গিয়ে ল্যাডারটা নামানো অবস্থায় দেখে বুঝতে পেরেছি কোথায় ভুল হয়েছিল আমাদের। সুযোগটা নিয়েছে ওরা।'

'তারমানে...' রিকার্ডোর কণ্ঠে উদ্বেগ, 'ওরা আগে থেকেই নজর রাখছিল আমাদের ওপর?'

'প্রথম থেকেই,' বলল রানা। 'আসলে ভুল হয়েছে আমার। ওদেরকে খাটো করে দেখাটা উচিত হয়নি। ষণ্ডা-গুণ্ডা যা-ই হোক, ওরা অর্গানাইয্‌ড কোনও দলের সদস্য, বড় লাভের আশায় প্ল্যান মোতাবেক এগোচ্ছে। প্রথমে টার্গেট করেছে ভাউযাকে, এবং স্রেফ গায়েব করে ফেলেছে রেমির ভাই ইটেকে। ভাউযা হাসপাতালে, কারও সঙ্গে কথা বলার মতো অবস্থায় নেই সে, তাই নতুন করে টার্গেট করেছে রেমিকে। এই নিয়ে দু'দফা অ্যাটেম্পট্ নেয়া হলো মেয়েটার ওপর।'

'এখন তা হলে কী করা উচিত?' জানতে চাইল কটন।

'কী কী অপশন আছে আমাদের হাতে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

‘এই অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা করা এবং শান্ত সুবোধ বালকদের মতো ঘরে ফিরে যাওয়া।’

‘কাজটা করলে ভাউযার কী হবে?’ প্রশ্ন করল রানা, ‘রেমি তানাঘাই—অসহায় একটা মেয়ে, ওরই বা কী হবে? সবচেয়ে বড় কথা, রাজা শামানের গুপ্তধনের রহস্য কি ফেলেই পালাব আমরা?’

‘পুলিশে খবর দেবে?’ বলল রিকার্ডো।

‘হোপলেস,’ প্রস্তাবটা বাতিল করে দিল কটন। ‘পুলিশ মানে তো ওই সার্জেন্ট ফুগুই, এবং এদের দলনেতা হিসাবে ওই লোকটাকেই সন্দেহ হয় আমার। সে নিজেই বলে গেছে আমাদের ওপর নজর আছে তার, মনে হয় গুণ্ডাবাহিনীর কাছ থেকে মাসোহারা নেয়ার বিনিময়ে তাদের কাছে খবর পাচার করছে লোকটা।’

‘তা হলে?’ মুখ খুলল হেক্টর।

‘তা হলে নিজেদের দেখভাল নিজেদেরই করতে হবে আমাদের,’ বলল রানা। ‘পোসেইডনে আছি আমরা ছ’জন, এখন থেকে পালা করে রাত জাগতে হবে আমাদের, পালা করে পাহারা দিতে হবে। স্পিয়ারগান আর ছুরিই ভরসা আমাদের; চেম্বারে মাত্র পাঁচটা বুলেট আছে এবং কোনও এক্সট্রা ম্যাগাযিন নেই এ-রকম একটা বেরেটা সরবরাহ করতে পারি আমি। তবে সেটা আমাদের যার কাছেই থাকুক, যেখানেই থাকুক, দেয়ালে পিঠ ঠেকার আগপর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে না। ইসাটাবুতে ফায়ারআর্ম নিষিদ্ধ।’

‘কিন্তু...’ রানার কথাটা যেন মানতে পারছে না কটন, ‘আমরা আর্কিয়োলজিকাল এক্সপ্লোরেশনের উদ্দেশ্যে এসেছি, মিস্টার রানা, লড়াই করার জন্যে নয়। এ কথার মানে এ-ই নয় যে, তোমাকে সাহায্য করতে চাইছি না আমি। বরং নিজেদের সীমিত সামর্থ্যের কারণে শেষপর্যন্ত তোমাকে ঠিকমতো সাহায্য করতে পারব কি না, সন্দেহ আছে আমার।’

‘ভায়োলেন্সে যাওয়ার দরকার নেই, তোমরা শুধু আমার

কথামতো কাজ কোরো, তা হলেই হবে। বাকিটা আমি দেখব। টনিকে নিয়ে বাকি রাতটা পাহারায় থাকছি আমরা, তোমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ো। আগামীকাল...'

কথা শেষ করতে পারল না রানা, ইঞ্জিনবোটের আওয়াজ পাওয়া গেল আবারও।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে ওরা।

চুপ করে বসে থাকল রানা, কিন্তু মাত্র কিছুক্ষণ। তারপর চট করে ফোল্ডিংচেয়ার ছাড়ল ও, কুঁজো হয়ে দৌড় দিল পাইলট হাউসের দিকে।

কিন্তু বাধা পেল মাঝপথে।

জ্ঞান ফিরে পেয়েছে হ্যাংলা, সংজ্ঞাহীনের ভান করে একভাবে বসে ছিল চোখ বন্ধ করে, রানাদের আলোচনা শুনছিল; রানা ওকে যেইমাত্র পাশ কাটাতে যাচ্ছে, অমনি চট করে মেলে দিল একটা পা, ল্যাং মারল রানাকে।

এ-রকম ঘটতে পারে ভাবতে পারেনি রানা, হোঁচট খেল ও, গতি সামলাতে না পেরে উপুড় হয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল ডেকের ওপর, জোরে ব্যথা পেল।

এগিয়ে আসছে ইঞ্জিনবোট।

দু'কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে মাথাটা উঁচু করল রানা, বিষদৃষ্টিতে তাকাল হ্যাংলার দিকে। কয়েকটা গড়ান দিয়ে গিয়ে হাজির হলো লোকটার কাছে, সাইকেলের প্যাডেল চালানোর ভঙ্গিতে উপর্যুপরি কয়েকটা লাথি মারল লোকটার নাকেমুখে, বুকে-পেটে। আরও কিছুক্ষণ "প্যাডেল" চালানোর ইচ্ছা ছিল ওর, পারল না—পিস্তলের গুলির আওয়াজ শোনা গেল।

যথেষ্ট কাছে চলে এসেছে ইঞ্জিনবোট, ওখান থেকে গুলি চালানো হচ্ছে পোসেইডনের ওপর।

রেলিং-এ স্ফুলিঙ্গ তুলল প্রথম বুলেট, পরেরটা ভেঙে দিল পাইলটহাউসের একদিকের কাঁচ। গড়াতে গড়াতে সরে যাচ্ছে রানা, চিৎকার করে বলল, 'মাথা নামাও তোমরা সবাই! শুয়ে

পড়ো ডেকের ওপর! কাভার নাও!'

আরও কাছে চলে এসেছে ইঞ্জিনবোট, আরও দু'বার গুলি করা হলো। তবে ধাতুর সঙ্গে ধাতুর সংঘর্ষের আওয়াজ পাওয়া গেল না এবার, কোথাও কোনও কাঁচও ভাঙল না।

'ওরা মিস্ করেছে!' বলল টনি, শুয়ে পড়েছে ডেকের ওপর। 'মিস্টার রানা, স্পিয়ারগানটা রেখে এসেছি আমি পাইলটহাউসের দরজার কাছে। ওটা তুলে নিয়ে কাজে লাগাও!'

কিন্তু স্পিয়ারগানে রানার আগ্রহ আপাতত আছে বলে মনে হলো না। নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে মাথা তুলল ও, দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে গিয়ে ঢুকল পাইলটহাউসে। যে-ক'টা লাইট জ্বলছে সেখানে এবং ডেকের ওপর, একে একে নেভাতে শুরু করেছে সেগুলো।

অনেক কাছে চলে এসেছে ইঞ্জিনবোট, আরও একবার গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল, আরও একবার চুরমার হলো পাইলটহাউসের কাঁচ। কাজ করতে করতেই মাথা নিচু করে ফেলল রানা। দুই কি তিন সেকেণ্ডের মধ্যেই অন্ধকার গিলে নিল পাইলটহাউস আর ডেকটাকে।

আবারও হামাগুড়ি দিয়ে হাজির হলো রানা দরজার কাছে, হাতড়ে হাতড়ে ঠাহর করল স্পিয়ারগানটার অস্তিত্ব, হাতে তুলে নিল ওটা। পিঠটা ঠেকাল দরজার পাল্লার সঙ্গে; ইঞ্জিনের ভটভট আওয়াজ আসছে যেদিক থেকে, ঘাড় ঘুরাল সেদিকে। শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে, ক্রল করে রওয়ানা হলো একদিকের রেলিং-এর কাছে।

আরও একবার গুলি করা হলো ইঞ্জিনবোট থেকে, কিন্তু বুলেটটা ঠিক কোথায় আঘাত করল বোঝা গেল না। ততক্ষণে রেলিং-এর কাছে পৌঁছে গেছে রানা, পিস্তলের মাযলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখেছে, বুঝে নিয়েছে কোন্ পজিশনে আছে পিস্তলওয়ালা। স্পিয়ারগানটা তাক করেই টান দিল ট্রিগারে। মৃদু একটা যান্ত্রিক গর্জন তুলে ছুটে গেল একটা স্পিয়ার। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল

বইঘর.কম

কারও মরণআর্তনাদ। পানিতে খসে পড়ল হালকা কিছু, পরমুহূর্তে ঝপাস আওয়াজ তুলে পানিতে পড়ল আগেরটার চেয়ে অনেক ভারী কিছু একটা।

একছুটে পাইলটহাউসে গিয়ে ঢুকল রানা, অন্ধকারেও দিক চিনতে অসুবিধা হচ্ছে না। একটু আগে লাইট নেভানোর সময় দেখেছে বাড়তি স্পিয়ার কোথায় আছে, হাতড়ে হাতড়ে দ্রুত তুলে নিল দুটো, একটা দিয়ে রিলোড করল গানটা, তারপর একহাতে গান এবং অন্যহাতে স্পেয়ার স্পিয়ার নিয়ে ছুটে গিয়ে আবার পজিশন নিল রেলিং-এর ধারে।

শব্দ শুনে মনে হচ্ছে নাক ঘুরিয়ে নেয়া হচ্ছে নৌকাটার। এবং একাধিক লোকের উত্তেজিত কণ্ঠও শোনা যাচ্ছে, পিজিন ভাষায় কথা বলছে ওরা।

আরেক পিস্তলওয়ালা দাঁড়িয়ে ছিল, তাই স্পিয়ারগানের মাযল আগের চেয়ে একটু নিচের দিকে তাক করল রানা এবার, কান পেতে ভালোমতো খেয়াল করল ঠিক কোত্থেকে আসছে কথোপকথনের আওয়াজ। তারপর আবার টান দিল স্পিয়ারগানের ট্রিগারে, মরণআর্তনাদ শোনা গেল আরও একজনের। স্পিয়ারগানটা রিলোড করতে শুরু করল রানা।

ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে নৌকার লোকগুলো, গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে ওরা এখন। কর্তব্য সম্পর্কে আদেশ দেয়া হচ্ছে, নাকি তর্ক করছে ওরা তা বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। রাগের মাথায় চরম ভুল করে ফেলল ওদের আরেকজন, নিজের আগ্নেয়াস্ত্র বের করল সে, পোসেইডনকে নিশানা করে একের পর এক টান দিচ্ছে ট্রিগারে।

তাড়াহুড়ো করল না রানা—দরকার নেই সেটার, রেলিং-এর কাছ থেকে আবারও ফায়ার করল ও। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল খেপা লোকটার গুলিবর্ষণ, পেছনদিকে হেলে পড়ল ওর শরীরটা, সাহায্য করার জন্য ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিল না সঙ্গীদের কেউ, পানিতে ঝপাস করে পড়ার আগেই মারা গেছে

লোকটা।

ইঞ্জিনের একটানা ভটভট আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। আস্তে আস্তে দূরে চলে যাচ্ছে নৌকাটা। কমতে কমতে একসময় মিলিয়ে গেল ইঞ্জিনের গর্জন।

'ওরা চলে গেছে,' বলল টনি। 'আমরা বোধহয় মাথা তুলতে পারি এবার।'

'না!' জোরে বলল রানা। 'এটা একটা ফাঁদও হতে পারে!'

'ফাঁদ?'

'আমরা জানি না দুটো নৌকা এসেছিল কি না। একটা চলে গেছে, আরেকটা হয়তো অপেক্ষায় আছে কখন আবার আলো জ্বালাই আমরা, কখন পরিণত হই ওদের সহজ নিশানায়। ...রেমি, হামাগুড়ি দিয়ে তোমার কেবিনে গিয়ে ঢোকো। ...হেক্টর আর রিকার্ডো, ডাইভিংল্যাডারের কাছে চলে যাও তোমরা, ওটা কোনওভাবে নামানোর চেষ্টা করা হয়েছে কি না দেখো। টনি, তোমার মিস্টার বাস্টার্ডের কাছে যাও, লোকটা ঠিক জায়গায় আছে কি না দেখো। আর কটন, পাইলটহাউসে যাও, সিচুয়েশন ইমার্জেন্সি হলে সরে যাওয়ার জন্য চালু করতে হতে পারে ইঞ্জিন।'

রানার কথামতো কাজ করল ওরা সবাই।

কিছুক্ষণ পর ডাইভিংল্যাডারের কাছ থেকে আওয়াজ দিল হেক্টর, 'ল্যাডারটা ঠিক জায়গাতেই আছে, মিস্টার রানা। ওদের কেউ দ্বিতীয়বার অ্যাটেম্পট্ নেয়নি এখান দিয়ে।'

'কেবিনে ঢুকতে পেরেছি আমি,' জানিয়ে দিল রেমি।

'মিস্টার রানা,' টনির কথাটা শুনে মনে হলো ডেকে উঠেছে একটা কোলাব্যাঙ, 'আমার মনে হয় মারা গেছে মিস্টার বাস্টার্ড।'

থমকে গেল রানা। আশা করেনি কথাটা শুনতে হতে পারে। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলল, 'মরলে মরুক, কান খাড়া রেখে যার যার জায়গায় অপেক্ষা করব আমরা।'

কিন্তু আরও আধ ঘণ্টা চুপ করে থাকার পরও যখন কোনও

সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না শত্রুপক্ষের, যথেষ্ট ঝুঁকি আছে জানার পরও পাইলটহাউসের ছাদে চড়ে বসল রানা, কটনকে বলল সার্চলাইটটা জ্বালিয়ে দিতে। অন্ধকারের চাদর ছিঁড়ে জ্বলে উঠল পোসেইডনের অত্যুজ্জ্বল সার্চলাইট।

ডানে-বাঁয়ে-সামনে-পেছনে আলো ফেলে ফেলে দেখল রানা আর কোনও নৌকা আছে কি না।

হ্যাঁ, আছে। ওই ইঞ্জিনবোটটাই ফিরে আসছে আবার। তবে এবার ইঞ্জিন চালু করেনি ওরা, দাঁড় বাইছে, যতটা সম্ভব নিঃশব্দে কাছিয়ে আসার চেষ্টা করছে পোসেইডনের—কী মতলব আছে নৌকার আরোহী তিনজন লোকের মনে, তা ওরাই ভালো বলতে পারবে।

সার্চলাইটের আলো পড়ামাত্র দাঁড় বাওয়া বন্ধ হয়ে গেল ওদের—স্তম্ভিত হয়ে গেছে যেন; চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলে চোরের যে-অবস্থা হয়, ওদের হয়েছে ঠিক তা-ই। পোসেইডনের কাছ থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে অবস্থান করছে ওরা এখন।

দাঁতে দাঁত পিষল রানা, খুনে আবেগটা টের পাচ্ছে আবার, লাফ দিয়ে নামল ও পাইলটহাউসের ছাদ থেকে, একটা মুহূর্ত দেরি না করে বলল, 'ইঞ্জিন চালু করো, কটন!'

ওর কথামতো কাজ করল কটন।

'টনি!' হাঁক ছাড়ল রানা, 'আমার কাছে এসো! নোঙর তুলতে হবে!'

টনিকে নিয়ে কাজটা শেষ করেই হালে গিয়ে দাঁড়াল রানা, হাঁক ছাড়ল আবার, 'সার্চলাইটের কাছে যাও, টনি! ওটা তাক করে রাখবে শয়তানগুলোর নৌকার ওপর, একচুলও যেন এদিকওদিক না হয়!'

এবার পাইলটহাউসের ছাদে গিয়ে উঠল টনি, সার্চলাইটের কাছে পজিশন নিল।

থ্রটল মেকানিজমটা কটনের কাছ থেকে বুঝে নিল রানা চটজলদি, তারপর আগে বাড়াল পোসেইডনকে। যত এগোচ্ছে,

গতি তত বাড়ছে জলযানটার।

'কী করতে যাচ্ছ?' হতভম্ব হয়ে গেছে কটন।

জবাব দিল না রানা, শক্ত হয়ে গেছে ওর দুই চোয়াল; ইঞ্জিনের গতি আরও বাড়াল ও।

নৌকার মুখ ঘুরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে দুর্বৃত্তরা, কিন্তু ওদের ওপর সার্চলাইটের আলো যেন চুম্বকের মতো সাঁটিয়ে দিয়েছে টনি।

'হেক্টর! রিকার্ডো!' আবার বলল রানা। 'যার যার স্পিয়ারগান নিয়ে পজিশন নাও তোমরা। ওরা আমাদের ওপর আবার কোনও অ্যাটেম্পট্ নিলে কোনও দয়ামায়া দেখাবে না, যে-ক'টাকে পারো মেরে ফেলবে! পরেরটা পরে দেখা যাবে!' পোসেইডনের গতি আরও বাড়াল।

পনেরো গজ...দশ গজ...পাঁচ গজ...কাছিয়ে আসছে ইঞ্জিনবোটটা...আরও কাছে এল...আরও...

পোসেইডনের গতি আরও বাড়াল রানা।

সার্চলাইটের উজ্জ্বল আলো থেকে বাঁচতে চোখের সামনে হাত তুলে দিয়েছে তিন দুর্বৃত্ত, স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে ওদের একজন খোদার-খাসি; ওদের কারও কাছেই আগ্নেয়াস্ত্র নেই সম্ভবত—থাকলে এতক্ষণে অ্যাকশনে যেতই। পোসেইডনের সঙ্গে ওদের দূরত্বটা যখন দশ ফুটেরও কম, তখনও জলযানটাকে দুর্ধর্ষ গতিতে এগোতে দেখে যা বোঝার বুঝে নিল ওরা, নৌকা থেকে সাগরের পানিতে লাফিয়ে পড়ল ওরা তিনজন তিনদিকে।

কাঠের নৌকার সঙ্গে পোসেইডনের মজবুত স্টীল বডির সংঘর্ষের আওয়াজটা, রাতের নিস্তব্ধতায়, শোনাল অনেকটা বাঁশ ফাটার আওয়াজের মতো। প্রচণ্ড ধাক্কায় প্রথমেই উল্টে গেল নৌকাটা, ওটার একদিকের কাঠে বড় চিড় ধরল, সেটা বিস্তৃত হয়ে ফাটল ধরিয়ে দিল তলায়, আর ঠিক তখনই গতি আরও বাড়িয়ে ওটার ওপর পোসেইডনকে পুরোপুরি তুলে দিল রানা।

আরেকবার শোনা গেল বাঁশ ফাটার আওয়াজ।

এবং সে-আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা গেল আরেকটা মরণআর্তনাদ—সাঁতার কেটে নিরাপদ দূরত্বে চলে যাওয়ার আগে পোসেইডনের নিচে চাপা পড়েছে লোকটা, দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে লোকটার শরীর।

'পাঁচ,' বিড়বিড় করল রানা, টের পেল খুনে আবেগটা প্রশমিত হয়েছে অনেকখানি। গতি কমিয়ে দিচ্ছে পোসেইডনের, সেই সঙ্গে আস্তে আস্তে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে জলযানটার—ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা আছে আগের জায়গায়; সাঁতার কাঁটতে কাঁটতে যে-দুই শয়তান ফিরে যাচ্ছে তীরে, ইচ্ছা করলেই পিষে মারতে পারে তাদেরকে, কিন্তু সেক্ষেত্রে ওদের আজকের এই পর্যুদস্ত হওয়ার কাহিনি পৌঁছুবে না যে বা যারা ওদেরকে পাঠিয়েছিল তাদের কাছে।

জায়গামতো ফিরে এসে পোসেইডনকে নিশ্চল করল রানা, নোঙর ফেলতে বলল টনিকে। সার্চলাইট নিভিয়ে দিল, পাইলটহাউসের দরজার ওপর একটা লাইট জ্বালিয়ে উপস্থিত হলো হ্যাংলার কাছে। একটা হাঁটু ভাঁজ করে বসল লোকটার সামনে।

হ্যাঁ, আসলেই মরে গেছে লোকটা—দুটো গুলি খেয়েছে পিঠে, দুটো বুলেটই বেরিয়ে গেছে বুক ছিদ্র করে দিয়ে।

পায়ে পায়ে রানার দিকে এগিয়ে এল কটন; রেলিং-এর সঙ্গে হাতবাঁধা লাশটা দেখল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'ইঞ্জিনবোট...ওটা আসলে আমাদের ওপর হামলা করার জন্য ফিরে আসেনি তখন। ওরা...এই লোকটাকে...শেষ করে দেয়ার জন্যেই ফিরে এসেছিল।'

রানা কিছু বলল না। পেছনে পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। এগিয়ে আসছে হেক্টর আর রিকার্ডো। নিজের কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে রেমি।

'কেন?' বলল টনি। 'এই লোকটা ওদেরই দোসর, ওরা তো একই দলের, তা-ই না? আমাদের কাউকে শেষ করে দেয়ার

বদলে একে খতম করে দেয়ার মানে কী?'

'মানেটা সহজ,' বলল কটন। 'ওরা চায়নি এই লোক মুখ খুলুক কারও কাছে।'

'মানলাম। তা হলে আমাদের কারও কোনও ক্ষতি করল না কেন ওরা?'

'করল না,' সোজা হয়ে দাঁড়াল রানা, 'তার কারণ, ওরা জানে রাজা শামানের গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারিনি আমরা এখনও।'

'ওই তিনজন,' নোঙর নামিয়ে দিয়ে এসেছে টনি, 'ফিরে আসছিল কেন? কী মতলব ছিল ওদের?'

জবাব দিল না রানা, আঙুল তুলে দেখাল হ্যাংলাকে।

সতেরো

বডিবিল্ডারের শরীর সার্চ করে লোকটার আইডেন্টিফিকেশন সংক্রান্ত কোনওকিছু যেমন পাওয়া যায়নি, হ্যাংলাকে সার্চ করেও তেমন কিছুই পাওয়া গেল না।

এই গরমেও লোকটার গায়ে ফ্লানেলের ঢলঢলে শার্ট, ক'দিন ধরে পরছে কে জানে—ঘামের দুর্গন্ধ আসছে। খাকি প্যান্টটাও ওর শারীরিক কাঠামোর সঙ্গে মানানসই নয়। প্যান্টের এক পকেট থেকে পাওয়া গেল সস্তা সিগারেটের প্যাকেট; ওটার মুখটা খোলামাত্র গন্ধে টের পেল রানা, সবগুলো শলাকা থেকে কিছু কিছু করে তামাক সরিয়ে নিয়ে সেখানে গাঁজা ভরা হয়েছে। পাওয়া গেল অতি সাধারণ একটা লাইটার আর বহুল ব্যবহারে মলিন হয়ে-যাওয়া একটা চামড়ার-মানিব্যাগ।

ব্যাগটা খুলল রানা। একটুখানি হলেও আশা করছিল ও,

ভেতরে আইডি কার্ড জাতীয় কিছু পাওয়া যাবে; কিন্তু নিরাশ হতে হলো ওকে। বেশকিছু টাকা আছে, কিছু খুচরো কয়েন আছে, আর আছে আপাদমস্তক নগ্ন একটা মেয়ের ফটোগ্রাফ। শার্টের পকেটে একটা প্রেসক্রিপশন পাওয়া গেল—সেণ্ট্রাল হাসপাতাল থেকে দেয়া হয়েছে, ওষুধগুলোর বেশিরভাগই ব্যথানাশক; হাতের লেখা এবং নিচেরদিকের সইটা, অনুমান করল রানা, নাম্বানা ভেলরের।

ফটোগ্রাফটা ছিঁড়ে টুকরোগুলো ছুঁড়ে পানিতে ফেলে দিল ও, প্রেসক্রিপশনটাও ফেলে দিতে যাচ্ছিল, কী ভেবে রেখে দিল নিজের কাছে। হ্যাংলার সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার আর মানিব্যাগ ঢুকিয়ে রাখল আগের জায়গায়; লোকটার ব্যাপারে কী করা যায় তা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সেরে নিল বাকিদের সঙ্গে। সিদ্ধান্তটা বডিবিল্ডারের মতোই: পুলিশকে খবর দেয়া আর খাল কেটে কুমির আনা সমান কথা, সলিলসমাধিই একমাত্র সমাধান।

সুতরাং এবার ডুব দিয়ে লাইমস্টোন ব্লক নিয়ে আসতে হলো রিকার্ডোকে। ওটা রানার হাতে দেয়ার সময় বলল, 'মিস্টার বাস্টার্ডের জন্য বাইবেলের শ্লোক আউড়াব না বলেই এই কাজ করলাম আমি। অসহায় মেয়েমানুষের ওপর যারা ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রার্থনা করি নরকেও যেন ঠাঁই না হয় তাদের।'

'ঠিক বললে না,' দ্বিমত পোষণ করল টনি, 'নরকে ঠাঁই না হলে সোজা চলে যাবে ব্যাটা স্বর্গে।'

রানা কিছু বলল না, হ্যাংলার পায়ে দড়ি বাঁধছে। লাশটা ডুবিয়ে দেয়ার পর একটা বালতি নিয়ে এল, সাগর থেকে বার বার পানি তুলে ডেকের যেসব জায়গায় রক্ত লেগে আছে সেগুলো ধুয়ে ফেলল। ওর সঙ্গে হাত লাগাল টনি আর হেক্টর। এরপর পাইলটহাউসের ওপর মনোযোগ দিল রানা, সরিয়ে ফেলা হলো সবগুলো ভাঙাকাঁচের টুকরো। যেসব জায়গায় কাঁচ ভেঙে গিয়ে আটকে আছে, অথবা যেসব জায়গার কাঁচ ফুটো করে দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট, নিশ্চিহ্ন করে দিল সেসব আলামতও। কাজ শেষে সময় নিয়ে দেখল সবকিছু, সন্তুষ্ট হলো।

সঙ্গীদের দিকে তাকাল রানা। 'আজ রাতে যা ঘটল পোসেইডনে, সে-ব্যাপারে কেউ কিছুই জানি না আমরা, কিছুই শুনিনি। সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়ার আগপর্যন্ত কেউ যদি কিছু জিজ্ঞেস করে আমাদেরকে, তা হলে ওই জবাবটাই দেব আমরা সবার কাছে। ঠিক আছে?'

নীরবে সম্মতি জানাল সবাই।

কটন আর রিকার্ডো গিয়ে শুয়ে পড়ল। নিজের কেবিনের দরজায় আগের মতোই দাঁড়িয়ে থাকল রেমি।

কথা ছিল রানার সঙ্গে টনি রাত জাগবে, কিন্তু এগিয়ে এসে রেমি বলল, এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসবে না ওর, রানার সঙ্গে থাকতে চায় সে। মুখ চাওয়াচাওয়ি করল টনি আর হেক্টর, কিন্তু কিছু বলল না, সময় নষ্ট না করে গিয়ে শুয়ে পড়ল ওরাও।

রেলিং-এর প্রান্ত ঘেঁষে পুরোটা ডেক দু'বার চক্কর দিল রানা, তারপর চলে এল পাইলটহাউসে, কম্পিউটার খুলল। স্বাভাবিক নিয়মে ওপেন হলো ওটা। যাক, শত্রুপক্ষের বেপরোয়া গুলিবর্ষণে কম্পিউটারটার কোনও ক্ষতি হয়নি।

ওর আর নিজের জন্য দু'কাপ কফি বানিয়ে নিয়ে এল রেমি। রানার পাশে বসে বলল, 'গুপ্তধনের ব্যাপারে কিছু কথা ছিল।'

কফির কাপে চুমুক দিল রানা। 'বলো।'

'আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধই বা কখন করল জাপানিরা, আর গুপ্তধন সরালই বা কখন? আর আমেরিকানরা কিছু জানতে পারল না কেন এ-ব্যাপারে?'

'প্রশ্নটা খোঁচাচ্ছে আমাকেও। গুপ্তধন সরানোর কাজটা ঠিক কখন করেছে জাপানিরা, জানি না; কিন্তু তখন ইসাটাবুতে না হলেও সলোমন সাগরে মিত্রবাহিনীর নৌবহরের সঙ্গে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই যুদ্ধ হচ্ছিল জাপানি নৌবহরের। এবং প্রতিপদেই হারছিল ওরা, রসদের জোগান আসতে পারছিল না, খাদ্যাভাব জেঁকে বসছিল, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের শঙ্কা পেয়ে বসছিল প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে নেয়া জাপানি সৈন্যদের। এ-অবস্থায় তুমি

থাকলে কী করতে, ভেবে দেখো। গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছ তুমি, সেটা তোমার হস্তগত হয়েছে। কিন্তু...'

'সেটা আমি দ্বীপে রাখব না,' রানার পয়েন্টটা ধরে ফেলেছে রেমি। 'সেটা নিরাপদ কোনও জায়গায় সরিয়ে ফেলব যত জলদি সম্ভব।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কিন্তু কোন্ জায়গা জাপানিদের জন্য নিরাপদ ছিল, সেটাও একটা প্রশ্ন। কোথায় যাবে ওরা ওই গুপ্তধন নিয়ে? দেশে ফেরার উপায় নেই, ইসাটাবুতে থাকার উপায় নেই। সমানে বোমাবর্ষণ করছে মিত্রবাহিনীর নৌবহর, বিমানবহর।'

রেমি কিছু বলল না, চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

'আরও একটা কথা আছে,' বলল রানা। 'গুপ্তধনটা তোলার জন্য এখানে, আই মীন খোলা সাগরে আসতে হয়েছে জাপানিদের, ডাইভ দিতে হয়েছে। কাজটা করার জন্য মূল ঘাঁটি থেকে প্রতিদিন আসা-যাওয়া করেছে ওরা—কেন যেন মেনে নিতে পারছি না আমি ব্যাপারটা। কেন যেন মনে হচ্ছে, ঠিক আমাদের মতো কোনও জাপানি জাহাজ নোঙর ফেলে অবস্থান নিয়ে ছিল এখানে কম করে হলেও এক সপ্তাহ ধরে।'

'এক সপ্তাহ কেন?'

'এত উন্নত প্রযুক্তি নিয়ে এই দু'দিনে কতটুকু ডেভেলপমেন্ট হয়েছে আমাদের? আজ থেকে সত্তর-পঁচাত্তর বছর আগে বর্তমান প্রযুক্তির প্রায় কিছুই ছিল না জাপানিদের কাছে।' মাথা নাড়ল রানা। 'এক সপ্তাহ অনুমান করেছি আমি, সময়টা আরও বেশি হতে পারে। কিন্তু আসল কথা সেটা না। আসল কথা হচ্ছে, একটা জাপানি জাহাজ এখানে নোঙর ফেলে ভেসে থাকবে, আর সেটার ওপর নজর পড়বে না মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলোর, তা কি হয়?'

'তা হলে?'

'আমরা যদি ধরে নিই জাপানিদের যে-জাহাজ এখানে ছিল, সেটা ওদের নৌবাহিনীর অফিশিয়াল জাহাজ না, সেক্ষেত্রে মনে

হয় না ভুল হবে।'

'নৌবাহিনীর অফিশিয়াল জাহাজ না? তারমানে...আপনি বলতে চাচ্ছেন...গুপ্তধন উদ্ধারের ব্যাপারটা জাপানিদের পক্ষ থেকে অফিশিয়াল কোনও কাজ ছিল না? তারমানে...'

আবারও মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হতে পারে ওদের কোনও একজন অফিসার, তার অধীনস্থ কয়েকজন লোক নিয়ে কাজটা করেছে। হতে পারে, এখানে নোঙর ফেলে থাকা জলযানটা আসলে ছিল একটা কনভার্টেড লংরেঞ্জ ফিশিং ভেসেল। আবার, আপাতদৃষ্টিতে অক্ষতিকর আর খালি কোনও বার্জও হতে পারে। মোদ্দাকথা, ওটা ছিল এমন কিছু, যা মিত্রবাাহিনীর নজর এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।'

'তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু গুপ্তধন গেল কোথায়? আমি আসলে হিসেবটা মেলাতে পারছি না। সলোমন সাগর দখল করে ফেলেছে মিত্রবাহিনীর নৌবহর, এখানকার আকাশে চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে আমেরিকান যুদ্ধবিমান। ইসাটাবুতে জাপানি বাহিনীর জন্য রসদ আসা বন্ধ। মিত্রবাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে যে ওদের কোনও ভেসেল চলে যাবে জাপানের দিকে, তার উপায় নেই। তা হলে?'

'আরেকটু ভাব, রেমি, আরেকটু ভাব। আরেকটু কষ্ট দাও মগজটাকে।'

'গুপ্তধন উদ্ধার করার পর দ্বীপের কোথাও লুকিয়ে রাখেনি তো?'

'এখন পর্যন্ত সে-রকম কিছু জানতে পারিনি আমরা।'

ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ চিন্তা করল রেমি, তারপর ঝট করে মাথা তুলে তাকাল রানার দিকে। 'সাবমেরিন! আপনি কি সাবমেরিনের কথা বলছেন?'

'অসম্ভব না। কিন্তু তাতেও ঝুঁকি আছে। একটা কিছু বিগড়ে গেলে, অথবা হিসেব-করা সময়ে কোনও গণ্ডগোল হলেই সব শেষ—হয় ধরা পড়তে হবে, নয়তো টর্পেডোর আঘাতে ধ্বংস

হয়ে যেতে হবে। তা ছাড়া, রাতের বেলায় ঘুটঘুটে অন্ধকারে মান্ধাতার আমলের একটা সাবমেরিন নিয়ে তীরের এত কাছে আসা, সেটাতে গুপ্তধন তোলা, তারপর নিরাপদে পালানো...পুরো ব্যাপারটা স্রেফ যেন কষ্টকল্পনা বলে মনে হচ্ছে আমার।'

'সেক্ষেত্রে...আবারও একই কথা বলতে হচ্ছে। গুপ্তধন তোলার পর এমন কোথাও লুকিয়ে রাখব, যে-জায়গার খোঁজ সহজে পাবে না কেউ, আমেরিকানরাও না। যখন আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হবে পরিস্থিতি, তখন...'

'পরিস্থিতির আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হওয়ার কি কোনও সম্ভাবনা ছিল তখন, রেমি? পরাজয় নিশ্চিত ছিল জাপানি বাহিনীর জন্যে, এবং এ-বিষয়েও কোনও সন্দেহ ছিল না যে, এ-দ্বীপ একবার দখলে নিতে পারলে সহসা ছাড়বে না আমেরিকানরা। কিন্তু যখন দেশে ফেরত পাঠানো হয় জাপানি সৈন্যদেরকে, সে-সময়ের কথা যদি চিন্তা করি? তা হলে আমার মনে হয় গুপ্তধন পাচার হলো কী করে সে-ব্যাপারে একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে।'

'যেমন?'

'ভেবে দেখো, হুড়োহুড়ি করে জাহাজে তোলা হচ্ছে জাপানিদেরকে, ওদের কার পুঁটুলিতে কী আছে, কার বস্তায় কী আছে, তা নিয়ে কোনও মাথাব্যথাই নেই আমেরিকানদের। কারণ জাপানিরা সঙ্গে কোনও অস্ত্র না নিয়ে যত জলদি সম্ভব বিদায় হলেই আমেরিকানরা খুশি। যারা গুপ্তধন উদ্ধার করেছে, তারা যদি কৌশল খাটিয়ে সুযোগ নিয়ে থাকে পরিস্থিতিটার, আশ্চর্য হব না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রেমি, তারপর বলল, 'কেন যেন সাবমেরিনের ব্যাপারটা ভুলতে পারছি না আমি।'

'যুক্তিটা ভালো, কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে মিল নেই। প্রথম কথা, সে-সময় সলোমন সাগরে বেশি সাবমেরিন ছিল না জাপানিদের। দুই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমলের সাবমেরিন দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। ওগুলোর ভেতরে জায়গা থাকত খুবই কম, মাল পরিবহন

করা এককথায় অসম্ভব।'

'আচ্ছা...ওরা ওগুলো তুলে আনার পর বেচে দেয়নি তো?'

'কার কাছে? কে কিনবে? দ্বীপের আদিবাসীরা? এইড ওয়ার্কারদের সাহায্য ছাড়া যারা চলতে পারে না এখনও, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাদের অবস্থা কী ছিল তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। যতরকম বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল করত সলোমন সাগরে, যুদ্ধের সময় উধাও হয়ে গিয়েছিল সব—সাধ করে মরতে চাইবে কে? তা হলে বাকি থাকল শুধু আমেরিকানরা। ওরা যদি গুপ্তধনের খবর শুনত, জাপানিদের বুকে রাইফেল ঠেকিয়ে ছিনিয়ে নিত সব, একটা পয়সাও দিত না। তোমাকে বলেছি বোধহয়, সেণ্ট্রাল লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওপর লেখা একটা বই পড়েছি। ওটাতে গুপ্তধনের ইঙ্গিত আছে—আমার ধারণা লেখক নিজের অজান্তেই করেছেন কাজটা, কিন্তু ওসব লেনদেন বা বেচাকেনার ব্যাপারে কোনও উল্লেখই নেই।'

'কী করবেন তা হলে?'

'ইণ্টারনেটের সাহায্য নেব,' কী-বোর্ডের ওপর ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানার আঙুলগুলো। 'ইসাটাবু ক্যাম্পেইন এবং জাপানিদের দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব। পারলে খুঁজে বের করব হারুকিচি হায়াকুটাকিকে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর রেমি বলল, 'অপ্রাসঙ্গিক একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি?'

'করো।'

'আপনি কি কাউকে ভালোবাসেন?'

মনিটরের দিকে তাকিয়ে ছিল, মনোযোগ নষ্ট হয়ে গেল রানার। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। কাকে ভালোবাসি—মনে মনে প্রশ্ন করল নিজেকেই, কাকে ভালোবাসি আমি?

রেবেকার নামটা উচ্চারণ করতে গিয়েও থেমে গেল ও। জীবনসঙ্গিনী হিসেবে বেছে নিতে চেয়েছিল সিনসিয়ার মেয়েটাকে,

নিয়তি বুঝিয়ে দিয়েছে জীবনসঙ্গিনী বলে কোনও শব্দ প্রযোজ্য নয় ওর জন্য। বলতে চাইল সুলতা বা রাফেলার কথা, তা-ও পারল না—সেই নিয়তিই বহুদূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে ওদেরকে। চোখের সামনে যেন জ্বলজ্বল করে উঠল সোহানার চেহারা, চোখ বন্ধ করে ফেলল রানা; জানে, মেয়েটার প্রতি ওর আবেগের কথা প্রকাশ করতে গেলেই আবারও উদয় ঘটবে নিয়তির, চিলের মতো ছোঁ মেরে সোহানাকেও সে নিয়ে যাবে এমন কোথাও, যেখান থেকে আর কখনও ফেরে না কেউ।

'হঠাৎ এই প্রশ্ন?' বলল রানা।

'আছে একটা কারণ।'

'আমি আমার কাজকে ভালোবাসি।'

'কোনও মেয়েমানুষকে না?'

'না, কোনও মেয়েমানুষকে না।'

'নাম্বানা ভেলরকেও না?'

রিভলভিং চেয়ারটা ঘুরিয়ে রেমির মুখোমুখি হলো রানা এবার। 'এখানে ভেলরের কথা আসছে কেন?'

'কারণ আমার ধারণা ডক্টর ভেলরকে ভালোবেসে ফেলেছেন আপনি।'

হেসে ফেলল রানা। 'ওকে আমি ভালোবাসতে যাব কেন?'

কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকল রেমি, তারপর বলল, 'কারণ সে সুন্দরী। উচ্চশিক্ষিতা। ডাক্তার। ইসাটাবুর অনেকেই দাম দেয় ওকে, ওর কথা শোনে। অনেক বছর বিদেশে থেকেছে সে, মানুষের সঙ্গে কীভাবে মিশতে হয় জানে। সবচেয়ে বড় কথা, বিপ্লব আছে মেয়েটার ভেতরে, আদর্শ আছে। ইচ্ছা করলে বিদেশেই থাকতে পারত, আরও বেশি বেতনে আরও ভালো জায়গায় চাকরি করতে পারত, তা না করে ফিরে এসেছে পিতৃভূমিতে—মাটি ও মানুষের টানে। এসব গুণ, আপনার মতো একজন নিঃসঙ্গ পুরুষকে আকর্ষণ করার জন্য যথেষ্ট।'

'আমি নিঃসঙ্গ বুঝলে কী করে?'

'বুঝেছি। মেয়েরা অনেককিছু বুঝতে পারে।'

'তাদের বুঝতে পারাটা সবসময় ঠিক না-ও হতে পারে।'

'জানি না। তবে এটা জানি, আপনিও জিতে নিয়েছেন ভেলরের মন।'

'তা-ই নাকি?'

'হ্যাঁ, তা-ই। আপনার নায়কোচিত আবির্ভাব, নায়কোচিত কাজকর্ম দেখে মুগ্ধ হয়েছে মেয়েটা—যে-কেউ হবে। সেজন্যই যেদিন পরিচয়, সেদিনই আপনাকে দাওয়াত দিয়েছে রেইন ট্রিতে। ভাউয়াকে যখন দেখতে গিয়েছিলাম, ডক্টর ভেলরের প্রাইভেট রুমে কিছুক্ষণের জন্য বসে ছিলাম আমরা; তখন বার বার আপনার দিকে তাকাচ্ছিল সে, এবং তার দৃষ্টিতে কী ছিল, তা বুঝতে পারবে একজন কিশোরীও। ...ভুল বললাম?'

'জানি না। ভেলরের দিকে মনোযোগ ছিল না আমার তখন। ...তোমার ধারণা ভুল, রেমি। ভেলর ভালোবাসে না আমাকে, আমিও প্রেমে পড়িনি মেয়েটার। কয়েকটা দিনের জন্য বেড়াতে এসেছি ইসাটাবুতে, কারও বাহুডোরে বাঁধা পড়ার জন্য আসিনি। যেদিন বেড়ানো শেষ হবে আমার, সেদিনই আমি আর নেই এ-দ্বীপে। খুঁজলেও আমার কোনও চিহ্ন পাবে না তুমি আর।'

'কোথায় চলে যাবেন আপনি?'

'যেখান থেকে এসেছি সেখানে।'

রানার দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রেমি। 'কে আপনি, মিস্টার রানা?'

'দেখো, রেমি, কিছু মনে কোরো না, নিজের পরিচয় দিতে দিতে আমি ক্লান্ত, কাজটা করতে চাই না আর। ...একটা কথা বলো তো। ভেলর এখনও বিয়ে করেনি কেন?'

'বিয়ে করা না-করা যে-কারও ব্যক্তিগত ব্যাপার। কেউ যদি মনে করে সে বিয়ে না-করেও সুখে থাকতে পারবে, অসুবিধে কী? ...ডক্টর ভেলর যদি নিজের পছন্দমতো জীবনসঙ্গী খুঁজে না পায়, তা হলে বিয়ে করার প্রশ্ন আসে না।'

‘ওর কোনও বয়ফ্রেণ্ড নেই?’

‘যতদূর জানি, না।’

‘রেইন ট্রিতে রাইস রিচার্ড নামের এক লোকের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল ভেলর। ওই লোকের সঙ্গে কি...’

‘জানি না। রাইস রিচার্ডকে চিনি না আমি। ...একটা অনুরোধ করি। রাখবেন?’

কিছু বলল না রানা, তবে ওর ভুরুতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

‘আগামীকাল সকালে হাসপাতালে যেতে চাই আমি। ভাউযাকে দেখার জন্য মন পুড়ছে। কেন যেন মনে হচ্ছে, খারাপ কিছু হয়েছে ওর।’

‘কিছুই হয়নি ভাউযার। তুমি শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করছ।’

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রেমি। ‘আমি শুয়ে পড়ি তা হলে। ঘুম আসছে।’ পাইলটহাউস থেকে বের হয়ে নিজের কেবিনে চলে এল সে। বাতি না নিভিয়েই শুয়ে পড়ল বাঙ্কে। এপাশওপাশ করল কিছুক্ষণ। ঘুম আসছে না। আরও কিছুক্ষণ পর উঠে বসল, বাঙ্ক ছেড়ে নেমে গিয়ে বাতি নেভাল, তারপর ফিরে এসে শুয়ে পড়ল আবার। কিন্তু এবারও শুধু এপাশওপাশ করা, ঘুমের কোনও খবর নেই। উঠে গিয়ে বাতিটা জ্বালাল রেমি। দেয়াল ঘেঁষে, মেঝেতে বসে পড়ল আস্তে আস্তে। এ-রকম লাগছে কেন?

আশ্চর্য একটা অনুভূতি কাজ করছে বুকের ভেতরে। মনে হচ্ছে, বড় রকমের কোনও বিপদ হয়েছে কোথাও; এবং সেটার চেয়ে আরও বড় কোনও বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

এ-রকম মনে হওয়ার কারণ কী? গুমট আবহাওয়া?

সলোমন সাগরে কি আরেকটা টাইফুনের সময় হয়েছে? সবাই জানে, এখানে যখন ঝড় আসে, তার আগে আশ্চর্য শান্ত হয়ে যায় প্রকৃতি। কিন্তু ঝড় আসার পর...প্রকৃতির রুদ্র রূপ দেখে যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী না, তারাও আস্তিক হয়ে যায়—অন্তত কয়েকদিনের

জন্য।

নাকি রাজা শামানের গুপ্তধন, দুর্ভাবনা আর আশঙ্কার বোঝা হয়ে চেপে বসতে চাইছে ওর মনে?

ভাউযা ওটা আবিষ্কার করার আগপর্যন্ত ঠিকমতোই চলছিল সবকিছু। কিন্তু তারপর থেকে...অপ্রাকৃতিক কোনও টাইফুন চলছে যেন রেমির জীবনে। মদের আড্ডা এড়িয়ে চলার কসম খেয়েছিল ভাউযা, সেটা মেনেও চলছিল, সম্ভবত মাত্রাতিরিক্ত খুশিতে গিয়ে বসল সে-রকম এক আড্ডায়। কয়েকদিনের মধ্যেই একদল গুণ্ডা হাজির হলো জেলেপাড়ায়। তারপর উধাও হয়ে গেল ইটে। কুমিরের কামড় খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলো ভাউযা। সেদিনই গুণ্ডারা লাগল রেমির পিছে, আবির্ভাব ঘটল মাসুদ রানার।

অভিশপ্ত ওই গুপ্তধনের কারণে কি কম ভুগতে হচ্ছে এই বিদেশি মানুষটাকেও? আরামে কাটাতে-আসা ছুটি হারাম হয়ে গেছে ওর। আপাতদৃষ্টিতে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে গিয়ে গুণ্ডাবাহিনীর টার্গেটে পরিণত হয়ে গেছে সে। ওকে নিশ্চয়ই শুধু মজা করার জন্য ক্রকোডাইল নদীর তীরে ফেলে দেয়নি গুণ্ডারা? আজ ভূমিকম্পের কারণে আটকা পড়ল লোকটা ধ্বংসাবশেষের ভেতরে—কী আশ্চর্য, নিজের নিরাপত্তার আগে ভেবেছে সঙ্গের মেয়েটার কথা! সবশেষে, ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো আবার হাজির হলো হ্যাংলা লোকটা, তার সঙ্গে সেই দুই স্যাঙাৎ। আশ্চর্য, পরোক্ষভাবে হলেও ওই তিন গুণ্ডা লেগেছিল গুপ্তধনের পেছনে; কী অভিশাপ—তিনজনের মধ্যে দু'জন এখন মৃত। মারা গেছে ওদের আরও তিন সঙ্গী।

উঠে দাঁড়াল রেমি, অস্থির লাগছে ওর। পায়চারি করে বেড়াতে লাগল ছোট্ট কেবিনটাতে।

দেবতাদের অভিশাপ কি কাজ করেনি জাপানি সৈন্যদের বেলাতেও? ইসাটাবুর যুদ্ধে কি আমেরিকানদের কাছে নাস্তানাবুদ হয়নি তারা? যদি অনুমান করা হয়, জাপানে ফেরত-যাওয়া সৈন্যদের সঙ্গে জাপানে গিয়েছিল অভিশাপটাও, এবং সে-

বইঘর.কম

কারণেই বিশ্বযুদ্ধের সময় পৃথিবীর আর কোথাও না, শুধু জাপানেই ফেলা হয়েছিল আণবিক বোমা, তা হলে কি ভুল হবে?

পিপাসা লেগেছে রেমির; পানি খেতে হলে বাইরে যেতে হবে ওকে, কিন্তু এই কেবিন ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না ওর এখন। বন্ধ দরজাটার অন্যপ্রান্তে খোলা ডেক, সেখানে আজ রাতে দু'জন তরতাজা লোককে মরতে দেখেছে মেয়েটা চোখের সামনে। হঠাৎ করেই টের পেল, গুমট আবহাওয়ার কারণে হোক অথবা অন্য কোনও কারণে হোক, ঘামছে সে; অসহ্য একটা অস্থিরতার কারণে দম আটকে আসতে চাইছে ওর। রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে—ইটের খবর আর কোনওদিন পাওয়া যাবে না ভেবে, ভাউযার সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না ধরে নিয়ে।

বাতি জ্বালিয়ে রেখেই আবার শুয়ে পড়ল সে, তাকিয়ে আছে বন্ধ দরজাটার দিকে। নাহ্, আসবে না মানুষটা।

রেমি চলে যাওয়ার পর কম্পিউটার মনিটরের মুখোমুখি হলো রানা আবারও, ওকে ভেলরের কথা মনে করিয়ে দিয়ে গেছে মেয়েটা।

ই-মেইল চেক করে নিজের ফেইসবুক অ্যাকাউণ্টে ঢুকল রানা। নোটিফিকেশনগুলো দেখল একনজর। একটা মেসেজ এসেছে, ওটা খুলল। সোহানা লিখেছে: খুব তো বেড়ানো হচ্ছে একা একা। আর এদিকে গাধার খাটুনি খেটে চলেছি আমি।

মুচকি হাসল রানা, জবাবে লিখল: শব্দটা গাধা হবে না, গাধী।

"সার্চ ফেইসবুক" লেখা খালি জায়গাটাতে ক্লিক করল রানা। ওখানে একটা "এল" এবং একটা "আর" দিয়ে লিখল: নাম্বানা ভেলর।

কোনও রেযাল্ট পাওয়া গেল না। একই শব্দ দুটো "এল" দিয়ে লিখল রানা। ফলাফল একই।

মনিটরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা, তারপর দুটো "এল" ঠিক রেখে "আর"-এর পেছনে বসিয়ে দিল একটা "ই"।

সার্চ করল আবার।

হ্যাঁ, এবার কয়েকটা রেযাল্ট পাওয়া যাচ্ছে। ভেলর এসপিনোযা: লিমা, পেরু...দরকার নেই। ভেলর মোরেলি রিয়াদুসভিসুর: নেদারল্যাণ্ডস...লাগবে না। ভেলর লুকিয়ানোভা: ব্যাংকার...বাদ। ভেলর আমিরাটো: বিকিনি কমিউনিটি...মুচকি হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। বিকিনিওয়ালারা তা হলে ফেইসবুকে কমিউনিটিও খুলেছে!

"সার্চ মোর" অপশনে গেল রানা, পাওয়া গেল ভারতের ভেলর আর সেখানকার কয়েকটা প্রতিষ্ঠান। ওগুলোর ওপর থেকে চোখ সরানোমাত্র একটা নাম আটকে গেল রানার দৃষ্টিতে: নাম্বানা পি ভেলর। অস্পষ্ট ছবিটার ওপর ক্লিক করল রানা। কয়েক মুহূর্ত পরই দেখা গেল ডক্টর ভেলরকে।

স্ট্রেইটকরা চুলগুলো ছেড়ে দিয়েছে সে নিজের আবক্ষ প্রোফাইল পিকচারে, সুন্দর চেহারায় ভুবনভোলানো হাসি ফুটিয়ে মাথাটা একটু কাত করে তাকিয়ে আছে দর্শকের দিকে, পরনে হাতাকাটা হালকা সবুজ একটা জামা। ছবিটা ঠিক কোন্ সময়ের অনুমান করার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু পারল না—বয়স ধরে রাখার ব্যাপারে ভেলর ওস্তাদ। ব্যাকগ্রাউণ্ডটা...কেন যেন পরিচিত বলে মনে হচ্ছে রানার কাছে; কিন্তু মনোযোগ দিয়ে কিছুক্ষণ দেখার পর বুঝল, আসলে ওই ব্যাপারে নিশ্চিত না ও।

নিজের কভার পেইজে ইসাটাবুর সুন্দর একটা ছবি ব্যবহার করেছে ভেলর, অনুমান করল রানা। দু'ধারের ঘন সবুজ গাছপালার মাঝখান দিয়ে চলে গেছে একটা কাঁচা রাস্তা, একটু খেয়াল করলে চোখে পড়ে টলটলে পানির একটা পুকুর। ছবিটার নিচে বাঁ দিকে লেখা উঠে আছে সাম্প্রতিক সময়ে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে ভেলর, কোথায় থাকে সে, কী করে ইত্যাদি। মেয়েটার ফ্রেণ্ডলিস্টটা দেখতে পারল না রানা, ওটা সম্ভবত ব্লক করা। "ফটোয" শব্দটার ওপর ক্লিক করল ও।

প্রথম ছবিটা হেণ্ডারসন ফিল্ডের, কোনও এক মেঘলা দিনে

ভেলর নিজেই বোধহয় তুলেছে ওটা, রানওয়েতে অলস দাঁড়িয়ে আছে দুটো অ্যারোপ্লেন। পরের ছবিতে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে হাসছে এক দ্বীপবাসী, নিচে লেখা: আমাদের ইসাটাবু, আমাদের গর্ব। তারপরেরটাতে দ্বীপের রেইন ফরেস্টে গিয়ে ঢুকেছে সে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমলের একটা পরিত্যক্ত কামানের কাছে দাঁড়িয়ে কী যেন দেখছে। তারপর একদল আদিবাসী মহিলার মাঝখানে, একটা সদ্যোজাত আদিবাসী শিশু কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে, নিচে লেখা: এরাও মানুষ, এদেরও অধিকার আছে চিকিৎসাসেবা পাওয়ার। পরের ছবিটা একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহাজের, রানা এখন যেখানে আছে সেখান থেকে দিনের বেলায় খালিচোখে দেখা যায় জাহাজটার কাঠামো; একদল ট্যুরিস্টের সঙ্গে একটা ইঞ্জিনবোটে করে ওটার কাছে গেছে ভেলর, কিছুটা দূর থেকে ফটোশুট করা হয়েছে ওদের।

পরের ছবিটা দেখামাত্র একটা ধাক্কার মতো লাগল রানার বুকের ভেতরে। ইসাটাবুর কয়েকজন আদিবাসী যুবতীর সঙ্গে সাগরসৈকতে দাঁড়িয়ে আছে ভেলর, পরনে ছোট জাঙ্গিয়া; তবে অর্ধনগ্ন মেয়েগুলোর সঙ্গে যেন একাত্মতা ঘোষণা করে খুলে ফেলেছে টপসটা, নিজের দুই স্তন দুই হাতে আড়াল করে সব দাঁত বের করে হাসছে।

এ-রকম একটা ছবি ফেইসবুকে দিতে পারল ভেলর? যদিও ইসাটাবুর বেশিরভাগ রমণীই অর্ধনগ্ন, কিন্তু শিক্ষিত কারও এই ছবি ভাবা যায় না।

আশ্চর্য সমাজব্যবস্থা ইসাটাবুর আদিবাসীদের, ভাবল রানা। এখানে মেয়েদের মদ খাওয়াটা কলঙ্কের বিষয়, কিন্তু তাদের উন্মুক্ত বুক তাদের জন্য লজ্জার কারণ নয়। সার্জেন্ট ফুগুইয়ের কথা হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল রানার, আপনমনে হেসে ফেলল ও। এ-রকম কোনও ছবি যদি প্রিন্ট করে দেয়া হয় সার্জেন্টকে, তা হলে কী হতে পারে লোকটার অবস্থা?

একটা ছবিতে খুঁজে পাওয়া গেল শিশু ভেলরকে। মস্তবড়

গোঁফওয়ালা বলিষ্ঠ এক লোকের কোলে সে, সবগুলো দাঁত বের করে হাসছে লোকটা, যদিও ওপরের পাটির দাঁতগুলো ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না গোঁফের কারণে। নিচে লেখা: জিহাভো ফিলিপ্স, আমার বাবা, আমার আদর্শ।

নাম্বানা পি ভেলর নামটার "পি"-এর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া গেল, ভাবল রানা।

আরও কিছু এলেবেলে ছবি আছে ভেলরের, আছে উপদেশবিতরণমূলক কিছু পোস্ট। একটা পোস্টে সে বলছে: তুমি যার সঙ্গেই পরিচিত হও না কেন, সে-ই জীবনযুদ্ধের একজন সৈনিক। সুতরাং দয়ালু হও, সবসময়। আরেকটা পোস্টে বলা হচ্ছে: ঈশ্বর নিজেও নিশ্চয়ই একজন প্রকৃতিপ্রেমিক। কারণ সূর্যটা সোনালি, আর আকাশটা নীল।

হাই তুলল রানা, ঘুম পাচ্ছে ওর। ভেলরের পোস্টকরা ছবিগুলোর শেষপর্যায়ে চলে এসেছে। এখন দেখা যাচ্ছে মেডিকেল গ্র্যাজুয়েশন সনদ পাওয়া ভেলরকে, একটা ক্যাম্পাসে বেশ কয়েকজন সহপাঠী-সহপাঠিনীসহ দাঁড়িয়ে আছে সে হাসিমুখে, খুশিতে ঝলমল করছে ওদের সবার চেহারা।

হ্যাঁ, এবার যেন একটুখানি হলেও বোঝা যায়, ছবিটা যখন তোলা হয়েছে, এখনকার তুলনায় বয়স কম ছিল মেয়েটার। নিচে লেখা আছে: আমার স্বপ্নপূরণের দিন, মনাশ ইউনিভার্সিটি। যথেষ্ট সময় নিয়ে ছবিটা ভালোমতো দেখল রানা, তারপর হাই তুলল আবারও। দেখতে লাগল বাকি ছবিগুলোও, একটা ছবিতে গিয়ে আবারও থমকাতে হলো ওকে।

একনজর দেখলেই বোঝা যায় এটা ভেলরের ছাত্রীজীবনের ছবি, তখন অস্ট্রেলিয়ায় থাকত সে; গিয়েছিল একটা নাইটক্লাবে, ব্যাকগ্রাউণ্ডে নগ্ননৃত্য পরিবেশন করছে দু'জন তাগড়া পুরুষ, নিচে লেখা: শুধু কি ছেলেরাই পারে মেয়েদের নগ্ননাচ দেখতে? মেয়েরাও পারে ছেলেদেরকে ন্যাংটো করে নাচাতে, এবং ওদের দিকে টাকা ছুঁড়ে মারতে।

'মিস্টার রানা?'

চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা।

পাইলটহাউসের দরজায় উদয় হয়েছে টনি, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মনিটরের ছবিটার দিকে। কাছে এল সে, ছবিটা দেখল আবারও, ভেলরের মন্তব্যটা পড়ল। তারপর একটুখানি হেসে বলল, 'সাংঘাতিক একটা মেয়েকে নিজের ফেইসবুক ফ্রেণ্ড বানিয়েছ তুমি, মিস্টার রানা।'

নিজের আইডি থেকে লগআউট হতে হতে রানা বলল, 'মেয়েটা আমার বন্ধু না, টনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ওর অস্তিত্ব আছে কি না, জানতে গিয়ে দেখতে পেলাম ছবিটা।'

'কে সে?'

'ইসাটাবুর একটা হাসপাতালের চীফ মেডিকেল অফিসার। ...তুমি কি ডিউটি করতে চাইছ এখন?'

মাথা ঝাঁকাল টনি। 'ভোর চারটে বাজে। নিজেকে আর কতক্ষণ কষ্ট দেবে? গিয়ে শুয়ে পড়ো এবার।'

হাতঘড়ি দেখল রানা। ভেলরের ফেইসবুক অ্যাকাউণ্ট ঘাঁটতে ঘাঁটতে খেয়ালই ছিল না, কোন্ ফাঁকে কেটে গেছে এতটা সময়। উঠে দাঁড়াল ও। গিয়ে ঢুকল নিজের কেবিনে, শুয়ে পড়ল বাঙ্কে। মাথাটা কেমন ভারী ভারী লাগছে।

বডিবিল্ডার আর খোদার-খাসিকে নিয়ে কেন এসেছিল হ্যাংলা? কেন ফিরে যেতে গিয়েও যায়নি খোদার-খাসি?

সন্দেহ নেই, ওদের দলটা প্রথম থেকে নজর রাখছে রানার ওপর। গতরাতের সেডান প্রমাণ করে সেটা। কিন্তু তা-ই বলে হাজির হয়ে যাবে পোসেইডনের ডেকে? যেখানে রানার সঙ্গে আরও চারজন শক্তসমর্থ পুরুষ আছে সেখানে? আসলে ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছে ওরা; জানত, ওদের এই হঠাৎ আবির্ভাবের কথা কল্পনাও করতে পারবে না রানা অথবা ওর সঙ্গীরা। এবং ওদের একমাত্র টার্গেট ছিল রেমি তানাঘাই, যাকে ভয় দেখিয়ে কাবু করতে পারলে গুপ্তধনের খবর জানা যাবে সহজেই।

একমাত্র? আরও একবার হাই তুলল রানা, পাশ ফিরল। বডিবিল্ডার কি শোধ নিতে চায়নি রানার ওপর? রানা ঘুমিয়ে আছে, জানার পর লোকটা কি হাতের ঝাল অনায়াসে ঝাড়ার জন্য হাজির হয়নি রানার কেবিনে?

"মাসুদ রানা কোথায়?"—রেমির কাছে জানতে চাওয়া হ্যাংলার প্রশ্নটা যেন ঘড়ির কাঁটার মতো টিকটিক করছে রানার ক্লান্ত মগজে। প্রশ্ন হচ্ছে, হ্যাংলা কীভাবে জানতে পারল রানার নাম?

মগজটা ক্লান্ত থেকে আরও ক্লান্ত হচ্ছে যেন; শুধু মাথা না, অবসাদটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। ঠিক কখন ঘুমিয়ে পড়ল রানা, বলতে পারবে না নিজেও। ঘুমের ঘোরে আজব এক স্বপ্ন দেখল আজও।

মনাশ ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে হাজির হয়েছে ও, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে গ্র্যাজুয়েশন সনদ পাওয়া শিক্ষার্থীদের। বাঁধভাঙা খুশিতে হাসাহাসি করছে সবাই, ছোটাছুটি করছে, কখনও আবার একসঙ্গে দাঁড়িয়ে গ্রুপ ফটো তুলছে। আশ্চর্য, মেয়েদের সবার পরনে সুন্দর সুন্দর পোশাক, কিন্তু ছেলেরা সবাই আপাদমস্তক নগ্ন।

রানাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল ভেলর, জিভটা বের করে ভেংচি কেটে বলল, 'শুধু কি ছেলেরাই পারে মেয়েদের নগ্ননাচ দেখতে? মেয়েরাও পারে ছেলেদেরকে ন্যাংটো করে নাচাতে, এবং ওদের দিকে টাকা ছুঁড়ে মারতে।'

ঘুমের মধ্যেই গুঙিয়ে উঠল রানা।

আঠারো

কে যেন বার বার ধাক্কা দিচ্ছে কেবিনের বন্ধ দরজায়।

চোখ খুলল রানা, হাতঘড়ি দেখল। সকাল সোয়া দশটা।

'মিস্টার রানা?' আবারও ধাক্কা দেয়া হলো দরজায়, কটনের কণ্ঠ শুনে বোঝা গেল জরুরি কোনও পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে। 'একটু বাইরে আসবেন? সার্জেন্ট ফুগুই দেখা করতে চাইছেন আপনার সঙ্গে।'

সার্জেন্টের নামটা যেন বাঙ্ক থেকে আলাদা করে দিল রানার পিঠ, খেয়াল করল গরমে ঘেমে গেছে ও; চোখ কচলাতে কচলাতে এগিয়ে গেল দরজার দিকে, খুলল সেটা।

কটনের চেহারায় উদ্বেগ। চাপা গলায় বলল, 'আমি মুখ খুলতে চাইছি না সার্জেন্টের সামনে—বেফাঁস কিছু বলে ফেললে লোকটা কী থেকে কী করে বসে কে জানে!'

মাথা ঝাঁকাল রানা, কটনকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল পোসেইডনের ডেকে। এত বেলা হয়ে গেছে, তারপরও রোদের দেখা নেই; টুকরো টুকরো কালচে মেঘ ছেয়ে ফেলেছে আকাশটাকে, সাগরের পানির রঙ নীলের বদলে ধূসর এখন। আবহাওয়া অস্বাভাবিক গুমট, ভাপসা গরম চারদিকে।

একদিকের রেলিং-এর কাছে একটা ফোল্ডিং চেয়ার পেতে দেয়া হয়েছে ফুগুইয়ের জন্য, ওটাতে বসে আছে সে, তাকিয়ে আছে রানার দিকে। আরেকটা চেয়ার নিয়ে গিয়ে লোকটার মুখোমুখি বসে পড়ল রানা।

'গুড মর্নিং,' আন্তরিক হওয়ার চেষ্টা করল ফুগুই।

মাথা নাড়ল রানা। 'আপনার শুভকামনার জন্য ধন্যবাদ, সার্জেন্ট, কিন্তু আবহাওয়া বলছে মর্নিংটা ভালো না। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ও কথাটা বলছে আমাকে। কারণ সকালটা শুভ হলে ঘুম থেকে উঠেই আপনার মুখোমুখি বসতে হতো না আমাকে।'

'কিছু করার নেই। আপনি এমন একজন মানুষ, ঘটনা বা দুর্ঘটনা যার পিছু ছাড়ে না, ফলে যাদের গায়ে আমার মতো পুলিশের উর্দি থাকে তাদেরকেও পালন করতে হয় নাছোড়বান্দার ভূমিকা। যা-হোক, আমি কিন্তু ভেবেছিলাম আরও তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস আপনার।'

'কাল রাতে দেরি হয়ে গেছে—ফেইসবুক ঘেঁটেছি অনেকক্ষণ।'

'শুধু ফেইসবুক? অন্য কোনও কারণ নেই?'

'অন্য কারণ, সার্জেন্ট?'

'যেমন মারামারি। অথবা...গোলাগুলি।'

'মারামারি?' নিখাদ বিনোদনের ভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল রানা নিজের চেহারায়। 'দু'-তিনজন গুণ্ডাকে একবার একটু শিক্ষা দিয়েছি বলেই কি রঙবাজ হয়ে গেছি নাকি আমি? আর গোলাগুলি? কিছু মনে করবেন না, সার্জেন্ট, বলতে বাধ্য হচ্ছি, ওই ব্যাপারে আপনি যথেষ্ট কল্পনাপ্রবণ। আরেকটু হলেই একটা বেরেটা খুঁজে পেয়েছিলেন আমার হোটেলরুমে, মনে পড়ে? ...গোলাগুলির খবরটাও নিশ্চয়ই ফোন করে জানিয়েছে কেউ আপনাকে?'

'কাল রাতে গোলাগুলি হয়েছে এখানে...সৈকতের ধারে বাস করে এ-রকম অনেকে শুনেছে গুলির আওয়াজ। আপনি নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন না এতগুলো লোক বানিয়ে কিছু বলবে আমাকে?'

'না, তা পারি না। তবে আমি আশা করতে পারি, গোলাগুলি যদি হয়েও থাকে, ঘটনাস্থল সম্বন্ধে ভুল করছে অতগুলো লোক।'

'তা-ই? আপনাদের পাইলটহাউসের কয়েক জায়গার কাঁচ

উধাও।'

সময় নিয়ে ঘাড় ঘুরাল রানা, পাইলটহাউসটার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর সময় নিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'দোষ আসলে আপনার না, সার্জেন্ট, দোষ আমাদের। আগেরবার যখন এসেছিলেন, খাতির করে ডেকে তোলা উচিত ছিল আপনাকে, দেখানো উচিত ছিল আমাদের ভেসেলটা। কিন্তু তা করতে পারিনি আমরা। যদি পারতাম, নিশ্চয়ই দেখতে পেতেন, কাঁচগুলো আগে থেকেই ভাঙা। ...পোসেইডন একটা রিসার্চ ভেসেল, সাত ঘাটের পানি খাওয়া জলযান। ধকল কি কম যায় এটার ওপর দিয়ে? টাইফুন, টর্নেডো, হারিকেন—কোন্‌টা সহ্য করেনি এই জাহাজ, বলুন? ঝড়ের সময় যদি কাঁচ ভেঙে যায়, দোষটা আমাদেরকে না দিয়ে, প্রকৃতিকে দিলে কি ভালো হয় না?'

'আমার সব কথারই কোনও না কোনও জবাব থাকে আপনার কাছে, মিস্টার রানা। কিন্তু,' ডান হাতের বুড়ো আঙুলের ইশারায় নিজের পেছনের রেলিং দেখাল ফুগুই, 'যদি বলি একটা রেলিং-এর চলটা বিশ্রীভাবে উঠে গেছে, বেশ কিছুটা ভেতরের দিকে দেবে গেছে ওটা, যা কি না বুলেটের আঘাতের চিহ্ন বলে মনে হয়, তা হলে কী বলবেন?'

'তা হলে আবারও কল্পনাপ্রবণ বলব আপনাকে। কারণ একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবেন, যেখানে বসেছেন, তার কাছেই নোঙরের খুঁটি; মোটা শেকল নেমে গেছে নিচে, নামিয়ে রাখা হয়েছে নোঙরটাও। নোঙর তুলতে বা নামাতে গিয়ে কি রেলিং-এর সঙ্গে সংঘর্ষ হতে পারে না? কাজটা কি সবসময়ই ধীরেসুস্থে করা হয়, কখনোই তাড়াহুড়োর প্রয়োজন পড়ে না? এবং এত ভারী একটা নোঙরের আঘাত কি বুলেটের আঘাতের মতো চিহ্ন তৈরি করতে পারে না রেলিং-এর গায়ে?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ফুগুই, তারপর অধৈর্য ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল। 'আপনি তা হলে স্বীকার করবেন না কাল রাতে গোলাগুলি হয়েছিল এখানে?'

‘না, করব না। কারণ যা ঘটেনি, যার কোনও আলামত টের পাইনি আমরা ছ’জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের কেউই, তা স্বীকার করব কেন? যারা খবর দিয়েছে আপনাকে, ঘটনাস্থল চিনিয়ে দেয়ার দায়িত্বটা তাদেরকেই দিচ্ছেন না কেন আপনি?’

ডাইভিংল্যাডারের দিকে এগিয়ে যেতে উদ্যত হলো ফুগুই।

‘চলে যাচ্ছেন?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

থামল ফুগুই। ‘হ্যাঁ। কাজ আছে আমার।’

‘একটু অপেক্ষা করবেন? চট করে ফ্রেশ হয়ে আসি, পয়েন্ট ক্রুয পর্যন্ত আরেকবার না হয় লিফট দিলেন আমাকে?’

আশ্চর্য, কিছু না বলে রাজি হয়ে গেল ফুগুই, বসে পড়ল চেয়ারে।

উঠে দাঁড়াল রানা। ‘আমি বন্দরে যাচ্ছি শুনলে আমার সঙ্গে আরেকজন যেতে চাইতে পারে। আপনার অসুবিধা নেই তো?’

‘না। কে সে?’

‘একটা মেয়ে।’

‘তা হলে আমার সামনে আসছে না কেন সে?

‘প্রশ্নটা আমাকে জিজ্ঞেস না করে আপনার নিজেকে জিজ্ঞেস করলে ভালো হয় বেশি। ...কফি খাবেন?’

‘না,’ কালো চেহারা আরও কালো হয়ে গেছে ফুগুইয়ের।

‘কামঅন, সার্জেন্ট। আমার কাছে বেরেটা থাক বা না থাক, অন্তত বিষ যে নেই সে-ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন। আর যে-মেয়ের কথা বললাম, কফি বানানোর দিক দিয়ে সে সারা ইসাটাবুতে অদ্বিতীয়, অন্তত আমার বিচারে।’

রানা আর রেমিকে পয়েন্ট ক্রুযে নামিয়ে দিয়ে, রেমিকে আপাদমস্তক শেষবার দেখে নিয়ে, চলে গেল ফুগুই।

লোকটা দৃষ্টিসীমার আড়ালে যাওয়ামাত্র থু করে থুতু ফেলল রেমি। তারপর বলল, ‘সারা গা ঘিনঘিন করছে আমার। মনে হচ্ছে নর্দমায় পড়ে গিয়েছিলাম।’ আবারও থুতু ফেলল।

রানা কিছু বলল না, তাকিয়ে আছে পোসেইডনের দিকে। আকারে একটা ম্যাচবাক্সের চেয়েও ছোট বলে মনে হচ্ছে ওটাকে; জানা না থাকলে এত দূর থেকে বোঝা সম্ভব না, ওটা কোনও সাম্পান নাকি অগযিলারি রিসার্চ ভেসেল।

আসার আগে কটনকে বলেছে রানা, হেক্টর আর রিকার্ডো যেন কাজ চালিয়ে যায়—ধ্বংসাবশেষের ভেতরে খোঁজ অব্যাহত রাখবে ওরা, নতুন কিছু পাওয়া যায় কি না দেখবে। স্যাটেলাইট ফোনটা আছে রানার সঙ্গে, কিছু পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে যেন জানানো হয় ওকে। যত জলদি সম্ভব চলে আসার চেষ্টা করবে ও।

পয়েন্ট ক্রুযের অবস্থা শান্ত, তবে একটু খেয়াল করলে বোঝা যায় চাপা একটা উত্তেজনা বিরাজ করছে। দূর সাগরে নোঙর করে আছে মাত্র দুটো জাহাজ, ইঞ্জিনচালিত একটা কার্গো নৌকা এগিয়ে যাচ্ছে একটা জাহাজের দিকে, আরেকটা নৌকা মাল নিয়ে ফিরে আসছে। মালবোঝাই যে-নৌকাগুলো ভিড়ে আছে বন্দরে, সেগুলো থেকে খালাসের কাজে তেমন উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে না।

পার্কিংলটে লোক নেই বললেই চলে। ভাউযার ভটভটিটাতে উঠতে যাচ্ছিল রানা, কিছু একটা মনে পড়ে গেল ওর, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বাইকটার দিকে।

'কী?' জানতে চাইল রেমি।

'বাইকটা...কাল লম্বা একটা সময় ধরে একলা ছিল এখানে।'

'তো?'

জবাব না দিয়ে বাইকের এখানে-সেখানে দেখতে লাগল রানা, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। সামনের চাকা, পেছনের চাকা, হ্যাণ্ডেল, ইঞ্জিন...সব মোটামুটি ঠিকই আছে, কিন্তু...সীটটা...একটুখানি বেঢপ লাগছে না? পকেট থেকে মাল্টিপারপাস নাইফটা বের করল রানা, ওটার সহায়তায় সীটটা যত দ্রুত সম্ভব খুলে ফেলে ধরিয়ে দিল রেমির হাতে।

যা ভেবেছিল তা-ই—ছোট্ট একটা ট্রান্সমিটার কায়দা করে বসিয়ে দেয়া হয়েছে সীটের নিচের বডির সঙ্গে, একটা লাল বাতি

নির্দিষ্ট বিরতিতে বার বার জ্বলছে-নিভছে জিনিসটার মাথায়। মাল্টিপারপাস নাইফটা আরেকবার কাজে লাগাল রানা, ট্রান্সমিটারটা আলগা করল বাইকের বডি থেকে।

'কী এটা?' চিনতে না পারলেও রেমি বুঝতে পেরেছে জিনিসটা বিপজ্জনক কিছু, ঘাবড়ে গেছে তাই।

'ট্রান্সমিটার,' বলল রানা। 'এবং যথেষ্ট উন্নতমানের।'

'মানে?'

'সাধারণ মানে হচ্ছে, এটা এমন একটা ডিভাইস, যা অকেজো না হওয়া পর্যন্ত, অথবা পাওয়ার সাপ্লাই না ফুরোনো পর্যন্ত, তোমার ভেহিকেলের অবস্থান ক্রমাগতভাবে জানাতে থাকবে আরেকটা সিগনাল রিসিভিং ডিভাইসে। আর অন্তর্নিহিত মানে হচ্ছে, যে-গুণ্ডাবাহিনী লেগেছে আমাদের পেছনে, তারা সাধারণ কোনও দল নয়, বরং আমি বলব তারা সংগঠিত এবং যথেষ্ট টাকা খরচ করা হচ্ছে তাদের পেছনে।'

'কিন্তু...দ্বিতীয় ডিভাইসটা কোথায়?'

রেমি প্রশ্নটা করার আগেই এদিকওদিক তাকাচ্ছিল রানা; ওদের থেকে দু'শ' গজ দূরে, ডক এরিয়া থেকে বের হওয়ার রাস্তাটা যেদিকে বাঁক নিয়েছে ইসাটাবুর প্রধান সড়কের দিকে, আঙুল তুলল সেদিকে—সেডানটা দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। চোখ রাখা হচ্ছিল ওদের ওপর; রানাকে আঙুল তুলতে দেখে গর্জে উঠল সেডানের ইঞ্জিন, নাক ঘুরিয়ে নিয়ে পেছনে একরাশ ধুলো উড়িয়ে উধাও হয়ে গেল ওটা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে।

রেমির দিকে চেয়ে হাসল রানা, হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল ট্রান্সমিটার। সীটটা জায়গামতো বসাল, কিন্তু স্ক্রুগুলো লাগাল না, বরং রেখে দিল পকেটে, উঠে বসল।

ওর পেছনে গম্ভীর চেহারায় বসে রেমি বলল, 'কোথায় যাবেন এখন?'

'কেন, হাসপাতালে?'

'একটু বাসায় যাওয়ার দরকার ছিল যে আমার?'

'ঠিক আছে, তোমাকে নামিয়ে দিয়ে হোটেলে চলে যাব আমি তা হলে। ...আবার কি নিতে আসব?'

'দরকার নেই। সময়মতো আমিই হাজির হয়ে যাব হোটেলে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বাইক স্টার্ট করল রানা। রেমিকে জায়গামতো নামিয়ে দিয়ে চলে এল মেণ্ডানায়। জানতে পারল, একটা লোক নাকি এসেছিল সেণ্ট্রাল হাসপাতাল থেকে, খুঁজে গেছে ওকে। এমনকী, ম্যানেজারকে ফোন করে রানা কোথায় জানতে চেয়েছে ভেলর নিজে।

রানাকে খুঁজেছে ভেলর?

যা-হোক, ব্যাপারটা নিয়ে এখনই চিন্তিত না হলেও চলবে, কারণ একটু পরেই তো রেমিকে নিয়ে যাচ্ছে রানা সেণ্ট্রালে। আগের কাজ আগে করা যাক।

মেণ্ডানার বাইরেই, ট্যুরিস্টদের কথা ভেবে, একটা ফ্যান্সি কাম মিনি ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর খোলা হয়েছে; ওখান থেকে নাইলনের সরু কিন্তু শক্ত একগাছি রশি কিনল রানা। চলে এল নিজের রুমে, ফ্যানের ব্লেড থেকে নামাল টমক্যাটটা, গুঁজল পেটের কাছে, ছেড়ে দিল শার্টের ইন। সিঁড়ি বেয়ে নেমে আবার হাজির হলো বাইকের কাছে; স্ক্রু লাগায়নি, তাই চট করে তুলতে পারল সীটটা, এদিকওদিক দেখে নিয়ে ঝুঁকে পড়ল বাইকের ওপর। টমক্যাটটা বের করল, একহাতের তালু দিয়ে আড়াল করে ঠেসে ধরল সীটের নিচের স্টীল বডির সঙ্গে, দড়ির গাছিটা হাতে নিল। একটু সময় খরচ করে ভালোমতো দেখে বুঝে নিল ঠিক কোন্ কায়দায় আগ্নেয়াস্ত্রটা বাঁধলে বাইরে থেকে টের পাওয়া যাবে না ওটার অস্তিত্ব। তারপর রশি দিয়ে বেঁধে ফেলল ও টমক্যাটটাকে স্টীল বডির সঙ্গে। কাজটা শেষ হওয়ার পর বাড়তি দড়ি কেটে ফেলল মাল্টিপারপাস নাইফ দিয়ে। সীটটা জায়গামতো বসিয়ে যখন স্ক্রু আটকাচ্ছে, ঘাড়টা এদিকওদিক ঘুরিয়ে নিয়ে দেখে নিল কেউ দেখছে কি না।

না, কাউকে নজরে পড়ল না ওর।

রুমে ফিরে এল ও, মোটামুটি সন্তুষ্ট বোধ করছে—গুণ্ডাদের শিখিয়ে দেয়া কায়দায় ওদেরকে ঘায়েল করার জন্য একটা আগ্নেয়াস্ত্র বহন করতে পারবে এখন রোডব্লক দেয়া পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে। চটজলদি গোসল সেরে নিল, হালকা কিছু খাওয়ার জন্য রুমসার্ভিসকে ডাকতে গিয়েও সিদ্ধান্ত বদল করল—হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে একবারে লাঞ্চ করা যাবে রেমিকে নিয়ে। টের পেল, একটু হলেও আরাম চাচ্ছে শরীরটা—কাল রাতে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি সময় খরচ করে ফেলেছে ফেইসবুকে। কিন্তু বিছানায় শুয়ে পড়তে গিয়েও সিদ্ধান্ত বদল করল, ইসাটাবু ক্যাম্পেইন আর হারুকিচি হায়াকুটাকির ব্যাপারে জানা বাকি আছে এখনও। রেমির ল্যাপটপটা টেনে নেয়ার আগে ফোন করল রায়হানকে। হায়াকুটাকির ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানাল ওকে। কিছুক্ষণ পরই ফিরতি ফোনে ওকে বিশেষ কয়েকটা ওয়েবসাইট আর সেগুলোতে ঢোকার কায়দা বাতলে দিল রায়হান। পাশাপাশি গুগলে সার্চ দিয়ে "ইসাটাবু—আমেরিকা'স ফার্স্ট ভিক্টরি অন্য দ্য রোড টু টোকিয়ো" এবং "দ্য ফার্স্ট টীম অ্যাণ্ড দ্য ইসাটাবু ক্যাম্পেইন" নামের বিশেষ দুটো ই-বুক খুঁজে বের করে পাঠিয়ে দিল রানার ই-মেইলে।

বই দুটোর চুম্বকাংশ পড়ে এবং সাইটগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করে রানা জানতে পারল, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন চলছে, তখন হায়াকুটাকি ছিলেন একটা জাপানি ডেস্ট্রয়ারের ক্যাপ্টেন। ইম্পেরিয়াল জাপানি আর্মি একাডেমি থেকে উনিশ শ' বত্রিশ সালে নেভি অফিসার হিসেবে গ্র্যাজুয়েশন করেন তিনি। উনিশ শ' ছত্রিশ সালে আর্মি স্টাফ কলেজের একটা পরীক্ষায় ভালো রেযাল্ট করার কারণে একটা ডেস্ট্রয়ারের সেকেণ্ড ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব পান। যুদ্ধের সময় মারা যান ওই জাহাজটার ক্যাপ্টেন, তখন জাপানি নৌবাহিনী তাঁকে ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব দেয়। উনিশ শ' তেতাল্লিশ

বইঘর.কম

সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুর দিকে, মিত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে একটা নৌযুদ্ধে পরাজিত হয়ে, বেশ কয়েকজন আহত সেনাসহ দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন হায়াকুটাকি। পথে ভয়ঙ্কর একটা টাইফুনের কবলে পড়তে হয় তাঁকে। দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে ডেস্ট্রয়ার নিয়ে তিনি চলে আসেন ইসাটাবুর কাছাকাছি। পরে দেশে ফিরে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন, কারণ চোখের সামনে ভুগতে ভুগতে মরতে দেখেছেন নিজের অধীনস্থ সৈন্যদের। একদিন কাউকেই কিছু না জানিয়ে উধাও হয়ে যান। তখন বিভিন্ন কারণে হরহামেশাই পালিয়ে যাচ্ছে অনেক জাপানি সেনা, আর ওদেরকে খুঁজতে গিয়ে নষ্ট করার মতো সময়ও নেই কর্তৃপক্ষের হাতে। তাই হায়াকুটাকির গায়েব হয়ে যাওয়ার ঘটনাটা তেমন গুরুত্ব পায়নি। যা গুরুত্ব পায় তা হলো, তাঁর রহস্যজনক আবির্ভাব—ইসাটাবু ক্যাম্পেইনের পর যেসব জাপানি সৈন্য মার্কিনিদের হাতে ধরা পড়ে বিশেষ ব্যবস্থায় ফিরে আসে দেশে, তাদের মধ্যে হায়াকুটাকিও ছিলেন।

'আশ্চর্য তো!' বিড়বিড় করল রানা। কয়েকটা প্রশ্ন উঁকি দিল ওর মনে। জাপান থেকে উধাও হয়ে কেন ইসাটাবুতে গেলেন হায়াকুটাকি? তাঁকে কি গোপন কোনও মিশনে পাঠানো হয়েছিল? তা-ই যদি হবে, তা হলে কেন বলা হলো, তিনি লাপাত্তা? যদি ধরে নেয়া হয় ইচ্ছাকৃতভাবে ইসাটাবুতে গিয়েছিলেন হায়াকুটাকি, তা হলে জানবাজি রেখে কেন করতে গেলেন কাজটা? আর যখন ধরা পড়লেন, তখন একজন জাপানি নাগরিক না, বরং তাঁকে একজন জাপানি সৈনিক হিসেবে কেন বিবেচনা করল আমেরিকানরা?

"মাই ইসাটাবু ডেইয"-এ রাজা শামানের গুপ্তধনের ইঙ্গিত দেয়া আছে, এবং সেটা হায়াকুটাকির মাধ্যমে। তা হলে কি অনুমান করা যেতে পারে, দিগ্‌ভ্রান্ত হায়াকুটাকি যখন ডেস্ট্রয়ার নিয়ে যাচ্ছিলেন ইসাটাবুর উপকূল দিয়ে, তখন এমন একটা কিছু দেখেছিলেন সেখানে, যা প্রচণ্ড কৌতূহলী করে তুলেছিল তাঁকে?

দেশে ফিরে গিয়ে সেটার কথা ভুলতে পারেননি তিনি, এমনকী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থাতেও না। তাই যেভাবেই হোক আবার হাজির হয়ে যান ইসাটাবুতে, কাজটা বিপজ্জনক জানার পরও। কিন্তু ক্যাপ্টেনের বেশে না, বরং একজন সাধারণ জাপানি হিসেবে, এবং একদল জাপানি লোক আর মাঝসাগরে ডুবুরির কাজ চালানোর মতো উপযোগী সাধারণ কোনও জলযান নিয়ে। চালাক মানুষ ছিলেন তিনি, জানতেন যদি ধরা পড়েন জাপানি সৈন্যদের হাতে, জাতভাই হওয়ার কারণে কিছু হবে না তাঁর। আবার আমেরিকানদের সহজ টার্গেটেও যাতে পরিণত না হন, সেজন্য বেছে নিয়েছিলেন সাধারণ জলযান। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, গুপ্তধন উদ্ধার করার পর সেগুলো কী করলেন হায়াকুটাকি?

নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার অভিযানের সঙ্গে হায়াকুটাকির অভিযানটার তুলনা করল রানা মনে মনে, বুঝতে পারল ওই কাজে অনেক সময় লেগে গিয়েছিল হায়াকুটাকির। নেট ঘেঁটে দেখল, ততদিনে ইসাটাবুতে হামলা শুরু করে দিয়েছিল মার্কিনিরা। তারমানে, অত কষ্ট করে উদ্ধার-করা গুপ্তধন বাঁচাতে একটামাত্র উপায় ছিল হায়াকুটাকির তখন: সেসব নিরাপদ কোথাও সরিয়ে ফেলা। এবং নিজেকে বাঁচানোর জন্যও করার মতো কাজ ছিল একটাই: কোথাও আত্মগোপন করা।

ইসাটাবুর যুদ্ধ নিয়ে আবার ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করল রানা ইন্টারনেটে। জানতে পারল, ইসাটাবু ক্যাম্পেইনে পরাজয়ের পর অনেক জাপানি সৈন্যই পালিয়ে গিয়েছিল রেইন ফরেস্টের এখানে-সেখানে। ওদেরকে ধরার জন্য জঙ্গলের ভেতরে চিরুনি অভিযান চালায় মার্কিন সৈন্যরা, এবং ধরতেও পারে অনেককে। ধরাপড়া ওই জাপানিদের মধ্যে হায়াকুটাকিও ছিলেন। ইসাটাবুর যুদ্ধে তিনি আদৌ অংশ নিয়েছিলেন কি না জানার দরকার নেই তখন মার্কিনিদের, ধরাপড়া জাপানিদের তখন ভেড়া খেদানোর মতো করে খেদিয়ে নিয়ে জড়ো করছিল একজায়গায়। পরে দেশে ফিরে আসতে হয় তাঁকে।

'এ-ই তা হলে রহস্যজনক আবির্ভাবের ব্যাখ্যা?' বিড়বিড় করল রানা আবারও।

নৌবাহিনী কর্তৃপক্ষের তখন এমন অবস্থা ছিল না যে, আত্মগোপনের অপরাধে বিচার করবে হায়াকুটাকির। কারণ ও-রকম ক'টা কেসের মীমাংসা করবে তারা? ফলে বিচারবহির্ভূত কারাবন্দি অবস্থায় সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে শুরু করেন হায়াকুটাকি। পঁয়তাল্লিশের অগাস্টে আণবিক বোমা ফেলা হলো হিরোশিমা-নাগাসাকিতে, আত্মসমর্পণে বাধ্য হলো জাপান। এ-অবস্থায়, তথাকথিত প্রাক্তন সৈন্যদের জেলে কয়েদ করে রেখে কোনও লাভ নেই বুঝে, ওদেরকে সুযোগ দিল কর্তৃপক্ষ—ওরা যদি পুনর্গঠনের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং ওদের বিরুদ্ধে যদি কোনও খারাপ রিপোর্ট না পাওয়া যায়, তা হলে মুক্তি দেয়া হবে। সুযোগটা নেন হায়াকুটাকি, একসময় মুক্তিও পেয়ে যান। ততদিনে অস্ট্রেলিয়া-নিউযিল্যাণ্ডের সঙ্গে নতুন করে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে জাপানের, টোকিও বিমানবন্দর থেকে সিডনি বা ওয়েলিংটনের রুটে নিয়মিত চলাচল করছে বাণিজ্যিক বিমানগুলো। কিন্তু হায়াকুটাকি বেছে নিলেন নৌপথ—গিয়ে চড়লেন অস্ট্রেলিয়াগামী একটা জাহাজে। রওনা দেয়ার পর বেশিদূর যেতে পারেনি জাহাজটা, ঝড়ের কবলে পড়ে, পূর্ব চীন সাগরে ডুবে যায়। সলিলসমাধি হয় সব যাত্রীর। যাদের মরদেহ উদ্ধার করা হয়, তাদের মধ্যে হায়াকুটাকিরটাও ছিল।

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে পিষে মারার সময় ভ্রূ কুঁচকে গেল রানার। হায়াকুটাকি যদি সাধারণ জাপানি নাগরিকের ছদ্মবেশে ইসাটাবুতে হাজির হয়ে থাকেন, তা হলে ওই ধ্বংসাবশেষের ভেতরে আরিসাকা রাইফেলের বেয়োনেট গেল কী করে?

বাইরে থেকে রুমের দরজায় টোকা পড়ল এমন সময়।

বিছানা ছেড়ে নামল রানা, দরজা খুলল। রেমি ঢুকল ভেতরে। সে-ও গোসল করেছে, একটা টিশার্ট আর হাফপ্যান্ট পরেছে, পায়ে চপ্পল। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রানা মেয়েটাকে, রুমের

ইন্টারকম টেলিফোন সেটটা বেজে ওঠায় পারল না। এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল রানা।

'স্যর,' বলা হলো রিসিপশন কাউন্টার থেকে, 'আপনার একটা ফোন এসেছে। লাইন ট্রান্সফার করব?'

নিশ্চয়ই ভেলর, ভাবল রানা। মুখে বলল, 'হ্যাঁ।'

ট্রান্সফার করা হলো লাইনটা।

'ভেলর?' বলল রানা।

'না। আপনার সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, মিস্টার ফুগুই, আমি জেকব ভাউয়া।'

সেই সর্দিলাগা কণ্ঠ।

একটা চমক অনুভব করল রানা। চুপ করে থাকল।

'নাকি আমার বলা উচিত ছিল, মিস্টার মাসুদ রানা?' আবার বলল সর্দিলাগা কণ্ঠটা।

'পুলিশ স্টেশনে আসতে বলেছিলাম তোমাকে,' মুখ খুলল রানা, 'আসোনি। পা-চাটা কুকুর বলে একটা কথা আছে, ইসাটাবুতে এসে দেখি কুমিররা চাটছে তোমার পা; তুমি না আসায় রাগ করেছিলাম, পরে যখন জানতে পারলাম তুমি হাসপাতালে ভর্তি, কোমায় থেকে মোবাইলে প্রেমালাপ করছ যমের সঙ্গে, তখন রাগ পানি হয়ে গেল আমার।'

এবার ওপ্রান্তে কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর সর্দিওয়ালা বলল, 'নিজেকে খুব চালাক ভাবেন আপনি, না?'

'জবাবটা তুমিই দাও। নৌকা বোঝাই করে একদল অতিচালাক পাঠালে গত রাতে, যাদের পাঁচজনের গলায় দড়ি পরালাম আমি নিজে। মাত্র এক রাতে ও-রকম পারফর্মেন্সের পর নিজেকে যদি চালাক ভাবতে শুরু করি, খুব বেশি দোষ কি দেয়া যায় আমাকে?'

'আপনাকে শেষবারের মতো সাবধান করে দেয়ার জন্য ফোন করেছি আমি, মিস্টার রানা!'

'আহ্...সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হলো রাজকুমার, শামান

রাজার দেশে গিয়ে শুনল সেখানে একজন শুভাকাঙ্ক্ষী আছে তার...রূপকথা জমেছে ভালো।'

'এখনও সময় আছে। হয় চলে যান ইসাটাবু ছেড়ে, নয়তো হাত মেলান আমার সঙ্গে। গুপ্তধনের বিশ পার্সেন্ট দেব আমি আপনাকে।'

'কিন্তু যদি তিন নম্বর অপশনটা গ্রহণ করি আমি?'

'তিন নম্বর?'

'ইসাটাবু ছেড়ে যাব না, তোমার হাত ভাঙব, গুপ্তধন তুলে দেব সরকারের হাতে, এবং নিজের প্রাপ্যটুকু বুঝে নেব।'

আবারও কিছুক্ষণের নীরবতা ওপ্রান্তে। তারপর হা হা করে হেসে ফেলল সর্দিওয়ালা, সমানে হাসছে।

'আস্তে হাসো,' বলল রানা, 'তোমার সব সর্দি নাক দিয়ে বের হয়ে গায়ে মাখামাখি হয়ে যাবে।'

হাসি বন্ধ হলো। 'ঠিকই বলেছেন, মিস্টার রানা, রূপকথা জমেছে ভালো। ...আপনি তা হলে ইসাটাবু ছেড়ে যাবেন না?'

'না।'

'আমার সঙ্গে হাত মেলাবেন না?'

'কয়েকবার তো হাত বাড়ালে আমার দিকে, জবাব পাওনি এখনও? আরও জোরে ঝাঁকি দিতে লাগবে আমাকে?'

'আচ্ছা যান, পঁচিশ পার্সেন্ট।'

'ফোনটা রেখো না, প্লিয। দরদাম চলতে থাকুক আমাদের। শতকরার হিসেবটা এক শ'তে পৌঁছাতে বেশি দেরি লাগবে বলে মনে হয় না।'

'মিস্টার রানা, ভুল করছেন আপনি, সাংঘাতিক ভুল। পরে কিন্তু মাশুল দিতে চাইলেও শোধরানো যাবে না সেটা। হাজার পস্তালেও...'

'ভুল আমি করছি না, বরং ভুল হচ্ছে তোমার—আমাকে চিনতে।'

'এ-ই তা হলে আপনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত?'

‘চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কথাটা তাদের বেলায় খাটে, যারা বার বার সিদ্ধান্ত বদলায়। আমি একবারই সিদ্ধান্ত নিই, এবং সেটা বদলাই না।’

আর কিছু না বলে লাইন কেটে দেয়া হলো ওপ্রান্ত থেকে।

রিসিভার জায়গামতো রেখে দিয়ে ঘুরল রানা, মুখোমুখি হলো রেমির।

‘কে ছিল?’ জানতে চাইল মেয়েটা।

তাড়া বোধ করছে রানা, তাই কে ফোন করেছিল, কী বলল, জানাল সংক্ষেপে। তারপর বলল, ‘চলো এখন।’ রুম থেকে বের হওয়ার সময় নিশ্চিত হলো, স্যাটেলাইট ফোনটা আছে ওর সঙ্গে।

হাসপাতালসংলগ্ন রাস্তার অবস্থা পয়েন্ট ক্রুযের মতো শান্ত না—দেখে চোখ সরু হলো রানার, বাইকটা থামাল ও হাসপাতাল থেকে বেশ কিছুটা দূরে।

ওখানে নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে জড়ো হয়েছে একদল দ্বীপবাসী, বেশিরভাগের হাতে লাঠিসোঁটা, দু’-একজনের কাছে মাচেটি। এরা ঠিক কোন্ জায়গায় গণ্ডগোল লাগাবে, বোঝা যাচ্ছে না। সেণ্ট্রাল হাসপাতাল তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনও জায়গা না, এখানে জল ঘোলা করলে ফায়দা হবে না কারোরই। সেক্ষেত্রে, অনুমান করল রানা, যেহেতু পুলিশের কড়াকড়ি নেই এ-জায়গায়, মারামারি করার ইচ্ছা যাদের আছে তারা আপাতত জড়ো হচ্ছে এখানে, দলে বড় হলে অন্য কোথাও যাবে পরে।

মোটরসাইকেল আরোহীর হেলমেট পরা এখানে বাধ্যতামূলক না, তারপরও পরেছে রানা; ওটা খুলে পিছন ফিরে পরিয়ে দিল রেমির মাথায়।

আশ্চর্য হলো রেমি। ‘আপনি কি আমার ক্ষতির আশঙ্কা করছেন?’

‘না, আমি তোমার নিরাপত্তার ব্যাপারটা ভাবছি।’ হাসপাতালের গেটের কাছে জড়ো-হওয়া লোকগুলোকে দেখাল

বইঘর.কম

রানা ইঙ্গিতে। 'ওরা ঝামেলা করতে পারে। ...যাবে হাসপাতালে, নাকি বাদ দেবে?'

'যাব। এত কাছাকাছি আসার পরও ভাউয়াকে না দেখে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

'ফোন করে ওর খবর নিতে পারি আমরা।'

'পারি, কিন্তু আমি হাসপাতালে যাব।'

বাইকটা চালু করল রানা। প্রস্তুত হয়ে আছে যে-কোনও জরুরি মুহূর্তের জন্য।

উত্তেজিত হয়ে আছে ফুটপাতের লোকগুলো, নিজেদের মধ্যে জোরালো কণ্ঠে পিজিন ভাষায় কীসব বলাবলি করছে ওরা, একটা মোটরসাইকেলকে হাসপাতালের দিকে এগোতে দেখে খেপা দৃষ্টিতে তাকাল কেউ কেউ, কিন্তু কিছু বলল না।

গেটটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল দু'জন সিকিউরিটি গার্ড, তাদের সঙ্গে পিজিন ভাষায় কিছুক্ষণ কথা বলল রেমি, ইণ্টারকমে ফোন করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিল একজন গার্ড, তারপর খুলে দিল দরজা।

পার্কিংলটে ঢুকল রানা, পরমুহূর্তে আবার লাগিয়ে দেয়া হলো দরজাটা।

পুলিশের বিরুদ্ধে মারামারি করার জন্য জড়ো-হওয়া জনতাকে খেপিয়ে তোলার দায়িত্ব ছিল দুই মিউটিনিয়ারের ওপর, চোখের সামনে দিয়ে বাইক চালিয়ে রানাকে ঢুকতে দেখল ওরা হাসপাতালে, পেছনে বসে আছে রেমি।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা। কিন্তু কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র, তারপরই কর্তব্য স্থির করে নিল একজন।

পকেট থেকে নিজের মোবাইল ফোনটা বের করল সে।

হাসপাতালের পার্কিংলটটা বলতে গেলে ভেহিকেলশূন্য। ভেলরের ছাদখোলা জিপটা দাঁড়িয়ে আছে হাসপাতাল-ভবনে ঢোকার মূল

দরজার কাছে। আরও দু'জন গার্ড আছে সেখানে, ওদের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে রেমিকে নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। ততক্ষণে হেলমেটটা খুলে হাতে নিয়েছে মেয়েটা।

এনকয়রি ডেস্কে আজও ডিউটি পালন করছে মাইক-উওম্যান। ওর সামনে দাঁড়িয়ে ছিল লম্বা একজন দ্বীপবাসী, পোশাকের ওপরে পরা সাদা ল্যাব কোট আর ঘাড়ে ঝোলানো স্টেথস্কোপ বলে দিচ্ছে সে একজন ডাক্তার, রানাদেরকে দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল লোকটা।

মাইক-উওম্যানকে ইংরেজিতে বলল রানা, ভাউযার সঙ্গে দেখা করতে চায় ওরা। কিন্তু মেয়েটা কিছু বলার আগেই ডাক্তারটা বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন, আমি কি জানতে পারি আপনারা কারা?'

আঙুলের ইশারায় রেমিকে দেখাল রানা। 'ও ভাউযার বোন। আর আমি...লোকটার বন্ধু।'

'ও। আপনার বন্ধু...মানে...যদি কিছু মনে না করেন, ডক্টর ভেলরের প্রাইভেট রুমে একটু অপেক্ষা করবেন আপনারা?'

'কেন?' আবারও চোখ সরু করল রানা। 'কী হয়েছে ভাউযার?'

'সেটা ডক্টর ভেলরই ভালো বলতে পারবেন আপনাদেরকে। আপনারা একটু বসুন সেখানে, আমি ডেকে দিচ্ছি তাঁকে।'

'কোথায় আছে সে?'

'জেনারেল ওয়ার্ডে, রোগী দেখছে। আপনারা বসুন,' ওয়ার্ড যেদিকে আছে, সেদিকে চলে গেল লম্বা লোকটা।

রেমিকে নিয়ে ভেলরের প্রাইভেট রুমে চলে এল রানা। টের পেল, ভাউযার অমঙ্গল আশঙ্কায় ঢিপঢিপ করছে ওর বুকের ভেতরটা। তাকাল রেমির দিকে। শুকিয়ে গেছে মেয়েটার চেহারা, ঠোঁট দুটো চেপে বসেছে একটা আরেকটার সঙ্গে, রানার দিকে তাকাতে পারছে না বেচারী।

বেশ কিছুক্ষণ পর, হাতের কাজ সেরে, হাজির হলো ভেলর।

গোবরাটে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, প্রাণহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে, তারপর কণ্ঠে একগাদা হতাশা নিয়ে বলল, 'এত দেরিতে এলে!'

বসে ছিল, উঠে দাঁড়াল রানা। 'দেরিতে মানে? কী হয়েছে ভাউযার?'

মাথা নাড়তে নাড়তে ঘরের ভেতরে ঢুকল ভেলর, এগিয়ে যাচ্ছে নিজের ডেস্কের দিকে। 'নিজে তো আর হাসপাতাল ছেড়ে গিয়ে খুঁজতে পারি না তোমাকে, কিন্তু বিশ্বাস করবে কি না জানি না, তোমার খোঁজে মেণ্ডানায় লোক পর্যন্ত পাঠিয়েছি আমি। এমনিতেই দ্বীপের যা অবস্থা—নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বের হতে চায় না কেউ, অনেক বলেকয়ে রাজি করাতে পেরেছিলাম একজনকে। সে ফিরে এসে বলল, হোটেলে নেই তুমি; কোথায় গেছ তা বলতে পারছে না কেউ। ফোন করলাম মেণ্ডানার ম্যানেজারকে। তোমার চিন্তায় অস্থির লোকটা বলল, খদ্দেরদের সবার খবর আছে তার কাছে, এক তুমিই নাকি কিছু না জানিয়ে গায়েব হয়ে গেছ, অথচ তোমার মালপত্র রয়ে গেছে হোটেলরুমে।'

'কিন্তু কী হয়েছে সেটা তো বলবে!' ধৈর্য রাখতে পারছে না রানা, এবং সেটা টের পেয়ে আরও অধৈর্য হয়ে যাচ্ছে ও।

ধপ করে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল ভেলর, ঘাড়েঝোলানো স্টেথস্কোপটা সরিয়ে নিয়ে রাখল ডেস্কের ওপর। আবারও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানার দিকে, তারপর বলল, 'অপারেশন করে কেটে ফেলতে হয়েছে ভাউযার আহত পা-টা।'

কাঠপুতুলের মতো স্থির হয়ে গেল রানা কথাটা শুনে।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রেমি, অসহ্য কোনও আবেগে কাঁপছে সে, ভিজে উঠতে শুরু করেছে ওর দু'চোখ।

জেকব ভাউযা, একদৃষ্টিতে ভেলরের দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবছে রানা, জীবনযুদ্ধের একজন সৈনিক। লোকটার দুঃসাহস তাকে বাধ্য করেছিল ধীবরবৃত্তি বাদ দিয়ে মুক্তো আহরণের পেশা

বেছে নিতে। লোকটার দুঃসাহস তাকে বাধ্য করেছিল হারিয়ে-যাওয়া ইটেকে খোঁজার জন্য ইসাটাবুর রেইন ফরেস্টে ঢুকতে। এবং লোকটার দুঃসাহস তাকে বাধ্য করেছিল খালে কুমির আছে জানার পরও পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

আশ্চর্য মানুষের জীবন, আশ্চর্য মানুষের আবেগ—মাত্র কয়েকটা মুহূর্তের পরিচয়, এবং কথোপকথন বলতে যা বোঝায় তা একবারও হয়নি লোকটার সঙ্গে, তারপরও বুকের ভেতরটা মোচড়াচ্ছে রানার, মনে হচ্ছে স্মৃতি যেন ছুরি হয়ে একের পর এক আঘাত করছে বুকের বাঁ দিকে। দুটো কুমির যখন ছেঁকে ধরেছিল ভাউযাকে, নিশ্চিত মৃত্যুকে মেনে নিয়েছিল লোকটা, ঠিক সে-মুহূর্তে রানাকে দেখতে পেয়ে আশার প্রদীপ আবার জ্বলে ওঠে ওর দু'চোখে, নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে সে ধরে নেয় আবির্ভূত হয়েছে ত্রাতা। নৌকায় ওঠার পর রানাকে জড়িয়ে ধরে বাঁচার কী সেই আকুতি লোকটার! যেন অন্তরের অন্তস্তল থেকে বলেছিল, 'তুমি যে-ই হও, আমাকে বাঁচাও, ভাই!' ওকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে রানা ধরেই নিয়েছিল, শুধু দুটো কুমির না, লড়াই করতে পেরেছে ও নিয়তির বিরুদ্ধেও—নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে আনতে পেরেছে একটা মানুষকে, এবং খারাপ কিছু হবে না লোকটার শেষপর্যন্ত। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, নিজের নিষ্ঠুর রূপ দেখানো বাকি রেখেছিল নিয়তি।

জেকব ভাউযা—নিজের চরম বিপদে পরম নির্ভাবনায় যে-লোক একটা মানিবেল্ট গছিয়ে দিয়েছিল রানার কাছে, যার ভেতরে ছিল দুটো সূত্র: প্রথমটা কোনও অপরাধীচক্রের, দ্বিতীয়টা একটা তথাকথিত অভিশপ্ত গুপ্তধনের। মুহূর্তের পরিচয়ে কাউকে কতটা বিশ্বাস করলে, কারও ওপর কতটা আস্থা চলে এলে করা যেতে পারে কাজটা, আজ আরেকবার টের পাচ্ছে রানা। টের পাচ্ছে, লোকটার আহত পা-টাই কেটে বাদ দেয়া হয়নি শুধু, কেটে বাদ দেয়া হয়েছে লোকটার ভবিষ্যৎ, এবং একটা ব্যতিক্রমী পরিবারের উপার্জনক্ষমতা।

'আমি দুঃখিত,' ভেলরের কথায় যেন হুঁশ ফিরল রানার, 'আমার আর কোনও উপায় ছিল না। তোমরা দেখে গিয়েছিলে, জ্বর বাড়ছিল লোকটার, বাড়ছিল ইনফেকশনের মাত্রা। সম্ভাব্য সবরকম উপায়ে চেষ্টা করেছি আমরা, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারিনি। ওর পা-টা যদি কেটে ফেলা না হতো, ইনফেকশন ছড়িয়ে পড়ত সারা শরীরে, এবং তারপর হয়তো...' কথা শেষ না করে থেমে গেল মেয়েটা।

কাঁদছে রেমি। নিঃশব্দে কাঁদার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না; অসহ্য সেই আবেগে এখনও কাঁপছে বেচারীর শরীর। সান্ত্বনা দেয়ার জন্য ওর কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। কিন্তু হাতটা সরিয়ে দিল রেমি। বেদনা বিদায় নিয়েছে ওর কান্নাভেজা চোখ থেকে, মুহূর্তের মধ্যে সেখানে ভর করেছে ক্রোধ। 'শাট আপ!' স্থান-কাল-পাত্র ভুলে চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা, 'আমার সঙ্গে একটা কথাও বলবেন না আপনি! একটা কথাও না! যারা মিথ্যুক, যারা মিথ্যা আশ্বাস দেয়, তাদের সঙ্গে আমার কোনও কথা নাই। কী বলেছিলেন, খেয়াল আছে? কিছুই হবে না ভাউযার...এখন দেখলেন কিছু হয়েছে কি না? দেখেছেন?' আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল মেয়েটা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে রেমিকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল ভেলর, কিন্তু মানাতে পারল না।

রানা সিদ্ধান্ত নিল, মানসিকভাবে আঘাত করবে সে রেমিকে—ওর ধারণা, আঘাতটার ফলে থেমে যাবে মেয়েটার কান্নাকাটি।

'তুমি আমাকে মিথ্যুক বলছ, রেমি?' কঠোর গলায় বলল ও। 'আমি মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছি তোমাকে? আমাকে ঘেন্না হয় তোমার? তা হলে তোমার উচিত, নিজেকে আরও বেশি ঘেন্না করা।'

ফোঁপানি বন্ধ হলো রেমির, কিন্তু কান্না বন্ধ হলো না; অশ্রুভেজা চোখ তুলে তাকাল রানার দিকে।

'রানা!' বিরক্তি প্রকাশ পেল ভেলরের কণ্ঠে। 'এসব কী বলছ এখন?'

'ঠিকই বলছি। আমাকে মিথ্যুক বলার আগে রেমির উচিত ছিল, আমার সঙ্গে কত বড় মিথ্যা বলেছে সে, সেটা বিবেচনা করা।'

'আমি মিথ্যা কথা বলেছি আপনার সঙ্গে?' এবার কান্নাও বন্ধ হলো রেমির।

'অবশ্যই বলেছ!'

'কী?'

'ভেলরের সামনেই শুনতে চাও?'

চোখের পানি মুছল রেমি। 'হ্যাঁ।'

'কী বলেছিলে নিজেকে তুমি—ভাউযার বোন, না?'

চুপ করে আছে রেমি।

'উত্তর দিচ্ছ না কেন? বলো, বলেছিলে কি না তুমি কথাটা?'

'যদি বলেও থাকে,' রেমির পক্ষ নিয়ে ওকালতি করল ভেলর, 'কী হয়েছে তাতে?'

'কারও হবু স্ত্রী যদি নিজেকে ওই লোকের বোন বলে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে, তা হলে যা হতে পারে, তা-ই হয়েছে।'

'মানে?' দেখে মনে হলো থতমত খেয়ে গেছে ভেলর।

'রেমি তানাঘাই জেকব ভাউযার বোন না, বাগ্‌দত্তা।'

উনিশ

অনেকেই বলে, ওরওয়েন ঝনয়া প্রধানমন্ত্রী সোগাভেরের ডান হাত। সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সদস্য সে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়,

কোনও মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেই তার ওপর। সে আসলে একইসঙ্গে একজন গুপ্তচর এবং একটা গুপ্তচরবাহিনীর নেতা। কোনও নাম নেই তার দলটার, সে ছাড়া আর কেউ জানে না কতজন সদস্য আছে তার দলে, এমনকী প্রধানমন্ত্রী সোগাভেরও না; কিন্তু ইসাটাবুতে সরকার আর বিরোধীদল যেমন সক্রিয়, তার দলটাও তেমনই সক্রিয়। সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তাব্যক্তিরা কে কী করছেন তার খবর জোগাড় করে সে, এবং পরে পাচার করে সোগাভেরের কাছে। দিনের পর দিন নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্বটা পালন করে যাচ্ছে বলে সোগাভেরের আস্থাভাজন সে। ওর প্রতিটা কথা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন সোগাভের, ওর পরামর্শ গ্রহণ করেন কখনও কখনও।

এই মুহূর্তে "লবস্টার" নামের একটা বারে বসে আছে ঝনয়া। বিদেশি পর্যটকরা ছাড়া দ্বীপবাসীদের কেউ পা রাখার সাহস পায় না এখানে; কারণ এখানকার পানীয়ের স্বাদ যেমন, দামও তেমন। অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে আস্তে আস্তে পর্যটকশূন্য হতে শুরু করেছে ইসাটাবু, তাই খাঁ খাঁ করছে লবস্টার এখন। দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়েছে বারটেণ্ডার কাম মালিক কলিন্সের কপালে; ব্যবসাটা খোলাও রাখতে পারছে না সে, আবার বন্ধও করে দিতে পারছে না। তাই বারের সামনের দরজাটা বন্ধ এখন, সেখানে ঝুলছে ইংরেজিতে "ক্লোয্ড" লেখা সাইনবোর্ড, অথচ পেছনের দরজা খোলা আছে ঠিকই।

ঝনয়াকে চেনে কলিন্স, চেনে মানে জানে লোকটা সলোমন-দ্বীপপুঞ্জের ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের একজন; আরও জানে, ওর বারে কালেভদ্রে যখনই পা দেয় ঝনয়া, মোটা টিপস অপেক্ষা করে ওর জন্যে, এবং একইসঙ্গে অপেক্ষা করে ঝনয়াও—কলিন্সের অপরিচিত কোনও না কোনও লোকের জন্য। অপরিচিত লোকগুলো যখনই আসে, একবারমাত্র ইশারা করে ঝনয়া, সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের ঘরে চলে যায় কলিন্স।

গোপন আলোচনা শেষ করে চলে যাওয়ার আগে প্রতিবারই

ঝনয়া ভেতরের ঘরের দিকে ছুঁড়ে মারে একটা মদের-গ্লাস, মেঝেতে পড়ে চুরমার হয় সেটা, আওয়াজ পেয়ে বেরিয়ে আসে কলিন্স। তখন ওর হাতে এক শ' সলোমন ডলারের একগাদা নোট ধরিয়ে দিতে দিতে ঝনয়া বলে, 'আমার জন্য ক্ষতি হলো তোমার, কিছু মনে কোরো না। এবং কিছু মনে রেখোও না।'

সবকিছুই মনে রেখেছে কলিন্স, কিন্তু কখনও কাউকে কিছু বলেনি ওসব ব্যাপারে।

ছোট ছোট চুমুকে কনিয়াক গিলছে ঝনয়া, তাকিয়ে আছে কলিন্সের দিকে, কখনও কখনও তাকাচ্ছে নিজের হাতঘড়ির দিকে। কিছুক্ষণ পর বারের পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকল একটা লোক, হ্যাট পরেছে সে এবং সেটা নিচু করে নামিয়ে রেখেছে কপালের ওপর। বরাবরের মতো কলিন্সকে ইশারা করল ঝনয়া, বরাবরের মতো কাঁচুমাচু চেহারায় ভেতরের ঘরে চলে যেতে বাধ্য হলো কলিন্স। ঝনয়ার সবচেয়ে কাছের চেয়ারে বসে পড়ল আগন্তুক।

হাতঘড়িটা আরেকবার দেখে নিয়ে নিচু গলায় ঝনয়া বলল, 'দেরি করে ফেলেছ। যারা আমাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখে, তাদেরকে পছন্দ করি না আমি।'

'সরি,' একশব্দে ক্ষমাপ্রার্থনা করল আগন্তুক, চাপা কণ্ঠ শুনলে মনে হয় যেন সর্দি লেগেছে ওর। 'আসলে...'

হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল ঝনয়া। 'বোতল আছে সামনে, গ্লাস আছে। শুরু করো।'

নিজের জন্য খানিকটা মদ ঢেলে নিয়ে গলা ভেজাল আগন্তুক।

ঝনয়া বলল, 'আমি আমার কাজ করে যাচ্ছি—সোগাভেরকে ক্রমাগতভাবে বোঝাচ্ছি দেশীয় খনিজসম্পদ উত্তোলন ও বিপণনের কাজ দেশীয় কোম্পানি দিয়ে করানোটাই সবদিক দিয়ে ভালো। সামান্য ক'টা টাকা ট্যাক্সের জন্য এসব ছোটখাটো ইস্যু নিয়ে না ভেবে, ভাবার মতো আরও বড় বড় বিষয় আছে আমাদের।'

‘তিনি কী বললেন?’

‘এখনও কিছু না। শালা আসলে সবসময় সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। তবে শেষপর্যন্ত যদি রাজি হয় সে, আমার বখরার কথাটা যেন মাথায় থাকে তোমার।’

‘হ্যাঁ, অবশ্যই। লাভের গুড় একা খাওয়া যায় না।’

‘আজ থেকে ছ’মাস আগের কথা ভেবে দেখো। রাষ্ট্রীয়করণের যে দাবি জোরালো হয়েছে এখন, আমার আন্তরিক চেষ্টা না থাকলে সেটা সম্ভব হতো?’

‘না, অবশ্যই হতো না।’

‘মনে রেখো কথাটা। এবং মনে রাখতে বোলো তোমার মালিককেও।’

‘অবশ্যই। কিন্তু...পরে সবকিছুর দখল নিতে সমস্যা হবে না তো আমার কোম্পানির?’

‘কীসের সমস্যা?’

‘আমার নাগরিকত্ব নিয়ে যদি কথা তোলে কেউ?’

‘তোমাকে এখন আমাদেরই একজন বলা যায়। আর...সময় হলে যদি দেখি কোনও সমস্যা হচ্ছে, দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করব, তবে সেক্ষেত্রে আরও কিছু মালপানি ছাড়তে হবে তোমার মালিককে।’

‘তাঁকে রাজি করানোর দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিন।’

‘দ্য মিউটিনিয়ার্সের পরবর্তী অপারেশন কী?’ প্রসঙ্গ পাল্টাল ঝনয়া।

‘এখন পর্যন্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। দ্বীপের সংঘাতময় পরিস্থিতি কোন্‌দিকে গড়ায় দেখতে চাইছি আগে। গতকাল কয়েকদফায় মারামারি হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়েছে বিক্ষুব্ধ জনতা, খণ্ড লড়াই হয়েছে রিপাবলিকান আর ডেমোক্রেট কর্মীদের মধ্যে। ভয়ে ইতোমধ্যে বিদেশিদের ভিড় জমে গেছে হেণ্ডারসন এয়ারফিল্ডে, যে যেভাবে পারছে পালাচ্ছে। আমরা চাইছি, আজও কিছু নাটক হোক। তবে...নাটক

প্রথমদিনই যতটা জমবে বলে মনে করেছিলাম, শেষপর্যন্ত তা হয়নি কিন্তু।'

'যেমন?'

'রয়্যাল পুলিশ ফোর্স জব্বর কাজ দেখিয়েছে গতকাল। কাজটা কীভাবে করতে পারল ওরা, ভেবে এখনও আশ্চর্য হচ্ছি আমি। যে-ক'জায়গায় মারামারি লেগেছে, যত দ্রুত পেরেছে সেখানে হাজির হয়েছে ওরা, এবং যত দ্রুত পেরেছে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে পরিস্থিতি। রোডব্লকের আইডিয়াটা দারুণ কাজে দিয়েছে ওদের জন্য। যেভাবে আশা করেছিলাম আমরা, বিক্ষুব্ধ জনতা আর রাজনৈতিক কর্মীরা সেভাবে একত্রিত হতেই পারেনি ব্লকের কারণে। পুলিশের ওই তৎপরতা আশ্চর্য করেছে আমাকে। ওরা যে ভেতরে ভেতরে এতটা সংগঠিত, তা ভাবতেই পারিনি।'

আরেক চুমুক কনিয়াক খেল ঝনয়া, ব্যঙ্গের হাসি হাসল। 'একবার কী বলেছিলে আমাকে...যদি কখনও প্রয়োজন হয়, দ্য মিউটিনিয়ার্সকে দাঁড় করাতে চাও রয়্যাল পুলিশের মুখোমুখি? হালকা কিছু ফায়ারআর্ম বাদে যেখানে অস্ত্র বলতে কিছুই নেই তোমাদের কাছে, সেখানে কাজটা কতটা হাস্যকর হবে, বুঝতে পারছ এখন? রয়্যাল পুলিশ তাদের কোস্টগার্ড ডিপার্টমেন্টে মেশিনগান পর্যন্ত যুক্ত করেছে, তা জানো? এটা-সেটা বুঝিয়ে এখন পর্যন্ত জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা থেকে বিরত রেখেছি সোগাভেরকে, কিন্তু ভেবে দেখো, যদি তা করা হয়, আর যদি দেখামাত্র গুলি করার আদেশ জারি হয়, মারামারি বাদ দিয়ে ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য হবে সবাই। আর, এখনও যেভাবে জঙ্গলের ভেতরে ঘাপটি মেরে আছে দ্য মিউটিনিয়ার্স, সেভাবেই থাকতে হবে বাকিজীবন।'

নিজের গ্লাসে নতুন করে কনিয়াক ঢালল আগন্তুক। 'আমাদের কপাল ভালো, রয়্যাল পুলিশের কিছু কর্তাব্যক্তি এখনও দেশের স্বার্থের চেয়ে নিজেদের স্বার্থটা বড় করে দেখে, এখনও টেবিলের নিচ দিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে ঘুষের টাকা নেয়। যা-হোক, আজ

বইঘর.কম

একটু অন্যভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে আমাদের পক্ষ থেকে। যেসব জায়গা পুলিশের নজরদারির বাইরে, জড়ো হওয়ার জন্য সে-রকম সুবিধাজনক কয়েকটা জায়গার কথা জানিয়ে দিয়েছি আমরা। এখন শুধু দেখার পালা—কোন্‌দিকের পানি কোন্‌দিকে যায়।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সাহস করে বলে ফেলল, 'আপনি বোধহয় ইচ্ছা করলে আরেকটু সাহায্য করতে পারতেন আমাদেরকে।'

'যেমন?'

'যদি ইচ্ছা করতেন, আড়ালে থেকে একটু কলকাঠি নাড়তে পারতেন। তা হলে শুরুতেই সোগাভেরের কথামতো হার্ডলাইনে চলে যেত না পুলিশ।'

'তোমার কি মাথা খারাপ? সরকার কীভাবে চলবে না-চলবে সে-ব্যাপারে কিছু বলার যেখানে এখতিয়ার নেই আমার, সেখানে দেদারসে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি সোগাভেরকে; দেশে জরুরি পরিস্থিতির মতো অবস্থা থাকার পরও যদি ওকে বলি, নিয়ন্ত্রিত আচরণ করা উচিত পুলিশবাহিনীর, লোকটা আমাকেই সন্দেহ করে বসবে না?'

আবারও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল আগন্তুক। তারপর বলল, 'কিন্তু শেষপর্যন্ত যদি মাঠে মারা যায় আমাদের পরিকল্পনা?'

'সেটা যাতে না হয় সেজন্য আরও টাকা বিনিয়োগ করতে বলো তোমার মনিবকে। কথা দিয়েছি আমার পক্ষে যা যা করা সম্ভব করব। তোমরা এখন চেষ্টা করে দেখো একটু শক্তিশালী বানানো যায় কি না দ্য মিউটিনিয়ার্সকে।'

'চেষ্টা তো করা হচ্ছে,' বলবে কি বলবে না ভাবতে ভাবতে শেষপর্যন্ত বলেই ফেলল আগন্তুক।

কিছু না বলে মদের গ্লাসের ওপর থেকে চোখ সরাল ঝনয়া, তাকাল আগন্তুকের দিকে, একটা ভ্রূ উঁচু হয়ে আছে ওর।

ভাউযা, সলোমন সাগরের বিশেষ একটা জায়গায় লোকটার বিশেষ একটা আবিষ্কার এবং সম্ভাব্য একটা গুপ্তধনের কথা বলল

আগন্তুক।

শুনতে শুনতে হাঁ হয়ে গেল ঝনয়ার মুখ। আগন্তুকের কথা শেষ হওয়ার পর বলল সে, 'তুমি...তোমরা আমার সঙ্গেও চালাকি করার চেষ্টা করলে শেষপর্যন্ত? এত বড় একটা খবর এতদিন ধরে গোপন রাখলে আমার কাছে? জানো, আমি যদি ইচ্ছা করি তা হলে একটুকরো সোনাও কেউ তুলতে পারবে না ওখান থেকে?'

'প্লিয, উত্তেজিত হবেন না আপনি। প্লিয, আমার সব কথা শুনুন আগে।'

একটু যেন শান্ত হলো ঝনয়া।

'আমরা এখনও নিশ্চিত না, আদৌ সেখানে কোনও গুপ্তধন আছে কি না।'

'নিশ্চিত না মানে?'

"খোদার-খাসির" মাধ্যমে যা খবর পাওয়া গেছে, সব ঝনয়াকে বলল আগন্তুক। বলল পোসেইডন, রেমি তানাঘাই, মাসুদ রানা আর সার্জেন্ট ফুগুইয়ের কথা। জানাল, একটা পা কেটে বাদ দেয়া হয়েছে ভাউযার—সেন্ট্রাল হাসপাতালে সার্বক্ষণিক চর আছে। তারপর বলল, 'আগে আমাদের প্ল্যান ছিল, ওদেরকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেব, আড়ালে থেকে চোখ রাখব ওদের ওপর। যখনই টের পাব কিছু পেয়ে গেছে ওরা, সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে চেপে ধরব টুঁটি। কিন্তু মাসুদ রানা এলোমেলো করে দিয়েছে সব।'

'কী রকম?'

মাকিরা-উলাওয়া, ক্রকোডাইল নদীর তীর এবং গতরাতে পোসেইডনে রানার সঙ্গে গুণ্ডাবাহিনীর সংঘর্ষের ঘটনা বলল আগন্তুক। জানাল, হোটেলরুমের বারান্দা থেকে সেডানটা দেখে ফেলেছে রানা; বাইকের সীটের নিচে ট্রান্সমিটারটার অস্তিত্ব অনুমান করে নিয়ে নষ্ট করে দিয়েছে সেটা। সবশেষে বলল, 'অন্য সবাই ঠিকমতোই ধরা পড়ছে আমাদের জালে, শুধু মাসুদ রানাই কীভাবে যেন নাস্তানাবুদ করছে আমাদেরকে বার বার। ওর

বইঘর.কম

কারণে ক্রকোডাইল নদীর তীরে হারিয়েছি দলের একজনকে। কাল রাতে হারিয়েছি আরও পাঁচজন।'

'লোকটা আসলে কে?'

'আমার মনে হয় ইন্টারপোলের এজেন্ট।'

'কেন? ইন্টারপোলের এজেন্ট হতে যাবে কেন?'

'ব্যর্থতাটা কিন্তু আপনারই ছিল, স্যর, কিছু মনে করবেন না। বার বার চেষ্টা করেও তখন বোঝাতে পারেননি সোগাভেরকে, জাল টাকার ঘাঁটি অনুসন্ধানের জন্য রয়্যাল পুলিশই যথেষ্ট, বাইরের সাহায্যের দরকার নেই। ইসাটাবু সরকারের আবেদন অগ্রাহ্য করেছে ইন্টারপোল, কিন্তু সেটা তো সোগাভের বলেছেন আপনাকে; গোপনে করা কোনও চুক্তির মাধ্যমে মাসুদ রানাকে যদি আমদানি করিয়ে থাকেন তিনি, আপনার জানার কথা না।'

'আমি জানি না, তুমি জানো?' আবার চটে উঠছে ঝনয়া।

'রাগ করবেন না, প্লিয। এখন রাগারাগি করার মতো অবস্থা নয় আমাদের। খেলা শুরু হয়ে গেছে, নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হলে সেইমসাইড গোল খেতে হবে। ...আপনিই বলুন, একটা লোক নিজেকে ট্যুরিস্ট বলে দাবি করছে; অথচ খালিহাতে পিটিয়ে বাপের নাম ভুলিয়ে দিচ্ছে আমার লোকদেরকে। আবার ওই লোকই স্কুবা ইকুয্যইপমেন্ট নিয়ে ডাইভ দিচ্ছে সাগরে। ...মোফাট ফুগুইকে দিয়ে কি কম চেষ্টা করছি আমরা? ওকেও কি নাকানিচুবানি খাওয়াচ্ছে না মাসুদ রানা? সে কি সার্জেন্টের হাত থেকেও পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে না বার বার? ...বলুন, একজন ট্যুরিস্ট কীভাবে করতে পারে এসব কাজ?'

চিন্তার ভাঁজ পড়েছে ঝনয়ার কপালে, কিছু বলছে না—মাসুদ রানা ভাবিয়ে তুলেছে তাকেও। মুখ খুলল বেশ কিছুক্ষণ পর, 'লোকটার ব্যাপারে কী করবে তা হলে?'

হাসল আগন্তুক, হেলান দিল কাউন্টারে। 'কথায় আছে, সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল বাঁকা করতে হয়। মাসুদ রানার ব্যাপারে আমরাও আমাদের আঙুল বাঁকা করব এখন।

...আমি এখানে আসামাত্র বললেন, যারা আপনাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখে তাদেরকে পছন্দ করেন না আপনি। দেরি হওয়ার কারণ, এখানে ঢুকতে যাব, এমন সময় আমার মোবাইলে ফোন করল জনৈক মিউটিনিয়ার; বলল, রেমি তানাঘাইকে নিয়ে সেণ্ট্রাল হাসপাতালে ঢুকেছে মাসুদ রানা।'

চুপ করে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে আছে ঝনয়া, বুঝতে পারছে কথা শেষ হয়নি লোকটার। যখন পুরো কথা বলে শেষ করল সে, তখন ঝনয়া বলল, 'কিন্তু যে-কথাটা ভেবে আমার খারাপ লাগছে তা হলো, আমার সাহায্য ছাড়া শামানের গুপ্তধন হাতিয়ে নিতে চাইছ তোমরা। কোনও একটা দেশের জলসীমা থেকে গুপ্তধন তুলবে, অথচ সে-দেশের সরকারকে বখরা দেবে না, এ-রকম কোনওকিছু হয়েছে কোনওকালে?'

ঝনয়ার খালি গ্লাসে আরেকটু পানীয় ঢেলে দিল আগন্তুক। 'সে-রকম কোনও কিছু যাতে হয়, সেজন্যই তো আপনাকে দরকার আমাদের। আপনি শুধু খেয়াল রাখবেন, গুপ্তধন সরানোর কাজ যখন করব আমরা, তখন যেন নাক ডেকে ঘুমায় ইসাটাবুর পুলিশ।'

'আচ্ছা, ওই গুপ্তধন-বেচা টাকা দিয়েই কি শক্তিশালী করতে চাইছ মিউটিনিয়ারদের? সলোমন সাগরে মূল্যবান কিছু একটার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছে ভাউযা—জানার পর সেজন্যই কি লেগেছ ওর পিছে?'

'বুদ্ধিমানের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।'

কনিয়াকভর্তি গ্লাসে চুমুক দিল ঝনয়া। 'ঠিক আছে, ঘুমের ওষুধ খাওয়াব আমি পুলিশদেরকে। বিনিময়ে কী দেবে আমাকে?'

'গুপ্তধন-বেচা টাকার টেন পার্সেণ্ট।'

'ছি, তোমার মন এত ছোট! এত কিপ্টে তুমি?'

'তা হলে বিশ।'

মুখে পানি নিয়ে যেভাবে কুলকুচি করে লোকে, কিছুটা কনিয়াক নিয়ে সেভাবে খেলা করল ঝনয়া, তারপর গিলে ফেলল

পানীয়টুকু। আগন্তুকের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর বলল, ‘যদি সোগাভের জানতে পারে, তা হলে কিন্তু হিসেবটা ওর জন্য হবে আশি, আর তোমাদের জন্যে বিশ।’

‘পঁচিশ?’

‘রাজি। যা টাকা পাবে তোমরা, তার চারভাগের একভাগ আমার। কিন্তু...যদি টের পাই ঠকানো হয়েছে আমাকে?’

‘আমি আপনার কাছে খাঁচায় পোষা পাখির মতো। যদি কোনওভাবে ঠকানোর চেষ্টা করি আপনাকে, যখন খুশি তখন ধরবেন, যেভাবে খুশি সেভাবে মটকে দেবেন আমার ঘাড়টা।’

তেলমাখা কথা শুনে সন্তুষ্ট হলো ঝনয়া। আরেকবার চুমুক দিয়ে খালি করে ফেলল কনিয়াকের গ্লাসটা, তারপর সেটা ছুঁড়ে মারল ভেতরের ঘরের দরজার কাছে। আগন্তুককে বলল, ‘তুমি যাও এখন। আজকের মতো আমাদের আলোচনা শেষ।’

ওর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে বিদায় নিল আগন্তুক।

ভেতরের ঘর থেকে বের হয়ে ঝনয়ার কাছে এল কলিন্স।

প্যান্টের পকেট থেকে অনেকগুলো সলোমন ডলার বের করে লোকটার দিকে বাড়িয়ে ধরল ঝনয়া, বলল, ‘আমার জন্য ক্ষতি হলো তোমার, কিছু মনে কোরো না, কিছু মনে রেখোও না।’

জবাবে দাঁত বের করে প্রাণহীন হাসি হাসল কলিন্স। ‘কোনও ক্ষতি হয়নি আমার, স্যর। কিচ্ছু মনে করিনি আমি। এবং সবাই জানে আমার স্মরণশক্তি খুব দুর্বল।’

তাল তাল চর্বিওয়ালা থলথলে পাছাটা কোনওরকমে চেয়ার থেকে আলগা করল ঝনয়া, তারপর থপ্ থপ্ করে এগিয়ে গেল পেছনের দরজার দিকে।

রানার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর রেমির দিকে তাকাল ভেলর। ‘রানা যা বলছে তা কি ঠিক?’

জবাব দিল না রেমি, দিতে পারল না সম্ভবত, মাথা নিচু করে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। পুলিশের ক্রমাগত জেরায় অপরাধ

স্বীকার করে নেয়ার পর অপরাধীর চেহারার যে-অবস্থা হয়, ঠিক সে-রকম হয়েছে ওর চেহারা।

'কেন করতে গেলে কাজটা?' ভেলরের বিস্ময় যেন কাটছে না এখনও। 'কেন ভাউযার সঙ্গে বাগ্‌দান হওয়ার পরও লোকটার বোন হিসেবে পরিচয় দিতে গেলে নিজের?'

তবুও জবাব নেই রেমির পক্ষ থেকে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রানার দিকে তাকাল ভেলর। 'তুমি কীভাবে বুঝলে, রেমি ভাউযার বোন না?'

'ভাউযাকে যখন হাসপাতালে নিয়ে আসছিলাম, যে-কোনওভাবেই হোক ওর মানিবেল্টটা পড়ে যায় আমার জিপের মেঝেতে। পরে ওটার ভেতর থেকে রেমির একটা ফটো পাই আমি। ...দুনিয়ায় ক'টা ভাই তার বোনের ছবি সবসময় বয়ে বেড়ায় সঙ্গে করে? আপন ভাইবোনের বেলায়, তাদের সম্পর্ক যত মধুরই হোক না কেন, কাজটা খুবই অস্বাভাবিক।'

চোখ পিটপিট করছে ভেলর, কিছু বলতে পারছে না।

'নিজের কাছে প্রেয়সীর ছবি বয়ে বেড়ানোর কাজটা সাধারণত করে প্রেমিকরা,' বলে চলল রানা, 'অথবা যাদের বাগ্‌দান হয়েছে কিন্তু বিয়ে হয়নি, অথবা যাদের নতুন নতুন বিয়ে হয়েছে তারা। ...গুণ্ডাদের হাত থেকে উদ্ধার করে রেমিকে নিয়ে গেলাম আমার হোটেলরুমে, ওর মোবাইলটা চেয়ে নিলাম ওর কাছ থেকে—আমার জিপের খবর জানার দরকার ছিল। ততক্ষণে রেমির কথায় সন্দেহ জেগেছে আমার মনে, তাই রেন্ট-আ-রাইডকে প্রথমেই ফোন না করে চলে গেলাম ওর কললিস্টে, ডায়াল্ড কলগুলো দেখলাম। প্রথম নামটা ছিল: লাভ—এল ও ভি ই। নম্বরটা দেখলাম সঙ্গে সঙ্গে—৬৬২০৩৫১। ওটা ভাউযার মোবাইল নম্বর। এবার বলো, ভাইয়ের সঙ্গে প্রেম করে কেউ?'

তাজ্জব হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে ভেলর। রেমির মাথা এখনও নিচু।

'আরও পরে রেমিকে খুঁজতে গেলাম পয়েন্ট ক্রুযের কাছে

জেলেপাড়ায়,' বলছে রানা। 'আমাকে দেখামাত্র হইহই করতে করতে ভিড় জমিয়ে ফেলল ছেলেছোকরারা, বুঝলাম বিদেশিরা সচরাচর যায় না ওখানে। বলার মতো একটা শব্দই ছিল আমার তখন: রেমি তানাঘাই; কারণ ধরেই নিয়েছিলাম ইংরেজির ই-ও জানে না ওখানকার কেউ। স্মার্টনেস দেখানোর জন্য একটা টিনএজার ছেলে বলে ওঠে, "ইউ লুকিং ফর মিস তানাঘাই, ফিয়্যান্সে অভ মিস্টার ভাউয়া?" বুঝলাম, মিশনারি স্কুলে পড়াশোনা করছে ছেলেটা। ...বলো, এরপর আর কিছু বলার থাকতে পারে?'

রেমির দিকে তাকাল ভেলর। 'কেন মিথ্যা বললে তুমি?'

কিন্তু মেয়েটা কিছু বলার আগেই উত্তেজিত জনতার ক্রুদ্ধ হুঙ্কারের আওয়াজ শোনা গেল রাস্তা থেকে। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল ঠাস্ ঠাস্ করে দুটো শব্দ—টিয়ারশেল নিক্ষেপ করা হচ্ছে।

সেণ্ট্রাল হাসপাতালের সামনে পুলিশের সঙ্গে আজ আবারও সংঘর্ষ বেধে গেছে বিক্ষুব্ধ লোকজনের।

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল রেমি।

রানা বলল, 'ভেবেছিলাম এখানে জড়ো হচ্ছে ওরা, পরে অন্য কোথাও যাবে। কিন্তু খবর পেয়ে গেছে পুলিশ, জনতাকে শুরুতেই ছত্রভঙ্গ করে দেয়ার জন্য হাজির হয়ে গেছে।'

'ওরা যে হাসপাতালের সামনে টিয়ারগ্যাস মারছে,' বলল ভেলর, 'আমার রোগীদের কষ্ট হবে না?'

'হবে। তোমার অ্যাটেণ্ডেণ্টদেরকে কাজে নেমে পড়তে হবে এখনই। সদর-দরজাটা বন্ধ করে দিতে হবে, যাতে যারা মারামারি করছে তাদের কেউ ঢুকে পড়তে না পারে হাসপাতালের ভেতর। সব জানালা বন্ধ করে দিতে হবে যাতে যতটা সম্ভব বাঁচা যায় টিয়ারগ্যাস থেকে। কেবিন, ওয়ার্ড, ইমার্জেন্সি—সব জায়গার রোগীদের জন্য পানির ব্যবস্থা করতে হবে যাতে জ্বালা করলে চোখ ধুতে পারে ওরা।'

রুম ছেড়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল ভেলর, সঙ্গে সঙ্গে ছুট লাগাল রানাও। দরজার কাছে পৌঁছে গেছে ভেলর, এমন সময় রানার

সঙ্গে জোরে ধাক্কা খেল সে, হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছিল আরেকটু হলেই, শেষমুহূর্তে ওর শার্টের কলার খামচে ওকে ধরে ফেলল রানা। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল মেয়েটা, কিন্তু রানা বলল, 'আমি বরং এখানেই থাকি, তুমি যাও।'

সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে গেল ভেলর। কয়েকজনের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে শুরু করেছে।

রাস্তা থেকে ঠাস্ ঠাস্ আওয়াজ শোনা গেল আরও দু'বার।

রেমির দিকে তাকাল রানা। 'আবেগ যা আছে তোমার মনে, আপাতত ঝেড়ে ফেলে দাও সব। টিয়ারগ্যাসের কারণে চোখ জ্বালা করছে, আমার মনে হয় পোস্ট অপারেটিভ সেকশনটা এ-জায়গার চেয়ে বেশি নিরাপদ, চলে যাও সেখানে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চোখ মুছল রেমি। 'আপনি?'

'আমি আসছি।'

বিশ

একদৃষ্টিতে সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে টনি, চিন্তার ভাঁজ পড়েছে কপালে।

রুদ্রমূর্তি ধারণ করতে যাচ্ছে সাগরটা। বড় বড় হয়ে উঠছে ঢেউয়ের আকার। ডানে-বাঁয়ে সমানে দুলছে পোসেইডন। বড় কোনও ঢেউ যখনই এসে বাড়ি মারছে ভেসেলটাকে, সঙ্গে সঙ্গে থরথর করে কেঁপে উঠছে ওটা। জলোচ্ছ্বাসের দিকে তাকালে বিশ্বাসই হতে চায় না, গতকালও নীল ছিল পানির রঙ। মনে হয়, কেউ যেন টন টন ছাই মিশিয়ে দিয়েছে পানির সঙ্গে।

যে-ব্যাপারটা বেশি ভাবিয়ে তুলেছে টনিকে তা হলো, সলোমনের তলদেশে এখনও রয়ে গেছে হেক্টর আর রিকার্ডো, কাজ করছে ধ্বংসাবশেষটার ভেতরে।

দ্রুত পায়ে পাইলটহাউসে গিয়ে ঢুকল টনি। ভ্রূ কুঁচকে মনিটরের দিকে তাকিয়ে ছিল কটন, টনিকে দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

'উদ্ধার অভিযান আপাতত পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে হবে আমাদের, ক্যাপ্টেন,' বলল টনি। 'ঝড় আসছে। আর দেরি করাটা ঠিক হবে না।'

'হুঁ,' সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে কটন, 'মিস্টার রানার সঙ্গে একবার কথা বলে নিলে বোধহয়...'

'কাজটা আপনি পয়েন্ট ক্রুযে গিয়েও করতে পারবেন, ক্যাপ্টেন। আপাতত উঠে আসতে বলুন হেক্টর আর রিকার্ডোকে, ওদের পক্ষে যত জলদি সম্ভব। বন্দরে পৌঁছানোর পর নিজেদের জন্য নিরাপদ জায়গা খুঁজে নিতে হবে আমাদেরকে।'

মাইক্রোফোনের মাধ্যমে হেক্টর আর রিকার্ডোর কাছে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠিয়ে দিল কটন, তারপর টেনে নিল নিজের স্যাটেলাইট ফোনটা। 'ওদের উঠে আসতে সময় লাগবে। ততক্ষণে আমাদের খবর জানিয়ে দিই মিস্টার রানাকে।'

নিজের স্যাটেলাইট ফোনের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, স্থির হয়ে গেছে কাঠপুতুলের মতো। ঠিক যা ভেবেছিল ও, তা-ই হয়েছে।

কারা যেন ছুটে আসছে করিডোর ধরে, শুনে চোখ তুলে তাকাল রানা দরজার দিকে।

হুড়মুড় করে ভেলরের দরজায় হাজির হলো গুণ্ডামার্কা পাঁচ-ছ'জন লোক, প্রত্যেকের হাতে নগ্ন মাচেটি। রানাকে একনজর দেখল ওরা, মুখ চাওয়াচাওয়ি করল নিজেদের মধ্যে, তারপর সবাই ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতরে।

লোকগুলোর উদ্দেশ্য আঁচ করতে পারছে রানা। ফোনটা রেখে দিল ও ডেস্কের ওপর, ভাবছে খালিহাতে কীভাবে লড়াই করবে মাচেটিওয়ালা ছ'জনের বিরুদ্ধে।

ভেলরের ডেস্কের কাছে এগিয়ে আসছে একটা লোক। পিজিন ভাষায় কী যেন বলল সে রানাকে, "রেমি" শব্দটা ছাড়া অন্য কোনও শব্দ বুঝতে পারল না রানা।

যে-কোনওভাবেই হোক এখন সময় নষ্ট করতে হবে হাসপাতালের ভেতরে ঢুকেপড়া এই গুণ্ডাদের, যাতে যে-কাজ করতে এসেছে ওরা তাতে সফল হতে না পারে।

দুটো পেপারওয়েট দিয়ে কিছু কাগজ চাপা দিয়ে রেখেছে ভেলর; চট্ করে তুলে নিল রানা দুটোই, তারপর ছুঁড়ে মারল সামনের লোকটার নাক বরাবর। মাথা নিচু করেও আঘাতটা এড়াতে পারল না সে, ভারী পেপারওয়েট প্রচণ্ড জোরে গিয়ে লাগল লোকটার কপালে, ওর হাত থেকে আপনাআপনি ছুটে গেল মাচেটি, গুঙিয়ে উঠে পড়ে গেল লোকটা মেঝেতে।

সঙ্গীর অবস্থা দেখল বাকি পাঁচজন, নিজেদের মধ্যে আবারও মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ওরা, একবার মাত্র মাথা ঝাঁকাল ওদের একজন। সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল লোকগুলো। প্রত্যেকেই কোপ মারার ভঙ্গিতে ধরে রেখেছে যার যার মাচেটি।

দ্বিতীয় পেপারওয়েটটাও তাক করল রানা পাঁচ প্রতিপক্ষের একজনের দিকে কিন্তু ছুঁড়তে গিয়েও নিশানা পরিবর্তন করল। যার উদ্দেশে ছুঁড়ে মারতে যাচ্ছিল, প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল সে, ঝুঁকে পড়েছিল কিছুটা। মুহূর্তের মধ্যে নিশানা বদল করে হাতের জিনিসটা সর্বশক্তিতে ছুঁড়ে মারল রানা অন্য একজনের কপালে। এই আঘাতের জন্যে প্রস্তুত ছিল না লোকটা। গুঙিয়ে উঠে মেঝেতে শুয়ে পড়ল সে-ও।

এবার একটানে ভেলরের চেয়ারটা মাথার ওপর তুলে নিল রানা। বুঝে গেছে এতজনের সঙ্গে একা পারবে না; এখন আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হবে, যতক্ষণ হাসপাতালের লোকেরা

এসে না পৌঁছায়।

চার গুণ্ডার মধ্যে একজন বাকিদের উদ্দেশে কিছু বলল পিজিন ভাষায়; সঙ্গে সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল দু'জন। ওরা কী খুঁজছে বুঝতে বাকি রইল না রানার।

দাঙ্গার সুযোগ নিয়ে রেমি আর ওকে কিডন্যাপ করার প্ল্যান করেছে, দুইজন গেল এখন রেমিকে ধরতে।

মাথার ওপর থেকে নামিয়ে বুকের কাছে বর্মের মতো করে ধরল রানা চেয়ারটা, তারপর এগোল কাছের লোকটার দিকে। রানার গতিপথ থেকে লাফিয়ে সরে যেতে চাইল লোকটা, কিন্তু পারল না পুরোপুরি, মেঝেতে পড়ে থাকা একজনের পায়ে পা বেধে হুড়মুড় করে পড়ে গেল সে একটা ভিযিটর্স চেয়ারের ওপর।

চেয়ারটা মাথার ওপর তুলে গায়ের জোরে মারল রানা লোকটার মাথায়। কানের ওপর পড়ল একটা পায়া, আরেক পায়া চিড় ধরাল ওর পাঁজরে। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল সে।

মাচেটি হাতে নিয়ে এতক্ষণ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে নেই ওদের দলপতি; একলাফে সামনে এগিয়ে মাচেটি চালাল সে। চেয়ার দিয়ে কোনওমতে ঠেকালো রানা মাচেটির কোপ, কিন্তু যে-দু'জন পেপারওয়েটের বাড়ি খেয়েছে, তাদের একজন উঠে বসেই কষে একটা লাথি মারল রানার পায়ে।

ঠিক এমনি সময়ে বেজে উঠল রানার স্যাটেলাইট ফোন। পলকের জন্যে মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সরে যেতে দেরি হলো ওর। বাঁ পা শূন্যে উঠে যেতেই ভারসাম্য হারিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল রানা মেঝেতে উঠে বসা লোকটার ওপর।

ইতোমধ্যে দ্বিতীয় লোকটাও উঠে দাঁড়িয়েছে। তিনজন মিলে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে হাজারটা সর্ষে ফুল ফুটিয়ে দিল ওর চোখের সামনে। লাথি ঘুষি চলছে সমানে। যে যেখানে পারে।

টের পেল রানা, মাচেটি ব্যবহার করছে না ওরা। অর্থাৎ ওদের ওপর খুন করবার হুকুম নেই, মারধর করতে পারে যত খুশি।

'মিস্টার রানা!'

বেদম পিটুনি খেয়ে জ্ঞান হারানোর আগের মুহূর্তে রেমির চিৎকারটা ভেসে এল রানার কানে।

পোস্ট অপারেটিভ সেকশনের সামনের কেঁচিগেটটা বন্ধ, তালা ঝুলছে সেখানে। সে-গেটে ঝুলছে ছোট্ট একটা নোটিশ: নো ভিযিটর্স অ্যালাউড নাউ। ওটার নিচে একই কথা লেখা আছে পিজিন ভাষাতেও।

এখানেই থাকবে, নাকি ডক্টর ভেলরের রুমে যাবে, সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিল রেমি; ভেলরের ঘরে আর্তনাদের শব্দ শুনে ভয়ে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল ওর। কী হয়েছে অথবা কী করা উচিত বোঝার আগেই টের পেল, ভেলরের প্রাইভেট রুমের দিকে ছুটতে শুরু করেছে সে। কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই, থমকে দাঁড়িয়ে গেল।

ওর দিকেই ছুটে আসছে গুণ্ডামার্কা চেহারার দুই লোক, দু'জনেরই হাতে মাচেটি। রেমিকে দেখতে পেল ওরা, চিনতে পারল সঙ্গে সঙ্গে, মুহূর্তের মধ্যে চেঁচিয়ে উঠল বুনো উল্লাসে।

উল্টো ঘুরে ছুট লাগাতে ইচ্ছে করল রেমির, কিন্তু পারল না—নিশ্চয়ই কিছু একটা হচ্ছে ডক্টর ভেলরের প্রাইভেট রুমে, এবং নিশ্চয়ই সেটা খারাপ কিছু। তাই দুই গুণ্ডার একজন যখন খপ্ করে চেপে ধরল ওর একটা হাত, এবং আরেকজন যখন তার মাচেটিটা ঠেকাল ওর গলায়, কিছুই করার থাকল না ওর। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল সে; একটু পর টের পেল, টানতে টানতে ওকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাসপাতাল থেকে বের হওয়ার দরজার দিকে।

'মিস্টার রানা!' গলা ফাটিয়ে একবার শুধু চেঁচিয়ে উঠতে পারল ও।

জবাব দিল না রানা।

ভেলরের প্রাইভেট রুমটা যখন পার হচ্ছে রেমি, তখন ঘাড়

ঘুরিয়ে খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেল, মেঝেতে পড়ে আছে রানা, ওকে সমানে মারছে তিন গুণ্ডা।

'শিকার ধরা পড়েছে!' রেমির গলায় মাচেটি ঠেকিয়ে রেখেছে যে-লোক, পিজিন ভাষায় ঘরের ভেতরের সঙ্গীদেরকে বলল সে।

সঙ্গে সঙ্গে রানাকে পেটানো বন্ধ করল তিন গুণ্ডা; ওদের যে-"কমরেডের" পাঁজরের হাড়ে চিড় ধরেছে তাকে ধরল একজন, বাকিরা মেঝে থেকে মাচেটি কুড়িয়ে নিল। এমন সময় আরেকদফা বেজে উঠল রানার স্যাটেলাইট ফোন।

ভেলরের ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল এক মিউটিনিয়ার, ভারী মাচেটির জোরালো এক কোপে দু'খণ্ড করে ফেলল ফোনটা।

তারপর অজ্ঞান রানাকে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে, স্থির দাঁড়িয়ে থাকা ভেলর এবং হাসপাতালের অন্য ডাক্তার আর কর্মচারীদের চোখের সামনে দিয়ে, রেমিকে কিডন্যাপ করে নিয়ে চলে গেল ওরা।

হাসপাতালের বাইরে তখন বিক্ষুব্ধ জনতার সঙ্গে সংঘর্ষ চলছে পুলিশের, উর্দিধারীরা একবার ধাওয়া করে সামনে বাড়ছে, পরক্ষণে পিছাচ্ছে পাল্টা-ধাওয়া খেয়ে। টিয়ারশেল ফুটছে থেকে থেকে। এমনি অবস্থায় কে কাকে অপহরণ করে কোথায় নিয়ে গেল তা দেখার মতো ফুরসত নেই কারও।

রানাকে দ্বিতীয়বার ফোন করে যখন হতাশ হয়ে মাথা নাড়ছে কটন, তখন হেক্টর আর রিকার্ডো একে একে খুলছে নিজেদের ডাইভিং ইক্যুইপমেন্ট, আর ওদিকে নোঙর তুলছে টনি। কাজটা শেষ করল সে, সঙ্গে সঙ্গে পোসেইডনকে সচল করল কটন। যোগাযোগ করল পয়েন্ট ক্রুয কর্তৃপক্ষের সঙ্গে, জানাল ওরা আসছে বন্দরে।

বন্দর কর্তৃপক্ষের অফিসার জরুরি কণ্ঠে বলল, 'তোমাদের বোধহয় আত্মহত্যা করার ইচ্ছা আছে, না? নইলে এত পরে যোগাযোগ করলে কেন?'

উন্মাতাল ঢেউয়ের বিরুদ্ধে যুঝতে যুঝতে বন্দরের দিকে রওয়ানা হলো পোসেইডন।

'টনি,' জরুরি কণ্ঠে ডাকল কটন, 'হাল ধরো তো! আমি শেষবারের মতো চেষ্টা করে দেখি যোগাযোগ করা যায় কি না মিস্টার রানার সঙ্গে।'

বিনা বাক্যব্যয়ে হালটা ধরল টনি।

গন্তব্য সামান্য বাকি থাকতেই টাইফুনটা আঘাত হানল।

ঈগল যেভাবে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায় ছুটন্ত খরগোস, প্রথম দানবীয় ঢেউ ঠিক সেভাবেই ফুট চল্লিশেক ওপরে নিয়ে গেল ভেসেলটাকে। পানির ওপর যখন আছড়ে পড়ল ওটা, হাল ধরে কোনওরকমে টিকে থাকল টনি, আর কটন পাইলটহাউসের দরজাটা আঁকড়ে ধরে নিজেকে কোনওরকমে রক্ষা করল ভেসে যাওয়ার কবল থেকে।

যিশু, মাতা মেরি আর ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে এবং একের পর এক দানবীয় ঢেউয়ের ছোবল সহ্য করতে করতে পোসেইডনকে কোনওরকমে পয়েন্ট ক্রুযের নিরাপদ অবস্থানে নিয়ে গেল টনি। টের পেল, অ্যামিউযমেন্ট পার্কের রাইড-আ-বোটের মতো দুলতে থাকা ডেকের ওপর দিয়ে কে যেন ছুটে আসছে পাইলটহাউসের দিকে।

দরজার ওপরে যেন আছড়ে পড়ল রিকার্ডো, একটা মুহূর্ত ধরে থাকল দরজাটা, তারপরই হুড়মুড় করে পড়ে গেল। ঝট করে মুখ তুলে তাকাল টনির দিকে, রুদ্ধশ্বাসে কোনওরকমে বলল, 'হেক্টর!'

ভয়ের একটা শীতল স্রোত নেমে গেল টনির মেরুদণ্ড বেয়ে। কিছু বলতে পারল না সে।

'হেক্টরকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ঢেউ!' আবার বলল রিকার্ডো।

চমকে উঠে এদিকওদিক তাকাচ্ছে টনি, পড়ে যাওয়ার ভয়ে হাল ছেড়ে সরে যেতে পারছে না।

এতক্ষণ খেয়ালই করেনি, কিন্তু এবার বুঝতে পারছে,

বইঘর.কম

কটনকেও দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

সলোমন সাগরের ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে পোসেইডনের ক্যাপ্টেনকেও।

চোখ খুব শক্ত করে বাঁধা হয়েছিল রেমির, বাঁধনটা যখন খুলে দেয়া হলো তখন মিনিটখানেক কিছু দেখতে পেল না সে। ঝাপসা দৃষ্টি যখন পরিষ্কার হলো আস্তে আস্তে, দেখল, মুখে হাসি নিয়ে ওর সামনাসামনি বসে আছে একটা লোক। দু'পাশে, কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে আরও দু'জন। রেমিকেই দেখছে তারা। মাথাটা উঁচু করল সে। কম পাওয়ারের একটা বাল্‌ব্ জ্বলছে, সেটার আলোয় আলোকিত হয়ে আছে মাঝারি সাইজের একটা কাঠের-টেবিল।

ঠিক কী করা উচিত এখন, বুঝতে পারছে না মেয়েটা। চেঁচাবে? কোনও লাভ হবে তাতে? ওকে নিশ্চয়ই লোকালয়ের কাছাকাছি কোথাও আনা হয়নি? হাত বাঁধা হয়নি, মুক্ত আছে পা দুটোও; দৌড় দেবে? কিন্তু এই ঘরের বাইরে যেতে পারবে কি না সন্দেহ আছে। খাঁচায় বন্দি পাখির কী রকম লাগে, বুঝতে পারছে রেমি এখন। টের পাচ্ছে, ভয় লাগছে ওর।

'ওয়েলকাম,' মুখোমুখি বসা লোকটা বলল, কণ্ঠ শুনলে মনে হয় সর্দি লেগেছে ওর।

কিছু বলবে কি বলবে না ভাবতে ভাবতে শেষে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করেই ফেলল রেমি, 'আমাকে ধরে এনেছেন কেন?'

'মাসুদ রানাকে মুঠোর ভেতরে আনতে হলে আর কোনও উপায় ছিল না আমার।'

'মিস্টার রানা কী ক্ষতি করেছে আপনার?'

'আসলে, ক্ষতি সে আমার যতটা না করেছে, তারচেয়ে বেশি করেছে তার নিজের। এবং তোমার।'

'মানে?'

'মানেটা বুঝতে পারবে আরও পরে। অন্য কিছু কথা বলি

তোমাকে, মনোযোগ দিয়ে শোনো। প্রথম কথা, এখান থেকে পালানোর যদি কোনও পরিকল্পনা থেকে থাকে, বাদ দাও। যদি ভেবে থাকো মাসুদ রানা ত্রাতা হয়ে উদ্ধার করতে আসবে তোমাকে, ভুলে যাও। আমার লোকদেরকে বলে রেখেছি, যদি পালাতে দেখে, তা হলে তোমাকে যেন গুলি করে মারে সঙ্গে সঙ্গে। যেমনটা করা হয়েছে তোমার ভাই ইটের বেলায়।'

বরফের মতো জমে গেল রেমি।

'সরি, কথাটা হঠাৎ বলে ফেললাম। কী করব বলো, সবই তো হঠাৎ ঘটতে শুরু করল। তোমার ত্যাঁদড় ভাইটা হঠাৎ করেই খুঁজে বের করে ফেলল আমাদের এই আস্তানা। সে যখন পালাচ্ছে তখন হঠাৎ করেই খুন চেপে গেল আমার মাথায়। এই যে,' প্যান্টের পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করল লোকটা, 'এটা দিয়েই শেষ করে দিয়েছি ওকে।'

কিছু বলছে না রেমি, বলতে পারছে না; একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লোকটার দিকে, ভিজে উঠছে দু'চোখ।

রিভলভারটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল লোকটা। 'কী করব, বলো? আমার জায়গায় নিজেকে বসিয়ে ভেবে দেখো, অন্যকিছু করার ছিল কি না। এত কষ্ট করে একটা দল গড়ে তুলেছি, এত কষ্ট করে চালাচ্ছি দলটা, আমাদের গোপন খবর ফাঁস হয়ে গেলে জেলে যেতে হবে না?'

রেমি কাঁদছে।

'ইটে যেমন ছিল, ভাউযাও কিছু কম না তার চেয়ে। কী দরকার ছিল ছেলেটাকে খুঁজতে আসার? কী দরকার ছিল আমাদের আস্তানা খুঁজে পেয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ার? কী দরকার ছিল জালনোটের কিছু নমুনা জোগাড় করে নিয়ে ছুট লাগানোর? বলো, আদালত যদি জানতে পারে এখানে জাল নোট ছাপিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছি আমি সারা সলোমন দ্বীপপুঞ্জে, যাবজ্জীবন দিয়ে দেবে না আমাকে?'

কান্না বন্ধ হয়নি রেমির।

বইঘর.কম

‘কিন্তু এই জাল নোটের ব্যবসা করে ক’টাকাই বা লাভ হয়? হাজার রকমের ঝামেলা এ-ব্যবসায়। সুতরাং হাত বাড়াতে হলো আরও বড় প্রজেক্টের দিকে। খনিজসম্পদে ভাসছে তোমাদের দেশ, তোমাদের সরকারকে নামকাওয়াস্তে ট্যাক্স দিয়ে সব লুটে নিয়ে যাচ্ছে বিদেশিরা। আমি কি করতে পারি না সে-কাজ? পারি, তবে সেজন্য অনেক শক্তিশালী করতে হবে আমার দলটাকে, যাতে প্রয়োজন পড়লে টক্কর দেয়া যায় রয়্যাল পুলিশের বিরুদ্ধে। কম সময়ে এত টাকা পাব কোথায়? উত্তরটা বলে দিল ভাউযা।’

রেমির মুখ বন্ধ।

‘লোকটা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ামাত্র পরিকল্পনা বদল করতে হলো আমাদেরকে। বদল করতে হলো আমাদের টার্গেটও। এক নম্বর টার্গেটের নাম মাসুদ রানা। কারণ ভাউযাকে হাসপাতাল পর্যন্ত নিয়ে গেছে সে, ভর্তি করিয়েছে। ওকে কি আমাদের ব্যাপারে কিছু বলেছে ভাউযা? দুই নম্বর টার্গেট তুমি। তোমাকে কি গুপ্তধনের ব্যাপারে কিছু বলেছে ভাউযা?’

রেমি চুপ।

‘প্রথমে চেষ্টা করলাম মাসুদ রানাকে ইসাটাবু থেকে বিদায় করতে। গেল তো না-ই একরোখা লোকটা, উল্টো কচ্ছপের কামড় বসিয়ে দিয়ে লেগে গেল আমাদের পিছে। ওর ব্যাপারে একটা হেস্তনেস্ত করেই ফেলতাম, যদি না হঠাৎ জানতে পারতাম সী-ডাইভিং পারে সে, এবং ভাউযা যা আবিষ্কার করেছে তা খতিয়ে দেখার জন্য খবর দিয়ে নিয়ে এসেছে একটা অগযিলারি রিসার্চ ভেসেলকে। ভেবেছিলাম, সুতোয় ঢিল দিয়ে দেখি ঘুড়ি কতদূর যায়, আমি তো নজর রাখছিই। ও, বাবা, ঘুড়ি দেখি উল্টো বুমেরাং হয়ে গুঁতো মারে আমাকেই! ওর কারণে মরেছে আমার দলের ছ’জন, আহত হয়েছে আরও দু’জন। ওর জায়গায় অন্য কেউ থাকলে চোর-পুলিশ খেলাটা চালিয়ে যাওয়া যেত, কিন্তু এ-লোক সম্পূর্ণ অন্যজাতের। লোকটার ব্যাপারে একটু অসাবধান

হলে বড় রকমের ক্ষতি হয়ে যাবে। তাই ঠিক করেছি, এবার একাই খেলবে মাসুদ রানা, তবে আমার কথামতো। এবং কাজটা করতে যাতে বাধ্য হয় সে, সেজন্যই তুলে আনা হয়েছে তোমাকে।'

রেমি নিশ্চুপ।

'মাসুদ রানা আসলে কে?'

জবাব দিল না রেমি।

'প্লিয, মুখ খোলো। তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে চাই না আমি।'

'জানি না।'

'শুধু শুধু মিথ্যা বলে কী লাভ?'

'আপনাকে মিথ্যা বলেই বা আমার লাভ কী?'

'এমন কি হতে পারে, গোপন কোনও মিশন নিয়ে ইসাটাবুতে এসেছে লোকটা?'

'গোপন মিশন নিয়ে ইসাটাবুতে এসে খালে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন তিনি? অপেক্ষায় ছিলেন কখন জঙ্গল থেকে বের হয়ে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে ভাউযা আর তাকে উদ্ধার করবেন তিনি? কীভাবে কামড়াতে হবে ভাউযাকে তা-ও কি শিখিয়ে রেখেছিলেন কুমির দুটোকে?'

একদৃষ্টিতে রেমির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর আবারও হাসল লোকটা। 'ভালো বলেছ! ওভাবে ভেবে দেখিনি আসলে। যা-হোক, তুমি থাকো এখানে, খাওদাও; আজ থেকে এই ঘরই তোমার পৃথিবী। বাবা আদমকে যেভাবে নিষেধ করেছিলেন ঈশ্বর, সেই একইভাবে মানা করছি তোমাকে—ভুলেও বের হওয়ার চেষ্টা করবে না এখান থেকে। যদি করো এবং যদি তোমাকে খুন না করে পাকড়াও করে আমার লোকেরা, সেক্ষেত্রে তোমার ব্যাপারে ওরা নিজেদের সংযম হারিয়ে ফেললে দুষতে পারবে না আমাকে।'

ফুঁপিয়ে উঠল রেমি।

বইঘর.কম

'অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম আছে এখানে। ঘাড়টা ঘুরিয়ে তাকালে একটা চৌকি দেখতে পাবে। তোমাদের জেলেপাড়ার-বাসার চেয়ে এ-ঘর খুব একটা খারাপ না। সময়ে সময়ে পৌঁছে দেয়া হবে তোমার খাবার, আর বন্ধ দরজার ওপাশে সবসময় পাহারায় থাকবে আমার লোক। বিশেষ কোনোকিছুর যদি দরকার হয়, ওকে বললেই হবে। ...ওহ্-হো, দেখো, এত কথা বললাম অথচ আসল কথাটা বলতেই ভুলে গেলাম।' রেমির উদ্দেশে হাত পাতল লোকটা। 'তোমার মোবাইলটা দাও দেখি। আমি চাই না আমার কোনও লোক তোমার শরীর হাতড়াক।'

কিন্তু মোবাইলটা দেয়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না রেমির মধ্যে।

যে-দু'জন দাঁড়িয়ে ছিল ওর দু'পাশে, তাদের একজন এগিয়ে গেল ওর দিকে। প্রচণ্ড শক্তিতে চেপে ধরল রেমির একটা বাহু—বুঝিয়ে দিতে চাইল যদি কোনও কারণে খেপে যায় সে তা হলে কী হাল করতে পারে মেয়েটার; ওর হাফপ্যান্টের পকেট হাতড়ে মোবাইলটা বের করার আগে দেখে নিল কোথায় কী আছে। মোবাইলটা ছুঁড়ে দিল রিভলভারওয়ালার দিকে।

টেবিলে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল মেয়েটা।

পরদিন সকাল।

টাইফুন থেমে গেছে, রেখে গেছে সেটার ধ্বংসলীলার চিহ্ন। এর আগে কখনওই কোনও টাইফুন খুশি করেনি রয়্যাল পুলিশকে, যা করেছে এবার। কারণ একদিক দিয়ে ঝড় শুরু হলো, আরেকদিক দিয়ে মারামারি করার ইচ্ছা বিদায় নিল বিক্ষুব্ধ জনতার, নিজেদের ঘরবাড়ি আর মালসামান সামলানোর জন্য যে যেভাবে পারল ছুট লাগাল। নিহত এইড ওয়ার্কারদের জন্য যতটা না সমবেদনা ছিল ওদের, তারচেয়ে বেশি টান ছিল নিজেদের সহায়সম্বলের জন্য। রিপাবলিকান আর ডেমোক্রেট কর্মীরাও বুঝতে পারল শক্তির অপচয় করে লাভ নেই, তাই মাঠ ফাঁকা

রেখে সরে পড়ল ওরাও।

ফলাফল: যেভাবে হঠাৎ শুরু হয়েছিল ইসাটাবুর দাঙ্গা, সেভাবে আচমকাই থেমে গেল সেটা ভয়াবহ রূপ নেয়ার আগেই।

মেণ্ডানার রেস্টুরেন্টে বসে নাস্তা খাচ্ছে রানা। কালশিটে পড়ে গেছে ওর বাঁ চোখের নিচে, ডান চোয়াল ফুলে আছে এখনও। নাকটা না ভাঙলেও কেটে গেছে দুটো ঠোঁটই। যদিও দেখা যাচ্ছে না, তারপরও রানা জানে মারের দাগ আছে ওর শরীরের আরও বিভিন্ন জায়গায়। গুণ্ডারা ওর শরীরের মাংসল জায়গাগুলোতে আঘাত করেছে বেশি, যাতে বড় রকমের ক্ষতি হওয়ার বদলে তীব্র ব্যথা অনুভব করে ও। কাজটা সফলভাবে করতে পেরেছে ওরা।

রেমিকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়ার বিশ-পঁচিশ মিনিট পর জ্ঞান ফিরে পায় রানা; দেখে, হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডের একটা বেডে শুয়ে আছে। ওর মাথার ভেতরটা তখন দপ্‌দপ্ করছে, ঝাপসা দৃষ্টির সামনে যেন দুলছে সবকিছু। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার জ্ঞান হারায় ও। কতক্ষণ পর জানে না, আবার যখন চোখ খোলে, তখন ওর মাথার কাছের জানালায় ভীষণ দাপাদাপি করছে বাতাস, সেখানে বার বার চাবুকের মতো আছড়ে পড়ছে বৃষ্টি। শুয়ে থেকেই প্যান্টের একটা পকেট হাত দিয়ে স্পর্শ করে, সেখানে বিশেষ একটা জিনিস আছে জেনে আশ্বস্ত হয়।

অনেকক্ষণ জেগে ছিল তখন রানা, অনেকক্ষণ। শরীরের ব্যথার চেয়েও বহুগুণ বেশি মনের একটা কষ্ট জাগিয়ে রেখেছিল ওকে। সহজসরল মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গেল ওরা, অথচ কিছু করতে পারল না ও। নিজের একটা ভুলের জন্য...একটামাত্র ভুল...এলোমেলো হয়ে গেল সব।

ভেলর গতরাতে ওয়ার্ডে এসে কয়েকবার দেখে গেছে রানাকে, ওর ক্ষতগুলোর পরিচর্যা করেছে, পেইনকিলার দিয়েছে। ওষুধ খেতে কোনওরকম দ্বিধা করেনি রানা—তাড়াতাড়ি সেরে

উঠতে হবে ওকে। তবে একটা কথাও বলেনি ও ভেলরের সঙ্গে। অক্ষমতাবোধ, ক্ষোভ, ক্রোধ আর প্রতিশোধস্পৃহার সম্মিলিত একটা আবেগ টের পাচ্ছিল ও তখন নিজের ভেতরে। পরে ভেলরই নিজের জিপে করে ওকে পৌঁছে গিয়ে গেছে হোটেলে।

সেই আবেগটা এখনও টের পাচ্ছে রানা।

নাস্তা শেষ করে কফির কাপটা টেনে নিয়েছে ও, চুমুক দিচ্ছে, এমন সময় ওয়েইটার এসে বলল, 'আপনার জন্য ফোন এসেছে, স্যর। রিসিপশন ডেস্কে।'

কলটা আশা করছিল রানা, তাই ভ্রূ কোঁচকাল না। বড় বড় দুই চুমুকে খালি করে ফেলল কফির কাপ, তারপর গিয়ে হাজির হলো জায়গামতো। রিসিভার কানে ঠেকাল। 'হ্যালো?'

'প্রথমেই সরি বলতে চাই আপনাকে, মিস্টার রানা,' বলল সর্দিলাগা কণ্ঠের মালিক। 'আমার লোকেরা একটু বেশিই রেগে গিয়েছিল গতকাল। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, সবারই সহ্যের সীমা আছে।'

'কুত্তার বাচ্চা!'

'ছি, ছি, মিস্টার রানা, ক্ষেত্রবিশেষে আপনি ভয়ঙ্কর হলেও মোটের ওপর আপনাকে ভদ্রলোক মনে করেছিলাম আমরা। প্লিয গালাগালি করবেন না।'

'রেমি কোথায়?'

'আপনার এই ব্যাপারটা আমার খুব ভালো লাগে, বিশ্বাস করুন। কাজের কথায় আসতে এবং কাজ শুরু করতে দেরি করেন না আপনি।'

'রেমি কোথায়?'

'কেন শুধু শুধু জিজ্ঞেস করছেন প্রশ্নটা? আপনি কি জানেন না, জবাবটা দেয়া হবে না আপনাকে? মেয়েটা যেখানেই থাকুক, ভালো আছে, সুস্থ আছে এবং...অক্ষত আছে। অক্ষত...বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই?'

'কুত্তার বাচ্চা!'

'আহ্, মিস্টার রানা, আপনার-আমার পারস্পরিক সহযোগিতা যেখানে সময়ের দাবি এখন, সেখানে কেন অকারণে ভদ্রতার মুখোশ সরিয়ে ফেলছেন বার বার?'

দাঁতে দাঁত পিষল রানা, টের পেল কাঁপছে ও। 'কীসের সহযোগিতা?'

'এই তো, মিস্টার রানা, ট্রেন ঠিক লাইনে আসতে শুরু করেছে। তবে মুশকিলটা কি, জানেন? আমি কথা বলছি আমার অফিস থেকে, আর আপনি বলছেন মেণ্ডানার রিসিপশন ডেস্কে দাঁড়িয়ে। বেফাঁস কোনওকিছু যদি বলে বসেন আপনি, আর পরে সেটা নিয়ে যদি কানাকানি হয়, তা হলে আমার-আপনার দু'জনেরই ক্ষতি।'

'কোথায় আসতে হবে আমাকে?'

'আহ্, ট্রেন শুধু ঠিক লাইনেই আসেনি, সেটা গতিও বাড়াতে শুরু করেছে! ...একটু কষ্ট করে ঘাড়টা যদি ঘোরান, দেখবেন নাদুসনুদুস একটা লোক বসে আছে লবিতে...দেখেছেন? সে আমার খুব কাছের একজন।'

ঘাড় বাঁকাল রানা।

লবিতে, একটা সোফায় পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে খোদার-খাসি; হাতের মোবাইলটা ঠেকিয়ে রেখেছে কানে।

তারমানে, কল্পনার দৃষ্টিতে দেখল রানা, সর্দিলাগা কণ্ঠের মালিক একইসঙ্গে দুটো লাইন ব্যবহার করছে।

'কার কথা বলছ?' বুঝতে পারার পরও বলল রানা। 'হোঁতকা ওই শুয়োরটা? আমার থেকে দূরে থাকতে বোলো ওকে। চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা খেলে অথবা সেটার নিচে কাটা পড়লে লোকের কী হাল হয়, জানো নিশ্চয়ই?'

'আমার খাঁচায় রেমি তানাঘাই বন্দি থাকার পরও কি এত রাগ করা উচিত আপনার, মিস্টার রানা?'

আবারও দাঁতে দাঁত পিষল রানা, কিছু বলল না।

'আমাদের এই আলাপ শেষ হওয়ার পর আপনার তথাকথিত

বইঘর.কম

শুয়োরের কাছে যাবেন আপনি। সে আপনাকে নিয়ে আসবে আমার কাছে। বাকি কথা মুখোমুখি বসে বলব আমরা, ঠিক আছে?'

জবাবে খাঁটি বাংলায় জঘন্য একটা গালি দিল রানা।

মানেটা বুঝতে না পারলেও অনুমান করে নিল সর্দিওয়ালা, লাইন কেটে দিল।

বাঁ পায়ের ব্যথাটা ভোগাচ্ছে ওকে এখনও, শরীরের প্রতিটা মাংসপেশি যেন আরাম দাবি করছে ওর কাছে। এখনও কিছুটা দপ্‌দপ্‌ করতে থাকা মাথা যেন বলছে, কিছুক্ষণের জন্য হলেও কর্মবিরতি চায় সে।

কিন্তু শরীরের কোনও কথাই শুনল না রানা, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গিয়ে হাজির হলো খোদার-খাসির কাছে। ততক্ষণে মোবাইলটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা, চেহারা দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে অস্বস্তি বোধ করছে।

'শরীরটা ভালো?' জানতে চাইল রানা।

খোদার-খাসির অস্বস্তি বাড়ল। কেমন ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল, 'কার...আউটসাইড।'

অর্থাৎ ভাঙা ভাঙা ইংরেজি পারে লোকটা এবং একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে বাইরে।

'তোমার নামটা জানা হয়নি,' বলল রানা।

'নো নেম।'

'নাম নেই? স্বাভাবিক। সন্তানটা যদি জারজ হয়, তা হলে দুনিয়ার কেউই তার নাম রাখার ব্যাপারে আগ্রহ দেখায় না।'

চেহারা লাল হয়ে গেল খোদার-খাসির। 'কার আউটসাইড,' আবারও বলল সে।

'এতবার করে বলছ, শুনে মনে হচ্ছে আমার জন্য রোলস রয়েস এনেছ তোমরা। চলো গিয়ে দেখা যাক।'

'ইউ ফার্স্ট, আই দেন।'

অর্থাৎ রানাকে আগে যেতে বলছে লোকটা।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। হাঁটা ধরল।

বাইরে এসে দেখল, সেই শিপট্রাকটা দাঁড়িয়ে আছে।

থু করে থুতু ফেলল রানা। ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'নো নেম, এটা কার না, ট্রাক। টি আর ইউ সি কে।'

'গো।'

আর কিছু না বলে ড্রাইভারের পাশের সীটে উঠে বসল রানা। ড্রাইভারের সীটে আগে থেকেই বসে ছিল আরেকজন, রানা উঠে বসামাত্র ইঞ্জিন চালু করল। রানার আরেকপাশে উঠে বসে যেই দরজাটা বন্ধ করল খোদার-খাসি, সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হলো ট্রাকটা।

ইন-ছাড়া শার্ট সরিয়ে কোমরের কাছে গুঁজে রাখা একটা স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন পয়েন্ট ফোর ফাইভ বের করল খোদার-খাসি। রানার বাঁ দিকের কোমরে ঠেসে ধরল সে নলটা, ভয়ে ভয়ে।

মুচকি হাসল রানা।

ড্রাইভারের ওপর মনোযোগ দিল রানা। সন্দেহ নেই, বেরেটাওয়ালাকে সঙ্গে নিয়ে আগেরবার ট্রাক চালিয়ে ক্রকোডাইল নদীর ধারে গিয়েছিল এই লোকই। অলঙ্কারের বাহার দেখা যাচ্ছে লোকটার শরীরে। কানে সোনার দুল, গলায় দুটো সোনার চেইন–একটা পাতলা, আরেকটা দেখতে অনেকটা শিকলের মতো। হাতের আঙুলগুলোতে সোনার আঙটিও আছে কয়েকটা। দি এ টিমের মিস্টার টি'র কথা মনে পড়ে গেল রানার। স্মরণ করার চেষ্টা করল, যখন পাথরের "বল" ছুঁড়ছিল ও মিস্টার টি আর বেরেটাওয়ালার দিকে, তখন এত গহনা দেখেছিল কি না এই লোকের শরীরে। কিন্তু মনে করতে পারল না।

বাতাস লাগছে ঘাড়ে, পিছন ফিরে তাকাল রানা। পরিবহন ট্রাকগুলোতে, সাধারণত, ড্রাইভার আর হেল্পারের সীটের পেছনে, দু'জনের মাঝখানে, কাঠ বা স্টীলের অবলম্বনে ফাঁকা জায়গা থাকে; পাতলা শিক আড়াআড়িভাবে লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয় জায়গাটা—ঘাড় ঘুরিয়ে এখান দিয়ে পেছনে তাকালে মালের

বইঘর.কম

অবস্থা দেখতে পারে ড্রাইভার। কিন্তু এই ট্রাকের শিকের বেড়াটা নেই—খুলে গেছে সম্ভবত। হাঁ হয়ে আছে জায়গাটা, পেছনের ফাঁকা কাঠের পাটাতন দেখা যাচ্ছে।

'নো বেনিফিট,' ওই ফাঁকা জায়গা দিয়ে রানা পালানোর মতলব করছে ভেবে ওর কোমরে স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন দিয়ে গুঁতো দিল খোদার-খাসি।

কিছু বলল না রানা, ঘাড় ঘুরিয়ে নিয়ে তাকাল সামনের দিকে।

ওকে নিয়ে ট্রাকটা দ্রুত চলে এল প্রধান সড়কে, একটানা বেশ কিছুদূর ছোটার পর পার হয়ে এল একটা বাজারমতো এলাকা, তারপর নেমে পড়ল সরু একটা রাস্তায়। গতি কমাল ড্রাইভার, কারণ রাস্তার অবস্থা ভালো না; ঝাঁকি খেতে খেতে আগে বাড়ছে ট্রাকটা। প্রায় আধ ঘণ্টা ওভাবে ঝাঁকি খাওয়ার পর, একটা ক্ষেত পার হয়ে; দোতলা একটা পাকা দালানের সামনে থামল।

দরজা খুলে নেমে গেল খোদার-খাসি, নিচু করে ধরে আছে পিস্তলটা, অপেক্ষা করছে রানার জন্য। আরেকদিকের দরজা খুলে নেমে গেল ড্রাইভারও, খোদার-খাসির কায়দায় একটা পিস্তল বের করল সে-ও।

নেমে পড়ল রানা।

'ওয়াক,' বলল খোদার-খাসি।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে দোতলা দালানটার ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। এদিকওদিক তাকিয়ে বুঝতে পারল, এই বাড়ি আসলে একইসঙ্গে কারও বাসস্থান কাম অফিস। নিচতলাটা অফিসের মতো করেই সাজিয়ে নিয়েছে লোকটা, এককোনায় দেখা যাচ্ছে একটা সিঁড়ি, দোতলায় উঠে গেছে সেটা। বেশ কয়েকটা ঘর দেখা যাচ্ছে, সবগুলোরই দরজা বন্ধ, কেবল একটা ঘরের দরজার পাল্লা ফাঁক হয়ে আছে একটুখানি, ভেতর থেকে ভেসে আসছে বেহালার চমৎকার সুর—কম্পিউটার বা সিডি প্লেয়ারে বাজছে

সম্ভবত।

ঘরটার দিকে পা বাড়াল রানা। হাত রাখল দরজার হাতলে, আলতো করে ঠেলে পুরোপুরি খুলে দিল পাল্লা। ওর মুখোমুখি একটা ডেস্ক, সেটার ওপ্রান্তে পুরনো একটা সুইভেল চেয়ারে বসে আছে লোকটা।

'সিংহের গুহায় স্বাগতম, মিস্টার রানা,' বেঢপ শরীরের সঙ্গে বেমানান নাকী গলায় বলল লোকটা, কণ্ঠ শুনলে মনে হয় যেন ঠাণ্ডা লেগেছে ওর।

রাইস রিচার্ড।

একুশ

বেহালা বাজছিল রিচার্ডের ডেস্কটপ কম্পিউটারে, সুরটা মিউট করে দিয়ে রানার মুখোমুখি হলো লোকটা, দন্তবিকশিত নিঃশব্দ হাসি চেহারায়। 'চমকে দিয়েছি নিশ্চয়ই?'

এগিয়ে গিয়ে রিচার্ডের সামনাসামনি, ডেস্কের এপ্রান্তের একটা ভিযিটর্স চেয়ারে বসে পড়ল রানা। টনটন করছে বাঁ পা'র আহত জায়গাটা, তাই চেয়ারটা একটু পিছিয়ে দিয়ে মেলে দিল পা-টা। 'না, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, যতটা ভাবছ, ততটা চমকে দিতে পারোনি তুমি আমাকে।'

হাসি মুছে গেল রিচার্ডের চেহারা থেকে। 'মানে?'

'মনে আছে, পুলিশ সার্জেন্ট ফুগুই ফোন দিয়েছিল তোমাকে?'

'ফুগুই...কিন্তু সেটা তো আপনি...'

'কী বলেছিলে তুমি খেয়াল আছে? "ইয়েস, দিস ইয ভাউযা স্পিকিং। হু আর য়ু?" '

চুপ হয়ে গেছে রিচার্ড; একটু আগে যতটা প্রাণোচ্ছল মনে হচ্ছিল ওকে, এখন আর সে-রকম মনে হচ্ছে না।

'তোমার নাকি গলার ইংরেজি টান শুনলে যে-কেউ বুঝবে,' বলল রানা, 'তুমি ইসাটাবুর আদিবাসী না। সেদিনই সন্ধ্যায় রেইন ট্রিতে যখন কথা হলো তোমার সঙ্গে, একই গলায় একই টান শুনে অনুমান করতে পারলাম, কার সঙ্গে কথা বলেছিলাম দুপুরে। বোকামি করে ফেলেছ, রিচার্ড, তোমার জায়গায় আমি থাকলে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতাম নিজেকে—কিউই উচ্চারণের ইংরেজি সহজে আড়াল করার মতো না।'

রিচার্ড কিছু বলছে না।

'"কী খবর, সার্জেন্ট?"' রিচার্ডকে নকল করল রানা। "ইংরেজিতে কথা বলছ কেন?" তারমানে ফুগুইয়ের সঙ্গে আগেও কথা হয়েছে তোমার, এবং সেটা পিজিন ভাষায়। ঠিক না?'

চেয়ারে হেলান দিল রিচার্ড। 'স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, মিস্টার রানা, আপনাকে যতটা চমকে দিতে পারব ভেবেছিলাম, আপনিই তারচেয়ে বেশি চমকে দিয়েছেন আমাকে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর রিচার্ড বলল, 'আপনি আসলে...সাংঘাতিক একটা মানুষ, মিস্টার রানা—যতটা ভেবেছিলাম, তারচেয়ে অনেক বেশি। যা-হোক, আসুন কাজের কথা বলি। প্রথমে বেরেটা টমক্যাট আর পোসেইডন। আপনার সঙ্গে আমার লোক যাবে, যেখানেই রেখে থাকুন না কেন অস্ত্রটা, দিয়ে দেবেন ওকে। ঠিক আছে?'

'ওটা নেই আমার কাছে।'

'তা হলে রেমি তানাঘাইয়ের একটা কাটা-আঙুল উপহার পাবেন। আপনাকে বুঝতে হবে এবং মেনে নিতে হবে, আপনি আমার খাঁচায় বন্দি, আর আমি ও আমার লোকেরা সেই খাঁচার বাইরে আছি। কাজেই আমি যা বলব, যেভাবে বলব, শুনতে হবে এবং করতে হবে। ...টমক্যাটটা কোথায়?'

'আমার কাছে নেই। বিশ্বাস না হলে এ-মুহূর্তে চলো আমার

সঙ্গে মেগুনায়। তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখো আমার রুম। যদি টমক্যাট পাও, রেমির আঙুল কাটতে হবে না, মাচেটি দিয়ে কোপ মেরে আমিই আমার আঙুল কেটে ফেলব।'

'কিন্তু...আমাকে বলা হয়েছে...'

'তোমাকে কী বলা হয়েছে না-হয়েছে তা নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই আমার। পিস্তলটা আমার কাছে নেই, এবং সেটাই শেষকথা। ফুগুই আগে একবার খুঁজে পায়নি, এবার ইচ্ছা করলে তোমার সব মিউটিনিয়ারকে পাঠাতে পারো আমার রুমে। অন্য কোনও কথা থাকলে বলো, না থাকলে হোটেলে ফিরে যাই।'

'পয়েন্ট ক্রুয ও আশপাশের এলাকায় আপনার আর রেমির ব্যাপারে খোঁজখবর করছে পোসেইডনের দু'জন লোক। টাইফুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ইসাটাবু, তার ওপর মারামারি চলছিল গতকাল পর্যন্তও, হয়তো সে-কারণে মূল শহরে প্রবেশ করার সাহস দেখাচ্ছে না ওরা এখনও। আমি চাই, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন আপনি, ভেসেলটা নিয়ে চলে যেতে বলবেন ওকে। কারণ, এক, আপনার খাঁচায় কোনও দরজা রাখতে চাইছি না আমি। দুই, যদি কাজটা না করেন, আমি স্রেফ খুন করে ফেলব ওই দু'জনকে এবং তারপর তলায় ফুটো করে ডুবিয়ে দেব আপনার এত সাধের পোসেইডন। আপনার খাঁচাটার নাম ইসাটাবু, মিস্টার রানা, বাকি দুনিয়ার সঙ্গে আপনার সবরকমের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হলো আজ থেকে। এখন থেকে পুলিশ স্টেশনে যাবেন না আপনি, কোনও সাইবার ক্যাফেতে ঢুকবেন না, আমার অনুমতি ছাড়া কথাও বলবেন না কারও সঙ্গে।'

'তা হলে পোসেইডনের ক্যাপ্টেনকে মানা করব কীভাবে? তা ছাড়া...যদি সাগরে ডুব দেয়ার দরকার হয়, কীভাবে করব কাজটা?'

'যদি সাগরে ডুব দেয়ার দরকার হয়, আমি ব্যবস্থা করে দেব। আর...মানা করবেন কীভাবে, না?' হাতের বাঁ পাশে রাখা

বইঘর.কম

একটা টেলিফোন সেট রানার দিকে বাড়িয়ে দিল রিচার্ড। 'নিন, ফোন করুন লোকটাকে।'

'ওর কন্ট্যাক্ট নম্বর মুখস্থ করে রাখিনি আমি। ওটা আমার স্যাটেলাইট ফোনে ছিল।'

'ওটার কথা ভুলে যান। ওটা শেষ করে দিয়েছে আমার লোকেরা। তা হলে...তা হলে...কী করা যায়...হুঁ...আমার লোকেরা আপনাকে নিয়ে যাবে পয়েন্ট ক্রুযে, আজ রাতে। বন্দরের কমিউনিকেশন সিস্টেম ব্যবহার করে যোগাযোগ করবেন পোসেইডনের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে, যা যা বলার দরকার বলবেন। ওখানকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আগেই কথা বলে ব্যবস্থা করে রাখছি আমি। ফুগুইকেও জানিয়ে রাখি, সে সাহায্য করতে পারবে।' ফোন করল সার্জেন্টকে।

ডিজিটগুলো খেয়াল করল রানা। ওদের কথোপকথন শুনে বুঝল, দহরম-মহরম আছে দু'জনের মধ্যে।

কথা শেষ করে রানার দিকে তাকাল রিচার্ড।

রানা বলল, 'ফুগুইয়ের সঙ্গে যখন কথা বলছিলে, বার বার পোসেইডনের ক্যাপ্টেন...পোসেইডনের ক্যাপ্টেন বলেছ। কেন? তুমি কি নাম জানো না লোকটার?'

'না, জানি না। কারণ এখন কটন না, পোসেইডনের দায়িত্বে আছে ওর সহকারী।'

'সহকারী?'

হাসল রিচার্ড। 'ভাগ্য সবদিক দিয়েই আপনার সঙ্গে প্রতারণা করছে, মিস্টার রানা। এত সাধ করে খবর দিয়ে এনেছিলেন যে-ভেসেলকে, টাইফুনের পর থেকে সেটার ক্যাপ্টেন রাল্‌ফ্ কটন এবং একজন ডুবুরি...কী যেন নাম...ও...হেক্টর...নিখোঁজ।'

বজ্রাহতের মতো চুপ করে বসে থাকল রানা।

ওর অবস্থা দেখে হা হা করে হেসে উঠল রিচার্ড। 'দয়া করে ভাববেন না আমার অথবা আমার লোকদের কোনও হাত আছে ঘটনাটার পেছনে। তবে যে-দু'জন বেঁচে আছে, যদি না চান

তারাও উধাও হয়ে যাক আগের দু'জনের মতো, আমার কথামতো চলে যেতে বলুন তাদেরকে।'

কিছু বলল না রানা।

'যা-হোক, আসুন সবচেয়ে বড় সমস্যাটার ব্যাপারে কথা বলি আমরা। গুপ্তধনের কী খবর?'

'সাগরের নিচে নেই,' রানার কণ্ঠে বিষণ্ণতা, কটন আর হেক্টরের জন্য খারাপ লাগছে ওর। 'কীভাবে ঘটল ঘটনাটা?'

'কটন আর হেক্টরের হারিয়ে যাওয়ার কথা বলছেন? সাগর থেকে ফিরতে অনেক দেরি করে ফেলেছিল ওরা। বন্দরে আসার আগেই শুরু হয়ে যায় টাইফুন। হয়তো কোনও কারণে অসতর্ক ছিল, ফলে মেনে নিতে হয়েছে নিয়তিকে। পরে বন্দর কর্তৃপক্ষ যথাসম্ভব খোঁজ করেছে ওদের, কিন্তু লাশ পায়নি—সলোমন সাগর কোনও নদী না। বাদ দিন। গুপ্তধনের কথা বলুন।'

'সরিয়ে ফেলা হয়েছে সব।'

'কোথায়?'

'জানি না। কেন জানি না জিজ্ঞেস কোরো না—সে-সুযোগ দাওনি তোমরা।'

'কিন্তু ওটা খুঁজে বের করতেই হবে আপনাকে, মিস্টার রানা, এবং যতদিন পর্যন্ত করতে না পারছেন কাজটা, ততদিন রেমি আর ভাউযাকে ছাড়ছি না আমি।'

'না ছাড়ো, আমার কী? ভাউযা আমার ভাই হয় না, রেমিও আমার ভাবী না। বেশির থেকে বেশি কী করতে পারো তুমি? মেরে ফেলবে ভাউযাকে? মারো। রেপ করবে রেমিকে? করো। টর্চার চালাবে আমার ওপর? চালাও। দেখি আমার সাহায্য ছাড়া রাজা শামানের গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারো কি না।'

'আপনার সাহায্য ছাড়া কাজটা পারব না বলেই তো চুক্তিতে আসতে চাইছি। সাহায্য করুন আমাকে, বিনিময়ে ভাউযাকে ছেড়ে দেব, রেমির কোনও ক্ষতি করব না, আপনিও সহিসালামতে ফিরে যেতে পারবেন নিজদেশে।'

বইঘর.কম

'কথা দিচ্ছ?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে।' গুপ্তধনের ব্যাপারে যেসব কথা রিচার্ডকে বললে ক্ষতির কোনও সম্ভাবনা নেই, সেগুলো বলল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'কতদিন ধরে আছো তুমি ইসাটাবুতে?'

'আছি অনেকদিন। কেন?'

'এ-রকম কাউকে কি চেনো, অথবা এ-রকম কারও নাম কি শুনেছ, যে লোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন চলছিল তখনও ছিল এ-দ্বীপে, এখনও আছে? আই মীন, নব্বইয়ের কাছাকাছি বয়স হবে হয়তো লোকটার; এমন কেউ, যার স্মরণশক্তি অটুট আছে?'

চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবল রিচার্ড, তারপর মাথা নাড়ল। 'উঁহুঁ, ও-রকম কারও কথা মনে পড়ছে না এ-মুহূর্তে।'

'খোঁজ লাগাতে পারবে?'

'তা পারব। তবে...ও-রকম কেউ যদি থাকেও, লোকটার খোঁজ পেতে সময় লাগতে পারে।'

'তা লাগুক, আপত্তি নেই। আমার নিজেরও একটু সময় দরকার। তোমার লোকেরা যা-খাতিরযত্ন করেছে আমার, গুপ্তধনের পিছে আবার লাগার আগে একটু জিরিয়ে না নিলেই নয়।'

'দোষ আপনার, সরি টু সে। আমাদেরকে খুব হালকাভাবে নিয়ে ফেলেছিলেন আপনি। কী ভেবেছিলেন? একটু কুংফু-কারাটে জানলেই কাত করে ফেলবেন আমাদের? এত সহজ? সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে পুলিশ সার্জেন্ট—নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাকে হাত করিনি আমরা? যেখানে প্রধানমন্ত্রী সোগাভেরের ডান হাত ওরওয়েন ঝনয়া নিয়মিত টাকা খাচ্ছেন আমাদের কাছ থেকে, সেখানে আমাদের বিরুদ্ধে যাবার সাহস পেলেন কী করে আপনি?' উপহাসের হাসি হাসল রিচার্ড। 'এতই সহজ?'

রানা কিছু বলল না।

'এখন আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে আসবে আমার লোকেরা। বিশ্রাম নিতে চেয়েছেন, ঠিক আছে, আমরা কেউ বিরক্ত করব না আপনাকে। এই ফাঁকে আমি খোঁজ লাগিয়ে দেখি বের করা যায় কি না আপনার "মনের মানুষটাকে"। ডিনারের পর আপনাকে নিয়ে যাওয়া হবে পয়েন্ট ক্রুযে, যাতে পোসেইডনের কেউ যদি থেকেও থাকে বন্দর এলাকায়, আপনাকে চিনতে না পারে রাতের আঁধারে। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আপনার কথা বলানোর ব্যবস্থা করে রাখছি। এখন যারা যাবে আপনার সঙ্গে মেগুনায়, তাদেরকে আপনার রুমে নিয়ে যাবেন, আরেকবার খুঁজে দেখবে ওরা টমক্যাটটা পাওয়া যায় কি না। বিপজ্জনক অন্যকিছু আছে কি না তা-ও দেখবে, আশা করি বাধা দেবেন না।'

'একটা মাল্টিপারপাস নাইফ আছে আমার কাছে।'

'মাল্টিপারপাস নাইফ?' হা হা করে হাসল রিচার্ড। 'রেখে দিন ওটা আপনার কাছেই। কখনও কান চুলকানোর দরকার হলে কাজে লাগাতে পারবেন। যা-হোক, আমার লোকদের একজন, আপনার ডিনার শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকবে লবিতে, যাতে ওর চোখ ফাঁকি দিয়ে কোথাও যেতে না পারেন আপনি। হোটেলের কাছাকাছি থাকবে ট্রাকের ড্রাইভারও।' কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানার দিকে, শয়তানি খেলা করছে চোখে। নিজের মোবাইল থেকে একটা নম্বরে ডায়াল করল, ওপ্রান্ত থেকে সাড়া পাওয়ার পর বলল, 'মেয়েটা কী করছে?' উত্তরটা শুনে নিয়ে বলল, 'যাও ভেতরে। ওকে বলো মিস্টার রানা কথা বলতে চায় ওর সঙ্গে,' স্পিকার মোড অন করে সেটটা নামিয়ে রাখল রানার সামনে।

'মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে চাইনি আমি,' বিরক্তি প্রকাশ পেল রানার কণ্ঠে।

'মিস্টার রানা!' ফোঁপানি শোনা গেল মোবাইলের স্পিকারে। 'মিস্টার রানা!'

বুকের ভেতরে আবেগ টের পেল রানা। নিজেকে সামলে

বইঘর.কম

রেখে বলল, 'কী খবর, রেমি?'

প্রশ্নটা শুনে রেমির ফোঁপানি বাড়ল। 'ওরা...আমাকে...তুলে এনেছে। আমাকে...আটকে রেখেছে।'

'ওরা কি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে?'

'না, মিস্টার রানা। কিন্তু...ভয় লাগছে আমার। ভীষণ ভয় লাগছে। এখানে আসার পর থেকে একমনে ডেকে চলেছি ঈশ্বরকে। বলছি, আপনাকে যেন পাঠিয়ে দেন তিনি, আপনি যেন উদ্ধার করেন আমাকে। ...মিস্টার রানা, আপনি কি বাঁচাবেন না আমাকে? আপনি কি আমাকে বাঁচাতে পারবেন না?'

'পারব, রেমি।'

'কোনও গুপ্তধনে কোনও কাজ নেই আমার। সব ওদেরকে দিয়ে দিন আপনি। ভাউযা সেরে উঠলে ওকে আর আমাদের সাম্পানটা নিয়ে চলে যাব অন্য কোনও দ্বীপে। মাছ ধরে চালাব দু'জনের ছোট্ট সংসার। ইটের হত্যাকাণ্ডের বিচারও চাইব না কারও কাছে।' কান্নায় ভেঙে পড়ল রেমি। 'আমার এইটুকু চাওয়া কি পূরণ করবেন না ঈশ্বর? আমার এইটুকু চাওয়া কি পূরণ করতে পারবেন না আপনি?'

জবাবে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রানা, থাবা দিয়ে মোবাইলটা সরিয়ে নিল রিচার্ড, লাইন কেটে দিল।

ভয়ঙ্কর ক্রোধে লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল রানা, ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল রিচার্ডের ওপর, কিন্তু লোকটার হাতে একটা রিভলভার দুলে উঠতে দেখে শেষমুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে।

বিদ্রূপের হাসি হাসল রিচার্ড। 'কী যেন বলেছিলেন? মেয়েটা আপনার ভাবী হয় না, না?' রানাকে জবাব দেয়ার সুযোগ না দিয়ে পিজিন ভাষায় উঁচু গলায় কী যেন বলল, রানা টের পেল ঘরে ঢুকল খোদার-খাসি আর শিপট্রাকের ড্রাইভার।

রানাকে শুনিয়ে ইংরেজিতে রিচার্ড বলল, 'মিস্টার রানাকে সসম্মানে হোটেলে পৌঁছে দাও তোমরা। তারপর কী করতে হবে, বলা আছে আগেই।'

নিজের খাসকামরায় বসে আছেন মানাশেহ সোগাভের; হাতের কাছেই বসে আছে আরেকজন।

এ-ঘর তাঁর বেডরুম না। ঘরটা তাঁর ব্যক্তিগত অফিসও না। এ-ঘরের মোটা শিক-লাগানো জানালার পাল্লা খোলা হয় না কখনও, দরজার তালার চাবি সবসময় নিজের কাছে রাখেন সোগাভের। কারণ তিনি চান না, তাঁর অনুপস্থিতিতে কেউ ঢুকুক এখানে, গোপন ডিভাইস বসিয়ে দিয়ে সংগ্রহ করুক গোপন আলোচনার খবর। দ্বীপরাষ্ট্রের সংবেদনশীল ইস্যুগুলো নিয়ে বিশ্বস্ত লোকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি এখানে, যেমন বলছেন এখন।

'তুমি ঠিক জানো তো?' নিচু গলায় কথাটা দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন সোগাভের। 'তোমার ইনফর্মেশন ভুল হলে কত বড় কেলেঙ্কারি হবে, বুঝতে পারছ?'

'জী, স্যর, আমি নিশ্চিত,' নিচু গলায় বলল লোকটা। 'এবং আমি জানি ইনফর্মেশনে ভুল থাকলে আমার গর্দানটা যেতে পারে।'

সোফায় হেলান দিলেন সোগাভের, হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি টের পাচ্ছেন তিনি বুকের ভেতরে। 'লবস্টারে তা হলে একসঙ্গে দেখা গেছে দু'জনকে?'

'জী, স্যর। আমাদের ক্রমাগত চাপাচাপিতে শেষপর্যন্ত ভেঙে পড়তে বাধ্য হয়েছে বারের মালিক কলিন্স। রাইস রিচার্ডের নাগাল পাওয়ার জন্য আমাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন, আমরা এখন নিশ্চিত, ওই লোকের সঙ্গেই দেখা করেছেন মিস্টার ঝনয়া।'

'তারমানে আমারই খেয়ে, আমারই প'রে, আমারই বুকে ছুরি চালাচ্ছে হারামিটা?'

'মিস্টার ঝনয়া যে তলে তলে কিছু একটা করছেন, সে-ব্যাপারে সন্দেহ নেই আমাদের, কিন্তু সেটা ঠিক কী, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। হতে পারে ডেমোক্রেটদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন

তিনি, নির্বাচনে জয়লাভ করতে সাহায্য করবেন ওদের, তারপর আপনার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে ওদের দলে যোগদান করে আরও গুরুত্বপূর্ণ কোনও পদ দখল করবেন। হতে পারে, প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে আপনাকে আর দেখতে চাচ্ছেন না তিনি। ওই চেয়ারে নতুন কাউকে...হয়তো নিজেকেই কল্পনা করছেন।'

'এর নাম বিশ্বাস?' হাতের তালু দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন সোগাভের। 'বলো, এর নাম বিশ্বাস?'

'স্যর, যদি কিছু মনে না করেন, বিশ্বাস আর বিশ্বাসঘাতকতা মুদ্রার এপিঠওপিঠ।'

'ওদের পরবর্তী চাল কী?'

'বলছি, তবে তার আগে জানিয়ে রাখি, আমার মনে হয় মাসুদ রানাকে কব্জা করে ফেলেছে ওরা,' সেন্ট্রাল হাসপাতালের ঘটনাটা বলল লোকটা। তারপর বলল, 'মেয়েটাকে তুলে নিয়ে গেছে, আর মাসুদ রানাকে বাধ্য করছে ওদের কথামতো কাজ করতে।'

'করুক। তুমি কিন্তু ভুলেও বাগড়া দিতে যাবে না ওদের কাজে।'

'আপনি যা বলবেন, ঠিক তা-ই করব আমি, স্যর।'

'ওরা ওদের মতো মাতামাতি করতে থাকুক, আমার টার্গেট ঝনয়া। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত জবাব দেব আমি লোকটার বিশ্বাসঘাতকতার। ...মাসুদ রানাকে দিয়ে ঠিক কী করাতে চাচ্ছে ওরা?'

'আমার ধারণা, তথাকথিত গুপ্তধন উদ্ধার করিয়ে নিয়ে সব মেরে দিতে চাইছে। লোকটা যেন ওদের হাতের পুতুল হয়ে থাকে সেজন্যে ওকে দিয়ে বলিয়ে আজ রাতেই বিদায় করাতে চাচ্ছে রিসার্চ ভেসেলটাকে।'

'করাক। সব জেনেও না জানার ভান করে থাকব আমরা। আমাদের এই অভিনয় ঝনয়ার মুখোশ খুলে দিতে সাহায্য করেছে। গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা কাজ বাকি আছে আমাদের: প্রমাণ

করা–জালনোটের ব্যবসা, দ্য মিউটিনিয়ার্স আর রাইস রিচার্ড এক সুতোয় গাঁথা।'

'স্যর, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, আমাদের হয়ে অর্ধেক কাজ করে দেবে মাসুদ রানা।'

'তা হলে আমরাও সময় ও সুযোগ দিই লোকটাকে, নাকি?'

'ঠিক আছে। আমি আসি তা হলে?'

কিছু না বলে মাথা ঝাঁকালেন সোগাভের।

সোফা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার উদ্দেশে হাঁটা ধরল মোফাট ফুগুই। মুচকি হাসছে, কারণ সোগাভের জানেন, সে কাজেকর্মে একজন ডাবল এজেন্ট, কিন্তু আসলে সে ট্রিপল এজেন্ট। তৃতীয় পক্ষটা সে নিজে।

এবং সময় ও সুযোগমতো দেখিয়ে দেবে সেটা।

হোটেলরুমে, বারান্দার থাই দরজা খুলে দিয়ে, খাটে শুয়ে আছে রানা। কোনও তাড়াহুড়ো নেই ওর মধ্যে। ক্ষুধা লেগেছে, কিন্তু খেতে ইচ্ছা করছে না। ঠিক করল, দুপুরে না খেয়েই থাকবে। এখন ঘুমাবে, ঘুম থেকে উঠে ডিনার সেরে নেবে একবারে।

টমক্যাটটা পায়নি ওরা। রানার রুম সার্চ করে বিপজ্জনক অন্যকিছুও পায়নি, পাওয়ার কথাও না। তবে রেমির ল্যাপটপ আর মোডেমটা নিয়ে গেছে। অস্ত্র বা টুল যা-ই বলা হোক না কেন, এখন রানার কাছে একটামাত্র জিনিসই আছে: মাল্টিপারপাস নাইফ।

অস্থির লাগছে ওর। বিস্বাদ ঠেকছে সবকিছু।

রেমি মেয়েটাকে ভালো লেগে গিয়েছিল। মেয়েটার সারল্য স্পর্শ করেছিল রানার মন। এই ক'দিনে কাছাকাছি চলে এসেছিল ওরা। এখন, মেয়েটাকে রক্ষা করতে না পেরে ভুগতে হচ্ছে মর্মপীড়ায়। ভুগতে হচ্ছে অক্ষম ক্রোধ আর প্রতিশোধস্পৃহায়। রিচার্ড কি আসলেই ছেড়ে দেবে মেয়েটাকে?

'এত সহজ?' শয়তানটার প্রশ্নটা যেন ঘুরপাক খাচ্ছে রানার

মগজের ভেতরে।

মনে পড়ে যাচ্ছে কটন আর হেক্টরের কথা। রানার আহ্বানে সাড়া দিতে এসে চিরতরে হারিয়ে গেল হাসিখুশি মানুষ দুটো। দুর্ঘটনাটার খবর কি জানতে পেরেছেন হ্যামিল্টন? খারাপ লাগছে অ্যাডমিরালের জন্যও। একটা দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি রানাকে, একটু একটু করে সেটা পালনও করছিল ও; চূড়ান্ত প্রমাণ সংগ্রহের জন্য যে-দিনটা নিজের জন্য বরাদ্দ করে রেখেছিল মনে মনে, সেদিনই এলোমেলো হয়ে গেল সব।

আর কোনওদিন কি কথা হবে হ্যামিল্টনের সঙ্গে? আর কখনও কি দেখা হবে পিতৃসম, গুরু রাহাত খানের সঙ্গে? মতিঝিলের হেডঅফিসটা—সেখানে কি যাওয়া হবে আর কোনওদিন?

আচ্ছা, সত্যিই কি কোনও অভিশাপের কবলে পড়েছে ওরা? তা না হলে একের পর এর দুর্ঘটনায় পড়ছে কেন যারাই হাত বাড়িয়েছে রাজা শামানের গুপ্তধনের দিকে, তারা? মাথা ঝাঁকিয়ে দূর করে দিল ও চিন্তাটা।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে সিদ্ধান্ত নিল: বাজিমাত করা সহজ না কঠিন, দেখিয়ে দেবে ও রিচার্ডকে, সময়-সুযোগমতো। ওর পরিচয় জানতে চেয়েছে ওরা বার বার, নিজেকে চিনিয়ে দেবে ও।

'চ্যালেঞ্জটা নিলাম,' বিড়বিড় করে বলে চোখ বন্ধ করল রানা।

বাইশ

ঘুমটা যখন ভাঙল, তখন গোধূলির শেষ আলো মিলিয়ে যাচ্ছে; অনতিদূরের জঙ্গলটা সরব হয়ে উঠেছে নীড়েফেরা পাখিদের

কলকাকলিতে। চিৎ হয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকল রানা, ছাদের দিকে তাকিয়ে চোখ পিটপিট করছে। উঠে পড়ল তারপর, বাথরুমে গেল। ঘরে এসে লাইট জ্বালিয়ে দিয়ে ইন্টারকমের মাধ্যমে যোগাযাগ করল রিসিপশনে। 'তিন শ' দশ নম্বর রুম থেকে মাসুদ রানা বলছি।'

'জী, স্যর। কী সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'

'লবিতে আমার জন্য অপেক্ষা করার কথা আমার এক বন্ধুর। নাদুসনুদুস সে...'

'জী, স্যর, আপনার বন্ধু অনেকক্ষণ ধরেই বসে আছেন সোফায়। আপনার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে ঝিমাতে শুরু করেছিলেন একসময়, এখন ঘুমাচ্ছেন। ডেকে দেব?'

'না, দরকার নেই। আমিই আসছি নিচে,' রিসিভার নামিয়ে রেখে বারান্দায় চলে এল রানা।

রেলিং আছে এখানে, তবে তা রানার কোমর পর্যন্ত লম্বা, তারপর ফাঁকা। অর্থাৎ, রানা যদি চায়, রেলিং টপকে নামতে পারবে নিচের সানশেডে। রেলিং-এ ভর দিয়ে এদিকওদিক তাকাল রানা।

জেঁকে বসতে শুরু করেছে রাতের আঁধার, দূরের জঙ্গলটা ঝাপসা হয়ে গেছে ইতোমধ্যে, তবে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়নি এখনও। সানশেডের একদিকে, কিছুটা দূরে, লোহার ওয়েইস্ট ওয়াটার পাইপ হোটেলভবনের দেয়াল ঘেঁষে নেমে গেছে নিচ পর্যন্ত।

মুচকি হাসল রানা। ইচ্ছে করলেই এখান দিয়ে নেমে যেতে পারে ও, সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে মিলিয়ে যেতে পারে হাওয়ায়।

ঘরে এসে সুগন্ধী ট্যালকম পাউডারের প্লাস্টিক ক্যানটা নিল বেসিনের ওপরের তাক থেকে, এগিয়ে গেল দরজার দিকে। কিছুটা পাউডার ছিটাল দরজার কাছে মেঝেতে, কাজ শেষে জায়গামতো রেখে দিল পাউডারের ক্যানটা। লাইট নিভিয়ে দিয়ে ঘুটঘুটে অন্ধকার বানাল ঘরের ভেতরটা, দরজা খুলে বেরিয়ে এল

করিডোরে, খেয়াল রাখল পাউডারের পাতলা প্রলেপের ওপর যেন পা না পড়ে। দরজাটা আটকে দিয়ে হাজির হলো লবিতে।

সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে আরামে ঘুমাচ্ছে খোদার খাসি। ওকে পাহারা দেয়ার জন্য পাঠিয়েছে রিচার্ড, ব্যাটা ঘুমাচ্ছে নিশ্চিন্তে। খাসির সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। কাঁধে আলতো করে কয়েকবার ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে জাগাল ঘুম থেকে।

'ইউ?' রানাকে দেখামাত্র স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন বের করতে যাচ্ছিল খাসি, স্থান-কাল-পাত্রের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় নিবৃত্ত হলো।

'হ্যাঁ, আমি,' বলল রানা। 'ঘুমাচ্ছ নাকি?'

'নো। থিঙ্কিং। নাউ আই কল মিস্টার রিচার্ড।'

রেস্টুরেণ্টে চলে এল রানা। বসে পড়ল কোণের একটা টেবিলে, ডিনারের অর্ডার দিল। খাসি বেরিয়ে গেল বাইরে।

খাবার সার্ভ করা হলো। খেতে খেতে পরবর্তী করণীয় নিয়ে ভাবতে লাগল রানা।

'স্যর...আমার কিছু খাওয়ার দরকার ছিল।'

জবাবে জঘন্য একটা গালি দিয়ে খোদার-খাসিকে ওর শরীরের যে-বিশেষ অঙ্গ খেতে বলল রিচার্ড, তা করতে গেলে আক্ষরিক অর্থেই খাসি হয়ে যেতে হবে লোকটাকে।

'স্যর, আমি কি একা...আই মীন...আমাকে একা পেয়ে লোকটা যদি...'

'রেপ করে, নাকি? তোমাকে সেটাই করা উচিত, ছাগল কোথাকার! যাও, তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে নাও। অস্ত্র আছে না সঙ্গে?'

'আছে, স্যর।'

খাসিকে হন্তদন্ত হয়ে রেস্টুরেণ্টে ঢুকতে দেখে, তারপর পাশের টেবিলে এসে বসতে দেখে, যা বোঝার বুঝে নিল রানা। এবং

একটু পরে দ্য মিউটিনিয়ার্সের আরও এক নতুন মুখ এসে যোগ দিল খাসির সঙ্গে।

খাওয়া শেষ করে তিন তলায় চলে এল রানা। লক খুলল ওর রুমের দরজার। পাল্লা ঠেলে হাঁ করে দিল দরজাটা, পাউডারের প্রলেপ এড়িয়ে পা রাখল ভেতরে। লাইট জ্বেলে দরজা লাগিয়ে দিল, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মেঝেতে।

হ্যাঁ, পাউডারের ওপর এক জোড়া জুতোর ছাপ দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।

তারমানে ওর অনুপস্থিতিতে ঘরে ঢুকেছিল কেউ। তারমানে মেগুনায় কমপক্ষে একজন চর আছে রিচার্ডের। এবং লোকটাকে অবহিত করা হয়েছে, ঘরে নেই রানা। সেই সুযোগে ঘরটা সার্চ করেছে লোকটা।

রাত দশটার সময় রানাকে নিয়ে পয়েন্ট ক্রুযের উদ্দেশে রওয়ানা হলো সেডানটা।

খোদার-খাসির সঙ্গে তিনজন নতুন লোক দেখা যাচ্ছে এবার। একজন গাড়ি চালাচ্ছে, তার পাশের সীটে বসেছে খাসি। বাকি দুই নতুন মিউটিনিয়ার রানাকে মাঝখানে রেখে পেছনের সীটে বসেছে।

ব্যবস্থা ভালোমতোই করা ছিল—বন্দরের গেটে দন্তবিকশিত অবস্থায় পাওয়া গেল ফুগুইকে। সে-ই ভেতরে নিয়ে গেল রানাকে; পোর্ট অফিসার যখন তাদের কমিউনিকেশন সিস্টেম ব্যবহার করে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে পোসেইডনের সঙ্গে, তখন সে রানার কানে কানে প্রেমনিবেদনের ভঙ্গিতে বলল, 'একটা বেফাঁস কথাও বলবেন না, প্লিয। আমার বুকপকেটে চালু অবস্থায় আছে একটা মোবাইল, ওপ্রান্তে সব শুনছেন মিস্টার রিচার্ড।'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

ওর কণ্ঠ শুনে আবেগ আটকে রাখতে পারল না টনি।

বইঘর.কম

ফোঁপাতে ফোঁপাতে জানাল দুর্ঘটনাটার খবর; বলল, রানাকে যথাসম্ভব খুঁজেছে ওরা, কিন্তু পায়নি।

টনির বেশিরভাগ কথা জানা ছিল রানার, তারপরও লোকটার সব কথা শুনল ও। টনির নাম যেন উচ্চারিত না হয় ওর মুখ দিয়ে, পূর্ণ খেয়াল রেখেছে সে-ব্যাপারে। টুকটাক কিছু কথা বলল ও টনির সঙ্গে, বলল চলে যেতে হবে ওদেরকে।

প্রতিবারই বিভিন্ন কথা জানতে চাইল টনি রানার কাছে, প্রতিবারই সুকৌশলে জবাব দিল রানা যাতে টনি বুঝতে পারে কিছু একটা ঘাপলা হয়েছে, আবার রিচার্ড ধরতে না পারে পোসেইডনে আসলে একটা মেসেজ পাঠানোর চেষ্টা করছে রানা।

ওদের কথোপকথনের শেষ টানল রানা ডিনারের সময় ভেবে-রাখা একটা কথা দিয়ে: 'অ্যাডমিরাল, লেট'স কাম টু কংক্লুশন, আই ওয়ান্ট ইউ টু গো ব্যাক। আয়্যাম ইন সাচ এ কণ্ডিশন দ্যাট আই ডু নট নীড ইউ অর ইয়োর ক্রু অর ইয়োর ভেসেল এনি মোর। ক্যাপচার এনি থিং দ্যাট বিলংস্ টু ইউ অ্যাণ্ড রিট্রিট। মে গড হেল্প মি অ্যাণ্ড অল অফ আস।' মাউথপিসটা পোর্ট অফিসারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল কন্ট্রোল রুম থেকে। ওর সঙ্গে আঠার মতো লেগে থেকে ওকে সেডান পর্যন্ত পৌঁছে দিল ফুগুই।

দুই রেবেলের মাঝখানে আগেরবারের মতো করে জায়গা করে নিয়েছে রানা; সেডানটা মাত্র রওয়ানা হয়েছে মেণ্ডানার উদ্দেশে, এমন সময় বেজে উঠল রানার ডানদিকের রেবেলের মোবাইল ফোন। কল রিসিভ করল লোকটা, পিজিন ভাষায় কথা বলল কিছুক্ষণ, তারপর সেটটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'মিস্টার রিচার্ড।'

সেটটা নিয়ে কানে ঠেকাল রানা। 'জানি দোস্ত, কী খবর? তোমাকে দেখি না অনেকক্ষণ।'

'লোকটাকে অ্যাডমিরাল বলে ডাকলেন কেন আপনি?' কণ্ঠ শুনে বোঝা গেল রানার মতো লঘু মেজাজে নেই রিচার্ড।

‘সে এক লম্বা ইতিহাস,’ তরল গলায় বলল রানা। ‘সব শোনার মতো ধৈর্য কি হবে তোমার?’

‘বলুন। আমি শুনছি।’

‘আচ্ছা থাক, সংক্ষেপেই বলি—তোমার মেজাজ মনে হচ্ছে ভালো না। লোকটার আসল নাম টনি, কিন্তু সবাই ওকে ডাকে অ্যাডমিরাল বলে। কারণ খুব শখ ছিল বেচারার, নৌবাহিনীর বড় অফিসার হবে; অবসর নেয়ার সময় নৌবাহিনীর চীফ থাকুক বা না থাকুক, অন্তত যেন অ্যাডমিরাল হতে পারে। কিন্তু কিছুই হয়নি—মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক। কীভাবে কীভাবে যেন অ্যাডমিরাল নামটা চালু হয়ে গেছে ওর বন্ধুমহলে, ওই নামে ডাকলে খুশিই হয় সে।’

চুপ করে আছে রিচার্ড, রানার কথাটা সত্যি না মিথ্যা বোঝার চেষ্টা করছে বোধহয়। কিছুক্ষণ পর বলল, ‘ইসাটাবুর আদিবাসী, বয়স নব্বইয়ের কাছাকাছি অথচ স্মরণশক্তি ভালো আছে এখনও, এ-রকম একজন লোকের খোঁজ চেয়েছিলেন আপনি।’

‘আহ্, যত সময় যাচ্ছে তোমার পারফর্মেন্স আমাকে ততই মুগ্ধ করছে, রিচার্ড, বিশ্বাস করো। তোমার প্রেমে পড়তে আর বেশি বাকি নেই আমার বোধহয়। ...নিশ্চয়ই খুঁজে বের করে ফেলেছ লোকটাকে?’

‘হ্যাঁ। আগামীকাল সকালে আমার লোকেরা তার কাছে নিয়ে যাবে আপনাকে। আপনার যা যা জানার আছে, খুঁটিয়ে জেনে নেবেন লোকটার কাছ থেকে।’

‘অবশ্যই। তবে তার আগে ছোট্ট একটা উপকার করতে হবে আমার।’

‘কী?’

‘“রাতারাতি পিজিন ভাষা শিক্ষা” নামের কোনও বই যদি থেকে থাকে তোমার কাছে, কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও মেণ্ডানায়।’

‘বললাম তো, আমার লোক থাকবে আপনার সঙ্গে।

বইঘর.কম

দোভাষীর কাজ চালাতে পারবে সে। আর যার কথা বলেছি একটু আগে, সে-ও কাজ চালানোর মতো ইংরেজি পারে।'

'কে সে?'

'সেটা আগামীকালই জানতে পারবেন।'

উইণ্ডশীল্ড দিয়ে বাইরে তাকাল ও। আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে মাকিরা-উলাওয়া। তারমানে আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাচ্ছে পয়েন্ট ক্রুয।

টনিকে বলা শেষ কথাটায় একটা কোডেড মেসেজ দিয়েছে রানা, লোকটা কি বুঝতে পেরেছে সেটা?

হোটেলে ঢোকার আগে, হোটেলসংলগ্ন স্টোরটা থেকে এক প্যাকেট সিগারেট, খাতা-পেন্সিল আর বলপেন কিনল রানা। ওর কেনাকাটা দেখে প্রশ্নবোধক ভঙ্গিতে একটা ভ্রূ ওপরে তুলল খোদার-খাসি।

সেটা না দেখার ভান করল রানা।

বন্দর কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ডিপার্চার ক্লিয়ারেন্স পেতে একটু দেরিই হয়ে গেল। ইসাটাবুর স্থানীয় সময় পৌনে বারোটার দিকে নিউযিল্যাণ্ডের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করল পোসেইডন।

একঘেয়ে, ক্লান্তিকর যাত্রা; তার ওপর কটন আর হেক্টর নেই। গুরুভার সওয়ার হয়েছে টনি আর রিকার্ডোর কাঁধে। পোসেইডন চালানোর দায়িত্ব নিয়েছে টনি, ওকে সবরকমভাবে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে রিকার্ডো।

পাইলটহাউসে টনি এখন একা। কফি বানিয়ে আনার জন্য কিচেনে গিয়েছে রিকার্ডো। রানার শেষের কথা নিয়ে ভাবছে টনি।

ওকে অ্যাডমিরাল বলে সম্বোধন করল কেন মিস্টার রানা?

ঘুমানো দরকার, কারণ আগামীকাল সকাল সকাল উঠতে হবে,

কিন্তু দুপুরে লম্বা ঘুম দিয়েছে বলে এখন এক হতে চাইছে না দু'চোখের পাতা। উঠে বসল রানা।

সন্দেহ নেই, ভাগ্য যদি সহায়তা না করে, তা হলে শেষপর্যন্ত কপালে খারাবি আছে ওর। যে-মুহূর্তে রাজা শামানের গুপ্তধন হস্তগত হবে দ্য মিউটিনিয়ার্সের, ধরে নেয়া যেতে পারে, পরমুহূর্তে দেহ ছেড়ে চলে যাবে ওর প্রাণটা। তারপর মারা পড়বে রেমি ও ভাউযা।

তারপর?

বিসিআই থেকে কয়েকজন আসবে ইসাটাবুতে। সারা দ্বীপ তন্ন তন্ন করে খুঁজবে ওরা রানাকে। কিন্তু কোথাও পাবে না। কোথাও না। ও নিখোঁজ—জানার পর কার দরদ উথলে উঠবে সবার আগে? অবশ্যই মেজর জেনারেল রাহাত খান। এবং সোহেল। আর হয়তো সোহানারও।

ঝটপট খাতা-পেন্সিল নিয়ে বসে পড়ল রানা। যা যা বলা দরকার, যতটুকু বলা দরকার, সব লিখে ফেলল বাংলায়। তারপর পাউডারের ক্যানটা নিয়ে ঢুকল গিয়ে বাথরুমে, ক্যাপ খুলে সব পাউডার ফেলে দিল কমোডে, ফ্লাশ করল। এবার বাংলা লেখা পাতাগুলো ছিঁড়ে ক্যানের মাপমতো ভাঁজ করল, ভেতরে ঢুকিয়ে ঠিক আগের মতো করে লাগিয়ে দিল ক্যাপ। তারপর ক্যানটা ফেলে রাখল যেখানে ছিল, অর্থাৎ বেসিনের ওপর সিরামিকের তাকে। এমন ভাবে শুইয়ে রাখল, যেন দেখলে মনে হয় পাউডার শেষ হয়ে যাওয়ার পর জিনিসটা নিতান্ত অবহেলায় পড়ে আছে ওখানে।

পেন্সিল নিয়ে এগিয়ে গেল যেদিকের দেয়ালে সুইচবোর্ড আছে সেদিকে; বোর্ড বরাবর সোজা নিচে, টাইলস-করা মেঝের স্ক্যাটারিং-এর ঠিক ওপরে, ইংরেজি অক্ষরে বাংলা উচ্চারণে এক লাইনে ছোট ছোট করে লিখল:

"পাউরুটি খাই কিন্তু রুটি খাই না, কারণ হিন্দিতে ভয় পাই"। তার পাশে লিখল ফুগুইয়ের মোবাইল নম্বর।

নিজের ভেতরে একটা সন্তুষ্টি টের পাচ্ছে রানা। ওর অস্পষ্ট পরিকল্পনাটা স্পষ্ট হচ্ছে ধীরে ধীরে; রেমি বন্দি হওয়ার পর যে-অস্থিরতা পেয়ে বসেছিল ওকে সেটা কমছে আস্তে আস্তে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, দুই চোখের পাতা ভারী ভারী ঠেকছে এখন।

শবাসনে শুয়ে পড়ল ও।

তেইশ

শহরতলী ছাড়িয়ে আরও ভেতরের দিকে, দুর্গম পাহাড়ি গ্রাম্য এলাকার দিকে চলে গেছে রাস্তাটা। আসলে রাস্তা না বলে কর্দমাক্ত ট্রেইল বললে মানায় বেশি। বার বার বাঁক নিতে হচ্ছে বলে গোঁ গোঁ করছে সেডানের ইঞ্জিন, গতি বেশি না। দু'পাশে দুই মিউটিনিয়ারকে নিয়ে পেছনের সীটে বসেছে রানা, সামনে ড্রাইভারের পাশের সীটে গতকালের মতো খোদার-খাসি। রানার কথামতো যে-লোকের খোঁজ বের করেছে রিচার্ড, তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে ওরা। এবড়োখেবড়ো ট্রেইলে এত বেশি ঝাঁকুনি লাগছে যে, রানার মনে হচ্ছে, গাড়িতে করে না, কোনও নৌকায় করে চলেছে ওরা ঝড়ে উন্মত্ত সাগরের বুক চিরে।

ট্রেইলটার দু'পাশে ঘন জঙ্গল। এমন একটা সময় ছিল যখন ইসাটাবুর উপকূল কিংবা সেটার ধারেকাছে বাস করত দ্বীপটার বাসিন্দারা, ভুলেও পা বাড়াত না জঙ্গলের দিকে। কিন্তু সময় যত গড়িয়েছে, জনসংখ্যা তত বেড়েছে; এবং সেই সঙ্গে গরিব মানুষগুলো বুঝতে পেরেছে, আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মূল শহর বা শহরতলীতে যদি থাকতে হয় ওদেরকে, চড়া মূল্য দিতে হবে। সুতরাং জীবনসংগ্রামের তাগিদে নিজেদের বসতি স্থাপন

করে তারা রেইন ফরেস্টে, যেখানে নাগরিকতার কোনও ঠাঁই নেই, তাই সেসবের জন্য কোনও দামও দিতে হয় না কাউকে। সরকার শুধু জানে এই লোকগুলো আছে, কিন্তু কোথায় আছে কেমন আছে তার কোনও খবর রাখে না।

পিজিন ভাষায় ড্রাইভারকে কিছু বলল খাসি। একই ভাষায় উত্তর দিল লোকটা।

'সুন, সুন,' আর বেশি দেরি নেই—রানাকে বোঝাতে চাইল খাসি।

সীটের পেছনে হেলান দিল রানা। যে-ক'দিন হলো ইসাটাবুতে আছে ও, যে-ক'জন আদিবাসীর মুখ থেকে ইংরেজি "সুন" শুনেছে, তারা একেকজন একেকরকমের অর্থ বোঝানোর জন্য ব্যবহার করেছে শব্দটা। কেউ বোঝাতে চেয়েছে "আগামীকাল", কেউ আবার "কখনও না"।

খোদার-খাসি কোন্‌টা বুঝিয়েছে তা খোদাই জানে।

আরও আধ ঘণ্টা পর ছোট্ট একটা খাঁড়ির ধারে পৌঁছাল ওরা। গাড়ি থামিয়েছে ড্রাইভার, এদিকওদিক তাকাচ্ছে। দু'পাশের তীর নুড়িপাথরে ভরা। এখানে ট্রেইলটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে এগিয়ে গেছে। একটা গেছে খাঁড়ি বরাবর বাঁ দিকে; আরেকটা খাঁড়ির ওপার দিয়ে এগিয়েছে সোজা, কিছুদূর যাওয়ার পর একটা ঢাল বেয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে।

হাতঘড়ির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে খাসির মনোযোগ আকর্ষণ করল রানা। 'এবার?'

ড্রাইভারের সঙ্গে পিজিনে আবারও কী যেন বলল খাসি।

প্রত্যুত্তর না দিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল ড্রাইভার, ওর দেখাদেখি খাসিও। পানির কাছে এগিয়ে গেল দু'জনে, কথা বলছে, বোঝা যাচ্ছে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করল খাসি, ফোন করল কাকে যেন, খুব সম্ভব রিচার্ড হবে। কোন্‌দিকে যেতে হবে জেনে নিল ভালোমতো, তারপর ফিরে এসে উঠে পড়ল গাড়িতে। ড্রাইভারও

ফিরে এসে বসে পড়ল তার জায়গায়। গাড়ি চালু করল সে। বাঁ দিকে ট্রেইলটা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। এবড়োখেবড়ো অবস্থা কমেছে, এখন আর অত ঝাঁকুনি লাগছে না। রানা খেয়াল করল, আস্তে আস্তে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে ট্রেইলটা এবং সরু হচ্ছে ক্রমশ, তবে দু'পাশে আগের মতোই ঘন আছে জঙ্গল।

মিনিট দশেক পর আবার থামতে হলো। ট্রেইলটা এখানে এত সরু হয়ে গেছে যে, সেডানটা যেতে পারবে কি না সন্দেহ হচ্ছে। নিজেদের মধ্যে আরও একবার দ্রুত আলোচনা সেরে নিল খাসি আর ড্রাইভার, তারপর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল। রানার দু'পাশের দুই মিউটিনিয়ারও বের হলো।

'গো, গো,' রানা বসে আছে দেখে ওকে তাগাদা দিল ড্রাইভার হাত নেড়ে।

নেমে পড়ল রানাও। বোঝা যাচ্ছে, এখান থেকে পায়ে হেঁটে এগোতে হবে ওদেরকে। একজনের পর একজন হাঁটতে শুরু করল ওরা। সবার আগে খাসি, তারপর একজন মিউটিনিয়ার। তারপর রানা। ওর পেছনে, বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে, আরেকজন মিউটিনিয়ার।

মাথার ওপর অকৃপণভাবে আগুন ঢালছে সূর্য। জঙ্গলের ভেতরে গরম কম লাগার কথা, কিন্তু কীসের কী! আবহাওয়া কেমন থম মেরে আছে। চারদিকে গুমট ভাব, একরত্তি বাতাস নেই কোথাও, শ্বাস নিলে মনে হয় ফুসফুসে ঢুকে যাচ্ছে গরম বাষ্প। প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল রানা। ইতোমধ্যে ভিজে উঠেছে শার্টের পিঠ, ইন ছেড়ে দিল ও। একটা হ্যাট অথবা ওই জাতীয় কিছু সঙ্গে আনেনি বলে আফসোস হচ্ছে। হাতঘড়ি দেখল আবারও। আবহাওয়ার যা অবস্থা, দুপুর গড়ানোর আগেই ঝুম বৃষ্টি নামলে আশ্চর্য হবে না।

টানা চল্লিশ মিনিট হাঁটার পর হঠাৎ করেই পাতলা হয়ে গেল দু'ধারের জঙ্গল, একটা খোলা জায়গায় হাজির হয়ে গেল ওরা; রানার মনে হলো থিয়েটারে নাটক শুরু হওয়ার আগে যেভাবে

পর্দা সরানো হয়, সেভাবে কেউ সরিয়ে দিল সব গাছপালা আর ঝোপ-লতাপাতা। সিকি মাইলেরও কম দূরে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়েছিটিয়ে আছে কুঁড়েঘরগুলো, গ্রামটার প্রায় মাঝখানের খোলা জায়গায় আগুন জ্বালানো হয়েছে বড় করে—সম্ভবত দুপুরের গণখাবারের আয়োজন চলছে। আশপাশের মাটিতে জায়গায় জায়গায় ঘাসের ছোট-বড় গালিচা আছে।

রানার দিকে তাকিয়ে সন্তুষ্টির হাসি হাসল খাসি। 'উই কাম।'

কুঁড়েঘরগুলোর দিকে এগিয়ে গেল ওরা। বাইরে যে-ক'জন গ্রামবাসী আছে এবং ঘরগুলোর ভেতরে যারা আছে, প্রায় সবাই কাজ ফেলে কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে ওদেরকে।

বোঝা গেল আগে থেকে ব্যবস্থা করা ছিল, কারণ ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে একটা কুঁড়েঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর বয়সী এক লোক। মাথায় বিচিত্র টুপি তার, সেটাতে ঝুলছে খরগোস বা কাঠবিড়ালির ছাল। টুপিটার দু'প্রান্ত ছাড়িয়ে নেমে এসেছে লোকটার জট-লেগে-যাওয়া লম্বা চুল। নেশা উদ্রেককারী স্থানীয় কোনও গাছের পাতা চিবাচ্ছে সে, রস বেরিয়ে এসে লাল হয়ে আছে কালো ঠোঁট দুটো, লাল হয়ে আছে লোকটার দুই চোখও। গলায় ঝুলছে মাদুলি বা ওই জাতীয় কিছু, সেটার শেষপ্রান্তে কোনও জন্তুর হাড়। নাভির নিচে কোনওরকমে ঝুলছে একটুকরো কাপড়। খাসির সঙ্গে কিছুক্ষণ বকবক করল লোকটা, তারপর হাতের ইশারায় দূরের একটা কুঁড়েঘর দেখিয়ে দিল।

রানার দিকে তাকাল খাসি। 'রাউনু সিক।' নেশাখোর যে-ঘরটা দেখিয়েছে একটু আগে, রানাকে সেটা দেখাল সে। 'দেয়ার।'

'অসুস্থ?' কিছুটা হলেও খুশি খুশি লাগছে রানার খবরটা শুনে। 'কথা বলতে পারবে না তা হলে?'

'উই ট্রাই।'

কথা না বাড়িয়ে ঘরটার দিকে হাঁটা ধরল রানা। খেয়াল করল, বিদেশি কেউ এসেছে বুঝতে পেরে কাজ বাদ দিয়ে ধারেকাছে একে একে জড়ো হচ্ছে ছেলেবুড়োর দল। পাত্তা দিল না রানা, এগিয়ে গিয়ে হাজির হলো ঘরটার দরজায়।

আসলে দরজা না বলে চৌকাঠ বলা উচিত, কারণ দরজা বলে কিছু নেই। ওটার বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে বহু পুরনো, দুর্গন্ধময়, ময়লা একটা চাদর। চাদরটা সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিল রানা, তারপর ঢুকে পড়ল। ওর পিছন পিছন ঢুকল খাসি আর নেশাখোরও। দুই মিউটিনিয়ার দাঁড়িয়ে থাকল ঘরের বাইরে, চাদরের দুই পাশে।

ছনছাওয়া ছাদে অনেকগুলো বড় বড় ফুটো আছে, মেরামত করা হয় না অথবা করার উপায় নেই; সূর্যের আলো ঢুকছে সেখান দিয়ে, যথেষ্ট আলোকিত হয়ে আছে ঘরের ভেতরটা। প্রথমেই নজরে পড়ে প্রায় ভাঙা একটা কাঠের নড়বড়ে টেবিল, জঙ্গল থেকে কেটেআনা কাঠ দিয়ে স্থানীয় কোনও মিস্ত্রি কোন্‌কালে ওটা বানিয়েছিল কে জানে! টেবিলের পাশেই একটা চৌকি, ওটার অবস্থাও বেশি সুবিধার না। সেখানে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে অশীতিপর বৃদ্ধ, কঙ্কালসার এক লোক; তার মাথার নিচে বালিশ নেই, পিঠের নিচে তোষক-জাজিম নেই, কাছেপিঠে কাঁথাকম্বল নেই। ছাদের সেই ফুটোর দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে সে, যেন অপেক্ষা করছে কোনওকিছুর—খুব সম্ভবত যমের; যেন ওই পথেই নেমে আসবে সে। নির্দিষ্ট বিরতিতে ফুলে উঠছে ঢোলের মতো বেঢপ পেট, বোঝা যাচ্ছে বেঁচে আছে লোকটা।

রাউনু, অনুমান করল রানা।

এগিয়ে গিয়ে লোকটার পায়ের কাছে বসে পড়ল ও। ইংরেজিতে বলল, 'আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই আমি।'

দৃষ্টি ফিরিয়ে রানাকে কিছুক্ষণ দেখল রাউনু। তারপর সময় নিয়ে, যন্ত্রচালিতের মতো, কী যেন বলল পিজিনে।

কথাটা তরজমা করে দিয়ে খাসি যা বলল, তার মানে হচ্ছে,

প্রয়োজন ছাড়া রাউনুর কাছে আসাটা অনেক আগেই বাদ দিয়েছে সবাই। যমও যদি আসে ওর কাছে, প্রয়োজনের খাতিরেই আসবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাকে।'

'হোয়াট?' জিজ্ঞেস করল রাউনু।

ইংরেজি আর পিজিন মিলিয়ে এবং খাসির ভাঙা ভাঙা "তরজমার" সহায়তায় এগিয়ে চলল ওদের কথোপকথন।

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা জানতে চাই আমি,' বলল রানা। 'জানতে চাই, তখন কী রকম ছিল এ-দ্বীপের অবস্থা।'

'খুব খারাপ। ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। আমার এক চাচাকে সাহায্য করেছিলাম তখন।'

'আপনাদের অবস্থা নিশ্চয়ই খারাপ ছিল?'

'খুব খারাপ। অনেক লোক মারা গেছে। জাপানিদের পছন্দ করি না আমি।'

হুট করে জাপানিদের প্রসঙ্গ চলে আসায় একটু যেন স্বস্তিই বোধ করল রানা। 'ওরা নিশ্চয়ই খারাপ ব্যবহার করেছিল আপনাদের সঙ্গে?'

'খুব খারাপ। একজন ছিল সবার চেয়ে খারাপ। কর্নেল।'

'কী করেছিল সে?'

'খারাপ কাজ। আমাদের অনেক লোক মেরেছে। আজব আজব কাজ করেছে। গোপনীয়।'

'আজব কাজ? গোপনীয়?'

'ধর্ষণ।'

'ধর্ষণ?'

'ওর দেশের সৈন্যদের দিয়ে আমাদের মেয়েদেরকে।'

'এটাকে আজব বলছেন কেন? যুদ্ধের সময় প্রায় সব দখলদার বাহিনীই কমবেশি এই কাজ করে।'

'লোকটা ইচ্ছে করে করিয়েছে। পরীক্ষা করে দেখতে

চেয়েছে, ধর্ষণ করানোর ফলে কেমন বাচ্চা হয়।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর রানা জানতে চাইল, 'তা হলে এসব আগে জানতে পারলাম না কেন?'

'জানি না।'

'আর কী কী করেছে ওই কর্নেল?'

'গোপন কাজ। গুহায়...আমরা কেউ যেতে চাইতাম না ওখানে। কেউ কোনওকালে গেছে বলে শুনিওনি।'

'লোকটার ব্যাপারে আরও কিছু বলবেন?'

'সে ছিল কুমিরের মতো। নিষ্ঠুর। একটা দানব। শয়তান।'

'কী নাম ওর?'

'কামা...কী যেন...কামাসাকু। কর্নেল কামাসাকু। কোনওদিনও ভুলতে পারব না নামটা।'

'আচ্ছা, যুদ্ধ যখন চলছিল, তখন জাপানিদের ব্যাপারে অদ্ভুত কোনও কথা শুনেছেন কখনও?'

'জাপানিরা সবসময়ই অদ্ভুত।'

'না, আমি আসলে ঠিক তা বলিনি। ধরুন...এ-রকম কি কখনও শুনেছেন, ইসাটাবুর পশ্চিম তীরে কিছু একটা করছে ওরা?'

'কিছু একটা মানে?'

'অদ্ভুত যে-কোনও কিছু, যা যুদ্ধের সঙ্গে একদম মেলে না।'

'যেমন?'

'যেমন...ধরুন, সাগরে ডুব দেয়া।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রাউনু, ভাবছে সম্ভবত। 'মনে পড়ছে না। ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, খেয়াল করতে পারিনি, অথবা খেয়াল করলেও এখন আর মনে নেই। তবে একটা ঘটনা মনে আছে।'

'কী?'

'পশ্চিম তীরের কাছে একটা গ্রামে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল ওরা।'

'ঠিক কোন্ সময়ের ঘটনা এটা?'

'ওরা চলে যাওয়ার আগে। তবে কতদিন আগে, তা মনে করতে পারছি না। ওই গ্রামে ছিলাম না আমি তখন। পরে লোকমুখে শুনেছি। তার আগে ওদেরকে দাস বানিয়েছিল ওরা।'

'দাস? কীসের জন্য?'

'জানি না। নিশ্চয়ই কোনও কাজের জন্য।'

'কী কাজ?'

'জানি না।'

'অস্বাভাবিক কিছু?'

'বললাম তো, জানি না। তবে...ওই লোকটা...মানুষ খুন করতে পছন্দ করত। আমরা সবাই খুব ভয় পেতাম ওকে।'

'যে-গ্রামের কথা বলেছেন, সে-জায়গার সবাইকে কি খুন করেছিল সে?'

'সবাইকে? না মনে হয়। আমি ছাড়াও আরও কয়েকজন বেঁচে গিয়েছিল বলে জানি।'

'ওই জাপানি কর্নেল, অথবা যাদেরকে সে দাস বানিয়েছিল তাদের ব্যাপারে আরও কিছু বলুন—যা আপনার মনে আসে। ইচ্ছা করলে গণহত্যাটার ব্যাপারেও বলতে পারেন।'

ছাদের ফুটোটার দিকে টানা আধ মিনিট তাকিয়ে থাকল রাউনু। তারপর বলল, 'এত বছর পর এসব নিয়ে কেন কথা বলছি আমরা?'

'কারণ এত বছর পর ওই জাপানি কর্নেল খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে। ওই সময়ে জাপানিরা ঠিক কী করেছিল এই দ্বীপে, সেটা জানা এবং কয়েকজনকে জানানো দরকার। কেন ওরা দাসপ্রথা চালু করতে গেল এখানে, জানা জরুরি। আবার, যাদেরকে দাস বানিয়েছিল, কেন হত্যা করতে গেল তাদের প্রায় সবাইকে, সেটাও জানতে চাই। একটু কষ্ট হলেও মনে করার চেষ্টা করুন—দ্বীপের পশ্চিম তীরে ঠিক কী করছিল জাপানিরা তখন।'

কয়েকবার দ্রুত ওঠানামা করল রাউনুর বুকটা, বোঝা গেল হঠাৎ করেই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে ওর; তবে সেটা সামলে নিতে পারল সে। কাঁপা কাঁপা একটা হাত তুলল গালের কাছে, চুলকাল নাকের কাছটা। হাতটা আবার কাঁপতে কাঁপতে নেমে গেল শরীরের একপাশে। আগের চেয়ে ধীরগতিতে, কিছুটা টেনে টেনে বলতে শুরু করল, 'ওই কর্নেল লোকটাকে জাপানি সৈন্যরা ড্রাগন বলে ডাকত। কারণ জানি না। ছোট ছোট বাচ্চাদের তুলে নিয়ে যেত সে। ধরে নিয়ে যেত শক্তসমর্থ পুরুষদের। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করাত ওদেরকে দিয়ে। দিন শেষে যখন বাসায় ফিরত পুরুষরা, কেউ কেউ দেখত, ওদের বউবাচ্চা গায়েব। কেউ প্রমাণ দিতে পারেনি, তবে গুজব ছড়িয়ে পড়ল, ভয়ঙ্কর গুহাগুলোর কোনও একটায় কিছু না কিছু করাচ্ছে লোকটা আমাদের জাতভাইদের দিয়ে। আমরা কেউ বাধা দিতে পারছিলাম না, প্রতিবাদ করতে পারছিলাম না—ও-রকম দুঃসাহসের শাস্তি একটামাত্র গুলি, তারপর সব শেষ। লাশটা আমাদের গ্রামে পৌঁছে দেয়ার মতো কষ্টও করত না জাপানিরা। কাউকে কাউকে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে কুমিরের মুখে, কেউ কেউ গেছে হাঙরের পেটে। এবং ওদের লাশ বহন করে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলার মতো জঘন্য কাজটা করতে হয়েছে আমাদেরকেই—জাপানিদের রাইফেলের মুখে।'

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা মনে পড়ে গেল রানার। 'এসব কাজ ওই কর্নেল আর ওর অনুগত সৈন্যরাই শুধু করেছে? স্থানীয় কেউ যদি ওদেরকে সাহায্য না করে থাকে তা হলে তো...'

'টকু।'

'টকু?'

'আমার চাচাতো ভাই। ছোট কিন্তু ভয়ঙ্কর যে-স্বেচ্ছাসেবক দল সাহায্য করত কর্নেলকে, তাদের নেতা।'

'স্বেচ্ছাসেবক দল?'

মাথা ঝাঁকাল রাউনু, কিছু বলল না।

'আমেরিকানরা যখন হামলা করল এখানে, তার আগে কি কোনও পরিবর্তন এসেছিল কর্নেলের আচরণে বা কাজে?'

'পরিবর্তন?'

'হ্যাঁ। শক্তসমর্থ লোকদের ধরে নিয়ে যাওয়া, গুহার ভেতরে গোপন কাজ চালানো, তারপর হঠাৎ করেই মেরে ফেলা—এসবের বাইরে অন্যকিছু কি করেছিল সে?'

আবারও প্রায় আধ মিনিট ছাদের ফুটোটার দিকে তাকিয়ে থাকল রাউনু। 'করেছিল।'

'কী?'

'ভারী ভারী কতগুলো বাক্স টেনে নিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল আমাদের গ্রামের বেশ কিছু জওয়ান লোককে।'

'ভারী বাক্স?' আপনাআপনি সোজা হয়ে গেছে রানার পিঠ।

'হ্যাঁ, কাঠের বাক্স। আমাদের জঙ্গল থেকে প্রথমে কাটা হয়েছিল গাছ, তারপর বানানো হয়েছিল তক্তা। পরে ওগুলো দিয়ে তৈরি করা হয় বেশকিছু বাক্স। সেসব বাক্সে কী ঢুকানো হয়েছিল, জানি না আমরা কেউই; কিন্তু যা-ই ঢোকানো হয়ে থাকুক না কেন, একেকটা বাক্সের ওজন ছিল সাংঘাতিক।'

'তারপর?'

'চাঁদিজ্বালানো রোদে আর দমআটকানো ভাপসা গরমে ওসব বাক্স টানতে বাধ্য করা হয়েছিল জওয়ানদেরকে। যতদূর শুনেছি, বাক্সগুলো নিয়ে পশ্চিম তীর থেকে ইসাটাবুর কোনও এক গুহার উদ্দেশে রওনা হয় ওরা। কাজ শেষ করার পর যারা বেঁচে ছিল, তাদেরকে গুলি করে মারা হয় ওখানেই। তাই কী টানতে টানতে ঠিক কোথায় নিয়ে গিয়েছিল ওরা, জানা যায়নি কখনোই।'

'বাক্সগুলো কোন্‌দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, আপনাদের কেউ না কেউ তা দেখেছে নিশ্চয়ই? পরে সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই কথা হয়েছে আপনাদের মধ্যে?'

রানার দিকে তাকাল রাউনু, তাকিয়েই থাকল বেশ কিছুক্ষণ। 'সুদর্শন যুবক, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না? জীবনের কাছ

থেকে আর কিছুই চাওয়ার-পাওয়ার নেই আমার, চাওয়ার-পাওয়ার মতো সময়ও নেই; কাজেই তোমার কাছে কেন মিথ্যা বলব?'

'আমি কিন্তু বলিনি আপনি মিথ্যা বলছেন। আমি বলেছি, বাক্সগুলো কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তা নিয়ে নিশ্চয়ই কথা হয়েছিল আপনাদের মধ্যে...হয়তো মনে পড়ছে না আপনার।'

আরও একবার ছাদের ফুটোর দিকে তাকাল রাউনু, ওখান দিয়ে হয়তো দেখতে পাচ্ছে প্রায় সত্তর বছর আগের দিনগুলো। কিছুক্ষণ পর, আবারও শ্বাসকষ্টের ধাক্কা সামলে নিয়ে বলল, 'নিষিদ্ধ।'

'নিষিদ্ধ? কী?'

'ওই জায়গার নাম উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ।'

'কোন্ জায়গা? বাক্সগুলো যেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেটা? জবাবটা যদি হ্যাঁ হয়, তা হলে আমার প্রশ্ন, কেন? আর...নাম উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু বর্ণনা দিতে মানা নেই নিশ্চয়ই?'

আবারও কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর রাউনু বলল, 'যুদ্ধের সময় দেখেছি, দ্বীপের জায়গায় জায়গায় কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে জাপানিরা। যে-উঁচু জায়গার কথা বলছি, সেটার ত্রিসীমানায় আমাদের, মানে দ্বীপের আদিবাসীদের জন্য নিষেধের বেড়া ছিল সবসময়, এখনও আছে। ওটা আমাদের সীমান্তের শেষ, আর একইসঙ্গে ওটা দৈত্যদেবতাদের সীমান্তের শুরু। ওটাই তাঁদের বাসস্থান, ওটাই তাঁদের কবরস্থান। এর বেশি কিছু বলা সম্ভব না আমার পক্ষে। যদি বলি, তা হলে মরার পরে আমার আত্মা কষ্ট পাবে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বুঝতে পেরেছি। তারপর কী হলো?'

'কীসের পর?'

'আপনার জাতভাইরা বাক্সগুলো বহন করে নিয়ে গেল দৈত্যদেবতাদের এলাকায়...তারপর?'

‘যুবক, খামোকা কষ্ট দিচ্ছ আমাকে। যা বলেছি একবার, তা আবার কেন জানতে চাচ্ছ?’

‘কারণ, কেন যেন বার বার মনে হচ্ছে, আমার সঙ্গে খোলাসা করে কথা বলছেন না আপনি।’

‘দু’-তিনজন বন্ধুকে নিয়ে কী একটা কাজে গ্রামের বাইরে গিয়েছিলাম সে-সময়। আজও বেঁচে আছি সে-কারণে। ফিরে এসে দেখি, যেন তুফান বয়ে গেছে আমাদের গ্রামটার ওপর দিয়ে। পার্থক্য একটাই—ঝড় হলে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়, সেখানে জাপানিদের বর্বর হামলায় জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল বেশিরভাগ ঘর। গ্রামের বাইরে যাওয়ার সময় যাদেরকে বেঁচে থাকতে দেখেছি, তাদের কারও লাশ উপুড় হয়ে, আবার কারও লাশ চিৎ হয়ে পড়ে ছিল জায়গায় জায়গায়। অন্য কোনও গ্রাম থেকে মানুষ তো পরের কথা, মড়া খাওয়ার জন্যও পাশের জঙ্গল থেকে একটা কুকুর বা শেয়াল পর্যন্ত ঢোকেনি গ্রামে, ভয়ে। শুধু মাছি দেখেছিলাম আমি তখন—নীল নীল, বড় বড়, হাজার হাজার...জঘন্য, বীভৎস! কোত্থেকে যে এল!’

নীরবতা।

রানা কিছু বলছে না, তাকিয়ে আছে রাউনুর দিকে।

রাউনু, বরাবরের মতো, দেখছে ছাদের ফুটো।

কিছুক্ষণ পর সে বলল, ‘পালিয়ে গিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিই আমরা। অনেক আগে থেকেই ভয় পেতাম জঙ্গলটাকে, কিন্তু তখন জাপানিদেরকে তুলনামূলকভাবে বেশি ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল। খেয়ে না-খেয়ে কোনওরকমে কাটিয়ে দিই প্রায় এক সপ্তাহ। তারপর বুঝতে পারি, বাঁচতে হলে নিজেদের ভিটেমাটির চিন্তা বাদ দিয়ে আশ্রয় খুঁজতে হবে অন্য কোনও গ্রামে। চলে এলাম নতুন একটা জায়গায়। এমন সময় দ্বীপে হামলা চালাল আফ্রিকানরা।’

রানা বলল, ‘আপনাদের সেই গ্রামটা...ওটার কী হলো পরে?’

‘কী আর হবে? বছরের পর বছর ধরে জনমানবহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে থাকতে একসময় জঙ্গলেরই অংশ হয়ে গেল ওটা।

ওই ঘটনার অনেক পরে আমি মাত্র একবার গিয়েছিলাম সেখানে, গাছপালার ফাঁকফোকরে ভাঙাচোরা কুঁড়েগুলো খুঁজে পেতে কষ্টই হয়েছিল।'

'আচ্ছা, দৈত্যদেবতাদের সেই সীমান্ত...ওটা ঠিক কোথায়, বলবেন?'

বুকটা আবার উঠতে-নামতে শুরু করল রাউনুর, কাশতে কাশতে কী যেন বলল সে ওর নেশাখোর ছেলের উদ্দেশে, একইসঙ্গে কাঁপা কাঁপা হাতের ইশারায় চলে যেতে বলছে রানাকে।

উঠে দাঁড়াল রানা। 'অন্তত এটা বলে দিন এখান থেকে ঠিক কোন্‌দিকে কতদূর গেলে আপনাদের সেই গ্রামে হাজির হওয়া যাবে।'

কাশির দমক বাড়ল রাউনুর, কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসার চেষ্টা করছে সে, কিন্তু পারছে না ঠিকমতো। ওকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে গেল ওর ছেলে, বাপের মতো সে-ও হাতের ইশারায় বেরিয়ে যেতে বলছে রানাকে।

অশীতিপর লোকটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বাইরে চলে এল রানা।

যাকে বলে কাঠফাটা রোদ, আবহাওয়ার ঠিক সেই অবস্থা এখন। একটুখানি বাতাস বইলে চুলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকার মতো অনুভূতি হয়। তারপরও, রাউনুর ঘরের ভেতরের গুমট অবস্থার চেয়ে বাইরেটা ভালো।

আপাতত আর কিছু করার নেই ধরে নিয়ে ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েছিল রানা, রাউনুর ঘর থেকে লোকটার ছেলে বেরিয়ে এল এমন সময়। পিজিন ভাষায় খাসিকে ডাকছে সে পেছন থেকে, কী নিয়ে যেন মৃদু বচসা হচ্ছে দু'জনের মধ্যে।

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, ঘুরল।

তর্কাতর্কি শেষ হলো কিছুক্ষণের মধ্যেই, রানার দিকে একবার তাকাল খাসি, তারপর যেন হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে মানিব্যাগ

বের করে কিছু টাকা দিল রাউনুর ছেলের হাতে। ওগুলো পাওয়ার পর অকৃত্রিম খুশি দেখা দিল লোকটার চেহারায়।

অসুস্থ এবং মৃত্যুপথযাত্রী বাপকে পুঁজি করে টাকা খেল লোকটা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উল্টো ঘুরল রানা।

রিচার্ডের অফিসে ফিরে আসতে আসতে দুপুর গড়িয়ে গেল ওদের। একসঙ্গে লাঞ্চ সারতে বসল রিচার্ড, খাসি, ফুগুই আর রানা। সার্জেন্টকে দেখে কিছুটা হলেও অপ্রস্তুত হয়ে গেছে রানা, কারণ লোকটাকে আশা করেনি সে এখানে।

খেতে খেতে রানার কাছ থেকে সব শুনল রিচার্ড।

'আশাব্যঞ্জক,' বলল রিচার্ড, 'স্বীকার করতেই হবে আমাকে। তবে ছোটখাটো কিছু সমস্যাও আছে। যেসব গুহার ইঙ্গিত দিয়েছে রাউনু, যতদূর জানি, পুরো এলাকাই জঙ্গলে ভরা। ওখানকার একটা গুহারও কোনও ম্যাপ নেই কারও কাছে। যেহেতু লোকবসতি নেই ওখানে, সাপবিচ্ছু থাকার সম্ভাবনা...ধরে নিন...শতকরা এক শ' ভাগ। কথা আরও আছে। রাউনু বলেছে, কাঠের বাক্সগুলো নিয়ে যাওয়া হয়েছে গুহার দিকে, তারপর হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে ওদের গ্রামে। এরপর যে বাক্সগুলো সরিয়ে ফেলা হয়নি, জানছি কী করে? তা ছাড়া...ওই বাক্সগুলোর ভেতরেই যে রাজা শামানের গুপ্তধন ছিল, সে-ব্যাপারেও কিন্তু কোনও নিশ্চয়তা নেই। কাজেই, জেলেপাড়ায় গিয়ে ভাউযাকে চেপে ধরার পর যে-অবস্থা ছিল আমাদের, এখনও তা-ই আছে; উল্লেখ করার মতো কোনও অগ্রগতি হয়নি। এত জল গড়িয়ে যাওয়ার পরও আমরা এখনও জানি না, ঠিক কোত্থেকে শুরু করতে হবে গুপ্তধন উদ্ধার অভিযান।'

রানা কিছু বলল না।

'কিছু বলছেন না যে?' যেন তাগাদা দিল রিচার্ড।

পানির গ্লাসটা নিজের দিকে টেনে নিল রানা, কিছুটা পানি

খেয়ে নামিয়ে রাখল সেটা। 'বলছি না, কারণ বলার মতো কিছু নেই। ভাবতে হবে আমাকে। সময় লাগবে তাতে।'

সারা ঘরে পিনপতন নীরবতা।

রিচার্ড, খাসি আর ফুগুই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। রানাও নির্নিমেষ দেখছে ওদেরকে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফুগুই। 'আপনি মানুষটা রহস্যময়। মানুষকে ধাঁধায় ফেলে দিতে পছন্দ করেন।'

'না, ধাঁধা না,' এতক্ষণ পর মুখ খুলল রিচার্ড, 'মিস্টার রানা আসলে দেরি করিয়ে দিতে চাচ্ছেন আমাদের। ঠিক না?'

'সে-ব্যাপারে কিছু তথ্যউপাত্ত আছে মনে হয় তোমাদের কাছে?' রানার কণ্ঠে উপহাস।

'হ্যাঁ, আছে,' জবাব দিল রিচার্ড। 'ইচ্ছা করলেই রাউনুর ছেলের সঙ্গে কথা বলে আসতে পারতেন আপনি। কিন্তু তা করেননি।'

'ইচ্ছা করলে আমাকে বাদ দিয়ে তোমরাই তো খুঁজে বের করতে পারো রাজা শামানের গুপ্তধন,' বলল রানা। 'করছ না কেন?'

'ভুল বললেন,' মাথা নাড়ল রিচার্ড। 'আপনাকে বাদ দিয়ে কাজটা করতে পারি না বলেই আজ আমাদের সঙ্গে বসে লাঞ্চ খাচ্ছেন আপনি। যা-হোক, কাজের কথায় আসি। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানানো হচ্ছে আপনাকে, হোটেলরুম থেকে উধাও হয়ে গেছে আপনার পাসপোর্ট। বাংলাদেশ থেকে কয়েকদিনের জন্য এ-দ্বীপে বেড়াতে এসেছেন আপনি; পাসপোর্ট না থাকলে ফিরে যাবেন কী করে, বলতে পারেন?' হা হা করে হেসে উঠল হঠাৎ। 'দেরি করিয়ে দিতে চাইছিলেন না আমাদের? সেক্ষেত্রে আমরাই আপনাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ইসাটাবুতে রেখে দিলাম।'

'ভালই হলো,' হাসল রানা, 'তা হলে দেখা যাচ্ছে, দেরি করা বা করানো আমাদের উভয়ের ইচ্ছাতেই হচ্ছে।' এক ঢোক পানি খেয়ে নিয়ে আবার বলল, 'গুপ্তধনের ব্যাপারে যা বললে, তোমার

সঙ্গে একমত আমি—আশাব্যঞ্জক, কিন্তু সমস্যা আছে। আর হ্যাঁ, রাউনুর ছেলেকে ওর বাপের আদিনিবাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারতাম অবশ্যই, কিন্তু সমস্যা ছিল তাতে। ধরো আমাদেরকে সেখানে নিয়ে যেত লোকটা। কিন্তু তারপর? তারপর কোথায় যেতে হবে, সে-দিকনির্দেশনা দেবে কে?'

চুপ করে রইল রিচার্ড। ফুগুইও কিছু বলছে না। "হাতি-ঘোড়া গেল তল, খাসি বলে কত জল" জাতীয় নতুন কোনও কথা চালু হয়ে যাওয়ার ভয়ে খোদার-খাসিও মুখ খুলছে না সম্ভবত।

চেয়ারে হেলান দিল রানা, কিছুক্ষণ পর বলল, 'রিচার্ড, তোমার লোকদের বলো ওরা যাতে সহিসালামতে হোটেলে পৌঁছে দেয় আমাকে। ভাবনাচিন্তা করার জন্য সময় চাই আমি। আজকের মতো অনেক কাজ করেছি, আর নয়।'

ওর দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রিচার্ড। তারপর বলল, 'তারমানে, আমরা কি ধরে নিতে পারি, আমাদেরকে অসহযোগিতা করার ইচ্ছা আসলেই আছে আপনার মনে?'

'এখানে ধরে নেয়ানেয়ির কিছু নেই,' উঠে দাঁড়াল রানা। 'আসলেই আমি সাহায্য করতে চাই না তোমাদেরকে।'

চব্বিশ

গিযবর্ন, নিউযিল্যাণ্ড।

নিজের ইয়টের দিকে তাকানোমাত্র ভ্রূ কুঁচকে গেল অ্যালবার্ট পামারের। ওর থেকে কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে সেটার ক্যাপ্টেন। সুন্দরী মেয়েদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেভাবে নজর

বোলায় পামার, সেভাবে দেখছে ইয়টটা; এবং যত দেখছে ওর ভ্রূ তত কুঁচকে যাচ্ছে যেন। রোদ প্রতিফলিত হচ্ছে জলযানটার গায়ে; প্রতিফলনটা কখনও কখনও এত তীব্র হচ্ছে যে, মনে হচ্ছে রোদ পড়ছে আয়নায়।

সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে গিয়েছিল পামার, মেরুদণ্ড সোজা করল। 'কই, কিছুই তো হয়নি!' অভিযোগের সুরে বলল পাশে-দাঁড়ানো লোকটার উদ্দেশে। 'কাজ করানোর জন্য কোত্থেকে যে চোর-বাটপার ধরে নিয়ে আসো তুমি, বুঝি না!'

'স্যর, গতবার যারা পলিশ করেছিল, তাদের কাজও পছন্দ হয়নি আপনার। বাধ্য হয়ে নতুন লোক আনতে হয়েছে এবার। তা ছাড়া, এবার লোক বাছাইয়ের দায়িত্ব নিইনি আমি, আপনার এক বন্ধুই করেছেন সেটা। এবং আগেই বলেছেন তিনি, যাদেরকে পাঠাচ্ছেন তাদের কাজে কেউ কখনও খুঁত ধরতে পারেনি।'

চটে উঠে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল পামার, ওর মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল এমন সময়। পকেট থেকে ওটা বের করে স্ক্রিনের দিকে তাকানোমাত্র আরও কুঁচকে গেল ওর ভ্রূ। ক্যাপ্টেনকে বলল, 'একটু নিরালায় কথা বলতে চাই আমি। প্রাইভেট কল।'

'জী, স্যর।'

ক্যাপ্টেন যথেষ্ট দূরে চলে যাওয়ার পর কলটা রিসিভ করল পামার। 'ঈশ্বর কি তোমাকে ধৈর্য বলে কিছু দেননি? এতবার তোমাকে নিষেধ করেছি আমার মোবাইলে কল দেবে না, একবারও যদি শোনো! আমি কি ব্যক্তিগত কাজে অফিস থেকে একটু বাইরেও বের হতে পারব না?'

'ব্যক্তিগত কাজ?'

ইয়ট পলিশের নমুনা দেখে এমনিতেই মেজাজ বিগড়ে ছিল পামারের, প্রশ্নটা শুনে আগুনে ঘি পড়ল যেন। 'তোমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে নাকি আমাকে?'

ওপ্রান্তে কিছুক্ষণের নীরবতা। তারপর বলা হলো, 'আমরা আরও রক্তপাত ঘটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কারণ যা চাইছি, রক্তপাত ঘটানো ছাড়া তা অর্জন করা যাবে না। এবং সেজন্য যত দূর পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হবে আমাদের পক্ষে, যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'ইতোমধ্যে অনেক হয়েছে রক্তপাত। দুই দলের কয়েকজন কর্মী মরেছে, এইড ওয়ার্কার মরেছে। লাভ হয়েছে কোনও?'

'হয়নি? নির্বাচন কি পেছাতে পারিনি আমরা? সোগাভের যদি নতুন মেয়াদের জন্য ক্ষমতায় আসতেন, খনিজসম্পদ রাষ্ট্রীয়করণের দাবি তোলা যেত? গোটা প্রশাসন ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা ছিল তাঁর, দুর্নীতিবাজ অফিসারদের শেকড় ধরে টান মারার ইচ্ছা ছিল; তিনি যদি কাজটা করতে পারতেন তা হলে আমাদের অবস্থা কী দাঁড়াত?'

'বোধহয় ভুলে যাচ্ছ, দ্য মিউটিনিয়ার্সকে ইতোমধ্যেই জঙ্গিবাহিনী হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। নড়েচড়ে বসেছে আন্তর্জাতিক মিডিয়া, মাথাব্যথা শুরু হয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া-নিউযিল্যাণ্ডের মতো দেশগুলোর।'

'আমাদের হাতে বিকল্প কোনও উপায় নেই, পিছিয়ে আসারও সুযোগ নেই। শামানের গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারি বা না-পারি, আগামী মেয়াদের জন্য কিছুতেই ক্ষমতায় আসতে দেয়া যাবে না সোগাভের সরকারকে। এবং এখানকার রাজনীতির ছক উল্টে দেয়ার পরিকল্পনাটা কিন্তু...'

'আমারই ছিল, সেটাই তো বলবে? ঠিক আছে, যা ভালো বোঝো করতে থাকো তা হলে।'

'খুশিতে বগল বাজাচ্ছেন সোগাভের—তাঁর রয়্যাল পুলিশ একটা সম্ভাব্য দাঙ্গা ঠেকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। এই সুযোগে নিজের স্বার্থটা কীভাবে আরও ভালোমতো হাসিল করে নেয়া যায়, সে-ছক কষতে শুরু করে দিয়েছেন তিনি। এবং দাঙ্গা লাগতে যাচ্ছিল কেন, সে-ব্যাপারে ঢিলেঢালা তদন্তও করছেন গোপনে

বইঘর.কম

গোপনে—আসল উদ্দেশ্য এখানে আমাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু ওরওয়েন ঝনয়াকে ফাঁসানো। তাঁর মতো একজন ধুরন্ধর মানুষকে সময় ও সুযোগ দেয়ার মানে হচ্ছে, সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে অপেক্ষা করা, কখন ছেঁকে ধরে হাঙরের পাল।'

'ঠিক আছে, রাখছি তা হলে, এসব কথা মোবাইলে আলোচনা করা ঠিক না।'

বিদায় না জানিয়েই লাইন কেটে দেয়া হলো ওপ্রান্ত থেকে।

কান থেকে সরিয়ে মোবাইল ফোনটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল পামার, মাথা নাড়ছে আস্তে আস্তে।

ওর কথা শেষ হয়েছে বোঝার পর পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়াল ইয়টের ক্যাপ্টেন। 'স্যর...'

হাত তুলে লোকটাকে থামিয়ে দিল পামার, ওর কোনও কথা শুনতে ইচ্ছা করছে না এখন। 'বাদ দাও। ইয়টের ব্যাপারে পরে কথা বলব আমরা।' হাঁটতে শুরু করল ডক এরিয়া ধরে, কিছুদূর গিয়ে সাগরের দিকে মুখ করা একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ল, বসে পড়ল এককোনায়। কফির অর্ডার দিল।

খেলাটা শুরুতে যত সহজ মনে করেছিল সে, এখন, কেন যেন, তত সহজ মনে হচ্ছে না ওর কাছে। কেন যেন বার বার মনে হচ্ছে, ছন্দপতন হয়েছে, এবং সেটা বড় রকমের। যদিও আপাতদৃষ্টিতে বড় বলে মনে হচ্ছে না, কিন্তু আরও সময় গেলে হয়তো দেখা যাবে, ছিঁড়ে গেছে বাদ্যযন্ত্রের কয়েকটা তার।

কেন এ-রকম হলো? হঠাৎ এমন কী হলো, যার কারণে বেসুরো ঠেকছে সবকিছু?

কফির কাপে চুমুক দিতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে টের পেল পামার, যাকে কখনও দেখেওনি, সেই মাসুদ রানার কথা কেন যেন ঘুরপাক খাচ্ছে ওর মগজে।

চোখ দুটো কখন লেগে এসেছিল রেমির, বলতে পারবে না নিজেও। ঘুমটা ভেঙে গেল দরজা খোলার আওয়াজে। ওর

"বন্দিশালায়" ঢুকছে কেউ।

দুপুরে কিছু খায়নি রেমি, খেতে ইচ্ছা করছিল না। যেভাবে রেখে যাওয়া হয়েছিল, খাবারের প্লেটটা সেভাবেই পড়ে আছে টেবিলের ওপর। খায়নি, কারণ সারাক্ষণ শুধু দুশ্চিন্তা করেছে সে। ভেবেছে ইটের কথা, ভাউযার কথা, নিজের কথা। আর ভেবেছে মাসুদ রানাকে নিয়ে—আর কখনও কি দেখা হবে লোকটার সঙ্গে? আর কখনও কি একসঙ্গে নামা হবে সলোমন সাগরের পানিতে? আর কখনও কি গুণ্ডারা ধাওয়া করবে ওকে, আর ওকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুৎ খেলে যাবে মানুষটার শরীরে?

উঠে বসল রেমি।

সাধারণত একজন মাত্র লোক আসাযাওয়া করে এই কামরায়, এখন আসেনি সে। ওর বদলে ঘরে ঢুকেছে তিনজন—কাউকেই চেনে না রেমি। কাছে এগিয়ে আসছে লোকগুলো, জ্বলজ্বলে নির্নিমেষ দৃষ্টি তিনজনের চোখেই। ঠোঁটের কোনায় বাঁকা হাসি। একজনের হাতে একটা ভয়ঙ্কর মাচেটি।

হঠাৎ করেই টের পেল রেমি, ওর বুকের ভেতরে পাগলের মতো লাফাতে শুরু করেছে হৃৎপিণ্ডটা।

ওর চৌকির কাছে এসে থামল তিন গুণ্ডা। হাফপ্যান্টের পকেট থেকে মোবাইল বের করল একজন। ফোন করল কাকে যেন। একটা কথাও বলল না, একটা শব্দও উচ্চারণ করল না; ওপ্রান্ত থেকে যা বলা হলো ওকে, মনোযোগ দিয়ে শুনে গেল শুধু। যখন লাইন কেটে দেয়া হলো ওপ্রান্ত থেকে, মোবাইলটা জায়গামতো ঢুকিয়ে রাখল সে। তারপর তাকাল ওর পাশে দাঁড়ানো মাচেটিছাড়া লোকটার দিকে, ঘাড় ঘুরিয়ে ইশারা করল।

বলিষ্ঠ পদক্ষেপে রেমির দিকে এগিয়ে গেল লোকটা, কোনও কথা না বলে চেপে ধরল মেয়েটার টিশার্টের গলার কাছটা, হ্যাঁচকা টান মেরে চৌকির কিনারায় নিয়ে এল মেয়েটাকে। কিন্তু যা লোকটা কল্পনাও করতে পারেনি, সে-রকম একটা ঘটনা ঘটে গেল। এবং ঘটনাটা কীভাবে ঘটাল রেমি, তা সে বলতে পারবে

বইঘর.কম

না নিজেও।

ধাঁই করে একটা লাথি মেরে বসেছে মেয়েটা লোকটার দুর্বল অঙ্গে।

একটা বোবা আওয়াজ বেরিয়ে এল লোকটার গলা দিয়ে, তলপেটের নিচটা চেপে ধরে উবু হয়ে শুয়ে পড়ল সে মেঝেতে, চোখে পানি এসে গেছে।

তিন গুণ্ডার মধ্যে যে-লোকটা নেতা, প্রচণ্ড রেগে গেল সে, এগিয়ে গেল রেমির দিকে। কাছে গিয়ে ঠাস্ করে চড় মারল ওর গালে, জবাবে রেমি আবারও পা তুলতে যাচ্ছে দেখে বিরাশি সিক্কার একটা ঘুসি বসিয়ে দিল ওর নাকেমুখে।

ছিটকে চৌকিতে পড়ে গেল মেয়েটা। ওই অবস্থাতেই ওকে আরও একবার ঘুসি মারল নেতা। চুলের মুঠি ধরে টেনে বসাল, তারপর মারল তিন নম্বর ঘুসিটা। টেনেহিঁচড়ে রেমিকে মেঝেতে নামাল সে, পেছন থেকে একহাতে কোমর জড়িয়ে ধরে একঝটকায় শূন্যে তুলে ফেলল মেয়েটাকে, ওই অবস্থাতেই খালি হাতটা দিয়ে চতুর্থ ঘুসিটা মারল মেয়েটার একটা কানের ওপর।

গোপন অঙ্গে লাথিখাওয়া লোকটা সামলে নিতে পেরেছে কিছুটা, নিজের দুই হাত দিয়ে রেমির ডানহাতটা ধরল সে সর্বশক্তিতে। ততক্ষণে রেমিকে পেঁচিয়ে ধরে রাখা লোকটা এগোতে শুরু করেছে টেবিলের দিকে। কাছে পৌঁছে আছড়ে ফেলল সে রেমিকে টেবিলের ওপর, অন্য লোকটা টান মেরে মেলে ধরল রেমির ডান হাতটা।

ওদের কাজে বাধা দেয়ার মতো শক্তি তখনও ফিরে পায়নি রেমি।

মাচেটিওয়ালা লোকটা নীরব দর্শকের মতো এতক্ষণ দেখছিল সব, এবার এগিয়ে এল সে।

কে যেন জোরে থাবা দিয়েছে দরজায়।

ঘুম ভেঙে গেল রানার। বালিশের নিচে হাত ঢুকাতে গিয়ে

মনে পড়ে গেল, কোনও লাভ নেই। হাতটা সরিয়ে নিয়ে উঠে বসল ও।

আজও অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে। অনতিদূরের জঙ্গলের পাখিদের কিচিরমিচির বলে দিচ্ছে, সন্ধ্যা হতে বেশি বাকি নেই। বিছানা ছাড়ল রানা, লাইট জ্বালিয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে, খুলল।

কেউ নেই।

ভ্রূ কুঁচকে গেল ওর। উঁকি দিল বাইরে, করিডোরের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত দেখল।

কেউ নেই।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে দরজাটা লাগিয়ে দিতে যাচ্ছিল রানা, পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা বাক্স দেখতে পেয়ে থমকে গেল। সাধারণত এনগেজমেন্টের আংটি রাখা হয় এ-রকম বাক্সে।

এনগেজমেন্টের আংটি?

ইসাটাবুতে কার সঙ্গে মনের দেয়ানেয়া হয়েছে রানার? উবু হয়ে বাক্সটা তুলে নিল ও। পিছিয়ে এসে লাগিয়ে দিল দরজা, ফিরে গিয়ে বসল বিছানায়। ডালা খুলল।

সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের খাঁচায় জোরে বাড়ি মারল হৃৎপিণ্ডটা।

খুব সম্ভব কোনও মেয়ের, ডান হাতের কড়ে আঙুলটা শুয়ে আছে বাক্সের ভেতর তুলোর বালিশে। রক্তে অনেকখানি ভিজে গেছে বালিশটা। আঙুলটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর রানা টের পেল, অদ্ভুত এক আবেগে কাঁপতে শুরু করেছে ওর শরীর।

বাক্সটার ভেতরে, ডালার সঙ্গে ছোট্ট একটা পিন দিয়ে আটকানো অবস্থায়, একটা ভিযিটিং কার্ড দেখা যাচ্ছে।

বিছানার ওপর নামিয়ে রাখল রানা বাক্স, কাঁপা কাঁপা হাতে আলগা করল পিন, খুলে নিল কার্ডটা। যার কার্ড, তার নাম-ঠিকানা লেখা আছে পিজিন ভাষায়, কাজেই পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হলো না রানার পক্ষে। কার্ডটার উল্টোপিঠে কিছু লেখা আছে কি না জানার জন্য সেটাকে উল্টো করে ধরল ও।

ছোট ছোট করে, পেঁচানো হস্তাক্ষরে ইংরেজিতে লেখা আছে:

আপনি আমাদেরকে সন্দিহান করেছেন, এটা সেইজন্য। আপনি আমাদের দেরি করিয়ে দিতে চেয়েছেন, এটা তার বদলা। আপনি অসহযোগিতা করার কথা সরাসরি বলেছেন আমাদেরকে, এটা তার শাস্তি। মিস্টার রানা, কেউ কেউ আছে, শেষবিচারের কথা জানে নিশ্চিতভাবে, কিন্তু ঈশ্বরকে ভুলে থাকে বেমালুম। আপনি কি তাদের মতো? আপনার কি চিন্তাভাবনা করা শেষ হয়েছে? কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটানা কাজ করতে কি রাজি আছেন আপনি? রেমি তানাঘাইয়ের দু'হাতে এখনও আরও ন'টা আঙুল বাকি আছে—কথাটা মাথায় রেখে প্রশ্নগুলোর জবাব দেবেন আশা করি।

কার্ডটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা; টের পাচ্ছে, ওর ভেতরে যেন গর্জন করছে কোনও বুনো জন্তু। টুকিটাকি কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস ঢুকিয়ে নিল ও শার্ট আর প্যান্টের পকেটে, তারপর বেরিয়ে এল করিডোরে। দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে প্রায় ছুটে নামতে শুরু করল সিঁড়ি দিয়ে। লবিতে পৌঁছে দেখল, আগের সোফায়, আগের ভঙ্গিতে বসে আছে খাসি, তবে ঘুমাচ্ছে না, কান চুলকাচ্ছে।

ওর দিকে রানাকে তেড়ে আসতে দেখে, যে হাত দিয়ে কান চুলকাচ্ছিল লোকটা, সেটা অবশের মতো স্থির হয়ে গেল।

খাসির কাছাকাছি পৌঁছে লোকটাকে শরীরের সব শক্তি দিয়ে লাথি মারার জন্য ডান পা-টা উঠে গিয়েছিল রানার, শেষমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিল ও। বলল, 'রিচার্ডের কাছে নিয়ে চল্ আমাকে, কুত্তার বাচ্চা!'

'আমি জানতাম আপনি আসবেন,' হাসছে রিচার্ড, কিন্তু সে-হাসি স্পর্শ করেনি ওর চোখ দুটোকে। ওর ডান হাতে একটা রিভলভার। 'নিজের জন্য তেমন কোনও দরদ নেই আপনার, জানি আমরা, কিন্তু আশা করি, অন্তত রেমির কথা ভেবে কোনও

পাগলামি করবেন না।'

'মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি,' রিচার্ডের মুখোমুখি বসে পড়ল রানা, নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে কষ্ট হচ্ছে ওর।

'পারতেন। কথা বলতে পারতেন, যদি আমাদের চাহিদামতো কাজ করতেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি, আমাদের চাহিদা পূরণ করতে পারেননি আপনি।'

'মেয়েটার সঙ্গে কথা না বলে...'

'কিছুই করবেন না, তা-ই তো? ঠিক আছে, মেগুনায় ফিরে যান তা হলে। কথা দিচ্ছি, আগামী ন'ঘণ্টায় আরও ন'টা বাক্স উপহার পাবেন আমাদের পক্ষ থেকে। যে-মেয়ে আপনার ভাবী না, তার জন্য এত দরদ কেন আপনার?'

রানা কিছু বলছে না। বার বার ফুলে উঠছে ওর চোয়ালের হাড়। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রিচার্ডের দিকে।

'শেষবিচার চলছে আপনার, মিস্টার রানা,' বলল রিচার্ড, বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা কয়েকবার ঠুকল নিজের বুকে। 'এ-অবস্থায় আমাকে ঈশ্বর মানতেই হবে আপনার।'

'এইচ. জি. ওয়েলসের "দ্য আইল্যাণ্ড অভ ডক্টর মোরো" বইটা পড়েছ?' আশ্চর্য শান্ত শোনাল রানার কণ্ঠ।

হা হা করে হেসে উঠল রিচার্ড। 'বিশ্বাস করুন, আপনার পক্ষ থেকে ও-রকম কোনও উক্তিরই অপেক্ষায় ছিলাম আমি। ...ডক্টর মোরো'র পরিণতির প্রতি ইঙ্গিত করছেন নিশ্চয়ই?'

'তোমারও একই হাল হবে।'

'দেখা যাবে। কাজের কথায় আসুন। শামানের গুপ্তধন চাই আমি—যত জলদি সম্ভব।'

'ইণ্টারন্যাশনাল কল করার সুবিধা আছে তোমার মোবাইলে?'

'আছে। আমাকে মাঝেমধ্যেই ইণ্টারন্যাশনাল কল করতে হয়...' রানাকে হাত বাড়াতে দেখে থেমে গেল রিচার্ড।

'দাও।'

'কার সঙ্গে কথা বলবেন?'

বইঘর.কম

‘জেনে কাজ নেই তোমার। মোবাইলটা দাও।’

‘কিন্তু...’

‘ইংরেজিতে বলব, নিজের কানেই শুনতে পাবে উল্টোপাল্টা কিছু বেরোয় কি না আমার মুখ দিয়ে।’

মোবাইলটা রানাকে দিল রিচার্ড। রায়হানকে ফোন করল রানা। দু’বার রিং হওয়ার পর ধরল রায়হান। ‘হ্যালো?’

‘মাসুদ রানা স্পিকিং।’

‘মাসুদ ভাই!’ রায়হানের কণ্ঠ শুনে মনে হলো, যেন অনেকদিন পর কথা বলছে রানার সঙ্গে।

‘আই নিড টু টক টু ইউ ইন ইংলিশ,’ বলল রানা।

‘অসুবিধা নেই। কিন্তু এটা কোন্ নম্বর? আপনার স্যাটেলাইট...’

‘এটা এখানকার এক লোকের। আর আমার স্যাটেলাইট ফোনটা বিগড়ে গেছে বলেই এই নম্বর থেকে কল করতে হয়েছে তোমাকে। যা-হোক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইসাটাবুতে থাকা জাপানিদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাই আমি। ওদেরকে ফেরত পাঠানোর কাজ শুরু হওয়ার আগে এখানে...কী বলব...অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনওকিছু ঘটেছিল কি না, জানতে চাই। উঁ...ধরো...শেষ চার কি পাঁচ মাসের কথা বলতে পারলেই চলবে।’

‘শেষ চার কি পাঁচ মাসের কোন্ কথা?’

রাউনু’র কাছ থেকে যা যা জানতে পেরেছে, সব বলল রানা রায়হানকে। তারপর বলল, ‘চেষ্টা করে দেখো দাসত্ব বা গোপন পরীক্ষার ব্যাপারে কিছু জানা যায় কি না। আসলে...তোমার জন্যে হয়তো কষ্টকর হয়ে যাবে, কিন্তু...’

‘অসুবিধা নেই, মাসুদ ভাই। জাপানি কর্নেলের নামটা যেন কী বললেন?’

‘কামাসাকু। এই লোকটার ব্যাপারে যা যা জানতে পারবে, সব জানাবে আমাকে। ভালো হয় যদি বিস্তারিত লিখে মেইল

পাঠাতে পারো বাংলায়।'

'ঠিক আছে।'

'রাখছি তা হলে,' লাইন কেটে দিয়ে মোবাইলের কললিস্টে চলে গেল রানা, ডিলিট করে দিল রায়হানের নম্বর। সেটটা ফিরিয়ে দিতে দিতে রিচার্ডকে বলল, 'সন্তুষ্ট?'

'সন্তুষ্ট মানে? এখন যদি আপনি আমাকে বলেন আপনাকে কোথাও নিয়ে গিয়ে নিজের পকেটের টাকা দিয়ে ডিনার করাতে, তাতেও রাজি আছি।'

'রেইন ট্রি?'

'কবুল।'

'সেখানে খেতে খেতে তোমার দ্য মিউটিনিয়ার্সের আদ্যোপান্ত যদি জানতে চাই, বলবে?'

'অবশ্যই বলব। কারণ শেষবিচার চলছে আপনার, সেটা শেষ হলে নরক ছাড়া অন্য কোথাও যেতে পারেন না আপনি, তার আগে আপনার মনের একটা খায়েশ পূরণ করাটা আর কী এমন আমার জন্য? তা ছাড়া, আমার কথাগুলো শুনতে পারবেন আপনি শুধু, আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবেন না কোথাও।'

'ঠিক,' উঠে দাঁড়াল রানা।

পঁচিশ

উইলিয়াম জেমার্ক রিপাবলিকান দলের একজন প্রভাবশালী নেতা এবং দেশের খনিজসম্পদ মন্ত্রী। অনেকেই বলে, প্রধানমন্ত্রী সোগাভেরের চেয়ে তাঁর জনপ্রিয়তা অনেক বেশি। তাঁর জন্য জান দিয়ে দিতে রাজি আছে এ-রকম অন্ধ অনুসারীর সংখ্যাও নেহাত

কম নয়। কারণ ত্যাগী ও আদর্শবাদী মানুষ বলতে যা বোঝায়, জেমার্ক ঠিক তা-ই। কেউ প্রমাণ করতে পারবে না, আজ পর্যন্ত কোনও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়েছেন তিনি কখনও। তাঁর কাছে আগে দেশ, তারপর দল, তারপর ব্যক্তিস্বার্থ। তাই, দল ও সরকারের কোনও কোনও প্রভাবশালী নেতা যখন প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে তাঁকে বলেন, দেশের খনিজসম্পদ উত্তোলন ও বিপণনের কাজটা রাষ্ট্রীয়করণ করে ফেলা উচিত, তিনি তখন সোচ্চার থাকেন বিদেশিদের পক্ষেই—না, নিজের কোনও স্বার্থ হাসিলের জন্য না, বরং সরকারি কোষাগারে জমা-হওয়া মোটা ট্যাক্সের কথা ভেবে। শুধু তা-ই না, দেশের আরও উন্নতির জন্য এখানে আরও বিদেশি বিনিয়োগের পক্ষপাতী তিনি। তাঁর এই ভালোমানুষি ইমেজকে সমঝে চলেন এমনকী সোগাভেরও।

এ-মুহূর্তে জেমার্ক আছেন নিজের বাসায়, কিচেন টেবিলে, ডিনার শেষ করেছেন কিছুক্ষণ আগে। ডিনারের পর এক কাপ কফি খাওয়া তাঁর অনেকদিনের অভ্যাস। কাপে শেষবারের মতো চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখলেন পিরিচের ওপর, থালাবাসন ধুতে থাকা স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসলেন। 'চমৎকার হয়েছে রান্না। থ্যাঙ্ক ইউ।'

বিয়ে করেছেন আঠারো বছর, প্রতিটা রাতে একই কথা বলেছেন জেমার্ক তাঁর স্ত্রীকে। এবং প্রতিবারই আন্তরিকভাবে।

'ওয়েলকাম,' কাজ করতে করতেই জবাব দিলেন তাঁর স্ত্রী। 'আরেক কাপ কফি খাবে?'

'না। প্রধানমন্ত্রীর ভবনে ডাক পড়েছে আমার। আমার সঙ্গে নাকি জরুরি কথা আছে তাঁর।'

'ফিরবে কখন? বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে গেছে তোমার ছেলে, বলে গেছে ফিরে এসে নাকি তোমার-আমার সঙ্গে কেক কাটবে জন্মদিনের। আমাকে দিয়ে কেকও বানিয়ে রেখেছে।'

'ওহ্, কী মুশকিল...সোগাভেরের হুঁশ বলতে কিচ্ছু নেই...একবার কথা শুরু করলে আর থামতেই চান না...দেখি,

যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসার চেষ্টা করব। যদি বেশি দেরি হয়ে যায়, রনিকে বোলো, কেকটা যেন কেটে ফেলে।' উঠে দাঁড়ালেন জেমার্ক, কফির কাপপ্লেট হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলেন সিঙ্কের দিকে, স্ত্রীর হাতে দিলেন ওগুলো। ঝুঁকে চুমু খেলেন স্ত্রীকে। 'কী কেক?'

'মোচা। ওর খুব পছন্দের।'

'ছেলেটা দেখতে দেখতে কত বড় হয়ে গেল, না? এই না সেদিন বিয়ে করলাম আমরা! আসলেই, সময় যে কোন্‌দিক দিয়ে পার হয়ে যায়!'

'সেজন্যেই তোমার মতো কাজপাগল মানুষের বোঝা উচিত, কাজ কাজ করে মাথা খারাপ করা ঠিক না, জীবনটা বেশি লম্বা নয়। যত জলদি সম্ভব কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে এসে বউবাচ্চাকে সময় দিতে হয়। ...দেশ কি তোমার একার? সব চিন্তা কি শুধু তোমার?'

'আবারও? সুযোগ পাওয়ামাত্র শুরু হয়ে গেল! ঠিক আছে, বাবা, কথা দিলাম: যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব।'

'আচ্ছা, যাও তা হলে। আমি এই ফাঁকে গুছিয়ে রাখি রনির উপহারগুলো।'

কিচেন থেকে বেরিয়ে এলেন জেমার্ক; সোফার ওপর পড়ে আছে তাঁর স্যাচেলটা, এগিয়ে গিয়ে তুলে নিলেন সেটা। তারপর সদরদরজা খুলে বেরিয়ে এলেন পোর্চে।

একটা মাত্র সরকারি গাড়ি ব্যবহার করেন তিনি, সেটাতে ড্রাইভার বাদে থাকে এক দেহরক্ষী। পিছনে পুলিশের একটা জিপও থাকে, সেটার ভেতরে দু'-একজন পুলিশ। আসলে নিজের নিরাপত্তা নিয়ে মোটেও চিন্তিত নন জেমার্ক, তাঁর জনপ্রিয়তার ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন তিনি, বিশ্বাসই করেন না ইসাটাবুর কোনও মানুষ ক্ষতি করতে পারে তাঁর।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে গাড়ির দিকে এগোচ্ছেন তিনি, কাছেপিঠের জঙ্গল থেকে গর্জে উঠল একটা রাইফেল—পর পর দু'বার।

বইঘর.কম

তাঁর গাড়ির ভেতরে বসে তখন গল্প করছিল ড্রাইভার আর দেহরক্ষী, চমকে উঠল ওরা। পিস্তল বেরিয়ে এল দেহরক্ষীর হাতে, একদিকের দরজা খুলে বেরিয়ে পজিশন নিল সে গাড়ির আড়ালে। আর ড্রাইভার লোকটা নিজেকে স্রেফ উধাও করে ফেলল গাড়ির ভেতরে।

পুলিশের জিপের ড্রাইভার স্টিয়ারিঙে মাথা রেখে ঝিমাচ্ছিল, চমকে উঠে বসল সে পিঠ সোজা করে, কী করবে বুঝতে পারছে না। ওর সঙ্গী গিয়েছিল পেশাব করতে, কাজটা শেষ না করেই দৌড়ে চলে এল সে জেমার্কের সদরদরজায়।

দেখল, বুকের বাঁ দিকে দুটো গর্ত তৈরি হয়েছে জেমার্কের। নিষ্প্রাণ দুই চোখ খুলে তাকিয়ে আছেন তিনি আকাশের দিকে। রাস্তার ওপর পড়ে আছে তাঁর স্যাচেল—সোগাভেরের সঙ্গে যে-বিষয়ে আলোচনা করার কথা ছিল, তার কিছু সাপোর্টিং ডকুমেণ্ট আছে ওর ভেতরে।

বাড়ির ভেতর থেকে চিৎকার শোনা গেল এমন সময়। রনির উপহারের প্যাকেটগুলো ফেলে দিয়ে ছুটে আসছেন জেমার্কের স্ত্রী।

রেইন ট্রিতে ডিনার শেষ করে মেণ্ডানায় ফিরে এসেছে রানা। রুমে ঢুকে লাইট জ্বালিয়ে পুরো ঘরটা দেখল ও, বাথরুম আর বারান্দাটাও দেখল। থাই দরজা টেনে দিয়ে চালু করল এসি, ঘরের ভেতর কিছুক্ষণ পায়চারি করে সোফায় বসে খুলল কেডস আর মোজা।

নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেছে রিচার্ড, মন না চাইলেও ওর আনুগত্য স্বীকার করে নিতে হয়েছে রানাকে। এবং ওর এই নরম ভাব দেখে খুশি হয়েছে লোকটা, মন খুলে অনেক কথা বলেছে।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল রানা, ভেতর থেকে বের হলো ছোট্ট একটা রেকর্ডার। ওর ব্যাগের গোপন পকেটে ছিল ওটা। এই প্যাকেটে ভরে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল।

বন্ধ অবস্থায় প্যাকেটটা বার বার দেখেছে ওরা, সিগারেট বের করে টানতেও দেখেছে, কিন্তু নিছক একটা সিগারেটের-প্যাকেটের বেশি কিছু বলে অনুমান করতে পারেনি। এমনকী, আজ ডিনারের সময়, রিচার্ডের সঙ্গে কথোপকথন শুরু করার আগে, প্যাকেটটা পকেট থেকে বের করে যখন রেখে দিয়েছিল ও টেবিলের ওপর, তখনও কল্পনা করতে পারেনি রিচার্ড, প্যাকেটের ভেতরে চালু অবস্থায় আছে শক্তিশালী মাইক্রোফোন লাগানো একটা টেপ রেকর্ডার।

টেপ রেকর্ডার থেকে মিনি সাইযের ক্যাসেট বের করে হাসল রানা। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার চীফ যদি হাতে পায় এটা, দ্য মিউটিনিয়ার্সের শেকড় ধরে টান মারতে একটুও দেরি করবে না। কিন্তু এই মুহূর্তে উপযুক্ত কারও হাতে এটা তুলে দিতে পারছে না রানা। এটা ওকে রেখে যেতে হচ্ছে এমন কারও কথা ভেবে, যে রানাকে খুঁজতে আসবে ইসাটাবুতে।

ফ্যানের ব্লেডের ওপর রেখে দিল রানা মিনি টেপ রেকর্ডারটা। তারপর বেসিনের তাক থেকে ট্যালকম পাউডারের কৌটো তুলে নিয়ে ফিরে এসে বসল সোফায়। ক্যাপ খুলে ভেতরে চালান করে দিল ক্যাসেটটা। ক্যাপ লাগানোর আগে আঙুল চালিয়ে টের পাওয়ার চেষ্টা করল ভেতরে-রাখা কাগজের পাতাগুলো ঠিকঠাক আছে কি না।

আছে।

ক্যাপটা লাগিয়ে দিয়ে ক্যানটা আগের মতো করে ফেলে রাখল রানা, ফিরে এল বিছানায়।

মনে পড়ে যাচ্ছে এনগেজমেন্ট-আংটির বাক্সটার কথা, ভেতরের বালিশের ওপর পড়ে থাকা আঙুলটার কথা। মনে পড়ে যাচ্ছে রেমিকে। ইস্‌স্...আঙুলটা যখন কেটে ফেলা হয় মেয়েটার, কী কষ্টটাই না পেয়েছে সে! বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল রানার।

ডিনার শেষ করে রেইন ট্রি থেকে যখন বেরিয়ে আসছিল

আজ, খুশি খুশি দেখাচ্ছিল রিচার্ডকে, তারপর একটা কল আসে লোকটার মোবাইলে। ওটা রিসিভ করে অন্যপ্রান্তের কথা শুনে রীতিমতো উৎফুল্ল হয়ে ওঠে লোকটা। কথা ছিল, রানাকে নিয়ে ফিরবে সে নিজের অফিসে, রানার কোনও মেইল এসেছে কি না দেখবে। কিন্তু করেনি সে কাজটা, বরং তার বদলে কী এক জরুরি কাজের কথা বলে রানাকে পৌঁছে দিয়েছে হোটেলে, নিজে গাড়ি নিয়ে চলে গেছে আরেকদিকে।

কে ফোন করেছিল রিচার্ডকে? কোথায় গেছে সে? নতুন কী এমন হলো ইসাটাবুতে যে...

রানার মনে পড়ে গেল, এফএম রেডিয়ো আছে হোটেলের রেস্টুরেন্টে, এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটে থাকলে জানা যাবে ওখানে গেলেই।

নিচে নেমে এল রানা স্লিপার পায়ে দিয়ে। ইংরেজিতে ব্রেকিং নিউয জাতীয় কিছু একটা প্রচারিত হচ্ছে একটা চ্যানেলে—সংবাদ উপস্থাপকের ভঙ্গি শুনলে তা-ই মনে হয়, মনোযোগ দিয়ে খবরটা শুনল রানা:

'...খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে মিস্টার জেমার্ককে। ঘটনাস্থলে সে-সময় উপস্থিত থাকা মিস্টার জেমার্কের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী এবং রয়্যাল পুলিশের একজন সদস্য বলেছেন, তাঁদের সন্দেহ, হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়েছে রাইফেল। নিহতের স্ত্রী জানিয়েছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সোগাভেরের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যখন বের হচ্ছিলেন মিস্টার জেমার্ক, ওঁৎ পেতে থাকা আততায়ী তখনই হামলা চালায় তাঁর ওপর। যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নেয়া হয় তাঁকে, কিন্তু কর্তব্যরত ডাক্তার তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

'বিদ্রোহী বাহিনী এবং ইতোমধ্যেই জঙ্গি হিসেবে ঘোষিত দ্য মিউটিনিয়ার্স এই হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেছে। আমাদের চ্যানেলসহ আরও কয়েকটি এফএম চ্যানেলের কার্যালয়ে ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো বার্তায় ওরা বলেছে: যতদিন পর্যন্ত

ওদের দাবি পূরণ করা না হবে, অর্থাৎ যতদিন পর্যন্ত বিদেশিদের কাছ থেকে সলোমন দ্বীপপুঞ্জের খনিজসম্পদ উত্তোলন ও বিপণনের দায়িত্ব সরিয়ে নিয়ে তা দেশীয় কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করা না হবে, ততদিন পর্যন্ত এ-রকম হত্যাকাণ্ড চলতেই থাকবে একের পর এক। পাশাপাশি ওরা এ-ও দাবি করেছে, আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বে বিদেশিদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে, আগামী নির্বাচনের ফল কী হবে না হবে সে-ব্যাপারে বিদেশিদের মাথা ঘামানো চলবে না।

'ফিরে যাই মিস্টার জেমার্কের হত্যাকাণ্ডের খবরে। মিস্টার জেমার্ক নিজের জনদরদী ও সৎ ভাবমূর্তির জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর মতো এত বড় মাপের একজন মানুষকে যেভাবে অবলীলায় খুন করা হলো, সেখানে আমজনতার জীবনের নিরাপত্তা কোথায়, জানতে চেয়ে রাস্তায় নেমেছে শত শত জেমার্ক-অনুসারী। আমাদের রিপোর্টার নিশ্চিত করেছেন, হেণ্ডারসন ফিল্ডের কাছে রয়্যাল পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ চলছে ওদের। গতবারের সম্ভাব্য দাঙ্গা পরিস্থিতি সফলভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছিল পুলিশ; সেটা ছিল দু'জন বিদেশি এইড ওয়ার্কার আর কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মীর হত্যাকাণ্ডের ফলে উদ্ভূত, কিন্তু এবার মিস্টার জেমার্কের মতো একজন নেতাকে হত্যার ফলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কারণ মিস্টার জেমার্কের প্রভাব শুধু সরকারি দলেই ছিল না, বিরোধীদের কাছেও তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যেই বলা হচ্ছে, সবই সরকারের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার ফল—একের পর এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার আগেই দ্য মিউটিনিয়ার্সের সঙ্গে আলোচনায় বসা উচিত ছিল সরকারের, তা না করে ওদেরকে জঙ্গি আখ্যা দিয়ে আলোচনার পথ রুদ্ধ করা হয়েছে।

'সরকারের পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে এই হত্যাকাণ্ডের। একইসঙ্গে বলা হয়েছে, আইন ভঙ্গ হয় এ-রকম

যে-কোনও আচরণের মোকাবেলায় রয়্যাল পুলিশ মারমুখী ভূমিকা পালন করবে। নতুন করে রোডব্লক দিতে বলা হয়েছে ইসাটাবুর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার আশপাশে, যে-কোনও পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে পুলিশ সদস্যদের। এমনকী, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তার সঙ্গে ফোনে কথা বলে জানা গেছে, পরিস্থিতি যদি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, অথবা সে-রকম কোনও সম্ভাবনা যদি আঁচ করতে পারে সরকার, তা হলে জরুরি আইন জারি করার পরিকল্পনা আছে। জেমার্ক সমর্থকদের আশ্বাস দেয়া হয়েছে, তাঁর ন্যক্কারজনক হত্যাকাণ্ডের স্বচ্ছ তদন্ত করা হবে এবং সেইসঙ্গে আশু বিচারের মুখোমুখি করা হবে ঘটনাটার সঙ্গে জড়িতদের। একইসঙ্গে আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়ার ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয়েছে সবাইকে, এবং এই ঘটনাকে উপজীব্য করে কেউ যদি লুটতরাজ বা খুনজখমের পরিকল্পনা করে থাকে, তা হলে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়া হয়েছে, তাকে বা তাদেরকে রয়্যাল পুলিশের শক্ত প্রতিরোধ মোকাবেলা করতে হবে।

'নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর পাওয়া গেছে, ইসাটাবুর টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে, অস্ট্রেলিয়া এবং নিউযিল্যাণ্ডের পক্ষ থেকে শান্তিরক্ষীবাহিনী পাঠানোর প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। শান্তিরক্ষীরা শুধু রয়্যাল পুলিশকে দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে সাহায্যই করবে না, আমজনতার জানমালের নিরাপত্তাও দেবে। কিন্তু এই প্রস্তাবে সরকার খুশি হলেও বিরোধীদলের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি; ওদিকে দ্য মিউটিনিয়ার্স হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছে, দেশের মাটিতে বিদেশিদের উপস্থিতি কিছুতেই সহ্য করবে না ওরা, তাদেরকে ডেকে আনার ফল হবে মারাত্মক। তবে, এখন পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে, বিদেশিদের প্রস্তাবে ইতিবাচক কোনও সাড়া দেননি সোগাভের সরকার; বরং প্রস্তাবটা নিয়ে কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসতে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী।

‘আজকের দিনটা ইসাটাবুর জন্য, সলোমন দ্বীপপুঞ্জের জন্য, তথা বিশ্বের জন্য একটা কালো দিন। কারণ মিস্টার জেমার্কের মতো নিঃস্বার্থ পরোপকারী মানুষরা ঘরে ঘরে জন্মান না। তাঁদের জন্ম হয় কালেভদ্রে, কয়েক শ’ জনপদে দু’-একজন করে...’

এই পর্যন্ত শুনে ঘরে ফিরে এল রানা। তা হলে এই কারণেই তখন এত খুশি খুশি লাগছিল রিচার্ডকে? তা হলে এই কারণেই রায়হান কী মেইল পাঠিয়েছে না দেখে জরুরি কাজের কথা বলে চলে গেছে সে অন্য জায়গায়? এই কারণেই আজ রাতের মতো স্থগিত করা হয়েছে গুপ্তধন উদ্ধার প্রক্রিয়া?

বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল ও। অনেকদূরে, খুব সম্ভব হেণ্ডারসন ফিল্ডের কাছে, কোথাও আগুন দেয়া হয়েছে। লাল হয়ে আছে ওদিকে রাতের আকাশ।

ঘাড়টা একটুখানি বাঁকা করল রানা। হ্যাঁ, জায়গামতোই আছে সেডানটা। দূরে, কিন্তু আছে।

“পাহারাদারের” সংখ্যা এখন বেড়েছে। দুইয়ের বদলে হয়েছে চার। গাড়ির ভেতরে দু’জন, আর বাকি দু’জন মেণ্ডানার তিন তলারই একটা রুম ভাগাভাগি করছে। কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না রিচার্ড, ঝুঁকি নিতে চাইছে না ওর মিউটিনিয়াররাও।

নিচ তলা থেকে কোলাহলের আওয়াজ ভেসে এল এমন সময়। কিছুক্ষণ শুনল রানা, কৌতূহলী হয়ে উঠল। চলে এল লবিতে।

অল্প যে-ক’জন ট্যুরিস্ট এখনও রয়ে গেছে হোটেলে, তাদের কয়েকজন ঘিরে ধরেছে ম্যানেজারকে। নিউযিল্যাণ্ডের এক দম্পতি আছে, ওদের সঙ্গে সেভাবে কথা না হলেও দু’-চারবার দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে রানার; ক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে ওদেরকে, বিশেষ করে মহিলাটাকে।

‘কিন্তু এটা কি আপনার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না?’ খনখনে গলায় চেঁচিয়ে উঠল মহিলাটা।

‘দেখুন, ম্যাডাম,’ নরম গলায় বলছে ম্যানেজার, ‘আমার

বইঘর.কম

দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন আমি। এই হোটেলের সীমানার মধ্যে আপনাদের নিরাপত্তার জন্য যা যা করা দরকার, করব। চেষ্টা করলে আপনাদের জন্য নিউযিল্যাণ্ডের টিকিটও বুক করাতে পারি। কিন্তু আপনাদেরকে পূর্ণ নিরাপত্তা দিয়ে হেণ্ডারসন ফিল্ড পর্যন্ত পৌঁছে দেয়াটা কি সম্ভব আমার পক্ষে? সে-রকম সুযোগসুবিধা কি আছে আমার? নিজের ঢোল পেটানোর জন্য নয়, আপনাদের ভালো চেয়েই বলছি, ইসাটাবুর অন্য যে-কোনও জায়গার চেয়ে মাকিরা-উলাওয়া অনেক নিরাপদ। এখানে মারামারি করে কারও কোনও লাভ নেই, এখানে লুটতরাজ করারও কিছু নেই। আমার হোটেলে যারা কাজ করছে সবাই স্থানীয়, চাকরির খাতিরেই তারা মেণ্ডানাকে নিরাপদ রাখার চেষ্টা করবে।'

'কিন্তু...উন্মত্ত জনতা যদি...'

'ম্যাডাম, উন্মত্ত জনতা বলে কিছু নেই ইসাটাবুতে। এখানকার অধিবাসীরা সবাই খেপে ওঠেনি, খেপেছে কিছুসংখ্যক লোক। তারপরও...এতবার করে যখন বলছেন...অন্তত আজকের রাতটা সময় দিন আমাকে, কাল সকালেই আমি যোগাযোগ করব পুলিশের সঙ্গে, আপনাদের জন্য যা যা করা সম্ভব করব,' ঘিরেধরা লোকগুলোর মাঝখান দিয়ে নিজের জন্যে পথ করে নিল ম্যানেজার, দ্রুত হেঁটে গিয়ে ঢুকল নিজের অফিসে, লাগিয়ে দিল দরজা।

'আরে, ওই লোক বললেই হবে নাকি?' বলে উঠল এক ট্যুরিস্ট, বোঝা গেল পিছকথা বলায় অভ্যস্ত সে। 'যে-দাঙ্গার জন্য ইসাটাবু কুখ্যাত, তখন কী হয়েছিল জানি না আমরা? চরম অবনতি হয়েছিল পরিস্থিতির, এবং বলতে গেলে চোখের পলকে। জ্বলে ছাই হয়ে গিয়েছিল অর্ধেক শহর।'

'আগামীকাল যেভাবেই হোক এয়ারপোর্টে যেতে হবে আমাদের,' বলল আরেকজন।

'অকারণে অতিরিক্ত ঘাবড়ে যাচ্ছেন আপনারা,' সাহস দেয়ার

চেষ্টা করল অন্য একজন। 'যা ঘটছে এখানে, তা মাথাগরম কিছু লোকের পাগলামি ছাড়া আর কিছু না। পুলিশের ডাণ্ডার বাড়ি খেলেই পাগলামি ভুলে যাবে ওরা।'

'যখন বলা হয় সবকিছু ঠিক আছে,' সুযোগ পেয়ে দার্শনিকদের মতো বাণী ঝাড়ছে এক আমেরিকান, 'তখন কারও দৃষ্টি আকর্ষিত হয় না। কিন্তু যখন কোনও গণ্ডগোলের খবর প্রচারিত হয়, মাথা খারাপ হয়ে যায় সবার।'

ঘুরে লোকটার দিকে তাকাল কিউই মহিলার স্বামী। 'কিছু মনে করবেন না। মারামারি লেগে গেছে শহরের জায়গায় জায়গায়—আপনার কি সেটা ভালো লাগছে?'

তর্কাতর্কি শুরু হবে এখন; এ-সবের মধ্যে থাকতে চায় না রানা, তাই নিজের ঘরে চলে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘুরল। থমকে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে একজন মিউটিনিয়ার, একদৃষ্টিতে দেখছে রানাকেই। একটা হাত প্যান্টের এক পকেটে, আরেকহাতে মোবাইল ঠেকিয়ে রেখেছে কানে।

চোয়ালের হাড় শক্ত হলো রানার।

অবাঞ্ছিত লোকটাকে পাশ কাটিয়ে যখন পা রেখেছে ও সিঁড়িতে, নিচু গলায় বলে উঠল লোকটা, 'কারও সঙ্গে কোনও কথা বলেননি আপনি—ব্যাপারটা ভালো হয়েছে মিস তানাঘাইয়ের জন্যে।'

থামল রানা। 'তোমার বিচি সই করে যদি একটা পেনাল্টি কিক মারতে পারতাম, তা হলে সেটাও একদিক দিয়ে ভালো হতো রেমি তানাঘাইয়ের জন্যে।'

কালো চেহারা আরও কালো হয়ে গেল লোকটার। 'আগামীকাল সকাল সকাল আপনাকে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন মিস্টার রিচার্ড।'

'কেন?'

'তাঁর অফিসে যেতে হবে।'

কিছু না বলে ওপরে উঠতে শুরু করল রানা।

'মিস্টার রানা,' পিছু ডাকল লোকটা, 'নিরাপত্তার খাতিরে সঙ্গে ফায়ারআর্মস রাখতে পারব না আমরা। শহরের বিভিন্ন জায়গায় আবার রোডব্লক দিয়েছে পুলিশ, আমাদেরকে গাড়ি থেকে নামিয়ে চেক করতে পারে ওরা। আপনার মাল্টিপারপাস নাইফটাও রেখে যেতে বলেছেন মিস্টার রিচার্ড।'

জেগে উঠে প্রথমেই যে-দুটো ব্যাপার টের পেল রেমি তা হচ্ছে: জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে ওর গা এবং প্রচণ্ড পিপাসা লেগেছে।

ওর ডান হাতের কড়ে আঙুল কেটে নিয়েছে ওরা; মাচেটির কোপ পড়ামাত্র জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল সে। রক্তপাত বন্ধ হয়েছে কীভাবে, ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছে কে—কিছুই জানে না সে। জানে না, ওকে কে বা কারা তুলে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়েছিল চৌকিতে। তারপর কয়েকবার জ্ঞান ফিরে পেয়েছে সে, কিন্তু বার বার তা হারিয়েছে কিছুক্ষণের মধ্যেই।

ভুলেও ডান হাতটার দিকে তাকাচ্ছে না রেমি; বাঁ হাতের ওপর ভর দিয়ে কষ্ট করে উঠে বসল। চৌকি থেকে নামতে গিয়ে একটুখানি চক্কর দিয়ে উঠল মাথাটা। কিন্তু পানি খেতে হবে ওকে—যেন মরণপিপাসা জেগেছে ওর।

টলতে টলতে এগিয়ে গেল ও টেবিলটার দিকে। ওখানে প্লাস্টিকের একটা বোতলে পানি রাখা আছে, আর আছে ওর জন্যে কিছু খাবার। খাবারের পাত্রটার দিকে তাকাল রেমি। কয়েক পিস পাউরুটি, কিছু সব্জি, আর একটা আপেল। পানির বোতলটায় কোনও ক্যাপ নেই। ওটা বাঁ হাতে তুলে নিল রেমি, ওর মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল আরেকবার। আহত হাতটা দিয়ে কোনওরকমে খামচে ধরল টেবিলের একটা কোনা, সঙ্গে সঙ্গে চিনচিনে একটা ব্যথা যেন উঠে এল আঙুল বেয়ে কাঁধ পর্যন্ত। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল রেমি, একটু একটু করে পানি খেল বেশ কিছুটা। বোতলটা মাত্র রেখেছে টেবিলের ওপর, সঙ্গে সঙ্গে

আবারও টলে উঠল সে; এবার আর সামলাতে পারল না, পড়ে গেল মেঝেতে। বমি করে দিল।

শরীর ঘষটে পিছিয়ে গেল মেয়েটা, দেয়ালের সঙ্গে কোনওরকমে হেলান দিয়ে বসল। ওর মনে হচ্ছে, আর একটুও শক্তি নেই ওর শরীরে।

ঈশ্বর কেন এ-রকম করছেন ওর সঙ্গে? কেন এত কষ্ট দিচ্ছেন ওকে? নাকি এগুলো আসলে দৈত্যদেবতাদের চিরন্তন অভিশাপের ফল?

ছাব্বিশ

পরদিন সকাল।

মাকিরা-উলাওয়া ছাড়িয়ে কিছুদূর আসতে না আসতেই ব্রেক চাপতে বাধ্য হলো সেডানের ড্রাইভার। সামনে উজ্জ্বল রঙা দোতলা একটা দালান দেখা যাচ্ছে, সাইনবোর্ডে বড় বড় করে লেখা: "র‍্যাম অ্যাণ্ড রম।" অর্থাৎ ওটা একটা কম্পিউটারের-দোকান। আগে ভালোমতো খেয়াল করেনি রানা, এখন যেহেতু বসে থাকা ছাড়া করার কিছু নেই, ভালোমতো তাকিয়ে বুঝল, ওটা ইসাটাবুর সবচেয়ে বড় কম্পিউটার-শপ।

কয়েক ডজন লোক জড়ো হয়েছে দোকানটার বাইরে, চেহারা দেখে তাদের কারোরই ভাবভঙ্গি সুবিধার মনে হচ্ছে না। স্টিলের রোলআপ শাটার দিয়ে সুরক্ষিত দোকানটার দরজা, এবং প্রতিটা দরজার ওপরই হামলে পড়েছে একাধিক লোক। যারা শাটার ভাঙার চেষ্টা করছে তাদের হাতে শাবল অথবা বড় হাতুড়ি, মাচেটি হাতে পাহারা দিচ্ছে কেউ কেউ। অরাজকতার সুযোগে

লুটতরাজ শুরু করেছে ওরা।

ড্রাইভারের উদ্দেশে পিজিন ভাষায় কিছু একটা বলল খাসি। গাড়ি ছাড়ল ড্রাইভার। কিন্তু তিন শ' গজ মতো আসার পর আবার ব্রেক চাপতে হলো ওকে। সামনে একটা মেকশিফ্‌ট ব্যারিকেড ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েক শ' দ্বীপবাসী। রাস্তার একধারে একটা ড্রামে আগুন জ্বালানো হয়েছে, সেখান থেকে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে। নিজেদের সব আক্রোশ, হাতের কাছে-পাওয়া দুটো গাড়ির ওপর ঝেড়েছে লোকগুলো; ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেছে গাড়ি দুটো। কোনও গাড়িরই কোনও জানালায় কাঁচ নেই, একটা গাড়ির পেছনের সীটে আগুন লাগানো হলো এইমাত্র।

দৃশ্যটা দেখে হইহই করে উঠল উন্মত্ত জনতার একাংশ।

'এদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না,' জরুরি গলায় খাসিকে বলল রানা। 'গাড়ি ঘুরাতে বলো ড্রাইভারকে।'

কথাটা শেষ হয়েছে কি হয়নি, পনেরো-বিশজন লোক রণহুঙ্কার ছেড়ে ছুটে এল সেডানের দিকে।

'গাড়ি ঘুরাও!' চিৎকার করে উঠল খাসি।

কিন্তু হতভম্ব ড্রাইভার যতক্ষণে বুঝতে পারল কথাটা, দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে।

যারা ছুটে এসেছে গাড়ির দিকে, তাদের সবার হাতে ইট বা পাথর, ওগুলো প্রায় একযোগে ছুঁড়ে মারল ওরা সেডানের দিকে।

স্টিয়ারিং তখন বন বন করে ঘুরাচ্ছে ড্রাইভার, একইসঙ্গে পা দাবিয়ে রেখেছে এক্সিলারেটরে, ঘুরে যাচ্ছে গাড়ির নাক। পর পর কয়েকটা ইটের টুকরোর আঘাতে চুরমার হয়ে গেল উইণ্ডশীল্ড, চুরমার হলো খাসি যেদিকে বসেছে সেদিকের জানালার কাঁচও। আর্তচিৎকার ছাড়ল লোকটা, কপাল চেপে ধরে ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে। ততক্ষণে গাড়ি ঘুরিয়ে ফেলেছে ড্রাইভার, রিয়ারউইণ্ডোটা এখন তেড়েআসা লোকগুলোর দিকে।

চট করে কোনওরকমে বসে পড়ল রানা গাড়ির মেঝেতে।

সঙ্গে সঙ্গে চুরমার হয়ে গেল পেছনের কাঁচ; একটু আগে

রানার ডানদিকে বসে ছিল যে-মিউটিনিয়ার, মাথা ফাটল তার। রানা টের পেল, ওর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে ড্রাইভারের সীটের পেছনদিকে আঘাত করল বড়সড় একটা পাথর। আগে বাড়ল সেডানটা। আরও কয়েকটা ইট-পাথর এসে আঘাত করল সেটার বডিতে, তবে আস্তে।

পঞ্চাশ গজমতো গিয়েই ব্রেক চাপল ড্রাইভার, কিন্তু গতি ঠিকমতো না কমিয়েই ডানে অনেকখানি ঘুরিয়ে দিল স্টিয়ারিং। একদিকে কাত হয়ে গেল সেডান; রানার মনে হলো, উল্টেই যাবে বুঝি। ইতোমধ্যে মেঝে ছেড়ে সীটে উঠে বসেছে ও।

জঙ্গলের ভেতরে কাঁচা রাস্তায় নেমে পড়েছে সেডান। রানা খেয়াল করল সামনে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে রাস্তাটা। একটা গেছে বাঁয়ে, সেটা সরু হয়েছে ক্রমশ। আরেকটা ডানদিকে, ওটা প্রায় মূল রাস্তার মতোই প্রশস্ত। ডানের রাস্তায় উঠল ড্রাইভার। এবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গতি আরও কমাতে হলো ওকে, কারণ এই রাস্তা আগেরটার চেয়েও খারাপ।

ইঙ্গিতে খাসিকে দেখিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ব্লাড! ব্লাড!'

'আমি ডাক্তার না,' শান্ত গলায় বলল রানা, 'আমার কিছু করার নেই।'

রানার বাঁ পাশে বসা "বিদ্রোহী রণক্লান্ত" কিছু একটা বলে উঠল পিজিন ভাষায়।

আবার রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল ড্রাইভার, এক হাতে আস্তে আস্তে থাবা দিচ্ছে খাসির সীটের পেছনে। 'ইউ সীট হিয়ার, হি সীট দেয়ার।'

মানে রানাকে উঠে গিয়ে সামনের সীটে বসতে বলছে লোকটা।

মানা করে দিতে যাচ্ছিল রানা, একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মত বদল করল। 'ঠিক আছে,' বলল ও, 'কিন্তু রেডিয়ো শুনতে দিতে হবে আমাকে।'

‘ওকে। ইউ লিসেন রেডিয়ো।’

প্রথমে মহাবিদ্রোহী, তারপর রানা নেমে পড়ল সেডান থেকে। এগিয়ে গিয়ে খাসিকে সাহায্য করল লোকটা, ধরাধরি করে নামাল গাড়ি থেকে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে খাসিকে দেখছে রানা। এগিয়ে গিয়ে মহাবিদ্রোহীর কাঁধে হাত রাখল ও। কিছুটা আশ্চর্য হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল লোকটা।

‘ওকে শুইয়ে দাও মাটিতে,’ বলল রানা।

আরও আশ্চর্য হলো মহাবিদ্রোহী, কিন্তু কিছু না বলে রানার কথামতো কাজ করল।

‘রুমাল আছে তোমার কাছে?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

জবাব না দিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে দিল লোকটা।

নিজের রুমাল বের করল রানা। দুটো রুমাল জোড়া দিল, তারপর বেশকিছু দুবলা ঘাস তুলে নিয়ে এল দ্রুত, ওগুলোর অর্ধেকটা দুই হাতের তালুতে ভালোমতো ঘষে মণ্ডের মতো বানাল, তারপর মণ্ডটা লাগিয়ে দিল খাসির কপালের ক্ষতে। এরপর দুই রুমাল দিয়ে বানানো পট্টিটা ভালোমতো বেঁধে দিল খাসির কপালে।

মাথার পেছনে হাত দিয়ে বসে ছিল মাথাফাটা বিদ্রোহী, ওর আর ড্রাইভারের রুমাল বের করে বাকি অর্ধেক ঘাস দিয়ে ওকেও একই চিকিৎসা দিল রানা। ধরাধরি করে খাসিকে তুলে দিল পেছনের সীটে, লোকটাকে মাঝখানে রেখে ওর বাঁ পাশে বসে পড়ল মহাবিদ্রোহী।

সামনের সীটে উঠে বসল রানা। গাড়ি ছাড়ল ড্রাইভার।

ড্যাশবোর্ডে রেডিয়োর নব আছে, ওটা ঘুরিয়ে রেডিয়ো চালু করল রানা, ইংরেজিতে খবর প্রচারিত হচ্ছে এ-রকম একটা এফএম চ্যানেলে গেল। ড্রাইভার কিছু বলল না।

‘...মিস্টার জেমার্কের হত্যাকাণ্ড যে শেষপর্যন্ত এত বীভৎস অবস্থা সৃষ্টি করবে ইসাটাবুতে, অনুমান করা যায়নি। ধারণা করা

হচ্ছে, এখনকার সংঘাতময় পরিস্থিতি আর লুটতরাজের পেছনে জঙ্গি-আখ্যা-পাওয়া দ্য মিউটিনিয়ার্সের ভূমিকা আছে। জানা গেছে, কোনও কোনও গ্রাম থেকে কিছুসংখ্যক দুর্বৃত্ত এখনও যোগ দিচ্ছে তাদের দলে, লুটের মাল ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিচ্ছে নিজেদের মধ্যে। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, নির্বিঘ্নে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে, এ-রকম শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি যতদিন পর্যন্ত না ফিরে আসছে দ্বীপে, এবং যতদিন পর্যন্ত না নির্মূল করা যাচ্ছে দ্য মিউটিনিয়ার্সকে, ততদিন রাস্তায় থাকবে রয়্যাল পুলিশ। জঙ্গিদলটার বিরুদ্ধে যে-কোনও রকমের তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে বলা হয়েছে সাধারণ লোকদের। মন্ত্রীদের সঙ্গে সফল আলোচনা শেষ করেছেন প্রধানমন্ত্রী সোগাভের, প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি পরিস্থিতির কোনও দৃশ্যমান উন্নতি না হয়, বিদেশি সাহায্য চাওয়া হবে। অস্ট্রেলিয়া ও নিউযিল্যাণ্ড থেকেও জানানো হয়েছে, প্রস্তুত অবস্থায় আছে তাদের কোয়ালিশন ফোর্স। সে-হিসেবে দাঙ্গা যদি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, আগামী বাহাত্তার ঘণ্টার মধ্যে ইসাটাবুতে পৌঁছাচ্ছে কোয়ালিশন ফোর্স।'

মনে মনে হাসল রানা। রিচার্ডের বুদ্ধি বুমেরাং হয়ে ফেরত গেছে ওর দিকেই। তারমানে, ভাবল ও, এখন তাড়াহুড়ো করবে লোকটা—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজে বের করতে চাইবে গুপ্তধন।

'আমাদের সঙ্গে নিজস্ব মতামত শেয়ার করার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম সরকার দলীয় প্রভাবশালী সাংসদ মিস্টার ওরওয়েন ঝনয়াকে,' বলে চলেছে সংবাদউপস্থাপক, 'আমরা ভাগ্যবান, আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি এখন। মিস্টার ঝনয়া, গুড মর্নিং। কষ্ট করে, ঝুঁকি নিয়ে আমাদের স্টুডিয়োতে এসেছেন আপনি, সেজন্য ধন্যবাদ।'

ওরওয়েন ঝনয়া? একটা ভ্রূ একটুখানি উঁচু হলো রানার।

'মাই প্লেজার,' বলছে ঝনয়া। 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন আপনি, ঝুঁকি নিয়ে এখানে আসতে হয়েছে আমাকে। তবে খুব খুশি

হতাম, যদি কথাটা বলতে না হতো আপনাকে।'

'মিস্টার ঝনয়া, এই যে মিস্টার জেমার্কের হত্যাকাণ্ড, এবং তার আগের বা পরের সংঘাতমূলক পরিস্থিতি, একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে এগুলো কীভাবে দেখছেন আপনি?'

'এককথায় যদি বলি, আমি হতাশ। আমি অনেক স্বপ্ন দেখি সলোমন দ্বীপপুঞ্জকে নিয়ে, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আমার সব স্বপ্ন ভেঙে খানখান হয়ে গেছে। এই সমাজের মুষ্টিমেয় কিছু লোকের কারণে ধুলোয় মিশে যাচ্ছে আমাদের সব অর্জন। প্রাণপণে চেষ্টা করছিলাম আমরা আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার জন্যে, নস্যাৎ হয়ে গেছে সব। মিস্টার জেমার্কের হত্যাকাণ্ড...কী বলা যায় এটাকে? ন্যক্কারজনক, কাপুরুষোচিত, জঘন্য। যদিও আমি একজন কট্টর সমালোচক ছিলাম মিস্টার জেমার্কের, তারপরও ঠিক ওই শব্দগুলোই ব্যবহার করতে চাই। সবাই জানে কী রকম মানুষ ছিলেন তিনি, সবাই জানে কোন্ জাতের নেতা ছিলেন মানুষটা। কিন্তু তাই বলে তাঁর সব নীতি যে ঠিক হবে, এমন কোনও কথা নেই। তাঁর সঙ্গে অনেক বিষয়েই অনেক সময় মতভেদ হয়েছে আমার, কিন্তু মানুষটাকে আমি সবসময় সম্মান করেছি, এখনও করছি। খনিজসম্পদ মন্ত্রী ছিলেন তিনি, আমাদের খনিজসম্পদ রাষ্ট্রীয়করণের ঘোর বিরোধী ছিলেন। আমি অনেকবার চেষ্টা করেও বোঝাতে পারিনি তাঁকে, এখন যুগ বদলেছে। এখন দেশের সম্পদ বিদেশিদের হাতে তুলে দিয়ে ট্যাক্স পাওয়ার চেয়ে, নিজেদের সম্পদ নিজেদের কাছেই রেখে সেটা চড়া দামে বিদেশিদের কাছে বেচাটা বেশি লাভজনক। তারপরও...প্রত্যেকের নিজস্ব মতামত থাকে, মূল্যবোধ থাকে। ...আর দ্বীপের সংঘাতমূলক পরিস্থিতির ব্যাপারে বলব, যা হয়েছে, হয়েছে। অতি আবেগের বশবর্তী হয়ে যা করছেন আপনারা, তা কিন্তু নিজেদের পায়ে কুড়াল মারারই নামান্তর। থামুন, অপেক্ষা করুন এবং অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে দিন সরকারকে।'

নব ঘুরিয়ে রেডিয়ো বন্ধ করে দিল রানা।

বিড়ালতপস্বী আর কাকে বলে! একদিক দিয়ে টাকা খাচ্ছে দ্য মিউটিনিয়ার্সের, ওদের স্বার্থ দেখছে, আর আরেকদিক দিয়ে রেডিয়োতে এসে ভালোমানুষির লেকচার কপচাচ্ছে।

রেডিয়ো নিয়ে এত মগ্ন ছিল ও, ঠিক খেয়াল করেনি, ঘুরপথে এসে কখন আবার প্রধান সড়কে হাজির হয়েছে সেডানটা, এগিয়ে চলেছে রিচার্ডের অফিসের দিকে।

এমনিতেই কটন নেই, তার ওপর সী-সিকনেসে আক্রান্ত হয়েছিল রিকার্ডো—টুরাঙ্গা থেকে ইসাটাবুতে যেতে যা সময় লেগেছিল পোসেইডনের, ফিরতে লাগল তার চেয়ে ঢের বেশি।

ইসাটাবুর সেই টাইফুন শুধু কটন আর হেক্টরকেই উধাও করে দেয়নি, বিকল করে দিয়েছে জলযানটার স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেমও; তাই, পয়েন্ট ক্রুয কর্তৃপক্ষের সঙ্গে টু-ওয়ে রেডিয়ো কমিউনিকেশনের মাধ্যমে যোগাযোগের কথা বাদ দিয়ে বললে এ-ক'দিন দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল ওরা। টুরাঙ্গায় পৌঁছানোর পর ওই সিস্টেম ব্যবহার করে প্রথমেই বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করল টনি, তারপর ভেসেল নোঙর করে রিকার্ডোকে নিয়ে হাজির হলো ডক এরিয়ায়। যোগাযোগ করল অ্যালেক্স হ্যালির সঙ্গে, রানা আর রেমির সন্দেহজনক অন্তর্ধানের কথাসহ যা যা ঘটেছে প্রথম থেকে সব জানাল।

হ্যালি বলল, আসছে সে, টনি আর রিকার্ডো যেন অপেক্ষা করে ওর জন্যে।

কিন্তু চুপচাপ অপেক্ষা করার মতো মানুষ টনি না। ওর কথা হচ্ছে, হয় কাজ করো, নয়তো মদ খাও। কাজেই রিকার্ডোকে নিয়ে ঢুকে পড়ল সে বন্দরের একটা বারে। মনে পড়ে গেল ওর, মিস্টার রানার অদ্ভুত মেসেজটার কথা বলা হয়নি হ্যালিকে। থাক, ভাবল সে, হ্যালি তো আসছেই। তা ছাড়া, মেসেজটা যাতে ভুলে না যায়, সেজন্য ওটা একটুকরো কাগজে লিখে কাগজটা রেখে দিয়েছে সে নিজের মানিব্যাগে।

বার থেকে বের হয়ে যখন ডক এরিয়ার উদ্দেশে হাঁটা ধরল ওরা, তখন ঝিম মেরে আছে রিকার্ডো, আর মাতাল টনির চোখের সামনে দুলছে দুনিয়াটা। তাই রাস্তা পার হওয়ার সময় গাড়িটাকে ওদের দিকে ছুটে আসতে দেখে রিকার্ডো নিজে সতর্ক হতে পারলেও টনিকে সতর্ক করতে পারল না; আর গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে কয়েক হাত দূরে যখন পড়ল টনি, তখনও বুঝতে পারল না সে, ঠিক কী হয়েছে।

সাদা চামড়ার মানুষের দেশ—পালিয়ে না গিয়ে গাড়ি থেকে নামল ড্রাইভার, রিকার্ডোর সহায়তায় টনিকে তুলল পেছনের সীটে, তারপর স্পিডলিমিটের মধ্যে থেকে রওনা হলো নিকটস্থ হাসপাতালের উদ্দেশে।

পেছনের সীটে বসে আছে ওরা দু'জন—রিকার্ডো আর টনি; রিকার্ডো জড়িয়ে ধরে রেখেছে টনিকে। গুরুতরভাবে আহত টনির মাথার ভেতরে যেভাবেই হোক আটকে গেছে রানার মেসেজটা, মুমূর্ষু লোকে যে-ভঙ্গিতে পানি খেতে চায় বার বার, সে-ভঙ্গিতে বলছে সে, 'মানিব্যাগ, চিরকুট! মানিব্যাগ, চিরকুট!'

আহত লোকটার অবস্থা সঙ্গিন বুঝতে পেরে গাড়ির গতি আরেকটু বাড়াল ড্রাইভার।

ইসাটাবু। রিচার্ডের কম্পিউটারে নেট থেকে নামিয়ে বাংলা ফন্ট ইন্সটল করে রায়হানের পাঠানো ই-মেইল পড়ছে রানা:

কর্নেল কামাসাকু বিচিত্র এক লোক। তাঁর পুরো নাম কামাসাকু হিরোহিতো। মাইক্রোবায়োলজিতে গ্র্যাজুয়েশন করেন তিনি, কিন্তু ক্যারিয়ার গড়ার জন্য গিয়ে নাম লেখান মিলিটারিতে। তাঁর সেই ক্যারিয়ারও কিন্তু ঘোলাটে। কোনও কোনও সূত্র বলছে তিনি পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন, কোথাও বলা হচ্ছে তিনি ছিলেন একজন কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট, আবার কেউ কেউ তাঁকে সম্রাটের বিশ্বস্ত সামরিক উপদেষ্টাপরিষদের একজন সদস্য বলেছেন। তবে তাঁর ব্যাপারে সবচেয়ে অদ্ভুত কথাটা সম্ভবত

বলেছে মিত্রবাহিনী। ওদের বর্ণনায়, কর্নেল কামাসাকু ছিলেন "নিকো", মানে "সানলাইট"-এর একটা অংশ।

"নিকো" কী, জানে না সাধারণ মানুষদের কেউই। জানে না হয়তো জাপানি সেনাবাহিনীর অনেক অফিসারও। ওটা, একবাক্যে যদি বলি, একটা স্পেশাল প্রজেক্ট গ্রুপ, যাদের কাজ ছিল প্রথাগত ধারণার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন চলছে, তখন প্রথাগত ধারণার বাইরের যুদ্ধ মানে ছিল এমন কিছু, যা আজ আমাদের কাছে বার বার শোনা কোনও টার্ম। উদাহরণ হিসেবে আণবিক বোমার কথাই ধরুন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে আমেরিকানদের সবচেয়ে গোপন গবেষণা "ম্যানহাটন্ প্রজেক্টের" নাম, ক'জন জানত তখন? ক'জন জানত, আমেরিকার সাঁইত্রিশটা গবেষণাগারে, তেরোটা ইউনিভার্সিটি-ল্যাবরেটরিতে চলছে একবারে লক্ষ মানুষ হত্যার নিপুণ কর্মযজ্ঞ? ক'জন জানত, নিউ মেক্সিকো'র মরুভূমিতে, পরীক্ষামূলক "ট্রিনিটি" প্রজেক্টের মাধ্যমে যখন প্রথমবারের মতো বিস্ফোরিত হয় আণবিক বম, তখন সমস্ত কর্মযজ্ঞের নেপথ্য কর্ণধার বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহেইমার বলেছিলেন ভগবদ্গীতার বিখ্যাত সেই শ্লোক, 'এখন আমিই মৃত্যু, আমিই ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়?'

জাপানিরা কি কল্পনা করতে পেরেছিল, আমেরিকানদের ওই গোপন গবেষণার ফল, পৃথিবীর শেষ দিনটা পর্যন্ত বহন করে যেতে হবে ওদেরকে? সম্ভবত পারেনি; এবং হয়তো সে-কারণেই ওদের গোপন গবেষণাগুলোও দেখতে পারেনি আলোর মুখ। আমার বিবেচনায়, খারাপ হয়নি তাতে—ওই গবেষণাগুলো যদি আলোর মুখ দেখত, আরও কত মানুষ যে কতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো, কে জানে! কারণ বায়োলজিকাল ওয়ারফেয়ারের আবিষ্কার ও উন্নয়নে কতদূর এগোতে পেরেছিল জাপানিরা, জানে না কেউই। আজও, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এত বছর পরও, দ্য সানলাইটের সব ফাইল ক্লাসিফাইড, টপ সিক্রেট। এ-সংক্রান্ত যে-ক'টা জাপানি ওয়েবসাইট আছে, সবগুলো ফায়ারওয়াল

বইঘর.কম

প্রটেক্টেড; লগইন করতে গেলে আপনাকে বলবে, "আন্অথরাইয্ড অ্যাকসেস ডিনাইড"।

আপনার মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এত বছর পরও কেন নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছে ওসব গবেষণার ফল? সম্ভাব্য উত্তর: সলোমন দ্বীপপুঞ্জের মতো একটা জায়গায়, ইসাটাবুর মতো নিভৃত একটা দ্বীপে, বায়োলজিকাল ওয়ারফেয়ারের ডেভেলপমেন্ট হয়তো এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল জাপানিরা, যা জানলে এখনকার বিজ্ঞানীরাও শিউরে উঠতে পারেন। এখন বুঝতে পারছি, যুদ্ধের সময় শুধু কৌশলগত কারণেই না, ওই বিশেষ উদ্দেশ্যেও ইসাটাবু নিজেদের দখলে রেখেছিল জাপানিরা; ও-রকম একটা জায়গায় কর্নেল কামাসাকুর মতো একজন মাইক্রোবায়োলজিস্টের উপস্থিতি অন্তত সেটাই ইঙ্গিত করে। যা-হোক, প্রত্যেক দুর্গে ফাটল থাকে, প্রত্যেক রাজপ্রাসাদের এমন কোনও না কোনও গোপন পথ থাকে যেখান দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে আততায়ী। আন্অথরাইয্ড অ্যাকসেস ডিনাইড মেসেজেরও বিকল্প থাকে কখনও কখনও।

মূলত বন্দি আর আমজনতার ওপর গবেষণা চালাচ্ছিল "নিকো"। কল্পনা করুন, অ্যানেসথেশিয়া ছাড়া কাটাছেঁড়া করা হচ্ছে কাউকে। কল্পনা করুন, হাত-পা বেঁধে কাউকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে চৌবাচ্চার পানিতে, নাকটা কোনওরকমে ভাসিয়ে রাখতে পেরেছে সে পানির ওপর, আস্তে আস্তে জমাট বরফে পরিণত হচ্ছে চৌবাচ্চার পানি। কল্পনা করুন, ষাট শতাংশ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে কাউকে, এবং বিনা চিকিৎসায় ছটফট করছে লোকটা। কল্পনা করুন, ইনজেকশনের মাধ্যমে বিষ ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে কারও শিরা-উপশিরায়। এসব আসলে ওদের গবেষণার অংশ—মরতে কত সময় লাগে একটা মানুষের, তা জানা দরকার ছিল। এবং সেটার সঙ্গে ওদের ডেভেলপ করা বায়োলজিকাল ওয়েপনের তুলনা করা। ওদের টার্গেট ছিল, ওয়ারফেয়ারকে শেষপর্যন্ত জার্ম ওয়ারফেয়ারে রূপান্তরিত করা, যাতে কোথাও

কোনও বিশেষায়িত বম নিক্ষেপ করলে ছড়িয়ে যাবে বিশেষ কোনও রোগের জীবাণু, রাতারাতি বিস্তৃতি লাভ করবে কোনও মহামারী।

মিত্রবাহিনীর গুপ্তচররা যে এসব খবর জোগাড় করতে পারেনি, তা কিন্তু না। খবর ঠিকই পেয়েছিল ওরা, এবং কামাসাকুর মতো বায়োলজিস্টদেরও হদিস করতে পেরেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, ওদের উপযুক্ত বিচার করার বদলে, ওদেরকে খুবই গোপনে এবং কঠোর নিরাপত্তা দিয়ে পাচার করে দেয়া হয় আমেরিকার গোপন কোনও জায়গায়; শুধু বাদ পড়েন হাতেগোনা কয়েকজন, যাদের মধ্যে কামাসাকু একজন। লোকটা খাঁটি দেশপ্রেমিক ছিলেন, আমেরিকানদের গৃহপালিত কুকুরের মতো বেঁচে থাকার চেয়ে জীবনের ইতিটাকেই শ্রেয় মনে করেছিলেন তিনি, ফলে যা হওয়ার তা-ই হয়েছিল।

যে-সময়ের কথা বলছি, তখনও ইসাটাবু থেকে জাপানি সৈন্যদের দেশে ফেরত পাঠানো শুরু হয়নি। কর্নেল কামাসাকু বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁকে এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচরদের দেশে পাঠানো হবে না। হয়তো আমেরিকানদের পক্ষ থেকে সে-রকম ইঙ্গিত দেয়া হয়েছিল তাঁদেরকে। কর্নেল টের পান, একবার যদি আমেরিকায় নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে, তা হলে ইসাটাবু তো পরের কথা, জাপানেও ফিরতে পারবেন না আর কখনও। তখন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন তিনি, পাগলাটে আচরণ শুরু করেন। যে-জায়গায় আটকে রাখা হয়েছিল তাঁদেরকে, সেখান থেকে পালানোর চেষ্টা করেন কয়েকবার। কপাল খারাপ—প্রতিবারই ধরা পড়তে হয় তাঁকে। ওই সময়ে, ধরাপড়া জাপানি সৈন্যদের ছোট একটা অংশ কীভাবে যেন হাতিয়ে নেয় কিছু অস্ত্র, আর সেগুলো সম্বল করেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে আমেরিকানদের বিরুদ্ধে। ডামাডোলের সুযোগ নেন কামাসাকু, পালানোর শেষ চেষ্টা করেন, ক্রুদ্ধ আমেরিকানরা নির্দয় প্রহার করে তাঁকে।

তারপর একদিন, ধরাপড়া জাপানি বিজ্ঞানীদের আমেরিকায়

বইঘর.কম

নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যখন হেণ্ডারসন ফিল্ডে অবতরণ করেছে একটা মার্কিন এয়ারক্র্যাফ্ট, যে-জায়গায় অন্তরীণ ছিলেন কামাসাকু সেখানে গিয়ে দেখা গেল, মরে পড়ে আছেন তিনি—আত্মহত্যা করেছেন। দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন দুই হাতের রগ, মৃত্যু হয়েছিল অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে। ব্যক্তিগত বলতে টুকটাক যা-কিছু ছিল কর্নেলের, সেগুলোসহ তাঁকে দাফন করা হয় ইসাটাবুরই একটা গোরস্থানে, যে-জায়গা আজ জাপানি মেমোরিয়াল পার্ক নামে পরিচিত।

অনেক খুঁজেছি, কিন্তু কর্নেলের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারিনি। শুধু জেনেছি, বড় একটা বোন ছিল তাঁর; ওই মহিলার কাছে নিজের বউবাচ্চাকে রেখে ইসাটাবুতে যান তিনি। নাগাসাকিতে থাকতেন তাঁরা, ঊনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের নয় অগাস্ট "ফ্যাটম্যানের" তেলেসমাতিতে একসঙ্গে মারা-যাওয়া চল্লিশ হাজার মানুষের মধ্যে তাঁরাও ছিলেন।

মাসুদ ভাই, ইসাটাবু সম্পর্কে যত খবর পাচ্ছি ইন্টারনেটে, সবই খারাপ। জঙ্গিবাহিনী দ্য মিউটিনিয়ার্সকে নাকি সামাল দিতে পারছে না সরকার। সাবধানে থাকবেন। যে-কোনও প্রয়োজনে যে-কোনও সময় যোগাযোগ করবেন।

একেবারে শেষে একটা কথা জানিয়ে আপনাকে চমকে দেব বলে ঠিক করে রেখেছিলাম, কিছু মনে করবেন না। কাকতালীয় হলেও সত্যি, জাপানি প্রতিরক্ষাবাহিনীতে কামাসাকু হিরোহিতোর সঙ্গে কাজ করছিলেন তাঁর এক দূর সম্পর্কের ভাই, এবং লোকটা সম্পর্কে আপনি জানেন।

নামটা কি অনুমান করতে পারছেন আপনি? জানি পারছেন, তারপরও বলে দিই।

হারুকিচি হায়াকুটাকি।

রায়হানের-পাঠানো ডকুমেন্টটা পড়া শেষ করে চেয়ারে হেলান দিল রানা। ডেস্কের আরেকপ্রান্তে এতক্ষণ ধৈর্য ধরে

অপেক্ষা করছিল রিচার্ড, সামনে ঝুঁকল সে। 'কী জানা গেল?'

রায়হানের ডকুমেন্টের চুম্বকাংশ বলল রানা রিচার্ডকে।

শুনতে শুনতে কপালে ভাঁজ পড়ল রিচার্ডের। রানার কথা শেষ হলে বলল, 'যে-গ্রামে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল জাপানিরা, রাউনুর ছেলে হয়তো চিনিয়ে দিতে পারবে সেটা; কিন্তু সেখানে গিয়ে কি কোনও লাভ হবে আমাদের? কোন্‌দিকে যাব, কোথায় খুঁজব—কিছুই তো জানি না!'

'স্বীকার করলে তা হলে কথাটা। অথচ প্রায় একই কথা আমি যখন বলেছিলাম, আমার বিরুদ্ধে দেরি করিয়ে দেয়ার অভিযোগ এনেছিলে।'

কিছু বলল না রিচার্ড।

চুপ করে রইল রানাও, তাকিয়ে আছে মনিটরের স্ক্রিনের দিকে, কী যেন ভাবছে।

'আমাদের হাতে কি তা হলে আর কোনও ক্লু-ই নেই?' অধৈর্য হয়ে উঠছে রিচার্ড। 'শামানের গুপ্তধন উদ্ধারের অভিযান এখানেই শেষ?'

কম্পিউটারে এখনও ওপেন করা আছে ডকুমেন্টটা, ওটার শেষের দিকের একটা লাইনের ওপর দৃষ্টি আটকে গেছে রানার। লাইনটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ও, তারপর মাথা ঝাঁকাল আস্তে আস্তে। 'আমার মনে হয় আছে।'

'আছে?' আগ্রহে পিঠ সোজা হয়ে গেছে রিচার্ডের। 'কী?'

ওর দিকে ঘাড় ফেরাল রানা। 'দেখো, আমি কিন্তু বলেছি *আমার মনে হয়*। অনুমানটা ভুলও হতে পারে।'

'আরে, বাবা, যা খুশি তা-ই হোক, পরে দেখা যাবে। অনুমানটা বলুন তাড়াতাড়ি।'

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল রানা। 'জাপানি মেমোরিয়াল পার্ক। কর্নেল কামাসাকুর কবর।'

কাঠের মূর্তির মতো একটা মুহূর্ত বসে থাকল রিচার্ড, তারপরই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'ও, মাই গড! আপনি...আপনি

বইঘর.কম

বলতে চাচ্ছেন...'

'আমি কিছুই বলতে চাইছি না। আমি আমাদের শেষ সুযোগটা নিতে চাইছি।'

'একটা সেকেণ্ড দাঁড়ান তা হলে,' বাথরুমের উদ্দেশে রওয়ানা হলো রিচার্ড। 'পেশাব করে আসছি আমি। আমার আবার ডায়াবেটিস আছে, ঘন ঘন যেতে হয়।' বাথরুমে ঢুকে দরজা আটকিয়ে দিল।

দুই লাফে দরজাটার কাছে হাজির হলো রানা, পাল্লায় কান ঠেকিয়ে ভেতরের আওয়াজ শুনল। তারপর আগের চেয়েও দ্রুত গতিতে ফিরে এল ডেস্কের কাছে। অতি উত্তেজনায় ড্রয়ারগুলোর চাবির কথা ভুলে গেছে রিচার্ড, ফেলে গেছে ডেস্কের ওপর। চাবিটা তুলে নিল রানা।

মোট তিনটা ড্রয়ার আছে, সবচেয়ে ওপরেরটার সঙ্গে তালা, ওটা লক করলে সবগুলো ড্রয়ারই আটকে যায়। তালা খুলল রানা, দ্রুত চোখ বুলাল প্রথম ড্রয়ারে। না, এখানে নেই ওর পাসপোর্টটা।

দ্বিতীয় ড্রয়ার ধরে টান মারল ও। হাবিজাবি কিছু কাগজ দেখা যাচ্ছে, দু'হাতে দ্রুত কাগজগুলো ঘাঁটতে শুরু করল; ইলেকট্রিক বিল...চিকন একটা নোটবুক...একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে খরিদকরা মালসামানের লম্বা লিস্ট...আজেবাজে কিছু কাগজ...হ্যাঁ, এই তো, ওর পাসপোর্টটা।

থাক ওটা ওখানেই।

বাথরুমের দরজাটা খুলে গেল এমন সময়, ঘরে এল রিচার্ড।

'রেমির সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলাম,' বলল রানা। 'সম্ভব?'

গম্ভীর হলো রিচার্ডের চেহারা। 'সম্ভব, তবে আগে কবরস্থান।'

সাতাশ

মারা গেছে টনি।

চেষ্টার ত্রুটি করেননি ডাক্তাররা, কিন্তু বেচারাকে বাঁচাতে পারলেন না শেষপর্যন্ত। খবর পেয়ে চলে এসেছে পুলিশ, জিজ্ঞাসাবাদ করছে ড্রাইভারকে। নিজেকে বার বার নির্দোষ দাবি করছে লোকটা। একেবারে চুপ হয়ে গেছে রিকার্ডো, চোখের সামনে গাড়ির নিচে পড়তে দেখেছে টনিকে, এবং বলতে গেলে ওর চোখের সামনেই মরল লোকটা। ভেতরে ভেতরে ভীষণ নাড়া খেয়েছে রিকার্ডো, ভয়ঙ্কর এই স্মৃতি কোনওদিন ভুলতে পারবে কি না সন্দেহ। তারপরও, কর্তব্যের খাতিরে, এগিয়ে গেল ড্রাইভার লোকটাকে সাহায্য করার জন্য। ঠিক কী ঘটেছিল, বলল পুলিশকে। ওকেও কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল পুলিশ, নিশ্চিত হলো গাড়ির নিচে পড়ার আগে মাতাল অবস্থায় ছিল টনি, এ-ব্যাপারেও নিশ্চিত হলো বেশি কিছু করার নেই ওদের। নিকটস্থ স্টেশনের সঙ্গে রেডিয়োতে কথা বলতে বলতে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গেল ওরা।

রিসিপশন কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল রিকার্ডো। 'একটা ফোন করা যাবে?'

টেলিফোনটা বাড়িয়ে দেয়া হলো ওর দিকে। হ্যালির মোবাইলে ফোন করল সে। কী ঘটেছে, জানাল।

'তুমি হাসপাতালেই থাকো,' জরুরি কণ্ঠে বলল হ্যালি।

বইঘর.কম

'আমি আসছি।'

জাপানিয পীস মেমোরিয়াল পার্ক।

লোহার জংধরা সিংহদরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল রানা; বিশ্রী ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ যেন মনে করিয়ে দিল, ও এখানে একজন অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথি। ওর পেছনে রিচার্ড আর নতুন দুই মিউটিনিয়ার; একজনের আবার খুসখুসে কাশির সমস্যা আছে, থেকে থেকে কেশে উঠছে লোকটা। ওদের থেকে কিছুটা দূরে, রাস্তার একটা ঝোপের ধারে সেডানটা পার্ক করেছে ড্রাইভার, অপেক্ষা করছে গাড়ির ভেতরেই। খাসি আর মাথাফাটা মিউটিনিয়ারকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে রিচার্ডের অফিস থেকে রানাদেরকে নিয়ে এখানে এসেছে লোকটা।

রানাকে সাবধান করার উদ্দেশ্যে একাধিকার বলেছে রিচার্ড, প্রতি পনেরো মিনিট পর পর ফোন আসবে ওর মোবাইলে, যদি কোনও কারণে ধরতে না পারে সে, অথবা ধরতে পারলেও যদি ওর কণ্ঠ শুনে কোনওরকম সন্দেহ হয় অন্যপ্রান্তের লোকটার, রেমিকে খুন করা হবে সঙ্গে সঙ্গে; কাজেই রানা যেন কোনও চালাকি করার চেষ্টা না করে।

আপাতত চালাকি করার ইচ্ছা নেই রানার।

পার্কের কোথাও কেউ নেই। থাকার কথাও না। আমেরিকানদের মেমোরিয়াল পার্কটা দেখার জন্য মাঝেমধ্যে আসে ট্যুরিস্ট, জাপানিদেরটার প্রতি তেমন আগ্রহ বোধ করে না প্রায় কেউই। যে-কোনও যুদ্ধে যারা জেতে তাদের কথাই জানতে চায় লোকে, যারা হেরে যায় তাদের খবর নেয় না। তা ছাড়া এখন যে-অবস্থা চলছে ইসাটাবুতে, জাপানিদের পার্কে কেউ থাকলে আশ্চর্যই হতো রানা।

পার্কের সব জায়গায় অযত্ন আর অবহেলার চিহ্ন। প্রায় হাঁটুসমান উঁচু ঘাসে ভরে গেছে পুরো জায়গা, দেখার কেউ নেই। সিংহদরজা দিয়ে ঢুকেই বিশ-পঁচিশ গজ সামনে মনুমেণ্ট বা ওই

জাতীয় কিছু একটা বানানো হয়েছিল কোনও এক কালে, রোদবৃষ্টির অত্যাচারে বিবর্ণ, মলিন হয়ে গেছে বিশালকায় ত্রিভুজের মতো দেখতে জিনিসটা। বেজির দল তাদের অভয়ারণ্য গড়ে তুলেছে পার্কে, এদিকওদিক তাকালে প্রাণী বলতে চোখে পড়ছে একমাত্র ওগুলোকেই। আশ্চর্যজনক হলেও এই দিনের বেলাতেও শোনা যাচ্ছে ঝিঁঝির ডাক। বড় বড় কয়েকটা গাছ দেখা যাচ্ছে, একটার ডালে বসে বিষণ্ন সুরে ডাকছে একটা মোরনিং ডাভ।

'পার্কটা দেখাশোনা করার জন্যে কেউ না কেউ আছে নিশ্চয়ই,' বলল রিচার্ড, এদিকওদিক তাকাচ্ছে। 'ওই যে, ওই ঘরটা। ওটাই অফিসরুম মনে হয়।'

পলেস্তারা খসেপড়া, জায়গায় জায়গায় গর্ত হয়ে-যাওয়া দেয়ালে লবণ-জন্মানো, বহু পুরনো, ভগ্নপ্রায় ঘরটার দিকে তাকাল রানা। ওটার বয়স, অনুমান করল ও, ষাট-পঁয়ষট্টির কম হবে না। হাঁটা ধরল ও ঘরটার উদ্দেশে। কাছাকাছি পৌঁছে, চৌকাঠে এখনও দরজার পাল্লা দুটো টিকে আছে কী করে ভেবে আশ্চর্য হলো ও। ধাক্কা দেবে কি দেবে না ভাবতে ভাবতে শেষপর্যন্ত আলতো ধাক্কা দিল একটা পাল্লায়। একচুল নড়ল না ওটা।

'আটকে গেছে কোনওকিছুর সঙ্গে,' মন্তব্য করল রিচার্ড, রানাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল সামনে। ভালোমতো দেখল পাল্লা দুটো। ময়লা জমে গাদ পড়ে গেছে মেঝের কাছে, ওগুলোই প্রতিবন্ধকতা গড়ে তুলেছে এখন। তারমানে অনেকদিন খোলা হয় না এই দরজা।

ইশারায় এক মিউটিনিয়ারকে কাছে ডাকল রিচার্ড। দু'জনে মিলে ঠেলে-ধাক্কিয়ে খুলে ফেলল একদিকের পাল্লা। রানার দিকে তাকাল রিচার্ড, দৃষ্টিতে প্রশ্ন। কিছু না বলে ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা।

বাইরের উজ্জ্বল সূর্যালোকের তুলনায় ঘরের ভেতরটা বেশ অন্ধকার, সইয়ে নিতে সময় লাগল রানার। শুনতে পেল, পিজিন

বইঘর.কম

ভাষায় দুই সঙ্গীকে কী যেন বলছে রিচার্ড। কথা শেষ করে একজনকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকল লোকটা।

'ভুল হয়ে গেছে আমাদের,' রিচার্ডকে বলল রানা, 'সঙ্গে করে টর্চলাইট নিয়ে আসা উচিত ছিল। তোমার মোবাইলে টর্চ আছে?'

পকেট থেকে মোবাইল বের করে টর্চ জ্বালাল রিচার্ড।

'আমার হাতে দেয়া যাবে?' বলল রানা। 'কোনও চালাকি করব না।'

মোবাইলটা ওর হাতে দিল রিচার্ড।

ঘরের এখানে-সেখানে আলো ফেলছে রানা। ছোটই বলা চলে ঘরটাকে—দশ বাই দশ হবে। বাইরের চেয়ে ভেতরের অবস্থা কোনওদিক দিয়ে ভালো না। একদিকের দেয়ালে সুইচ দেখা যাচ্ছে, তারমানে বিদ্যুৎসংযোগ আছে এখানে। এগিয়ে গিয়ে সুইচটা টিপে দিল রানা, কিন্তু আলো জ্বলে উঠল না কোথাও। মাথার ওপরে খালি ঝুলছে একটা বাল্‌ব্‌হোল্ডার।

একটা টেবিল আছে ঘরে, সঙ্গে একটামাত্র চেয়ার। টেবিলের ওপর মাঝারি সাইজের একটা রেজিস্টার। আরও একবার এদিকওদিক তাকাল রানা, কিন্তু রেকর্ড রাখার মতো অন্য কোনও খাতাপত্র নজরে পড়ল না ওর। রেজিস্টারটা হাতে নিয়ে টর্চ নিভিয়ে দিল ও, রিচার্ডকে ফিরিয়ে দিল মোবাইল, বেরিয়ে এল বাইরে।

ডানদিকে ইটবিছানো একটা পথ চলে গেছে পার্কের সীমানার দিকে, সীমানাপ্রাচীরের পর শুরু হয়েছে জাপানিদের গোরস্থান; পথটার পাশে কয়েকটা বেঞ্চ দেখা যাচ্ছে। একটা বেঞ্চে গিয়ে বসল রানা। সেখানে নিজের জন্য জায়গা করে নিল রিচার্ডও। ধুলোর কারণে ট্রাউজারের বারোটা বেজে যাবে জেনেও কোলের ওপর রেখে রেজিস্টারটা খুলল রানা।

যেমনটা ভেবেছিল—পুরোপুরি নির্দয়ের মতো আচরণ করেনি মার্কিনিরা নিহত জাপানি সৈন্যদের সঙ্গে, যুদ্ধে যারা নিহত হয়েছে তাদের নাম বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে রেজিস্টারে,

যাতে নিহতদের স্বজনরা যদি কখনও আসে ইসাটাবুতে, গিয়ে দাঁড়াতে পারে কাঙ্ক্ষিত কবরটার পাশে। আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করার মতো—কোন্ সৈনিকের র‍্যাঙ্ক কী ছিল, তা-ও লিখে রাখা হয়েছে তার নামের পাশে।

'কামাসাকু নামের বানানটা ইংরেজি কোন্ অক্ষর দিয়ে হতে পারে?' রিচার্ডের কাছে জানতে চাইল রানা।

'কেন, "কে" ছাড়া আর কী?'

'শিয়োর?'

'এক শ' ভাগ।'

"কে"-এর জন্য বরাদ্দ-করা পাতায় চলে এল রানা। একটা একটা করে সবগুলো নাম দেখল ভালোমতো, প্রতিটা নামের সঙ্গে মেলাল র‍্যাঙ্ক। কিন্তু কর্নেল কামাসাকু হিরোহিতোকে পাওয়া গেল না।

কৌতূহলী দৃষ্টিতে রিচার্ডের দিকে তাকাল রানা।

পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল লোকটা, চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে ধৈর্য হারাচ্ছে আস্তে আস্তে। 'আপনি মনে হয় আনন্দ পাচ্ছেন, মিস্টার রানা? কামাসাকুকে খুঁজে বের করতেই হবে, তা না হলে...'

'তুমি বোধহয় আমাকে জাদুকর ভাবতে শুরু করেছ?' বাধা দিয়ে বলে উঠল রানা। 'এখানে আসার আগেই কিন্তু বলেছি, যা করতে যাচ্ছি তা সম্পূর্ণ আমার অনুমান। আমি হয়তো, তোমার কথামতো, একটু কুংফু-কারাতে জানতে পারি, কিন্তু নিশ্চয়ই গায়েবি ক্ষমতা রাখি না?'

বিরক্ত হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রিচার্ড, ওর মোবাইলটা বেজে ওঠায় বলতে পারল না। কলটা রিসিভ করল সে, পিজিন ভাষায় সংক্ষেপে আলাপ সেরে কেটে দিল লাইন। রানার দিকে তাকাল। 'ভাবুন, মিস্টার রানা, ভাবুন।'

'আমার ভাবতে হবে না, তুমি ভাব। কামাসাকু নামটা আর কীভাবে লেখা যেতে পারে ইংরেজিতে, বলো।'

বইঘর.কম

‘কামাসাকু...কামাসাকু...’ বিড়বিড় করছে রিচার্ড। ‘কিউ...’

রানার হাত থেকে রেজিস্টারটা প্রায় ছিনিয়ে নিল রিচার্ড। আগ্রহের আতিশয্যে তুমুল গতিতে উল্টাতে শুরু করেছে একের পর এক পাতা—যেন “কিউ”তে হাজির হওয়ার জন্য কেউ সময় বেঁধে দিয়েছে ওকে।

‘আস্তে,’ সতর্ক করল রানা, ‘পাতা ছিঁড়ে গেলে কাজ বাড়বে।’

“কিউ”তে হাজির হওয়ামাত্র রিচার্ডের সব উৎসাহে ভাটা পড়ল যেন। ওই অক্ষরটা দিয়ে একটা এণ্ট্রিও নেই রেজিস্টারে।

হতাশ হয়ে রানার দিকে তাকাল রিচার্ড।

‘আবার ভাবতে বলবে তো আমাকে? তুমি বলার আগেই ভাবা হয়ে গেছে আমার। উচ্চারণের জন্য “কে”-এর আরেকটা বিকল্প হতে পারে ইংরেজিতে—একসঙ্গে “সি” এবং “এইচ” ’

‘যেমন “চক”!’

‘না, হাঁদারাম, যেমন “কেমিকেল” ।’

আরও একবার টর্নেডোর গতিতে “সি” এর পাতায় চলে এল রিচার্ড। “সি” এবং “এইচ” মিলিয়ে এণ্ট্রিগুলো দেখল, কিন্তু পাওয়া গেল না কামাসাকুকে।

‘হিরোহিতো,’ রিচার্ডের হাত থেকে রেজিস্টারটা নিতে নিতে বলল রানা, ‘শব্দটা “এইচ” দিয়ে। এণ্ট্রিটা ওভাবে দিয়েছিল কি না আমেরিকান সৈন্যরা, দেখি তো।’

“এইচ” দিয়ে অনেক নাম আছে, তাদের মধ্যে কর্নেলও আছে বেশ কয়েকজন; মজার ব্যাপার হচ্ছে, কর্নেল হিরোহিতো মিশিকাও নামের একজনকে পাওয়া গেল, কিন্তু যাকে খোঁজা হচ্ছে সে নেই।

হতাশ হয়ে বেঞ্চের পিঠে হেলান দিল রিচার্ড। ‘জীবনেও খুঁজে বের করা সম্ভব না লোকটাকে। একটা-দুটো কবর গোরস্থানে? ইসাটাবুর যুদ্ধে শত শত জাপানি সৈন্য মারা গেছে। তাদের সবাইকে যদি আলাদা আলাদা কবরে দাফন করা না-ও হয়ে থাকে, যদি ধরে নিই এখানেই গোর দেয়া হয়েছিল

কামাসাকুকে, তা হলেও কয়েক শ’ কবরের নামফলক পড়তে হবে আমাদের। সম্ভব কাজটা, বলুন? আমাদের হাতে অত সময় আছে? যে-কোনও সময় দ্বীপে হাজির হয়ে যেতে পারে কোয়া...’ আক্ষেপের কথা বলতে গিয়ে বেশি বলে ফেলছে টের পেয়ে চুপ হয়ে গেল সে।

রানা বুঝল, ঠিক অনুমান করেছিল ও। ‘কী, থেমে গেলে যে?’

জবাব দিল না রিচার্ড।

বেঞ্চের পিঠে হেলান দিল রানাও, বলল, ‘কামাসাকু জাপানি সেনাবাহিনীর সাধারণ কোনও সৈন্য ছিলেন না। বিশেষ একটা মিশনে, বিশেষ একজন অফিসার হিসেবে তাঁকে ইসাটাবুতে পাঠিয়েছিল জাপানি সেনাবাহিনী। ওদিকে তাঁর দূর সম্পর্কের ভাই, হারুকিচি হায়াকুটাকি একটা ডেস্ট্রয়ার নিয়ে ফিরে যাচ্ছিলেন জাপানে। হায়াকুটাকি জানতেন, ইসাটাবুতে আছেন তাঁর ভাই। তাই, যে-কোনওভাবেই হোক, রাজা শামানের গুপ্তধনের খোঁজ পাওয়ার পর, হাজির হন তিনি এ-দ্বীপে, যোগাযোগ করেন ভাইয়ের সঙ্গে, সব খুলে বলেন। লোভ জাগে কামাসাকুর মনে, অধীনস্থ সৈন্যদের মাধ্যমে গুপ্তধন উদ্ধারে সাহায্য করেন তিনি তাঁর ভাইকে। তারপর যুদ্ধে পরাজিত হয় জাপানিরা, দেশে ফেরত পাঠানো হয় হায়াকুটাকিকে। নিজের ঘনিয়ে-আসা পরিণতির কথা অনুমান করতে পারেন কামাসাকু।’

সামনে ঝুঁকল রিচার্ড। ‘একই কথা নিয়ে আবারও আলোচনা করছি কেন আমরা?’

‘কারণ আমাদেরকে শত শত কবরের মধ্যে খুব কম সময়ে খুঁজে বের করতে হবে কামাসাকুর কবরটা।’

‘কিন্তু...’

‘আগেও বলেছি, কামাসাকু সাধারণ কোনও অফিসার ছিলেন না। আমেরিকানরাও সাধারণ কোনও অফিসারের মতো আচরণ করেনি তাঁর সঙ্গে। ওরা ওদের মুঠোর ভেতরে পেতে চেয়েছিল

বইঘর.কম

তাঁকে, নিজেদের স্বার্থেই। অথচ দেখো, লোকটা আত্মহত্যা করার পর, তাঁকে কবর দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করেছে কবরের হদিস। কেন, বলো তো?'

'কেন?'

'কারণ যাতে বায়োলজিকাল ওয়ারফেয়ার ডেভেলপমেণ্টেও আগ্রহ ছিল আমেরিকার, সেটা জানাজানি না হয়—অন্তত ওই সময়ে, যখন গোপন ম্যানহাটন প্রজেক্টের মাধ্যমে আণবিক বোমার জন্ম দিচ্ছেন রবার্ট ওপেনহেইমার আর তাঁর শিষ্যরা।'

'জানাজানি হলে ক্ষতি কী ছিল?'

'তুমি আসলেই একটা হাঁদারাম। ম্যানহাটন প্রজেক্ট যে সফল হবে, তার কি গ্যারাণ্টি ছিল? যদি না হতো, জাপানিদেরকে ওদের উদ্ভাবিত ওষুধই গেলানোর মতলব করেছিল মার্কিনিরা।'

'আমার অতশত বুঝে কাজ নেই। কামাসাকুর কবর কোথায় আছে, বলুন।'

জবাব না দিয়ে রেজিস্টারের "সি"-এর পাতায় এল রানা। বলল, 'ইংরেজিতে কর্নেল বানান হচ্ছে সি ও এল ও এন ই এল। এই দেখো, ধূর্ত আমেরিকানরা কামাসাকুকে তাঁর নামের প্রথম বা শেষ শব্দ দিয়ে এণ্ট্রি করেনি রেজিস্টারে, বরং তাঁর র‍্যাঙ্ক দিয়ে এণ্ট্রি করেছে। কবরও দেয়া হলো, আবার কবর গোপনও করা হলো। আমার ধারণা, লোকটার কবরে কোনও নামফলক পাওয়া যাবে না।'

রেজিস্টারের পৃষ্ঠাটা ভালোমতো দেখে নিয়ে উঠে দাঁড়াল রিচার্ড, নিঃশব্দে হাসছে। 'কিন্তু কবরের নম্বরটা এখন জানা আছে আমাদের—চার শ' আটষট্টি। সেটা নিশ্চয়ই চার শ' সাতষট্টি আর চার শ' ঊনসত্তরের মাঝখানে হবে?'

উঠে দাঁড়াল রানাও। 'চলো, রেজিস্টারটা রেখে আসি জায়গামতো। ওই ঘরের ভেতরে শাবল আর গাঁইতি দেখেছি, ওগুলো নিতে হবে আমাদের।'

'অবশ্যই,' রিচার্ডের দাঁত দেখা যাচ্ছে এখনও, হাঁটতে শুরু

করেছে রানার পাশাপাশি। 'একটা কথা না বলে পারছি না, মিস্টার রানা। দুটো ব্যাপার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি আমি এখন। এক, কামাসাকুর কবরের ভেতরে এমন কিছু পাব আমরা, যা শেষপর্যন্ত গুপ্তধনের কাছে নিয়ে যাবে আমাদেরকে। দুই, আপনি যদি না থাকতেন, এবং মিস তানাঘাইকে যদি কিডন্যাপ না করতাম আমরা, কোনওদিনও নাগাল পেতাম না ওই গুপ্তধনের।'

'আমার উপকার স্বীকার করছ তা হলে?' হাঁটতে হাঁটতেই ঘাড় ঘুরাল রানা।

হা হা করে হেসে ফেলল রিচার্ড। 'কে বলল আপনার উপকার স্বীকার করছি? আমি তো দু'চোখে দেখতে পারি না আপনাকে।'

'আমি যতদূর জানি,' বলল হ্যালি, 'নিঃসঙ্গ লোক ছিল টনি। বউবাচ্চা ছিল না, পোসেইডনই ছিল ওর সংসার। একটা মাত্র বন্ধু ছিল ওর—মদ, তা-ও যখন কোনও কাজ থাকত না হাতে তখন।' দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'শেষপর্যন্ত ওর বন্ধুই ওর পিঠে ছুরি মারল।'

কিছু বলল না রিকার্ডো, ওর চোখের সামনে এখনও যেন ভাসছে গাড়ির নিচে টনির চাপা পড়ার দৃশ্যটা।

'রিকার্ডো? কিছু বলছ না যে?'

'মিস্টার কটন গেল। হেক্টর গেল। টনিও চলে গেল। আমরা যে-চারজন গিয়েছিলাম ইসাটাবুতে, তাদের মধ্যে বাকি আছি শুধু আমি।'

'কীসব আবোল-তাবোল বকতে শুরু করেছ?'

'একটা গুপ্তধনের পেছনে লেগেছিলেন মিস্টার রানা। তাঁর সঙ্গে স্থানীয় একটা মেয়ে ছিল। তাঁদেরকে বলতে শুনেছি, গুপ্তধনটা নাকি অভিশপ্ত। যে বা যারা ওটা উদ্ধার করার চেষ্টা করে, তাদেরই কোনও না কোনও ক্ষতি হয়। আমারও হবে।'

'পাগলামি থামাও তো, রিকার্ডো। তোমার কিছু হতে যাবে কেন?'

'কারণ আমিও নেমেছিলাম সলোমন সাগরের পানিতে। হেক্টরের সঙ্গে মিলে খুঁজে বের করেছি রাজা শামানের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ—পৃথিবী ভুলে গিয়েছিল যে-ইতিহাস। ঢুকেছি তাঁর গোপন চেম্বারে, যেখানে তিনি গুপ্তধন রেখেছিলেন বলে ধারণা করা হচ্ছিল। ধ্বংসাবশেষের ভেতরে আটকে পড়েছিলেন মিস্টার রানা, পরে তাঁকে উদ্ধার করি আমরা। চোখের সামনে মরতে দেখেছি গুণ্ডাবাহিনীর কয়েকজন লোককে।'

'গুণ্ডাবাহিনী?'

ইসাটাবুতে যাওয়ার পর থেকে শুরু করে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, সব বলল রিকার্ডো হ্যালিকে।

'মাই গড!' পায়চারি করতে শুরু করল হ্যালি। 'মাই গড! এসব তুমি কী বলছ?'

'বিশ্বাস করা না করা আপনার ইচ্ছা, স্যর।'

'মিস্টার রানা এখন কোথায়?'

'জানি না। ...ইসাটাবুতেই আছেন সম্ভবত।'

'আমি কি অ্যাডমিরালকে বলব মিস্টার রানার সঙ্গে যোগাযোগ করতে?'

'আপনার ইচ্ছা, স্যর।'

'কী ব্যাপার, এত হতাশ মনে হচ্ছে কেন তোমাকে, রিকার্ডো?'

'স্যর, যদি কিছু মনে না করেন, নুমা'র চাকরিটা ছেড়ে দিতে চাইছি আমি।'

'চাকরি ছেড়ে দেবে? বলো কী? কেন?'

'আমার কিছুই ভালো লাগছে না। কিচ্ছু না। মেরিন ভেসেলে করে সাগরে কম ঘোরাঘুরি করিনি আমি। একেবারে শুরুর দিকের কথা বাদ দিয়ে বললে কখনও কিছু হয়নি আমার, এবার হঠাৎ করেই পেয়ে বসল সী-সিকনেস। ভেবেছিলাম ধাক্কাটা সামাল দিতে পারব নিউযিল্যাণ্ডে ফিরে, কিন্তু কীসের কী? এখন মৃত্যুভয় ঢুকে গেছে আমার ভেতরে। মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখেছি

আমি, একাধিকবার, তা-ও মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে। প্রথমে পাঁচ গুণ্ডা, তারপর মিস্টার কটন আর হেক্টর, শেষে টনি।' মাথা নাড়ল রিকার্ডো। 'না, স্যর, এই চাকরি আমি আর করব না।'

'চাকরি না করলে...?'

'খাব কী, তা-ই তো? যেখানে বাঁচি না মরি তার কোনও ঠিক নেই, সেখানে খাওয়া-পরার চিন্তা করা বাতুলতা।'

'কোথায় যাবে?'

'মেক্সিকান-আমেরিকান সীমান্তে ফিরে যাব ভেবেছি। বেঁচে থাকতে পারলে কিছু একটা করে পেট চালিয়ে নিতে পারব আশা করি। টনির মতো আমারও বউবাচ্চা নেই, আর আমাকে এতিম করে দিয়ে বাপ-মা তো স্বর্গে গেছে সেই কবেই।'

'যেতে চাচ্ছ যাও, কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিয়ো না হুট করে। তুমি বরং কিছুদিনের ছুটি নাও। নিরিবিলিতে একা কয়েকটা দিন কাটাতে পারলে ভালো লাগতে পারে তোমার, আমি সেই ফাঁকে তোমার ব্যাপারে কথা বলব অ্যাডমিরালের সঙ্গে। তোমার মতো একজন দক্ষ ডুবুরিকে সহজে ছাড়তে চাইবেন না তিনি।'

কিছু বলল না রিকার্ডো।

'হিমঘরে ঢোকানো হয়েছে টনির লাশ,' প্রসঙ্গ বদল করল হ্যালি, 'পুলিশি ক্লিয়ারেন্স না পাওয়া পর্যন্ত দাফন করা যাচ্ছে না। মরার সময় ওর সঙ্গে যা কিছু ছিল, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সে-সব বুঝে নিতে হবে এখন আমাকে। ...আসবে নাকি?'

'না, স্যর, রক্তমাখা ওই জামাকাপড় আর দেখতে চাই না আমি।'

'ঠিক আছে...যা ভালো মনে করো।'

'পোসেইডনের ব্যাপারে কী করবেন, স্যর?'

'অ্যাডমিরাল যা করতে বলবেন, তা-ই। আমার ধারণা নতুন কাউকে পাঠাবেন তিনি। হয়তো সাময়িক দায়িত্বও দিতে পারেন ডারউইনের কাউকে।'

'আমার টুকটাক কিছু জিনিস রয়ে গেছে পোসেইডনে।

ওগুলো কি নিয়ে আসতে পারি আমি?'

'অবশ্যই। যেতে চাচ্ছ সেখানে?'

'জী।'

'যাও তা হলে। আমিও সেরে নিই হাতের কাজটা।'

রাস্তায় এসে রিকার্ডো ঠিক করল, বন্দর যেহেতু বেশি দূরে না, হেঁটেই যাবে সে পথটুকু। ট্যাক্সি ভাড়া বাঁচবে।

হাসপাতাল থেকে সিকি মাইল দূরে আসার পর মনে হলো ওর, কী যেন একটা জরুরি কথা বলতে ভুলে গেছে হ্যালিকে। চলার গতি ধীর করল সে, ভ্রূ কুঁচকে ভাবছে জরুরি কথাটা কী।

নাহ্, কিছুতেই মনে পড়ছে না।

সাত দশক লম্বা একটা সময়। তা ছাড়া কামাসাকুকে কবর দেয়ার কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল বাজে তক্তা দিয়ে বানানো কফিন, তাই ডালার পেরেক খোলার সময় জায়গায় জায়গায় চিড় ধরে গেল, অথচ খোলা গেল না একটা পেরেকও। উপায় না দেখে ডালাটা ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল রানা।

টুকরোগুলো সরিয়ে ফেলার পর দেখা গেল, বুকের ওপর দুই হাত ভাঁজ করে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে কামাসাকুর কঙ্কাল; নষ্ট হয়ে গেছে তাঁর সামরিক পোশাক। তবে, আশ্চর্যের ব্যাপার বুট দুটোর ফিতে নষ্ট হয়ে গেলেও প্রায় অক্ষত অবস্থায় আছে জুতো জোড়া।

কফিনের ভেতরে এখানে-ওখানে খুঁজছে রিচার্ড, কিন্তু কিছুই পেল না। চোখ তুলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে।

'তোমার দুই বিদ্রোহী বীরকে বলো,' বলল রানা, 'কামাসাকুর কঙ্কালটা সাবধানে ধরে উঁচু করতে। একজন ধরবে খুলি আর কাঁধের হাড়, অন্যজন দুই পা।'

ওর কথামতো কাজ করা হলো।

সঙ্গে সঙ্গে নিচের দিকে ঝুলে পড়ল কঙ্কালটার দুই হাত, কনুইয়ের জয়েন্টের কাছে টান লাগল, আলগা হয়ে পড়ে গেল কফিনের ভেতরে। যেখানে পড়েছে ওগুলো, সেখানে দেখা যাচ্ছে

কালো প্লাস্টিকের একটা প্যাকেট—দুমড়েমুচড়ে রাখা হয়েছে। প্যাকেটটা তুলে নিল রানা। কঙ্কাল নামিয়ে রাখল দুই মিউটিনিয়ার।

প্যাকেটটা খুলল রানা, ভেতরটা দেখে নিয়ে ঢুকিয়ে দিল একটা হাত। প্রথমেই বের হলো দুটো ব্যাজ, কামাসাকুর র‍্যাঙ্কের বাইরে বিশেষ কোনও অর্জন হবে হয়তো। কফিনের ভেতরে ও-দুটো রেখে দিল রানা। এরপর বের হলো একটা ফটোগ্রাফ—কোনও একটা বিয়ের অনুষ্ঠানের, সম্ভবত কামাসাকুরই। সাদাকালো ছবিটাতে হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় একটা সোফায় বসে আছে সে ওর নবপরিণীতা বউকে নিয়ে, পুতুলের মতো চেহারা মেয়েটার।

'এই যে,' রিচার্ডের চোখের সামনে ধরে ছবিটা নাচাল রানা, 'বিয়েশাদী করেছ কি না জানা হয়নি। যদি না করে থাকো, বয়স যেহেতু এখনও ফুরিয়ে যায়নি, চেষ্টা করে দেখবে নাকি?'

থাবা দিয়ে রানার হাত থেকে ফটোটা কেড়ে নিল রিচার্ড, ছুঁড়ে ফেলে দিল কফিনের ভেতরে। 'মেয়েদেরকে দু'চোখে দেখতে পারি না আমি।'

'তুমি কি কিছুই দু'চোখে দেখতে পারো না?' প্যাকেটের ভেতরে আবারও হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে রানা। 'চক্ষুবিশেষজ্ঞ কেউ কি নেই ইসাটাবুতে?'

জবাব দিল না রিচার্ড, চেহারা কালো হয়ে গেছে।

প্যাকেটটা ঘাঁটতে ঘাঁটতে বাদামি চামড়া দিয়ে মোড়ানো একটা নোটবুক বের করল রানা।

ওর হাত থেকে চিলের মতো ছোঁ মেরে নোটবুকটা নিয়ে নিল রিচার্ড। দ্রুত উল্টেপাল্টে দেখল ওটা, তারপর একের পর এক পাতা উল্টাল, শেষে সম্পূর্ণ হতাশ কণ্ঠে বলল রানাকে, 'জাপানি ভাষা! যা লিখেছে সবই জাপানি ভাষায় লিখেছে কামাসাকু!'

প্যাকেটটার ভেতরে আর কিছু নেই নিশ্চিত হয়ে ওটা কফিনের ভেতরে রেখে দিল রানা। বলল, 'কেন, তুমি কি

বইঘর.কম

ভেবেছিলে, তোমার কথা চিন্তা করে আজ থেকে সত্তর বছর আগে বিশুদ্ধ ইংরেজিতে লিখে রেখে যাবে কামাসাকু তোমার সমস্যার সমাধান?'

'তা হলে এখন কী করব আমরা? আমি নিজে জাপানি ভাষা জানি না, সারা সলোমন দ্বীপপুঞ্জের কেউ জানে কি না সন্দেহ। কীভাবে জানতে পারব...'

'তোমার কম্পিউটারের সঙ্গে একটা স্ক্যানার থাকার পরও হতাশায় এভাবে বুক চাপড়াচ্ছ কেন, বুঝলাম না। চাবি ছাড়া যেমন তালা হয় না, সমাধান ছাড়া তেমনি সমস্যাও হয় না।'

ওপরে উঠে এল ওরা চারজন; কামাসাকুর কঙ্কালটাকে গোর দিয়ে ফিরে এল পার্কের সদরদরজার কাছে। খেয়াল করল, এখনও কেউ নেই কোথাও। কেমন একটা অস্বস্তিবোধ পেয়ে বসল রানাকে। রাস্তাটা পার হওয়ার সময়, সেডানটার দিকে তাকিয়ে, বুঝতে পারল কেন ও-রকম লাগছে ওর।

সীটে বসে আছে ড্রাইভার লোকটা, কিন্তু তার বসে থাকার ভঙ্গি খুবই অস্বাভাবিক—দেখে মনে হচ্ছে যেন জোর খাটিয়ে কাজটা করতে হচ্ছে তাকে; বুকের ওপর মাথা ঝুলে পড়েছে।

ছুটে গেল ওরা সবাই।

সাইলেন্সারওয়ালা পিস্তল দিয়ে পিছন থেকে একবার মাত্র গুলি করা হয়েছে ড্রাইভারকে, খুঁজলে এখনও হয়তো পাওয়া যাবে ওর মগজে গেঁথে থাকা বুলেটটা। রক্তের মোটা ধারা নেমে গেছে লোকটার ঘাড় বেয়ে নিচের দিকে।

হতবাক হয়ে রানার দিকে তাকাল রিচার্ড, লোকটার দৃষ্টিতে একইসঙ্গে বিস্ময় আর প্রশ্ন।

প্রশ্নটা পড়তে পারল রানা।

সারাটা সময় ও রিচার্ডদের সঙ্গেই ছিল; তা হলে কে খুন করল ড্রাইভারকে?

আটাশ

যে-পাতাগুলোয় কিছু লেখা হয়নি, সেগুলো ছাড়া পুরো নোটবুকটা স্ক্যান করে ফেলল রানা। পিডিএফ ফাইলটা রায়হানের কাছে পাঠাতে গিয়েও সিদ্ধান্ত বদল করল—রায়হান জাপানি ভাষা জানে না, সুতরাং হয় ইণ্টারনেটের সাহায্য নিতে হবে রায়হানকে, নয়তো দ্বারস্থ হতে হবে কোনও জাপানি ভাষা বিশেষজ্ঞের। তারচেয়ে, রানা নিজে যদি নেটে বসে, দ্রুত কাজ হতে পারে।

কীভাবে কী করা যেতে পারে ভেবে ফেলল ও, তারপর ফাইলটার একটা কপি রিচার্ডের ডেস্কটপে সেইভ করে মুখোমুখি হলো লোকটার। 'কী যেন লিখেছিলে আমাকে পাঠানো কার্ডটাতে? আমি সন্দিহান করে তুলেছিলাম তোমাকে, তা-ই না? পারলে এবারও একই কথা বলো।'

কিছু বলল না রিচার্ড, থমথম করছে ওর চেহারা।

'তোমার দলের মধ্যে কেউটে সাপ আছে, রিচার্ড?'

'কীভাবে সম্ভব সেটা? ওদের প্রত্যেককে চিনি আমি। ওদের প্রত্যেকের নাড়িনক্ষত্রের খবর জানি। ওদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যতটা কঠোর হওয়া সম্ভব আমার পক্ষে, হই। তারপরও...'

'তোমার কোনও মিউটিনিয়ার কি সাইলেন্সারওয়ালা পিস্তল ব্যবহার করে?'

'না। সেটাই ভাবিয়ে তুলছে আমাকে। বাইরের কারও শুধু শুধু খুন করার কথা না আমার দলের কাউকে। কোনও মিউটিনিয়ার যদি বাইরের কাউকে দিয়ে...'

‘ড্রাইভার লোকটার সঙ্গে ঝগড়া ছিল কারও?’

‘সে-রকম তো টুকটাক চলতেই থাকে সবসময়। কিন্তু...সিরিয়াস কোনওকিছুর কথা শুনিনি কখনও।’

‘তা হলে আর কী, ফুগুইকে খবর দাও। সে তো তোমারই লোক। তদন্ত শুরু করুক। ...আমি কি আপাতত হোটেলে ফিরে যেতে পারি? দুপুর হয়ে গেছে, খিদেও লেগেছে। সেই সকাল থেকে রোদে পুড়ে ঘামে ভিজে কাজ করেছি, গোসল না করলেই নয়।’

‘ঠিক আছে।’

উঠতে গিয়েও উঠল না রানা। ‘তোমার সুযোগ্য শিষ্যদের খবর কী, বলো তো। নতুন কোনও খুনখারাপি করেছে ওরা?’

‘জেমার্কের পর আর না।’

‘আরও করার ইচ্ছা আছে?’

‘আছে একটা, তবে অন্যরকম।’

‘কী?’

‘আপনাকে বলা যাবে না।’

‘বললে কী হবে? খাঁচায় বন্দি বাঘ কারও ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে পারে না।’

‘তবুও বলব না। এটা আমাদের সিক্রেট। এবং সেটা যদি সফলভাবে করতে পারি, সোগাভের তো সোগাভের, ওর মরা বাপও কবর ছেড়ে উঠে এসে ইসাটাবুর সব খনিজসম্পদ তুলে দেবে আমাদের হাতে।’

‘শিয়োর?’

‘এক শ’ ভাগ।’

‘যে-প্রলয়কাণ্ডের কথা বললে, ধরো সেটার পরও ইসাটাবুর খনিজসম্পদ পেলে না। তখন কী করবে?’

‘কাণ্ডটার রেযাল্ট দেখি আগে, তারপর সিদ্ধান্ত নেব। এখন আমাদের প্রথম টার্গেট গুপ্তধন।’

‘কোয়ালিশন ফোর্স আসার খবরে তোমাদের প্ল্যানিং-এ মনে

হয় গড়বড় হয়ে গেছে, না?'

'বুঝেই যখন গেছেন, তখন জানতে চাইছেন কেন?'

'কারণ তোমার মতো এক শ' ভাগ নিশ্চিত হতে চাই,' উঠে দাঁড়াল রানা। 'যত তাড়াতাড়ি পারি হোটেল থেকে ফিরে আসব আমি। স্ক্যানকরা ফাইলটা রেখে গেলাম তোমার ডেস্কটপে, কেউ যেন ঘাঁটাঘাঁটি না করে। ফিরে এসে কাজ করব ওটা নিয়ে।'

এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছে রিকার্ডো।

বেশি সময় বাকি নেই আর, একটু আগেও মাইকে ঘোষণা করা হয়েছে ঠিক কখন ছাড়বে আমেরিকাগামী প্লেনটা।

মনমরা হয়ে আছে রিকার্ডো এখনও। মনে পড়ে যাচ্ছে টনিকে। মনে পড়ে যাচ্ছে লোকটার গাড়িচাপা পড়ার দৃশ্যটা। মনে পড়ে যাচ্ছে ঘাতক গাড়িরই পেছনের সীটে বসে ছিল সে টনিকে জড়িয়ে ধরে। মনে পড়ে গেল, মুমূর্ষু লোকটা বার বার বলছিল, 'মানিব্যাগ, চিরকুট! মানিব্যাগ, চিরকুট!'

'মাই গড!' বিড়বিড় করে বলে উঠল রিকার্ডো, লাগেজ ফেলে রেখে ছুট লাগাল টেলিফোন বুথের দিকে।

যে-জরুরি কথা বলতে ভুলে গিয়েছিল সে হ্যালিকে, মনে পড়ে গেছে সেটা।

রিচার্ডের অফিসে ফিরে এসেই কাজে লেগে গেল রানা।

প্রথমেই চলে গেল গুগলে, জাপানিয ল্যাঙ্গুয়েজ লিখে সার্চ দিল। উইকিপিডিয়াসহ বেশ কয়েকটা ডকুমেন্ট পড়ল মনোযোগ দিয়ে, মোটামুটি একটা ধারণা নিল জাপানি ভাষার ওপর। আবার গেল গুগলের সার্চ বারে, টাইপ করল: "ফ্রম পিডিএফ টু টেক্সট কনভার্টার ইন জাপানিয"।

পাওয়া গেল বেশ কয়েকটা কনভার্টার। কিন্তু তালিকাটার প্রথম দিকের সফটওয়্যারগুলো কিনতে হলে পে করতে হবে অনলাইনে, এবং যেহেতু সে-সুবিধা নেই এখন, ফ্রি কোন্‌টা আছে

খুঁজতে লাগল ও।

কাজ করতে করতেই বলল রানা, 'অসহ্য গরম!'

'ঠিক বলেছেন,' বলল রিচার্ড।

'তা হলে জানালা-দরজা খুলে দিচ্ছ না কেন?'

ম্যাগাযিনটা রেখে দিয়ে ঘরের জানালা ও দরজা খুলে দিল রিচার্ড।

'খবর দিয়েছিলে ফুগুইকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দিয়েছিলাম।'

'এসেছিল লোকটা?'

'না। বলল, ড্রাইভারের বদলে যদি সোগাভেরও খুন হতো, স্টেশন ছেড়ে কোথাও যেতে পারত না সে—ওর ওপরওয়ালাদের নাকি নিষেধ আছে।'

আর কিছু বলল না রানা, কাজে মনোযোগ দিল। একটা ফ্রি কনভার্টার খুঁজে পেল ও, তবে ওটা ডাউনলোড করতে হবে চব্বিশ ঘণ্টার ট্রায়াল চুক্তিতে রাজি হয়ে, সময়টা শেষ হয়ে গেলে কার্যকারিতা হারাবে সফটওয়্যারটা; তখন, যদি ব্যবহারকারীর ইচ্ছে থাকে, কিনতে হবে। 'আশা করছি চব্বিশ ঘণ্টার অনেক আগেই কাজ শেষ হয়ে যাবে আমার,' মনে মনে বলল ও।

ডাউনলোড করে নিল সফটওয়্যারটা, কনভার্শন অপশনে গিয়ে চিনিয়ে দিল ডেস্কটপে রাখা পিডিএফ ফাইলটাকে, তারপর "ওকে" লেখা আইকনে ক্লিক করল।

বালিঘড়ির মাউস কার্সর ব্যবহার করছে রিচার্ড ওর কম্পিউটারে, ঘড়িটা বার বার উল্টাচ্ছে-পাল্টাচ্ছে, কেটে যাচ্ছে মিনিটের পর মিনিট, কিছুই হচ্ছে না।

অল্ট-কন্ট্রোল-ডিলিট একসঙ্গে চেপে টাস্ক ম্যানেজার খুলল রানা, গলা টিপে মারল কনভার্টার সফটওয়্যারটাকে, রিস্টার্ট করল কম্পিউটার, তারপর কনভার্শনের চেষ্টা করল আবার।

এবারও একই অবস্থা।

'সমস্যা কী?' জানতে চাইল রিচার্ড।

মাথা নাড়ল রানা। 'বুঝতে পারছি না। কনভার্টারটা বোধহয়...এত বড় ফাইল নিতে পারছে না একবারে।'

'তা হলে?'

জবাব না দিয়ে আবারও কম্পিউটার স্টার্ট করল রানা, হাতে নিল কামাসাকুর নোটবুকটা। স্ক্যান করতে শুরু করল একটা করে পাতা। স্ক্যান করছে, কাজটা শেষ হয়ে গেলেই ব্যবহার করছে কনভার্টার সফটওয়্যারটা।

হ্যাঁ, এবার প্রতিটা পিডিএফ ফাইলকে সফলভাবে টেক্সট ফাইলে রূপান্তর করা যাচ্ছে। কামাসাকুর পুরো নোটবুকের একটা টেক্সট ফাইল পাওয়ার পর চেয়ারে পিঠ ঠেকাল রানা।

'এবার?' জিজ্ঞেস করল রিচার্ড।

ওর দিকে তাকাল রানা। 'তুমি বোধহয় তোমার বিদ্রোহী বীরদের নিয়ে এত ব্যস্ত থাকো যে, দীনদুনিয়ার কোনও খবর রাখার সময় পাও না। গুগল ট্রান্সলেটরের নাম শুনেছ?'

'শুনেছি, কিন্তু কখনও কাজ করিনি।'

'আমি করব এখন, দেখে শিখে নাও।'

জাপানি ভাষার প্যাটার্নটা মনে আছে রানার, তারপরও কাজের সুবিধার্থে ওয়েব ব্রাউযারের হিস্টরিতে গিয়ে চোখ বুলিয়ে নিল আগে-পড়া ডকুমেন্টগুলোর ওপর। সেই অনুযায়ী, টেক্সট ফাইলটা থেকে প্রয়োজনীয় ডাটা কপি করে করে পেস্ট করতে লাগল গুগল ট্রান্সলেটরের উইণ্ডোতে—জাপানিয থেকে ইংলিশ অপশনটা সিলেক্ট করেছে আগে। ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে-যাওয়া ডাটা কপি করে করে পেস্ট করছে আরেকটা নতুন ওয়ার্ড ফাইলে।

ওর কাজ কিছুক্ষণ দেখার পর রিচার্ড বলল, 'আপনি তো...প্রথমেই পিডিএফ থেকে কপি করে গুগলে বসাতে পারতেন শব্দগুলো।'

'চেষ্টা করেছিলাম, কাজ হয়নি। তোমার পিডিএফের ভার্সনটা বেশি পুরনো, কপি-পেস্টের অপশন সাপোর্ট করছিল না

ঠিকমতো। তা ছাড়া,' ধাপ্পাবাজিটা দেবে কি না ভাবতে ভাবতে বলেই ফেলল রানা, 'যতদূর জানি, পিডিএফ অথবা ও-রকম কোনও ফরম্যাট থেকে কপি করে গুগলে পেস্ট করলে ফল পাওয়া যায় না নিখুঁতভাবে, যতটা পাওয়া যায় ওয়ার্ড ফাইলের বেলায়।'

কিছু বলল না রিচার্ড, কম্পিউটারের ব্যাপারে তত পাকা নয় সে। চুপ করে থেকে একটানা অনেকক্ষণ কাজ করার সুযোগ দিল রানাকে। তারপর জানতে চাইল, 'কিছু বুঝতে পারছেন?'

'বিরক্তিকর।'

'মানে?'

'একঘেয়ে সব কথা লিখে রেখেছে কামাসাকু। বন্দি অবস্থায় যেহেতু কোনও কাজ ছিল না ওর, হাস্যকর কবিত্ব পেয়ে বসেছিল ওকে, তাই কবিতা চর্চার নামে ছেলেমানুষি করেছে কোনও কোনও জায়গায়।'

'বিশেষ কিছু নজরে পড়ল আপনার?'

'বিশেষ কিছু? না, কথাটা দিয়ে যা বোঝাতে চাইছ তুমি সে-রকম কিছু পাইনি এখনও, অথবা পেলেও আমার নজর এড়িয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, লোকটার বর্ণনাভঙ্গি সত্যি অদ্ভুত। অথবা...হতে পারে গুগল ট্রান্সলেটর ব্যবহার করছি বলে ও-রকম মনে হচ্ছে আমার কাছে। যা-ই হোক, অর্ধেক কাজও শেষ হয়নি এখনও, আগেভাগেই কিছু বলাটা উচিত হবে না। ধৈর্য ধরো।'

'ধৈর্য ধরেছি বলেই তো এখনও বেঁচে আছে মিস তানাঘাই, বেঁচে আছেন আপনি নিজে। তবে মুশকিলটা কোথায়, জানেন? কোয়ালিশন ফোর্সের কথা যতবার মাথায় আসছে আমার, ততবার ধৈর্যহারা হয়ে যাচ্ছি আমি।'

'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়—জানো তো? শেষপর্যন্ত কোয়ালিশন ফোর্সের গুলিতেই না মরতে হয় তোমাকে!'

'কে কার গুলিতে মরে সেটা দেখা যাবে পরে। কামাসাকুর

কথা বলুন। আপনার কি এখনও মনে হচ্ছে, নিজের নোটবুকে গুপ্তধনের কথা বলে গেছে লোকটা? কাজটা কেন করতে যাবে সে? গুপ্তধনের কথা কাকে জানানোর ছিল ওর?'

'কেন, ফুটফুটে জাপানি মেয়েটার কথা ভুলে গেছ এত তাড়াতাড়ি? হয়তো অনেক দোষ ছিল কামাসাকুর, কিন্তু সন্দেহ নেই বউকে ভালোবাসত সে, তা না হলে নিজের বিয়ের ছবি সঙ্গে নিয়ে ইসাটাবুতে আসত না। যখন আমেরিকানদের হাতে বন্দি ছিল সে, বুঝতে পারছিল ভালোমন্দ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে ওর, যদি বলি তখন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল গুপ্তধনের কথা ইঙ্গিতের মাধ্যমে জানিয়ে যাবে মেয়েটাকে, তা হলে? ...ও, তুমি তো আবার মেয়েদেরকে দু'চোখে দেখতে পারো না, তুমি এসবের কী বুঝবে? ...আবার...হতে পারে, অন্য কারও জন্য কিছুই লেখেনি কামাসাকু, যা লিখেছে নিজের জন্যই লিখেছে। কারণ, হয়তো ভেবেছিল, যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর কখনও না কখনও ফিরতে পারবে ইসাটাবুতে, তখন ওর ইঙ্গিত ওরই কাজে লাগবে।'

'তারমানে আপনি বলছেন কামাসাকুর নোটবুকে কোনও না কোনও ইঙ্গিত আছে?'

'পড়ে শেষ করতে দাও আগে, তারপর জবাব দিচ্ছি তোমার প্রশ্নের।' মনিটরের দিকে তাকাল রানা।

রিচার্ডের মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। কল রিসিভ করে কিছুক্ষণ পিজিন ভাষায় কথা বলল সে। তারপর রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'খারাপ খবর আছে একটা।'

ঘাড় ঘুরাল রানা। 'তোমাদের সেই প্রলয়কাণ্ডের পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে নিশ্চয়ই?'

'মারা গেছে রাউনু।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা। 'কীভাবে?'

'স্বাভাবিক মৃত্যু। আপনি নিজেই তো দেখে এসেছেন, অনেক বয়স হয়েছিল লোকটার। ওর সঙ্গে যে কথা বলতে পেরেছিলেন, সেটা আমার-আপনার দু'জনেরই সৌভাগ্য।'

বইঘর.কম

আর কোনও কথা বলল না রানা, বিকেল পর্যন্ত কাজ করে গেল একটানা। তারপর গ্লাস থেকে কয়েক ঢোক পানি খেয়ে আবার পিঠটা এলিয়ে দিল চেয়ারে। ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলার জন্য আড়মোড়া ভাঙল।

'কী জানতে পারলেন?' তীর্থের কাকের মত শোনাল রিচার্ডের গলা।

ম্যাক্সিমাইয আইকনে ক্লিক করে ইংরেজিতে অনূদিত ওয়ার্ড ফাইলটা বড় করে দিল রানা, উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। 'এসো, সিংহাসন গ্রহণ করো তোমার। একটু কষ্ট করে নিজেই পড়ে দেখো। একটানা বসে থাকতে থাকতে পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে আমার, একটু পায়চারি না করলেই নয়।'

ডকুমেন্টটা আদ্যোপান্ত দু'বার পড়ল রিচার্ড, কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত "ক্লু" খুঁজে না পেয়ে হতাশ দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে। 'এসব কী? মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমার! হারামি লোকটা তো ওর বন্দিজীবনে কোথায় কী খেয়েছে, কোথায় মুতেছে, কোথায় হেগেছে—এসব ছাড়া আর কিছু লেখেনি! ও, হ্যাঁ...লিখেছে...ছাগলামি-পাগলামি মার্কা কিছু কবিতা।'

'কবিতাগুলো কি পড়ে শোনাবে আমাকে?'

ঘাড় ঘুরিয়ে রানার দিকে তাকাল রিচার্ড। 'কী বলছেন আপনি? ওসব ছাইপাঁশ শুনতে চাচ্ছেন? তা-ও আবার আমার মুখ থেকে?'

'হ্যাঁ। সময় নষ্ট কোরো না।'

রাগ সামলানোর জন্য কিছু একটা ভেঙে ফেলতে ইচ্ছা করছে রিচার্ডের, কিন্তু জোর করে নিজেকে সামলে রেখে বলতে লাগল, 'প্রথম কবিতার নাম, গ্রামের চেরি গাছ। ...ইদানীং খুব স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েছি আমি। কেন যেন বার বার মনে পড়ে যায় আমাদের গ্রামটার কথা। কারণ চেরি ফুল খুব পছন্দ করি আমি। সারা জাপানে, যতদূর ঘুরে দেখেছি, কোথাও চেরি গাছ দেখিনি; কিন্তু সেই গ্রামে আছে। আমি গ্রামটাকে দেখেছিলাম

চেরি ফুলে শোভিত অবস্থায়। প্রিয়তমা, রাজি হও, অন্তত একবারের জন্য হলেও—তোমাকে সঙ্গে নিয়ে দাঁড়াতে চাই আমি সেই গাছের নিচে, চেরি ফুলে শোভিত অবস্থায় দেখতে চাই নগ্ন তোমাকে, ঠিক সেই গাছটার মতো। ...শেষ।'

'কী বুঝলে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বুঝলাম, বউকে জাপানে রেখে ইসাটাবুতে এসে কামুক কামাসাকুর মাথাটা, অথবা অন্যকিছু একটা, সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল না।'

'আচ্ছা। তারপর?'

'তারপরের কবিতার নাম সর্পিলাকার পথ। পড়ব?'

'কেন নয়?'

'তোমার স্মৃতি যেন সাপের মতো। যদি জড়পদার্থ হয়ে যাই, কিছু বলে না। যদি হাঁটি, পিছু নেয়। যদি বসে পড়ি, ছোবল দেয়। যদি শুয়ে থাকি, পেঁচিয়ে ধরে। তারপরও, সর্পিলাকার কোন্ পথ ধরে যে ঢুকে পড়ো তুমি আমার মনে, বুঝি না। ...শেষ।'

'কী বুঝলে?'

'বিশ্বাস করুন, কামাসাকু যদি এখন বেঁচে থাকত, আর আমার হাতে পড়ত, ওকে আমি...পেঁচিয়ে ধরে...থাক, বাকিটা বলে মুখ খারাপ করতে চাই না।'

'তোমার মুখ ভালো ছিল কোন্ কালে? ...তারপরের কবিতার নাম কী?'

'ঝরনা ছাড়িয়ে।'

'পড়ো।'

'মিস্টার রানা, ফালতু কাজে সময় নষ্ট না করে...'

'পড়তে বলেছি।'

'কাল রাতে স্বপ্নে দেখলাম, দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছ তুমি আমার দিকে। আমি সেই হাত দুটো ধরামাত্র, মুহূর্তের মধ্যে, যেন স্বর্গে হাজির হলাম আমরা। খুব হাসছি দু'জনে, ছুটে বেড়াচ্ছি,

গান শোনানো একটা ঝরনা ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছি দূরে, আরও দূরে, যত দূরে সম্ভব। আমরা দু'জনই নগ্ন, দু'জনের চোখেই ঘোর, আমাদের যৌবন যেন বাঁধ ভেঙেদেয়া বন্যা।'

'মুখ খারাপ করার ইচ্ছাটা কি এখনও আছে তোমার?'

জবাব দিল না রিচার্ড, রানার দিকে তাকালও না।

'আসলে মাথা গরম হয়ে আছে তোমার, তাই কামাসাকুর বাতলে-দেয়া দিকনির্দেশনা পড়েও বুঝতে পারছ না।'

এবার রানার দিকে তাকাল রিচার্ড। 'দিকনির্দেশনা?'

হেঁটে গিয়ে খোলা জানালার সামনে দাঁড়াল রানা। বিকেলের আলো মরে আসছে, কারণ মেঘ জমছে আকাশে। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বলল, 'যে-ক'টা কবিতা পড়েছ সেগুলোর নাম খেয়াল করোনি? আপাতদৃষ্টিতে পাগলামি মনে হচ্ছে, কিন্তু কোত্থেকে যাত্রা শুরু করে কোথায় যেতে হবে তা কিন্তু বলে দিয়েছে কামাসাকু।'

ঝট্ করে মনিটরের দিকে তাকাল রিচার্ড। 'গ্রামের চেরি গাছ...সর্পিলাকার পথ...ঝরনা ছাড়িয়ে...। কিন্তু...জাপানের কথা আসছে কেন?'

'ধোঁকাটা তো সেখানেই দিয়েছে লোকটা। সারা জাপানের যতদূর সে ঘুরবে, চেরি গাছ দেখবে না—তা কি হয়? কিন্তু আমরা যদি ধরে নিই জাপান বলতে আসলে ইসাটাবু বুঝিয়েছে সে, তা হলে? তুমি অনেকদিন ধরে আছো ইসাটাবুতে, বলো তো, এখানে চেরি গাছ আছে কি না?'

'আছে তো। সংখ্যায় খুব কম হলেও, আছে।'

'ওটাই বুঝিয়েছে কামাসাকু। ইসাটাবুর যতদূর ঘুরেছে সে, কোনও চেরি গাছ দেখেনি, কিন্তু যে-গ্রামে যেতে হবে আমাদের, সেখানে এমন একটা চেরি গাছ আছে, যেটার নিচে বা কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালে একটা সর্পিলাকার পথ বা ট্রেইল দেখা যাবে। ...বুঝতে পারছ?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে আছে রিচার্ড, চোখ

পিটপিট করছে। চট করে আবার তাকাল মনিটরের দিকে, দ্রুত নজর বুলাচ্ছে তিন নম্বর কবিতাটার ওপর। বলল, 'ওই ট্রেইল ধরে গেলে একটা ঝরনা পাওয়া যাবে, তারপর...'

'তারপর কী আছে জানতে হলে চার নম্বর কবিতাটা পড়তে হবে।'

'কবিতার নাম গুহা...জীবন একটা গুহার মতো। যখন সেখানে ঢোকো তুমি, তখন আসলে জন্ম হয় তোমার। সেই গুহার দু'দিকের দেয়ালের নাম নিয়তি, মাটির মেঝের নাম ভাগ্য, আর তোমার এগিয়ে চলার নাম প্রচেষ্টা। গুহাটার শেষপ্রান্তে আরেকটা ফোকর আছে, নাম মৃত্যু। তুমি যতই...আর পড়ব না...সব ফালতু কথা...আমি বুঝে গেছি! সর্পিলাকার পথটা ধরে এগোলে একটা ঝরনা পাওয়া যাবে। ওটা ছাড়িয়ে গেলে পাওয়া যাবে একটা গুহা। আর সেই গুহার ভেতরই আছে...হ্যাঁ, এই তো, পাঁচ নম্বর 'কবিতায় ঠিক সেই কথাই বলছে কামাসাকু...সম্পদ...এসো, তোমার জন্য সাজিয়েছি আমি আদিম বাসর; মাটির ঘরে, মাটির বিছানায়; একত্রিত করেছি আমার যৌবনসম্পদ—তোমাকে প্রেম দেব বলে।' হা হা করে হেসে উঠল রিচার্ড। 'মিস্টার রানা, বলেছিলাম না, যদি কেউ খুঁজে বের করতে পারে শামানের গুপ্তধন তা হলে সে একমাত্র আপনি? আমার কথা সত্যি হয়েছে।' উঠে দাঁড়াল। 'চলুন তা হলে আমার সঙ্গে সেই মাটির ঘরে, মাটির বিছানায়।' ড্রয়ারের তালা খুলে ভেতর থেকে বের করল ওর রিভলভার। 'গুপ্তধন হাতে পাওয়ার পর আপনাকেও প্রেম দেব আমি।' অট্টহাসি হাসল আবারও।

একটা ভ্রূ উঁচু করল রানা। 'হঠাৎ রিভলভার?'

'কেন, ভয় লাগছে? শেষ একটা খেল্ দেখানো বাকি আছে দ্য মিউটিনিয়ার্সের, বলেছি আগেও; আপাতত যেহেতু চুপ মেরে গেছি আমরা, সেহেতু কড়াকড়ি কমিয়েছে রয়্যাল পুলিশও। রোডব্লকের সংখ্যা কমানো হয়েছে, ইসাটাবুর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও তেমন বাড়াবাড়িও করছে না পুলিশ।'

‘কিন্তু জেমার্কের সমর্থকরা? ওদের তো এত সহজে পিছিয়ে যাওয়ার কথা না।’

আবারও দাঁত দেখা গেল রিচার্ডের। ‘পিছিয়ে গেছে ওরা, কারণ আমরা রটিয়ে দিয়েছি, ধরা পড়েছে দু’জন লোক—যারা জেমার্কের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল।’

‘মানে?’

‘বৃহত্তর স্বার্থে ছোট্ট একটা কোরবানি দিয়েছি আমি। আমার যে-দু’জন লোক গুলি করেছে জেমার্ককে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছিল ফুগুই।’

‘হয়েছিল?’

মাথা ঝাঁকাল রিচার্ড। ‘কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, ওদেরকে নিয়ে যখন পুলিশ স্টেশনে ফিরছিল ফুগুই, কে বা কারা যেন গুলি করে মেরে ফেলেছে লোক দুটোকে।’

কিছু বলল না রানা, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রিচার্ডের দিকে।

‘পুলিশের দ্রুত সাফল্য ঘরে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছিল জেমার্কের সমর্থকদের, এখন বিভ্রান্ত হয়ে গেছে তারা। এখন বলা হচ্ছে, আই মীন বলানো হচ্ছে, জেমার্ক আসলে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের শিকার। মিস্টার রানা, আপনি জানেন কি না জানি না, আন্তর্জাতিক শব্দটা শুনলে, অস্বস্তি বোধ করে ইসাটাবুর বাসিন্দারা—যে যত বড় দেশপ্রেমিকই হোক না কেন। কারণ আন্তর্জাতিক রাজনীতির বেড়াজালে এখনও বন্দি হয়ে আছে সলোমন দ্বীপপুঞ্জ।’

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। ‘নোংরা রাজনীতিতে তোমার মাথা ভালো কাজ করে। যা-হোক, এবার একটু অন্যভাবে গুপ্তধন উদ্ধার করতে যেতে চাই আমি।’

‘অন্যভাবে?’

‘সেডানে করে যাব না আর। ওটার পেছনের সীটে ঠিকমতো জায়গা হয় না তিনজনের, এত গরমে ঠাসাঠাসি করে বসতে ইচ্ছা

করে না। তা ছাড়া দুর্গম রাস্তায় চলার উপযোগীও না গাড়িটা।'

'তা হলে?'

'একটা জিপ ভাড়া করো তোমরা তোমাদের জন্য।'

'আর আপনি?'

'ভাউযার বাইকটা ব্যবহার করব আমি। সেণ্ট্রাল হাসপাতালের পার্কিং লটে থাকার কথা ওটার।'

'মিস্টার রানা...'

হাত তুলে রিচার্ডকে থামিয়ে দিল রানা। 'পুরনো কথা তুলে লাভ নেই। রেমি যতক্ষণ বন্দি আছে, আমি কোনও ফন্দি করব না। যদি করতাম, তা হলে গুপ্তধনের খোঁজ জানাতাম না। বিশ্বাস করতে পারো কথাটা।'

ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর রিচার্ড বলল, 'ঠিক আছে, বিশ্বাস করলাম।'

'টুকটাক কিছু জিনিস কেনার দরকার আমাদের। কামাসাকু যে-সময়ে কবিতা লিখেছে, তখন ওর বলা পথগুলোর যে-অবস্থা ছিল, এই সাত দশকে সেসব বদলে গেছে অনেক। যদি কোথাও কোনও প্রতিবন্ধকতা থাকে, সরাতে হবে আমাদেরকেই।'

'মানলাম। জিপ ভাড়া নেয়ার ব্যবস্থা করছি আমি, ওটা নিয়ে চলে যান সুপার স্টোরে, যদি খোলা পান তা হলে যা যা লাগে কিনবেন—কোনও মানা নেই আমার পক্ষ থেকে।'

'তোমার লোকদের বলে দিয়ো, জিপটা যেন সেণ্ট্রাল হাসপাতালে নিয়ে যায় আমাকে। ওখান থেকে একটা পাম্পে যাব আমি—ট্যাঙ্ক ভর্তি করে তেল নিতে হবে ভাউযার বাইকে।'

'ঠিক আছে।'

খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে ইঙ্গিত করল রানা। 'তুমি চাইলে আগামীকাল ভোরে রওনা হতে পারি আমরা—আবহাওয়া ভালো না।'

'আমি চাইছি না সেটা।'

আর কিছু না বলে দরজার উদ্দেশে রওনা হলো রানা।

'মিস্টার রানা?' পিছু ডাকল রিচার্ড।

থামল রানা, ঘুরে তাকাল।

'বাইকটা নিতে চাচ্ছেন আপনি, নিন, আমার অসুবিধা নেই; তবে আমি চাই না আপনি সওয়ার হন ওটাতে। আমি চাই, জিপের পেছনের সীটে আমার পাশে বসবেন আপনি।'

'তা হলে বাইকটা চালাবে কে?'

'নাম বললে তো চিনবেন না, তবে সে যে আমার লোক সে-ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন। ওর পেছনে আরেকজন থাকবে।'

'তোমরা মোট ক'জন যাচ্ছ আমার সঙ্গে?'

'জিপের ড্রাইভারসহ পাঁচ। আপনাকে নিয়ে জিপের পেছনের সীটে বসব শুধু আমি, ঠাসাঠাসি হবে না।'

রিচার্ডের দিকে একটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর বলল, 'তোমার বিশ্বাস যে এত নড়বড়ে, জানতাম না।'

'চিরকুটটা টনির মানিব্যাগের ভেতরে আছে?' আগেও জিজ্ঞেস করেছিল, এখন আরও একবার জানতে চাইল হ্যালি কথাটা।

'জী, স্যর,' বলল রিকার্ডো। 'অ্যাক্সিডেন্টের পর বার বার কথাটা বলছিল টনি। আমি তখন বুঝতে পারিনি, এখন পারছি। ওটাই ছিল টনিকে বলা মিস্টার রানার শেষ কথা। সেটা যাতে ভুলে না যায়, সেজন্য একটুকরো কাগজে লিখে রেখেছিল টনি, আমাকে বলেওছিল কথাটা। কিন্তু...'

আর কিছু শোনার দরকার মনে করল না হ্যালি, লাইন কেটে দিল। ডারউইনের ডেকে দাঁড়িয়ে ছিল, যত জলদি সম্ভব হাজির হলো নিজের কেবিনে; ওয়াল কেবিনেট থেকে বের করল টনির মানিব্যাগটা, তারপর সেটা থেকে চিরকুটটা। পড়ল।

অ্যাডমিরাল হ্যামিল্টনকে ফোন করার জন্য হাতে চলে এসেছে নিজের মোবাইল।

ঊনত্রিশ

রিচার্ডের সঙ্গে সম্ভবত আগেই কথা হয়ে গিয়েছিল ফুগুইয়ের; শহর থেকে যে-পথে বের হলো ওরা সেখানে একটামাত্র পুলিশি রোডব্লক দেখা গেল, এবং ওই জায়গায় হাজির থাকতে দেখা গেল লোকটাকে। জিপটাকে থামাল সে-ই।

পেছনের সীটে যে-পাশে বসেছে রিচার্ড, সেদিকের জানালার কাঁচ নামিয়ে পিজিন ভাষায় হেসে হেসে কিছুক্ষণ কথা বলল সে সার্জেন্টের সঙ্গে। ফুগুইয়েরও প্রায় সবগুলো দাঁত দেখা যাচ্ছে; লোকটার ভাব দেখে মনে হচ্ছে খুবই সম্মানিত কারও সঙ্গে কথা বলছে, এবং ধন্য হচ্ছে। ওদের প্রেমালাপ যখন শেষ হলো, কাঁচটা তুলে দিচ্ছিল রিচার্ড, তখন একটু উঁচু গলায় বলতে শোনা গেল ফুগুইকে, 'হ্যাভ আ গুড ট্রিপ, মিস্টার রানা।'

নিজের দিকের কাঁচ নামিয়ে থু করে বাইরে থুতু ফেলল রানা। খেয়াল করল, মাতাল হাওয়া বয়ে যাচ্ছে একটু পর পর, বিদ্যুতের ঝলকানি বেড়েছে আকাশে, মেঘ আরও পুরু হয়েছে।

'রাউনুকে যে-গ্রামে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল, আমাদের খোঁজ তা হলে শুরু হচ্ছে সেখান থেকে?' রোডব্লক ছাড়িয়ে কিছুদূর আসার পর মুখ খুলল রিচার্ড, বলার ঢং শুনে বোঝা গেল ফুরফুরে মেজাজে আছে সে।

'জী, জনাব,' রিয়ারভিউমিররের দিকে তাকাল রানা, ভাউযার বাইকটা দেখল। ওটাতে সওয়ার দুই মিউটিনিয়ার বৃষ্টির আশঙ্কায় রেইনকোট পরে নিয়েছে আগেভাগেই।

বইঘর.কম

‘অন্ধকারে চিনতে পারবেন তো গ্রামটার পথ?’

‘মস্করা করছ মনে হয়? আগেরবার তোমাকে ফোন দিয়েই পথের নির্দেশ নিয়েছিল খাসি।’

‘কে?’

‘তোমার সবচেয়ে নাদুসনুদুস চামচা, কপালে পাথরের বাড়ি খেয়ে বাসায় শুয়ে আছে যে এখন।’

হা হা করে হাসল রিচার্ড। ‘ভালো নাম দিয়েছেন। তবে আমার কাছ থেকে পথের নির্দেশ নেয়নি সে, অন্য একজনের কাছ থেকে নিয়েছিল।’

ভ্রূ কোঁচকাল রানা। ‘অন্য একজন?’

হাত দিয়ে মশা তাড়ানোর ভঙ্গি করল রিচার্ড। ‘চিনতে পারবেন কি না বলুন।’

‘পারব মনে হয়। তা ছাড়া, সেদিন সেডান-চালানোর দায়িত্বে ছিল তোমার যে-লোক, সে-ই তো জিপ চালাচ্ছে এখন। আমার যদি ভুল হয়, আগেভাগেই বলে রাখো লোকটাকে যেন চোখকান খোলা রাখে।’

‘কী মনে হয় আপনার? মুখ খুলবে রাউনুর ছেলে?’

‘খুলবে। নেশাটেশা করে লোকটা, টাকার লোভ আছে। ওখানে গিয়ে প্রথমেই কিছু ধরিয়ে দিয়ো ওর হাতে।’

‘তারপরও যদি কাজ না হয়?’

‘তা হলে আর কী? শক্তপোক্ত দেখে একটা গাছ খুঁজে নিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পোড়ো। অনেক লোকের উপকার হবে।’ বাইরে তাকাল রানা। ঘন ঘন বিদ্যুচ্চমকের আলোয় দেখা যাচ্ছে, গাছপালার ঘনত্ব বাড়ছে আস্তে আস্তে, সরু হচ্ছে রাস্তাটা। তর্জনীর ইশারায় সামনে দেখাল ও। ‘এটা কোন্ রাস্তা?’

‘এখানে আপনি আগে আসেননি সম্ভবত। পিজিন ভাষায় এই রাস্তার যে-নাম, ইংরেজি করলে অর্থটা দাঁড়াবে: বে-রোড।’

‘আগেরবার যেখান দিয়ে গিয়েছিলাম রাউনুর গ্রামে সেখান দিয়ে যাচ্ছি না কেন এবার? পুলিশি ঝামেলা এড়ানোর জন্য?’

'হ্যাঁ। ফুগুইয়ের পক্ষে তো আর সবগুলো ব্লকে হাজির থাকা সম্ভব না।'

'উপকূল থেকে ঠিক কতটা ভেতরে আছি আমরা, বলতে পারো?'

'জানি না...দেড়-দু'মাইল হবে।'

'তা হলে আরও মাইল তিনেকের মতো যেতে হবে আমাদেরকে। গতবার যখন গিয়েছিলাম, গ্রামটাকে সমুদ্রের তীর থেকে পাঁচ-ছ'মাইল ভেতরে বলে মনে হয়েছিল আমার।'

'আপনি অনেক কিছু খেয়াল করেন, মিস্টার রানা। সেজন্যই...'

'কী?'

'কিছু না। ...রাউনুর ছেলে যে-গ্রামে নিয়ে যেতে পারে আমাদের, সেটা কেমন হবে বলে আপনার অনুমান?'

'অবশ্যই পরিত্যক্ত...' কথা শেষ করতে পারল না রানা, কানে তালা লাগিয়ে বাজ পড়ল কাছাকাছিই কোথাও, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল মুষলধারার বৃষ্টি। দৃষ্টিসীমা নেমে এল ত্রিশ ফুটে, কমে গেল জিপের গতি। 'এবং পুরো এলাকা জঙ্গলে ভরা।'

আধ ঘণ্টা পর বৃষ্টি কমল অনেকখানি, জানালার কাঁচ নামিয়ে এদিকওদিক দেখল রানা। 'ঠিক পথেই এগোচ্ছি মনে হয়।'

পিজিন ভাষায় ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলল রিচার্ড। তারপর রানাকে বলল, 'হতে পারে। ড্রাইভার নিশ্চিত হতে পারছে না।'

'আমি দিক বদল করতে না বলা পর্যন্ত সোজা এগোতে বলো ওকে।'

রানার কথামতো কাজ করা হলো।

আরও আধ ঘণ্টা পর ছোট্ট খাঁড়িটার ধারে পৌঁছাল ওরা। এখন আর ছোট বলার উপায় নেই ওটাকে, কারণ তুমুল বৃষ্টিতে পাহাড়ি ঢল বয়ে যাচ্ছে ওখান দিয়ে। ওটা পার হয়ে জিপ থামাল ড্রাইভার, তাকিয়ে আছে রিয়ারভিউমিররের দিকে।

ভাউযার বাইকটা নিয়ে দুই মিউটিনিয়ার ওখান দিয়ে পার

বইঘর.কম

হতে পারবে কি না ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়ল রানা। তবে বাইকের চালক পার হওয়ার জন্য এমন একটা জায়গা বেছে নিল যেখানে নুড়িপাথরের পরিমাণ অনেক বেশি। ফলে স্রোতের তীব্রতা কম সেখানে, পানির গভীরতাও কম। বাইকটা এপারে আসার পর আবার শুরু হলো ওদের যাত্রা।

বাইকটার কথা ভেবে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করল রানা। বেরেটাটা হাতের নাগালে পেতে চেয়েছিল, ভেস্তে গেছে সেটা। এখন রানাকে নির্ভর করতে হবে বাইরের সাহায্যের জন্যে, অথবা...প্রতিপক্ষের কোনও ভুলের জন্য।

রাউনুদের গ্রামে যখন পৌঁছাল ওরা, গ্রামবাসীদের যারা দেখল ওদেরকে, স্বাভাবিকভাবেই আশ্চর্য হলো। রাউনু'র ছেলেকে খুঁজে বের করল রিচার্ড, রানার কথামতো টাকা দিল ওর হাতে, কী চায় জানাল।

'ওখানে কিছু নেই,' পিজিন ভাষায় জানাল লোকটা, তরজমা করল রিচার্ড।

'জানি,' বলল রানা। 'কিন্তু পথ দেখিয়ে ওখানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে টাকা দেয়া হয়েছে তোমাকে।'

আবার তরজমার দায়িত্ব নিতে হলো রিচার্ডকে।

'কোনও রাস্তা নেই।'

'খুব ভালো,' বলল রানা। 'হেঁটে যাব আমরা। পথ দেখাও।'

লোকটা তারপরও গড়িমসি করছে দেখে রিচার্ডকে রানা বলল, 'আরও এক শ'টা ডলার দাও তো নেশাখোরটার হাতে।'

'কখন যেতে চান আপনারা?' অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তিতে খুশি হয়েছে রাউনু'র ছেলে। 'এখন?'

'এই মুহূর্তে।'

'আমি তা হলে ঘরে গিয়ে আমার বউকে একটু বলে আসি।'

'নাম কী তোমার?'

'বেঞ্জি।'

'যাও। তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।'

গদাইলস্করি চাল বেঞ্জির, ওর ফিরে আসতে সময় লাগতে পারে অনুমান করে নিয়ে সঙ্গে করে আনা ব্যাকপ্যাক, ক্যাম্পিংগিয়ার আর অন্যান্য জিনিস নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে নিল রানা। প্রত্যেকের ভাগে জুটল একটা করে ব্যাকপ্যাক আর স্যাক, অতিরিক্ত হিসেবে ক্যাম্পিংগিয়ারগুলো জুটল চার মিউটিনিয়ারের কপালে।

বেঞ্জি ফিরে আসামাত্র নিজের প্যাক থেকে শক্তিশালী একটা টর্চলাইট বের করল রানা, ওটা জ্বালিয়ে বেঞ্জির হাতে দিল। রিচার্ডেরটা চেয়ে নিল নিজের জন্য। কাউকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে হাঁটার ইঙ্গিত করল বেঞ্জিকে।

খালি পায়ে হাঁটছে লোকটা, ক্রমে ঢুকে পড়ছে রেইন ফরেস্টের গভীর থেকে আরও গভীরে। চলার গতি ধীর হলেও বয়সের তুলনায় তা ঠিকই আছে, এবং দেখে মনে হচ্ছে জঙ্গলের ভেতরে হাঁটাচলায় অভ্যস্ত সে।

ঠিক উল্টো অবস্থা হয়েছে রিচার্ডের। এসব কাজে অভ্যস্ত নয় সে, তার ওপর পিঠে সওয়ার হয়েছে ভারী বোঝা; মিনিট চল্লিশেক যেতে না যেতেই ঘেমে নেয়ে উঠল সে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল রানা, মুখ হাঁ করে দম নিতে হচ্ছে লোকটার। কিছু বলল না ও; যে-অস্পষ্ট গেইম ট্রেইলটা ধরে এগিয়ে চলেছে ওরা, বার বার এদিকসেদিকে আলো ফেলে ভালোমতো চিনে রাখছে সেটা।

আরও বিশ মিনিট যাওয়ার পর আবারও মুষলধারে বৃষ্টি নামল। নিজের বর্ষাতি বের করে পরে নিল রানা, যদিও জানে এই বৃষ্টিতে খুব একটা কাজে দেবে না সেটা। থামবে কি না জানতে চাইল বেঞ্জি, সোজা মানা করে দিল রানা, বলল কারোরই কোনও অসুবিধা হচ্ছে না।

পিচ্ছিল হয়ে গেছে জঙ্গলের মাটি; রানার মনে হচ্ছে কাদা না, যেন আঠার ওপর দিয়ে হাঁটছে ওরা। চলার গতি, স্বাভাবিকভাবেই, ধীর। গ্রাম থেকে বের হওয়ার প্রায় দু'ঘণ্টা পর প্রথম একটা পাহাড়ের কাছে হাজির হলো ওরা।

বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু মেঘ কাটেনি। মাঝেমধ্যেই বয়ে যাচ্ছে ঝোড়ো বাতাস। টর্চলাইটের আলো হাস্যকর মনে হচ্ছে রানার কাছে। রেইন ফরেস্টের ডালে বসা নাম-না-জানা পাখি, অমঙ্গল আশঙ্কায় ডেকে উঠছে মাঝেমধ্যে।

সামনে কিছুটা পাতলা হয়েছে জঙ্গল, তারপর ছোট একটা নদী, ইঙ্গিতে সেটা দেখাল বেঞ্জি। নদীর ধারে দেখা যাচ্ছে পাথর দিয়ে বানানো কয়েকটা ঘর; লতাগুল্মের পুরু আস্তরণে ঢাকা পড়ে গেছে সবগুলোই, তারপরও ঠাহর করা যায়। ওগুলোর কাছে পৌঁছে যাত্রাবিরতি করল ওরা।

একটা ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। টর্চের আলো ফেলে ফেলে এদিকওদিক তাকাচ্ছে। কাঁচা মাটির ওপর কোনওরকমে কতগুলো প্রস্তরখণ্ড দাঁড় করাতে পেরেছিল কারা যেন—কোন্‌কালে কে জানে! তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, এত বছরেও দাঁড়িয়ে আছে ওগুলো, ইসাটাবুতে বার বার ভূমিকম্প হওয়ার পরও। চার দেয়ালের মাঝখানে কোনও আসবাব আশা করেনি রানা, নেইও। এককোনায় পাথর দিয়ে বানানো কী যেন দেখা যাচ্ছে, আকারে বড়সড়ই বলা যায়। চার পায়াওয়ালা জিনিসটাকে টেবিল বলা যাবে না, মাছ কাটাকুটি অথবা কাপড় ধোওয়ার কাজে ব্যবহৃত হতো হয়তো।

পেছনে একটা হিস্‌হিস্‌ শব্দ শুনতে পেয়ে সচকিত হলো ও, গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে পাক খেয়ে ঘুরল মুহূর্তের মধ্যে। টর্চের আলো ফেলল শব্দের উৎস লক্ষ্য করে।

একটা রাজগোক্ষুর। রানার থেকে চার হাত দূরে, ঘরে ঢোকার প্রবেশপথের কাছে ফণা তুলে আছে। টর্চের আলো চোখেমুখে পড়ায় অস্বস্তি আরও বাড়ল ওটার, আরেকটু উঁচু করল মাথাটা। এখনই বোধহয়...

বাজ পড়ার মতো আওয়াজ শোনা গেল ঘরের প্রবেশপথের কাছ থেকে।

বিসিআই হেডঅফিস, মতিঝিল, ঢাকা।

নিজের সুইভেল চেয়ারে বসে আছেন রাহাত খান, পিঠটা এলিয়ে দিয়েছেন চেয়ারে, একটা হাতলে কনুই রেখে গাল ঠেকিয়েছেন হাতে। দপদপ করছে তাঁর কপালের একটা শিরা। দামি চুরুটের বাক্স পড়ে আছে টেবিলের ওপর, ওটার প্রতি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না তাঁর।

'অ্যাডমিরাল,' রানার পাঠানো মেসেজটার প্রিন্টআউট নিয়ে কাগজটা সোহেলকে দিয়েছেন রাহাত খান, তাঁর মুখোমুখি বসে ওটা পড়ছে সে, 'লেট'স কাম টু কন্‌ক্লুশন, আই ওয়াণ্ট ইউ টু গো ব্যাক। আয়্যাম ইন সাচ এ কণ্ডিশন দ্যাট আই ডু নট নীড ইউ অর ইয়োর ক্রু অর ইয়োর ভেসেল এনি মোর। ক্যাপচার এনি থিং দ্যাট বিলংস্ টু ইউ অ্যাণ্ড রিট্রিট। মে গড হেল্প মি অ্যাণ্ড অল অফ আস।'

'কী বুঝলে?' পাথরকঠিন হয়ে গেছে মেজর জেনারেলের চেহারা, চোখের পলক পড়ছে না তাঁর।

'অ্যাডমিরাল হ্যামিল্টনের কাছে পাঠানো কোডেড মেসেজ বলে মনে হচ্ছে, স্যর।'

'এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান সিক্রেট সার্ভিসের ব্যবহৃত একটা কোড,' বললেন রাহাত খান। 'নাম: নাল এইন এইন মাইনাস যুয়ি।'

'মনে পড়েছে, স্যর। যুদ্ধের শেষদিকে যখন বেশ কয়েকজন নাৎসি গুপ্তচর একসঙ্গে ধরা পড়ে ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সের হাতে, তখন খবর পাচার করার এ-রকম কয়েকটা জার্মান কোড জানতে পারে তারা। ...জার্মান শব্দ নাল এইন এইন মাইনাস যুয়ি মানে ইংরেজিতে নাল ওয়ান ওয়ান মাইনাস টু। অর্থাৎ, প্রথম বাক্যতে কোনও মেসেজ নেই, ওটা শুধু সম্বোধনের জন্য। তারমানে, অ্যাডমিরাল হ্যামিল্টনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে রানা। ওয়ান মানে দ্বিতীয় বাক্যের প্রথম শব্দ...আয়্যাম, অর্থাৎ আই অ্যাম। আবারও ওয়ান মানে তৃতীয় বাক্যের প্রথম শব্দ...মানে, ক্যাপচার। মাইনাস

টু মানে চতুর্থ বাক্য থেকে প্রথম দুটো শব্দ বাদ দিয়ে তিন নম্বরটা...মানে হেল্প। অর্থাৎ অ্যাডমিরাল হ্যামিল্টনকে বলতে চাচ্ছে রানা, আই অ্যাম ক্যাপচার...আই অ্যাম ক্যাপচার? এটা তো...মিলছে না...ব্যাকরণগত ভুল আছে...মাই গড...রানা বুঝিয়েছে, আই অ্যাম ক্যাপচার্ড...' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল সোহেল, 'মানে বন্দি করা হয়েছে ওকে!'

ফুলে উঠেছে রাহাত খানের চোয়ালের হাড় দুটো। 'এবং সাহায্য চেয়েছে সে।'

'স্যর...আমি কি...'

'রানাকে ফেরত চাই আমি,' সোহেলের জিজ্ঞেস করতে না-পারা প্রশ্নটার জবাব দিয়ে দিলেন রাহাত খান, চেহারা পাথরকঠিন হলেও মুঠিপাকানো দুই হাত দেখে বোঝা গেল আবেগের ঝড় চলছে তাঁর বুকে, 'জীবিত এবং অক্ষত।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঝড়ের গতিতে মেজর জেনারেলের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সোহেল।

স্কাইপি চালু করা আছে রাহাত খানের ল্যাপটপে, ওপ্রান্তে কনভার্সেশনে আছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিল্টন। পিঠ সোজা করে ল্যাপটপের দিকে কিছুটা ঝুঁকলেন রাহাত খান, আবেগের ঝড়টাকে গলা টিপে মেরে অ্যাডমিরালকে বললেন, 'সোহেল যাচ্ছে।'

'হেণ্ডারসন ফিল্ডে ববি মুরল্যাণ্ডকে পাবে ও,' বললেন হ্যামিল্টন। 'ইসাটাবুর প্রধানমন্ত্রী সুবিধার লোক না, দুর্নীতির অভিযোগ আছে দেশটার রয়্যাল পুলিশের বিরুদ্ধেও। তারপরও, কোন্ লেভেল থেকে ফোন করালে সোজা আঙুলেই ঘি উঠবে, জানা আছে আমার।'

গুলি করেছে রিচার্ড।

ফণায় গুলি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল রাজগোখরা।

'ভয় পেয়েছিলেন, মিস্টার রানা?' জিজ্ঞেস করল রিচার্ড।

হাতেধরা টর্চটা নাচাল রানা। 'এত বড় একটা টর্চ থাকার পরও?' আলো দুলিয়ে চার পায়াওয়ালা জিনিসটা দেখাল রানা। 'চিনতে পারছ?'

দেখল, কিন্তু বুঝতে পারল না রিচার্ড।

'ও, আমারই ভুল, তোমার তো চেনার কথা না। তুমি তো আর সাগরের পানিতে ডুব দাওনি।'

'মানে?'

'ওটা বানানোর জন্য যে-লাইমস্টোন ব্যবহার করা হয়েছে, আর রাজা শামানের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষে লাইমস্টোনের যেসব ব্লক দেখেছি আমরা, একই জাতের লাগছে আমার কাছে।'

রানা ঠিক কী বোঝাতে চাইছে, বুঝতে পারল না রিচার্ড; এদিকওদিক তাকাচ্ছে। 'দেখুন, এতদিন ধরে আছি ইসাটাবুতে, অথচ রেইন ফরেস্টের গভীরে যে এ-রকম কিছু থাকতে পারে, কল্পনাও করিনি কোনওদিন।'

'কল্পনা করতে পারার কথাও না। রাউনু বলেছিলেন, তিনি আর তাঁর কয়েকজন বন্ধু ছাড়া বাকি সবাইকে হত্যা করা হয়েছিল। তারপর থেকে ভয়ে হোক অথবা অন্য যে-কোনও কারণেই হোক, এদিকে আর আসেননি তিনি; কেউই আসেনি।' ঘরটা থেকে বের হলো রানা, এগিয়ে গিয়ে থামল নদীর তীরে। একটা কম্পাস বের করল ওর ব্যাকপ্যাক থেকে। বেশ কিছুক্ষণ দেখল ওটা, মনে মনে কী হিসেব করল যেন, তারপর মাথা ঝাঁকাল।

'বেঞ্জির সঙ্গে কথা বলেছি আমি,' বলল রিচার্ড, রানার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, 'সে বলেছে এই খাল পেরিয়ে নাক বরাবর মাইল তিনেক গেলেই নাকি রাউনুদের সেই গ্রামটা।'

দূরে কোথাও বাজ পড়ল।

থেকে থেকে ঝোড়ো বাতাস বইছে; সেই বাতাস যখন কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে রেইন ফরেস্টটাকে, অপার্থিব এক আওয়াজে ভরে যাচ্ছে চারদিক। আকাশে বিদ্যুতের ঝলকানি আগের মতোই

আছে, কমেনি। যে-কোনও সময় বৃষ্টি নামতে পারে আবারও।

'আজ রাতের মতো ক্ষান্ত দিলে হয় না?' রিচার্ডকে বলল রানা। 'আবহাওয়া সুবিধের না।'

'ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই কাজ করতে হবে আমাদেরকে, মিস্টার রানা, উপায় নেই। দেরি করলে আরও বড় বিপদে পড়ে যেতে পারি।'

দূরে বাজ পড়ল আবার।

'শুনলে?' বলল রানা।

'পরোয়া করি না। কামাসাকুর কাঠের ওই বাক্সগুলো দেখার জন্যে, ভাঙার জন্যে, ভেতরের গুপ্তধন লুট করার জন্যে আর তর সইছে না আমার।'

'আমি পারব না। অন্তত আজ রাতে আর না। মাথা গুঁজবার মতো মোটামুটি নিরাপদ একটা জায়গার সন্ধান পাওয়া গেছে, কষ্ট করে আর ক্যাম্পিং করতে হবে না আমাদের। তা ছাড়া, এখন খুব বেশি হলে হয়তো চেরি গাছটা পর্যন্ত যেতে পারব আমরা। দিনের আলো ছাড়া খুঁজে বের করা যাবে না ট্রেইলটা।'

কিছু না বলে পকেট থেকে মোবাইল বের করল রিচার্ড, ফোন করল কাকে যেন। পিজিন ভাষায় কথা বলল কিছুক্ষণ, তারপর সেটটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। 'নিন, কথা বলুন মিস তানাঘাইয়ের সঙ্গে। দুই মিনিট সময় দেয়া হলো।'

মোবাইল ব্যবহার করাটা উচিত হচ্ছে না জেনেও সেটটা নিল রানা। 'রেমি?'

দুর্বল, জড়ানো গলায় কী যেন বলল মেয়েটা, ঠিক বুঝতে পারল না রানা।

ওরই কারণে যার আঙুল কাটা গেছে, তাকে কেমন আছো প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করতেও বাধছে, তবু জানতে চাইল রানা।

'ভালো না,' বলল রেমি। 'ওরা আমার একটা আঙুল কেটে নিয়েছে, তারপর থেকে জ্বর। দুর্বল হয়ে পড়েছি, কিছু খেতে ইচ্ছা করে না। খেলেই মনে হয় বমি হয়ে যাবে এখন। শুধু পানি খেতে

ইচ্ছা করে। কিন্তু ওরা তা-ও ঠিকমতো দেয় না আমাকে। ...ঈশ্বর আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন, মিস্টার রানা?'

'জানি না। একটু ধৈর্য ধরো রেমি, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'ধৈর্য?' একটা শব্দ শোনা গেল মোবাইলে—রানা ঠিক বুঝল না হাসল নাকি ফুঁপিয়ে উঠল মেয়েটা। 'ভাউযার ক্ষেত্রেও কিন্তু বলেছিলেন আপনি, কিছু হবে না।'

'এবার আসলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, রেমি, দেখে নিয়ো। ...ওরা তোমাকে ওষুধটষুধ কিছু দিয়েছে?'

'আমাদের কি আর দেখা হবে না, মিস্টার রানা?' রানার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল রেমি।

'হবে। আমি...' লাইন কেটে দেয়ার টোন পাওয়া গেল ওপ্রান্ত থেকে। কল্পনার চোখে দেখল রানা, মোবাইল কেড়ে নেয়া হয়েছে রেমির হাত থেকে। বিষদৃষ্টিতে তাকাল ও রিচার্ডের দিকে, ওর বাড়ানো হাতে ধরিয়ে দিল সেটটা। 'জ্বরে কষ্ট পাচ্ছে মেয়েটা, তোমরা ওষুধ দাওনি ওকে?'

'দেয়া হয়েছে। সে যদি না খায় তা হলে আমরা কী করব? সে যদি স্বেচ্ছায় মরতে চায়, আমাদের করার কিছু আছে?'

টের পেল রানা, রেগে যাচ্ছে ও।

'আজ রাতে অন্তত চেরি গাছটা পর্যন্ত যেতে চাই আমি,' বলল রিচার্ড।

'বেঞ্জিকে চলে যেতে বলো তা হলে। বাকি পথ আমরাই চিনে নিতে পারব। খাল পার হচ্ছি আমি, তোমার লোকদের নিয়ে আমার পিছন পিছন আসো।'

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা।

কাস্টমস চেকিং পার হওয়ার সময় স্ক্যানারে ধরা পড়ল, আগ্নেয়াস্ত্র বহন করছে সোহেল। কিন্তু দেখেও না দেখার ভান করলেন কাস্টমস কর্মকর্তারা—ট্রাভেলিং ব্যাগটা কার, সেটা সোহেল এয়ারপোর্টে হাজির হওয়ার আগেই জানেন তাঁরা।

বইঘর.কম

চলমান বেল্টের পিঠে চেপে ব্যাগটা হাজির হলো এক কর্মকর্তার কাছে, ওটা তুলে নিলেন তিনি, বাড়িয়ে ধরলেন অপেক্ষমাণ সোহেলের দিকে। 'আপনার ব্যাগ, স্যর।'

ব্যাগটা নেয়ার সময় ছোট করে মাথা ঝাঁকাল সোহেল।

'আপনার সঙ্গে আর কিছু কি আছে স্যর?' জিজ্ঞেস করলেন অফিসার। 'আই মীন, পাইলটকে জানিয়ে রাখতে হবে আমাদের...'

'আছে। জোড়া শোল্ডার হোলস্টারে দুটো ফায়ারআর্ম ক্যারি করছি আমি।'

কোনও মন্তব্য করলেন না কাস্টমস অফিসার, মাথা ঝাঁকালেন একবার।

ওপারে গিয়ে রিচার্ডদের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল রানা, ওরা যাওয়ার পর আবার এগোতে শুরু করল। ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে কিছুদূর যাওয়ার পর অনেক ঘন হলো জঙ্গল, ডালপালা ঠেলে এগোনোটা মুশকিল হয়ে গেল, গতি কমে গেল ওদের।

'একটা মাচেটি বা ভোজালি দাও আমাকে,' রিচার্ডকে বলল রানা।

'উঁহুঁ, না,' প্রত্যাখ্যান করল রিচার্ড। 'পিছিয়ে যান আপনি। আমি লিড দিচ্ছি। পথ পরিষ্কারের দায়িত্ব নিচ্ছি নিজে। আপনার হাতে কোনও অস্ত্র দেয়া যাবে না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সরে গেল রানা।

মাচেটি বের করল রিচার্ড আর এক মিউটিনিয়ার, ওদের পেছনে টর্চলাইট হাতে একজন, তারপর রানা। বাকিরা ওর পেছনে। কুপিয়ে ডালপালা ভাঙছে রিচার্ড আর অন্য লোকটা, কখনও কখনও লাথি মেরে সরিয়ে দিচ্ছে একজাতের গাছের ফার্নের মতো বড় বড় পাতা।

এক ঘণ্টা পর আরেকটা খাল পার হয়ে একটা বট গাছের নিচে এসে থামল ওরা, পথশ্রমে কমবেশি ক্লান্ত হয়ে গেছে সবাই।

রিচার্ড আর ওর যে-লোক ডালপালা ভেঙেছে এতক্ষণ, তারা রীতিমতো হাঁপাচ্ছে।

'কতদূর এসেছি?' রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করল রিচার্ড।

'বেশি না,' কম্পাসটা আবার বের করে দেখল রানা, 'আধ মাইলের কিছু বেশি হবে হয়তো।'

যাত্রাবিরতি ঘোষণা করল রিচার্ড। ওর এক লোক ব্যাকপ্যাক থেকে বের করল কফির কৌটা, খাল থেকে পানি নিয়ে এল আরেকজন। রানা আর রিচার্ড মিলে সঙ্গে করে বয়ে আনা শুকনো কাঠের টুকরো সাজিয়ে আগুন জ্বালাল। কফি আর বিস্কিট দিয়ে হালকা নাস্তা সেরে নিল ওরা।

তারপর এগোতে শুরু করল আবার।

রাউনুদের সেই গ্রামের সীমানায় পা রাখল যখন, হঠাৎ করেই আরও খারাপ হয়ে গেল আবহাওয়া, বেশ কিছুক্ষণ একটানা বয়ে গেল ঝোড়ো বাতাস, ঝিরঝিরে বৃষ্টি নামল। এসব আবারও উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল রিচার্ড, এগিয়ে যেতে বলল সবাইকে; কোনও চেরি গাছ দেখামাত্র যেন জানান দেয়া হয় সেটা মনে করিয়ে দিল।

ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বলে বোঝা যাচ্ছে একটা গ্রামের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে ওরা, তা না হলে রাতের অন্ধকারে ব্যাপারটা ঠাহর করা যেত কি না সন্দেহ। ঘাস আর লতাগুল্মের জঙ্গলে পরিণত হয়েছে পুরো জায়গা; যত্রতত্র গজিয়েওঠা বেঁটে বেঁটে অসংখ্য গাছের পটভূমিতে প্রায়-ভেঙে-পড়া কুঁড়েঘরগুলোর অস্তিত্ব আলাদাভাবে নির্ণয় করা মুশকিল—ওগুলোকেও গাছ বলে মনে হয়। কোনও কোনও ঘরের অবস্থা একেবারেই যা-তা, দু'-একটা আবার আশ্চর্যভাবে রেহাই পেয়ে গেছে জঙ্গলের ছোবল থেকে।

চেরি গাছটা আগে নজরে পড়ল রিচার্ডের।

'ইউরেকা!' উল্লাসে চিৎকার করে উঠল সে আর্কিমিডিসকে নকল করে। 'ইউরেকা!' হা হা করে হাসছে। 'মিস্টার রানা,

গাছটা পেয়ে গেছি আমরা।' ছুটে গেল সেটার দিকে।

আসলেই পাগলের মতো আচরণ করছে রিচার্ড। গাছটা ঘিরে চক্কর খেল সে দু'বার, তারপর যেন অনেকদিন পর দেখা পেয়েছে প্রেয়সীর, এমনভঙ্গিতে জড়িয়ে ধরল।

কাছাকাছি গিয়ে গাছটার দিকে ভালোমতো তাকাল রানা। একটা ফুলও নেই, এ-মৌসুমে থাকে কি না জানে না রানা, ওটা মরে গেছে কি না তা-ই বা কে জানে! কেমন যেন খটকা লাগল রানার, মনে হলো ভুল হচ্ছে কোথাও।

'মিস্টার রানা!' চিৎকার করে উঠল রিচার্ড। 'আপনি না থাকলে জীবনেও হাজির হতে পারতাম না এই গাছের কাছে।'

'খুব খুশি লাগছে, না? মিষ্টি বাটো তা হলে। কাছের লোক বলে যদি কেউ থেকে থাকে তোমার, ফোন করে জানাও তাকে খবরটা।'

'ভালো বলেছেন,' বলতে বলতে পকেট থেকে মোবাইল বের করল রিচার্ড, ফোন করল কাউকে।

মোবাইলের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক তরঙ্গে আকর্ষিত হলো আকাশের ইলেকট্রন, কানফাটানো শব্দে অত্যুজ্জ্বল একটা আলোকরশ্মি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে একইসঙ্গে নেমে এল রিচার্ড আর চেরি গাছটার ওপর।

আগুন ধরে গেল গাছটাতে। দাঁড়ানো অবস্থা থেকে একদিকে কাত হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল রিচার্ড।

পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে গিয়েছিল রানা, কোমরে পিস্তলের খোঁচা খেয়ে যেন সংবিৎ ফিরল ওর।

'কাম!' বলল এক মিউটিনিয়ার। 'কুইক!'

মুষলধারার বৃষ্টি শুরু হয়েছে আবার, বড় বড় পানির ফোঁটাগুলো শরীরের যেখানেই এসে আঘাত করছে ব্যথা লাগছে; একইসঙ্গে দাপাদাপি করছে ঝোড়ো বাতাস। দৌড়ে পিছিয়ে এল ওরা চেরি গাছটা থেকে। অন্তত আজকের রাতটা কোনওরকমে কাটিয়ে দেয়ার উপযোগী একটা কুঁড়েঘর খুঁজে বের করল আরেক

মিউটিনিয়ার, তারপর সবাই ঢুকে পড়ল ভেতরে।

টর্চলাইটের আলোয় মেঝেটা ভালোমতো দেখে নিয়ে বসে পড়ল রানা, পিঠ ঠেকাল বেড়ার সঙ্গে। পকেট থেকে রুমাল বের করে চুল মুছতে গিয়ে খেয়াল করল, কাজ হবে না—রুমালটাই ভিজে গেছে পুরোপুরি।

ওর কোমরে পিস্তলের খোঁচা দিয়েছিল যে-মিউটিনিয়ার, ঝড়বৃষ্টি একটু কমার পর পকেট থেকে মোবাইল বের করল লোকটা, ফোন করল কাউকে। পিজিন ভাষায় কথা বলল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর রানার দিকে তাকাল। 'উই ফরগেট মিস্টার রিচার্ড। উই গো টুমরো এগেইন। ওকে?'

মানে রিচার্ডের কথা ভুলে যেতে হবে, লোকটার যা হওয়ার ছিল হয়েছে। আগামীকাল সকাল থেকে আবার শুরু হবে গুপ্তধন উদ্ধারের অভিযান।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ওকে।' টর্চলাইটটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল ও মেঝেতে, চোখ বন্ধ করল। ঘুমাতে হবে।

ত্রিশ

ভোরের প্রথম আলোয়, রিচার্ডের লাশ দেখে টের পেল রানা, কিছুটা হলেও খারাপ লাগছে ওর।

বীভৎস অবস্থা হয়েছে লোকটার। সম্ভবত টেরও পায়নি বাজ পড়েছে ওর ওপর, তার আগেই মারা গেছে। প্রচণ্ড তাপে পুড়ে কালো হয়ে গেছে চামড়া, দেখলে শ্বেতাঙ্গ বলে চেনার উপায় নেই। কাঠপুতুলের মতো শক্ত হয়ে গেছে শরীর। চামড়া ছিঁড়ে গেছে কোনও কোনও জায়গায়, সেখান দিয়ে বেরিয়ে এসেছে গলে

বইঘর.কম

যাওয়া লাল মাংস।

লাশটার ব্যাপারে কী করার ইচ্ছে আছে জানতে চাইল রানা এক মিউটিনিয়ারের কাছে, জবাবে লোকটা বলল, 'ওয়ার্ক।'

অর্থাৎ, কাজ করো, রিচার্ডের ব্যাপারে আগ্রহ না দেখালেও চলবে।

চেরি গাছটার ওপর মনোযোগ দিল রানা।

আগুন ধরে গিয়েছিল ওটাতে, কিন্তু পুড়িয়ে কয়লা বানাতে পারেনি—ধন্যবাদ যদি দিতে হয় কাউকে তা হলে গতরাতের মুষলধারার বৃষ্টিকে দিতে হবে। আগেরবার যে-রকম অস্বস্তিকর অনুভূতি হয়েছিল রানার, এবারও হলো সে-রকম: কেন যেন বার বার মনে হচ্ছে, গড়বড় হচ্ছে কোথাও।

কথাটা বলল রানা মিউটিনিয়ারদেরকে; এবং সেটা বোঝানোর জন্য কয়েকবার বলতে হলো। অথবা, হতে পারে, লোকগুলো সন্দেহ করছে ওকে। তবে শেষপর্যন্ত, রানার পরামর্শ অনুযায়ী, পুরো গ্রামটা দিনের আলোয় ভালোমতো চক্কর দিতে রাজি হলো ওরা। খোঁজাখুঁজি শেষে দেখা গেল, গ্রামে চেরি গাছ আছে আরও দুটো, একেকটা একেকদিকে।

মুশকিল হলো দেখছি, মনে মনে বলল রানা।

কোন্ গাছের কথা বলেছে কামাসাকু?

এ-ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই, যে-গাছের সঙ্গে সর্পিলাকার পথ দেখেছিল লোকটা, কবিতা লিখেছিল সেটা নিয়েই। কিন্তু তিনটা গাছেরই আশপাশ ভালোমতো দেখেছে রানা, ঘন জঙ্গলের কারণে সর্পিলাকার কোনও পথের দেখা পায়নি। পথটা খুঁজে বের করতে হলে সাফ করতে হবে ওই তিন গাছসংলগ্ন অনেকখানি জায়গা; সে-সময়ও নেই, আর থাকলেও সঙ্গের মিউটিনিয়াররা কাজটায় হাত লাগাবে কি না সন্দেহ আছে।

সমস্যাটা জানাল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণিত হলো, ওর সন্দেহ সত্যি। আভাসে-ইঙ্গিতে আর ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে জানিয়ে দেয়া হলো ওকে,

পথ যদি খুঁজে বের করতে হয়, তা হলে সে-দায়িত্ব নিতে হবে ওকেই, একজন মিউটিনিয়ারও হাত লাগাতে পারবে না।

যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখান থেকে সরে গিয়ে ভূপাতিত একটা গুঁড়ির ওপর বসে পড়ল রানা; কী করা যায় ভাবছে।

মনে মনে ক্রামাসাকুর কবিতাগুলো ঘাঁটছে ও।

গ্রামের চেরি গাছ...সর্পিলাকার পথ...ঝরনা...গুহা...সম্পদ।

না, শুধু দিকনির্দেশনাই দিয়েছে লোকটা, অন্যকিছু নেই ওর কোনও কবিতায়। অন্যকিছু লেখার কথা ভাবেওনি লোকটা, কারণ অন্য কোনও সম্ভাবনার কথা আসেইনি ওর মাথায়।

তা হলে?

রাউনু'র বলা কথাগুলো মনে পড়ে গেল রানার।

...গোপনীয় কাজ। গুহায়...আমরা কেউ যেতে চাইতাম না ওখানে। কেউ কোনওকালে গেছে বলে শুনিওনি।

...পশ্চিম তীরের কাছে একটা গ্রামে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল জাপানিরা।

...তার আগে ওদেরকে দাস বানিয়েছিল ওরা।

...ছোট ছোট বাচ্চাদের তুলে নিয়ে যেত সে। ধরে নিয়ে যেত শক্তসমর্থ পুরুষদেরও। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করাত ওদেরকে দিয়ে।

...গুজব ছড়িয়ে পড়ল, ভয়ঙ্কর গুহাগুলোর কোনও একটায় কিছু একটা করাচ্ছে লোকটা আমাদের জাতভাইদের দিয়ে।

...ভারী ভারী কতগুলো বাক্স টেনে নিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল আমাদের গ্রামের বেশ কিছু জওয়ান লোককে।

...একেকটা বাক্সের ওজন ছিল সাংঘাতিক।

...চাঁদিজ্বালানো রোদে আর দমআটকানো ভাপসা গরমে ওসব বাক্স টানতে বাধ্য করা হয়েছিল জওয়ানদেরকে; যতদূর শুনেছি, বাক্সগুলো নিয়ে পশ্চিম তীর থেকে ইসাটাবুর কোনও এক গুহার উদ্দেশে রওনা হয় ওরা।

...যে-উঁচু জায়গার কথা বলছি, আমাদের, মানে দ্বীপের

আদিবাসীদের জন্য সেটার সীমানায় নিষেধের এক অদৃশ্য কাঁটাতারের বেড়া ছিল সবসময়। ওটা আমাদের সীমানার ওপারে, আর দৈত্যদেবতাদের সীমানার শুরু। ওটাই তাঁদের বাসস্থান, ওটাই তাঁদের কবরস্থান।

'হেই, মিস্টার!' এক মিউটিনিয়ারের ডাকে বাস্তবে ফিরল রানা। 'হোয়াই থিঙ্ক? ওয়ার্ক!'

'বাক্সগুলো টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল লোকগুলো,' বলল রানা, 'বয়ে নিয়ে যায়নি।'

'হোয়াট?'

'এবং এখান থেকে উঁচু কোনও জায়গায় যেতে হয়েছিল ওদেরকে।'

'হোয়াট?'

যে-গাছের ওপর বাজ পড়েছে সেটার কাছে হাজির হলো রানা। যেদিক দিয়ে গেলে গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়া যাবে, সেদিক অনুমান করে নিয়ে হাঁটা ধরল। মিউটিনিয়াররা লেগে আছে ওর পেছনে আঠার মতো।

আধ মাইলমতো যাওয়ার পর খেয়াল করল রানা, আস্তে আস্তে নিচু হচ্ছে জমিন, অর্থাৎ নিচে নামতে শুরু করেছে ওরা। মাথা নাড়ল ও, জানাল পথ ভুল হয়েছে, গ্রামে ফিরে যেতে হবে আবার।

এবার দ্বিতীয় চেরি গাছটা বেছে নিল রানা। আগেরবারের কায়দায় ওটা ধরে মাইলখানেক এগোনোর পর টের পাওয়া গেল, উঁচুতে উঠছে না ওরা, নিচুতে নামছে।

আবার গ্রামে ফিরে আসতে হলো রানাকে। তিন নম্বর চেরি গাছটার কাছে গেল ও। নিজের ক্যান্টিন থেকে পানি খেল বেশ কিছুটা।

এই গাছটা, অন্য দুটোর চেয়ে, আকারে বড়, এবং সম্ভবত বয়সেও। এটার আশপাশের জঙ্গলও, আগের দুটোর তুলনায়, ঘন। একদিকে একটুখানি ফাঁকা জায়গা আছে, সেখান দিয়ে

অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে একটা পর্বতের চূড়া; সেটার ওপরে স্থির হয়ে আছে একখণ্ড কালচে সাদা মেঘ।

'ভারী ভারী বাক্স টানতে টানতে উঁচুতে যাওয়া হয়েছিল,' বলল রানা, 'তখন জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়েছিল, এ-রকম কোনও কথা বলেনি রাউনু। তারমানে, প্রাকৃতিক কোনও পথ ধরে সারা হয়েছে গুপ্তধন পরিবহনের কাজ। তারমানে, আঁকাবাঁকা ট্র্যাকটা যদি খুঁজে না-ও পাই আমরা, এবং যদি একটা সরলরেখা কল্পনা করে নিয়ে এগোতে থাকি, অসুবিধা হবে না।'

'উই নট আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ইয়োর টক।'

'না বুঝলেই ভালো।' ব্যাকপ্যাকে কম্পাসটা ঢুকিয়ে রেখে বিনোকিউলার বের করল রানা, কাছাকাছি একটা বড় গাছে গিয়ে চড়ল। পুবদিকের ল্যাণ্ডস্কেপ পর্যবেক্ষণ করছে।

চেরি গাছটা ছাড়িয়ে দূরের ওই পর্বতের দিকে জঙ্গল যেন সবুজ থেকে আরও সবুজ হয়েছে। পুরো জায়গাটা, সকালের মরা আলোয় ভরা আকাশের পটভূমিতে, কেন যেন অনতিক্রম্য বলে মনে হচ্ছে। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে গজিয়ে ওঠা ঘন ঘাস বলে দিচ্ছে, অনেক বছর হলো কোনও মানুষের পা পড়েনি ওখানে।

রানা গাছ থেকে নামার পর একজন মিউটিনিয়ার জানতে চাইল, 'হোয়াট?'

'ঘাসের জঙ্গল ধরে এগোতে হবে আমাদেরকে। ...চলো।'

'ইফ মিসটেক?'

'তা হলে আর কিছু করার থাকবে না আমার। আমার সাধ্যমতো যা যা করার ছিল, করেছি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মিউটিনিয়ারটা বলল, 'গো।'

ঘাসের জঙ্গল ধরে এগোতে শুরু করল ওরা।

গত রাতের ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে কাদায় পরিণত হয়েছে মাটি, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। টের পাওয়া যাচ্ছে, পথ আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে ওপরের দিকে, এবং মাঝেমধ্যে ডানেবাঁয়ে বাঁক নিচ্ছে ঘাসের জঙ্গলটা। খুশি হলো রানা।

টানা এক ঘণ্টা এগোনোর পর, যখন সবার গলা শুকিয়ে কাঠ, পানি-পানের জন্য অল্প সময়ের যাত্রাবিরতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। তারপর আবার শুরু হলো একঘেয়ে পথচলা। সূর্য ততক্ষণে তেতে উঠতে শুরু করেছে, পর্বতচূড়ায় ঠাঁই নেয়া মেঘটা উধাও হয়ে গেছে কোন্ ফাঁকে, জ্বালা করতে শুরু করেছে চাঁদি। আশ্চর্য এক জলীয়বাষ্পের চাদরে ঢেকে গেছে আশপাশের জঙ্গল, দৃষ্টিসীমা নেমে এসেছে বিশ মিটারে। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি হওয়ায় মনে হচ্ছে দম নেয়া যাচ্ছে না ঠিকমতো। কেউ কোনও কথা বলছে না; আওয়াজ বলতে পায়ের নিচে কাদা বা ঝরাপাতা চাপা পড়া অথবা ওদের হাঁ করে দম নেয়ার শব্দ।

পৌনে দু' ঘণ্টা পর, কোমর সমান উঁচু ঘাসেভরা একটা বাঁক যখন পার হচ্ছে রানা, হঠাৎ করেই থেমে দাঁড়াল ও, হাত তুলল।

থামল মিউটিনিয়াররাও।

'হোয়াট?' জানতে চাইল ওদের একজন।

'শুনতে পাচ্ছ?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল মিউটিনিয়াররা, কেউ কিছু বলছে না।

'পানি পড়ার শব্দ,' বলে দিল রানাই।

সিডনি এয়ারপোর্ট।

প্যাসেঞ্জার্স লাউঞ্জে গোমড়া মুখে বসে আছে সোহেল। ইসাটাবুর চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে বেশিরভাগ ফ্লাইট; আজ শেষ যে-বিমানটার যাওয়ার কথা আছে সেখানে, গড়িমসি করছে সেটাও। ইসাটাবুর যাত্রীও বেশি নেই, তাই তাড়াও নেই কর্তৃপক্ষের। ইতোমধ্যে ঘোষণা দিয়ে জানানো হয়েছে, অনিবার্য কারণে যাত্রাবিলম্বের জন্য তারা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

নিজের স্যাটেলাইট ফোন বের করল সোহেল, কল করল মুরল্যাণ্ডকে।

'হ্যালো, সোহেল?' পরিস্থিতির কারণে বদলে গেছে

মুরল্যাণ্ডের সবসময়ের হাসিখুশি কণ্ঠ।

'কোথায় তুমি?'

'হিথ্রো ছাড়লাম ঘণ্টাখানেক আগে। ফ্লাইট ডিলে ছিল।'

'আমারও একই অবস্থা।'

'রানার কী হয়েছে, জানতে পেরেছ কিছু?'

'না, পারিনি। ইসাটাবুতে আমাদের কোনও কণ্ট্যাক্ট নেই। রয়্যাল সলোমন পুলিশের কমিশনারের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন অ্যাডমিরাল নিজে, মেজর জেনারেল আপত্তি জানিয়েছেন।'

'কেন?'

'মেজর জেনারেলের ধারণা, দ্য মিউটিনিয়ার্সের হাতে বন্দি হয়েছে রানা। আমিও তা-ই মনে করছি। জঙ্গি দলটা যদি আসলেই ধরে থাকে রানাকে, এবং যদি বুঝতে পারে সে-ব্যাপারে গোপনে গোপনে কিছু করছে পুলিশ, রানার ক্ষতি করতে পারে।'

'তারমানে, সাধ্যমত যা করার করতে হবে আমাদেরকেই।'

'হ্যাঁ। আমরা হেণ্ডারসন ফিল্ডে পৌঁছানোর আগেই মানাশেহ সোগাভেরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে অ্যাডমিরালের পক্ষ থেকে। ওখানকার কাস্টমস আমাদের ব্যাপারে যাতে কোনও ঝামেলা না করে সেজন্য আগে থেকেই ইনফর্মেশন থাকবে রয়্যাল পুলিশের কাছে। অ্যাডমিরাল বলেছেন, কমিশনার যাতে সবরকমের সাহায্য করেন আমাদেরকে সেটা দেখবেন তিনি।'

'কোত্থেকে কাজ শুরু করবে, ভেবেছ কিছু?'

'হ্যাঁ। মেণ্ডানা।'

'মেণ্ডানা?'

'হোটেলের নাম—যেটায় উঠেছিল রানা। ইসাটাবুতে পৌঁছানোর পর যোগাযোগ করেছিল ও ঢাকার সঙ্গে, তখন বলেছিল নামটা।'

'ওর স্যাটেলাইট ফোন...'

'বন্ধ। সম্ভবত নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। তবে রায়হানের সঙ্গে

যোগাযোগ করেছিল রানা।'

'কী বলেছে সে?'

'বলেছে, একটা সম্ভাব্য গুপ্তধনের পিছে লেগেছে অথবা লাগতে বাধ্য হয়েছে রানা।'

'গুপ্তধন? জঙ্গি গ্রুপের সঙ্গে গুপ্তধন? হিসেবটা মেলাতে পারছি না।'

'আমিও পারছি না আপাতত। ইসাটাবুতে না গেলে পারা যাবে বলে মনেও হয় না। রায়হান যা যা জানে এ-ব্যাপারে, বলেছে; সেসব নিয়ে কাজ করছে ঢাকা।'

'একটা কোয়ালিশন টীমের যাওয়ার কথা শুনেছিলাম ইসাটাবুতে।'

'যাবে ওরা। তবে ওদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ রাজনৈতিক; অ্যাডমিরাল বা মেজর জেনারেলের কেউই চাচ্ছেন না ওরা কোনও কারণে জড়িয়ে পড়ুক রানার ব্যাপারটার সঙ্গে। আমরা আমাদের মতো কাজ করব, ওরা ওদের মতো।'

'একদল যাচ্ছে জঙ্গিতৎপরতা থামাতে, আরেকদল যাচ্ছে জঙ্গিদের হাত থেকে মাসুদ রানাকে উদ্ধার করতে। যদি...এখনও বেঁচে থাকে ও।'

'যদি বেঁচে না থাকে রানা,' বলতে গিয়ে টের পেল সোহেল আবেগতাড়িত হয়ে পড়ছে সে, 'নরক বানিয়ে ছাড়ব আমরা ইসাটাবুকে। স্রেফ নরক।'

একটা খাড়া ঢালের মাথা ছাড়িয়ে একটুখানি দেখা যাচ্ছে ঝরনাটা।

পথ যদি ভুল করে না থাকে, ওই ঢাল বেয়ে ভারী ভারী বাক্সগুলো নিয়ে কীভাবে উঠেছিল গ্রামবাসীরা, ভেবে আশ্চর্যই হলো রানা। ঢালের মাথায় হাজির হলো ও মিউটিনিয়ারদের নিয়ে। খেয়াল করল, ঝরনাটা দেখছে আর বার বার মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে মিউটিনিয়াররা।

কী ব্যাপার?

বেশ উঁচু একটা পাহাড়ের কোনা বেয়ে নেমে আসছে ঝরনাটা, চওড়ায় বিশ ফুটের কম হবে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলা জলপ্রপাত পাহাড়টার পায়ের কাছে তৈরি করেছে গভীর ক্ষত, পানি জমে ছোটখাটো পুকুর হয়ে গেছে সেখানে।

এদিকওদিক তাকাল রানা। অনতিদূরে কয়েকটা বোল্ডার দেখা যাচ্ছে, সেগুলোর পাশে একটা গুহা।

মিউটিনিয়ারদের দিকে ঘুরল রানা। 'জাপানি কর্নেল বলেছিল, ঝরনা ছাড়িয়ে গেলে একটা গুহা পাওয়া যাবে। আমার মনে হয় ওটাই সেই গুহা।'

আরও একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করল মিউটিনিয়াররা, কিছু বলল না।

পকেট থেকে মোবাইল বের করল ওদের একজন। ফোন করল কাকে যেন। কিছুক্ষণ কথা বলল পিজিন ভাষায়। কথা শেষ করে রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'নাউ হোয়াট?'

'ওই গুহায় যাব আমরা,' হাঁটা ধরল রানা।

গত রাতের ঝুম বৃষ্টিতে পানির প্রবাহ বেড়েছে ঝরনায়, পুকুরটা উপচে দু'দিকে দুটো জলধারার সৃষ্টি হয়েছে ঝোপঝাড়ে ভরা এবড়োখেবড়ো জমিনে। ওগুলো টপকে গুহামুখের সামনে এসে দাঁড়াল রানা।

যেন কোনও দৈত্যের মুখের মতো হাঁ করে আছে গুহা। কাঁটাগাছ আর লতাগুল্মের ছোটখাটো জঙ্গল গজিয়ে গেছে সামনে, দুর্ভেদ্য করে তুলেছে প্রবেশপথ। গুহার ভেতরটা, এই দিনের বেলাতেও, ঘুটঘুটে অন্ধকার।

আবারও মিউটিনিয়ারদের দিকে ঘুরল রানা। 'আমার হাতে তো মাচেটি দেবে না তোমরা, কাজেই নিজেরাই পরিষ্কার করো গুহামুখ। এই সুযোগে একটু জিরিয়ে নিই আমি।'

নিজেদের মধ্যে পিজিন ভাষায় কী যেন বলাবলি করল মিউটিনিয়াররা, কোনও ব্যাপারে একমত হতে পারছে না সম্ভবত।

একটু আগে মোবাইলে কথা বলেছিল যে, সেটটা বের করল সে আবারও, কিন্তু কল না দিয়ে আরও কিছুক্ষণ শলাপরামর্শ করে নিল সঙ্গীদের সঙ্গে।

আবারও খটকা লাগল রানার।

মোবাইলটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে একটা মাচেটি হাতে নিয়ে গুহামুখের দিকে এগিয়ে গেল ওই মিউটিনিয়ার। আধ ঘণ্টার চেষ্টায় কাঁটাগাছের জঙ্গল সাফ করে ফেলল সে। ব্যাকপ্যাক থেকে বড়সড় টর্চলাইটটা বের করল রানা, আগে বাড়ল।

গুহার প্রবেশপথটা লম্বা এবং ক্রমশ সরু। ভেতরের দিকে যত এগিয়েছে, তত সরু হয়েছে এবং উচ্চতায় তত খাটো হয়েছে। মাথা নিচু করে এগোতে এগোতে শেষে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে বাধ্য হলো ওরা। জ্বলন্ত টর্চলাইট নিয়ে আগে আগে যাচ্ছে রানা।

ছোট একটা চেম্বারে হাজির হলো ওরা, গুহার ছাদ যথেষ্ট উঁচু হয়েছে এখানে, সোজা হয়ে হাঁটা যাচ্ছে। এ-জায়গার মেঝে কেমন ভেজাভেজা, চকচকে। মাঝেমধ্যে একটা-দুটো ছোট বড় পাথর দেখা যাচ্ছে। গুহার দু'দিকের দেয়ালে জায়গায় জায়গায় ফাটল।

বার বার এদিকওদিক তাকাচ্ছে রানা, এগোনোর গতি ধীর। 'মনে হচ্ছে, আমাদের আগেও লোকজন এসেছিল এখানে।'

মিউটিনিয়ারদের কেউ কোনও মন্তব্য করল না।

একটা বাঁক ঘুরেই থমকে গেল রানা। একজোড়া কঙ্কাল পড়ে আছে সামনে, দু'জোড়া শূন্য অক্ষিকোটর যেন অভিযোগের দৃষ্টিতে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে ওর দিকেই।

কঙ্কাল দুটোর দিকে ভালোমতো তাকাল রানা। কাপড় নেই কোনওটারই—তারমানে হয় নগ্ন অবস্থায় এখানে এনে ফেলা হয়েছিল লাশ দুটো নয়তো লাশখেকো প্রাণীর দল কাপড়ও উধাও করে ফেলেছে। আপাতদৃষ্টিতে কোনও কঙ্কালের কোথাও কোনও ক্ষত দেখা যাচ্ছে না, কোনও হাড় ভাঙেনি, খুলির কোথাও ফাটল

নেই, চিহ্ন নেই বুলেটেরও। যে-কঙ্কালটা আকারে ছোট সেটার এক পায়ে একটা প্লাস্টিকের জুতো দেখা যাচ্ছে; ইসাটাবুর কোনও কোনও মেয়েকে ও-রকম জুতো পরতে দেখেছে রানা। মরার সময় লাশ দুটোর হাত পিছমোড়া করে বাঁধা ছিল দড়ি দিয়ে, লম্বা সময় ধরে পচা মাংসের সঙ্গে থেকে থেকে ছিঁড়ে গেছে দড়ি, আলগা হয়ে গেছে বাঁধন।

'এরা কারা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

জবাব দিল না মিউটিনিয়ারদের কেউ।

'নিহত দ্বীপবাসী?' আবারও বলল রানা।

জবাব নেই।

'তোমরাই খুন করেছ ওদেরকে, না? এ-জায়গা তোমাদের পূর্বপরিচিত, সেজন্যেই এখানে আসার আগে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিলে বার বার। সেজন্যেই তোমাদের বর্তমান নেতার কাছে ফোন করে জানতে চাইছিলে, এখানে আসবে কি না। ...তোমাদেরকে এখন নেতৃত্ব দিচ্ছে কে?'

টুঁ শব্দ করল না কোনও মিউটিনিয়ার।

গিযবর্ন, নিউযিল্যাণ্ড।

নিজের এগযিকিউটিভ চেয়ারে আরাম করে হেলান দিল অ্যালবার্ট পামার। শার্টের ওপরের দুটো বোতাম খুলে রেখেছে সে, ওর আর্মানি জ্যাকেটটা ঝুলছে অফিসের এক কোনায় রাখা কোটর্যাকে। ওর মুখোমুখি বসে-থাকা সোনালি চুলের এক যুবতী সাংবাদিক উঠে দাঁড়িয়ে ঝুঁকল, হাত বাড়িয়ে টেনে নিল নিজের মোবাইল—এতক্ষণ সেটাতে পামারের সাক্ষাৎকার রেকর্ড করেছে সে। এই ফাঁকে যুবতীর বুকের ভাঁজে আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিল পামার, টের পেল কী যেন ছটফট করছে ওর নিজের বুকের ভেতর, হাসল অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে।

একখানা ফিগার বটে মেয়েটার! রোদেপোড়া বাদামি চামড়া, এক ছটাক বাড়তি চর্বি নেই শরীরের কোথাও। বোঝা যায়

নিয়মিত জিম করে সে। এ-ও বোঝা যায়, যে-পত্রিকায় চাকরি করে, সেটার অর্থনীতি পাতাটা সচল রাখতে নিয়মিত সাক্ষাৎকার নিয়ে বেড়ায় পয়সাওয়ালাদের। টাইট ব্লাউযের শাসন মানতে না চাওয়া উন্নত দুই স্তন নিঃশব্দে বলে দিচ্ছে, পয়সাওয়ালা লোকগুলোর সামনে নিজেকে কীভাবে উপস্থাপন করতে হয়, জানে সে।

ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়ল মেয়েটা, ঝাঁকুনি খেয়ে দুলে উঠল ওর বুক, ছয় পয়েন্ট আট মাত্রার একটা ভূমিকম্প টের পেল পামার নিজের বুকে। 'কাজ চলবে,' বলল মেয়েটা। 'আরও কিছুর দরকার যদি হয়, তা হলে পরে...'

'অবশ্যই, অবশ্যই। ইউ আর অলওয়েয ওয়েলকাম। তোমার যে-কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে খুশি হব আমি। তবে একটা কথা কী...অফিসে আসলে মুড একেকসময় একেকরকম থাকে, যে-কথাটা যেভাবে বলতে চাই সেটা সেভাবে বলা হয় না। আমি চাইছিলাম আমাদের পরবর্তী সাক্ষাৎটা যদি নিরালায় কোথাও হয়, তা হলে...আই মীন...'

হাসল মেয়েটা, বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। 'আপনি যে আমাকে সময় দিতে রাজি হয়ে যাবেন, ভাবতেই পারিনি, মিস্টার পামার।'

'অ্যালবার্ট, মিস, কাছের লোকেরা আমাকে ওই নামেই ডাকে। একটা ইয়ট আছে আমার, ভাবছিলাম আজ বিকেলে ওটা নিয়ে ভেসে পড়ব সাগরে—ছোট্ট একটা ককটেল পার্টিও হয়ে গেল, আবার সূর্যাস্তও দেখা গেল...'

হাসি আরও চওড়া হলো মেয়েটার। 'তুমি মেয়ে পটাতে দারুণ ওস্তাদ, অ্যালবার্ট। আমার নাম জেসিকা, তোমার মনে আছে কি না জানি না...ঠিক কখন আসতে হবে আমাকে?'

'আমি বন্দরে থাকব সাড়ে পাঁচটায়। যদি মনে করো আরও আগেই হাজির হবে, আমার পিএসের কাছ থেকে দরকারি ইনফর্মেশন আর সিকিউরিটি কোড জেনে নিয়ো।' জেসিকাকে

উঠে দাঁড়াতে দেখে ওর ওপর আরও একবার চোখ বুলাল পামার। 'প্রিয় কোনও বেভারেজ আছে তোমার?'

চোখ টিপল জেসিকা। 'প্রিয় কোনও বেভারেজের চেয়ে, সারপ্রাইয আমার কাছে আরও প্রিয়।'

অফিস কামরাটা কেন ওর বেডরুম হলো না, সেটা ভেবে আফসোস করতে করতে জেসিকাকে মনিকার কাছে পৌঁছে দিয়ে নিজের চেয়ারে ফিরে এল পামার। মনে মনে কাঁধ চাপড়ে দিচ্ছে নিজের—কোম্পানির ব্যর্থতার দায়ে ওকে চেপে ধরেছিল জেসিকা, সেখান থেকে সে শুধু কৌশলে রেহাই-ই পায়নি, অভিসারে যাওয়ার ব্যাপারে রাজি করিয়ে ফেলেছে মেয়েটাকে।

পামার জানে, হুট করে এমনি এমনি রাজি হয়নি মেয়েটা, কোনও না কোনও উদ্দেশ্য আছে নিশ্চয়ই। থাকুক, পামারের তেমন কিছু যায়-আসে না; জেসিকাকে যদি কিছু দিতে হয় তা হলে মেয়েটার কাছ থেকে যা নেয়ার নিয়ে নেবে সে আগে।

বিশেষ ফোনটা বেজে উঠল এমন সময়।

রিসিভার তুলল পামার। 'হ্যালো?'

'সাফল্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি আমরা।'

'সপ্তাহখানেক হতে চলল একই কথা শুনছি।'

'আর বড়জোর আটচল্লিশ ঘণ্টা। তারপর...। খবর পাওয়ামাত্র কিন্তু রওনা হতে হবে।'

'আমি প্রস্তুত। আর কিছু?'

'রিচার্ড মারা গেছে।'

'বলো কী! কীভাবে?'

'বাজ পড়েছে ওর ওপর।'

'তা হলে ইসাটাবুর খনিজসম্পদের অধিকার?'

'আমি দাবি করব। আমার গ্রহণযোগ্যতা রিচার্ডের চেয়ে কোনও অংশে কম হবে বলে মনে হয় না। তবে তার আগে শেষ ছোবলটা দিতে হবে আমাদেরকে।'

'বুঝলাম, কিন্তু লোকে সন্দেহ করতে পারে তোমাকে। সবাই

জানতে চাইবে, এত বড় ফিনানশিয়াল ব্যাকআপ তুমি পেলে কোত্থেকে।'

'সেজন্যেই তো বলেছি, খবর পাওয়ামাত্র রওনা হতে হবে। আর সন্দেহ? প্রমাণ ছাড়া সন্দেহ করা আর কল্পনায় বাঘ-ভালুক মারা একই কথা। ফিনানশিয়াল ব্যাকআপ? বিদেশে পয়সাওয়ালা বন্ধু থাকাটা নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক কিছু নয়? ...আসলে এমন সব সমস্যা নিয়ে কথা বলছি, যেগুলো, আমরা নিজেরাই জানি, ম্যানেজ করা কোনও ব্যাপারই না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল পামার। তারপর বলল, 'দ্য মিউটিনিয়ার্স?'

'যে-ক'জন বেঁচে আছে অথবা অক্ষত আছে, নিয়ন্ত্রণে আছে।'

'আর ওই বেয়াড়া লোকটা...মাসুদ রানা?'

'কজার ভেতরে রাখা হয়েছে ওকেও। একদিক দিয়ে আমাদের হাতে গুপ্তধন তুলে দেবে সে, আর আরেকদিক দিয়ে...'

'লোকটাকে প্রথমেই শেষ করে না দিয়ে ভালোই হয়েছে তা হলে, না?'

'হুঁ। সে না থাকলে গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারতাম না আমরা।'

'এখনও পারোনি কিন্তু।'

'পারব। আর আটচল্লিশ ঘণ্টা।' লাইন কেটে দেয়া হলো ওপ্রান্ত থেকে।

রিসিভারটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল পামার, হেলান দিল চেয়ারে। কল্পনার চোখে অনেককিছু দেখতে পাচ্ছে সে:

আজ রাতে শেষ হয়ে গেছে ছোট্ট ককটেল পার্টিটা, তারপর জেসিকাকে নিয়ে যা খুশি তা-ই করছে সে ইয়টে।

গুপ্তধন খুঁজে পেয়েছে মাসুদ রানা, খতম করে ফেলা হয়েছে লোকটাকে, দ্য মিউটিনিয়ার্স এখন অনেক ধনী, সেই সূত্রে পামারও।

শেষ ছোবল দেয়া হয়েছে, কোয়ালিশন ফোর্স কল্পনাও করতে পারেনি সেটা, রাতারাতি সিদ্ধান্ত বদলে ফেলে খনিজসম্পদের রাষ্ট্রীয়করণে রাজি হয়ে গেছেন সোগাভের, ইসাটাবুতে নিজের সক্ষমতার ঘোষণা দিয়ে সে-সম্পদের অধিকার বুঝে নিয়েছে পামারের এজেন্ট, ওকে কারিগরি সহায়তা দিতে দ্বীপশহরটাতে গেছে সে।

জেসিকার সাহায্যে প্রিন্ট মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, পামারের প্রতিষ্ঠান এখন এত সুসংহত যে, সেটা বিদেশি কোম্পানিকে সাহায্য করতে পারে; ফলে ওই এক খবরেই মার্কেটে হু হু করে বাড়তে শুরু করেছে প্রতিষ্ঠানটার শেয়ারের দাম।

মুচকি হাসল পামার; মোবাইল হাতে নিয়ে এসএমএস পাঠিয়ে দিল ইয়টের ক্যাপ্টেনের কাছে, প্রস্তুত অবস্থায় রাখতে বলল ইয়টটা।

আসলেই, ম্যানেজ করতে জানলে কোনও সমস্যাই সমস্যা না।

একত্রিশ

দুটো কঙ্কাল পাওয়া গেছে যে-গুহায়, সেটা ছাড়িয়ে ভেতরে আরেকটা ছোট গুহা দেখা গেল; ওখানে ঢুকল রানা। বিভিন্ন আকারের আরও ত্রিশ-চল্লিশটা কঙ্কাল আছে এখানকার মেঝেতে। সবগুলো কঙ্কালই কিশোর-কিশোরীদের। অদ্ভুত ব্যাপার, মাত্র তিনটা বাদে বাকি কোনওটারই হাত বাঁধা নেই পিছমোড়া করে। এবং আঘাতের কোনও চিহ্ন নেই কোনও কঙ্কালে।

‘তোমাদের দ্বীপে কি মহামারী লেগেছিল কখনও?’ মিউটিনিয়ারদেরকে জিজ্ঞেস করল রানা।

জবাব নেই।

‘এটা কি কোনও গণকবর? যদি তা-ই হয়, কোনও কোনও কঙ্কালের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা কেন?’

মিউটিনিয়াররা নিরুত্তর।

গুহার মেঝেতে আরও কিছু প্লাস্টিকের জুতো পড়ে আছে, একটা তুলে নিল রানা। ‘দেখা যাচ্ছে বেছে বেছে বাচ্চাদেরকে খুন করেছ তোমরা, কারণ কী?’

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল মিউটিনিয়াররা, কেউ কিছু বলল না।

বড়সড় একটা কঙ্কাল পাওয়া গেল, দেখলে বোঝা যায় প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের, অথবা লম্বাচওড়া কোনও কিশোরেরও হতে পারে; ফাটল ধরেছে সেটার খুলিতে, আঘাতটা সম্ভবত বুলেটের। বেশি হলে ছয়-সাত দিন আগে মরেছে মানুষটা, কারণ লাশখেকো পোকার দল এখনও লেপ্টে আছে কঙ্কালটার গায়ে।

কেন যেন, রেমির ভাই ইটের কথা মনে পড়ে গেল রানার। গুপ্তধনের সঙ্গে, আপাতদৃষ্টিতে, কোনও সম্পর্ক নেই এসব কঙ্কালের, বুঝতে পারছে ও; তারপরও কেন যেন মনে হচ্ছে, যোগসূত্র একটা আছে, কোথাও না কোথাও। ‘কী যেন বলে তোমাদের দ্বীপের লোককাহিনি?’ বলল মিউটিনিয়ারদের উদ্দেশে। ‘দৈত্যদেবতারা ধরে ধরে নিয়ে যায় ছেলেমেয়েদেরকে, তারপর খেয়ে ফেলে তাদেরকে? তারা কি ছেলেমেয়েদের মাথায় গুলিও করে নাকি আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে?’

মুখে কুলুপ এঁটে আছে মিউটিনিয়াররা।

‘যেদিক দিয়ে ঢুকেছি আমরা এই গুহায়,’ আবারও বলল রানা, ‘সেদিক দিয়ে বয়ে নিয়ে আসা হয়নি এই লাশগুলো। তারমানে এখানে ঢোকার আরও কোনও পথ আছে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেটা তোমরা জানো।’

মিউটিনিয়ারদের পক্ষ থেকে কোনও মন্তব্য নেই।

হাতঘড়ি দেখল রানা। সাড়ে এগারোটা।

'ঝরনা ছাড়িয়ে,' ওকে মনে করিয়ে দিল একজন মিউটিনিয়ার।

লোকটার দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকাল রানা, লোকটার গালে কষে একটা চড় মারতে ইচ্ছা করছে ওর। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে বলল, 'চলো বের হই এখান থেকে। এখানে মনে হয় না কিছু পাওয়া যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না ঠিক গুহাটা খুঁজে বের করতে পারছি আমরা, ততক্ষণ খোঁজ চালিয়ে যেতে হবে আমাদেরকে।'

পকেট থেকে মোবাইল বের করল এক মিউটিনিয়ার, রানার কথাগুলো পিজিন ভাষায় রূপান্তর করে জানিয়ে দিল সম্ভবত।

ঝরনাটার কাছে ফিরে আসামাত্র অদ্ভুত একটা অনুভূতি যেন ছেঁকে ধরল রানাকে। ওর মনে হচ্ছে, কিছু একটা অথবা কেউ যেন ঘন জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে নজর রাখছে ওদের, বিশেষ করে ওর ওপর।

এদিকওদিক তাকাল রানা, আশপাশের ঝোপঝাড়গুলোর ওপর চোখ বুলাল ভালোমতো।

না, হিংস্র কোনও জন্তু অথবা কোনও মানুষের উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে না। অস্বস্তিকর অনুভূতিটা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মাথা নাড়ল সজোরে, কিন্তু কোনও লাভ হলো না। বিপদের আশঙ্কা খচ্‌খচ্‌ করছে ওর মনে। কিন্তু সে-ব্যাপারে কিছু বলল না মিউটিনিয়ারদের কাউকে।

একটু আগের গুহাটা একপাশে রেখে সামনে এগিয়ে গেছে ঢালটা, এগোতে শুরু করল ওরা। প্রচণ্ড গরম স্বাভাবিকভাবেই ধীর করে দিয়েছে ওদের এগোনোর গতি। প্রায় দেড় ঘণ্টা পর হাজির হলো ওরা আরেকটা গুহায়।

কয়েকটা গাছ জড়াজড়ি করে জন্মেছে সেটার মুখের সামনে, তবে ভেতরে ঢুকতে হলে মাচেটি দিয়ে পথ পরিষ্কার করে নিতে হবে না, গা বাঁচিয়ে এগোলেই হবে। রানা খেয়াল করল, ব্যায়ামের অভ্যাস না থাকায় ইতোমধ্যে হাঁপিয়ে গেছে

বইঘর.কম

মিউটিনিয়ারদের সবাই; একটানা পরিশ্রম সহ্য করতে পারছে না তাই, একটা গা-ছাড়া ভাব কাজ করছে ওদের সবার মধ্যে।

সতর্কতায় ঢিল পড়েছে ওদের। এবং রানা চেয়েছিল, এ-রকম যেন হয়।

'আহ্!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল এক মিউটিনিয়ার।

গাছগুলোর ফাঁকফোকর দিয়ে নিজের জন্য পথ করে নিচ্ছিল রানা তখন, চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

বাঁ পা-টা চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়েছে আহত লোকটা, আহাজারি করে কীসব যেন বলছে পিজিন ভাষায়। ওর দিকে এগিয়ে গেল দু'জন, পিস্তল হাতে নিয়ে রানাকে পাহারা দিচ্ছে চতুর্থজন।

বেখেয়ালে আলগা পাথরে পা দিয়ে ফেলেছিল লোকটা, পা-টা পিছলে গিয়ে ঠোকর খেয়েছে আরেকটা বড়, চোখা পাথরের সঙ্গে, কেটে গেছে বিশ্রীভাবে, রক্ত ঝরছে অঝোরে।

ব্যাকপ্যাক থেকে প্রয়োজনীয় জিনিস বের করে ওর শুশ্রূষায় মন দিল দুই মিউটিনিয়ার। ক্ষতস্থানে পেঁচিয়ে দেয়া হলো একটা পট্টি, সোজা হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল আহত মিউটিনিয়ারটা, কিন্তু এক পা এগোনোর চেষ্টা করেই বসে পড়ল। পিজিন ভাষায় যা বলল সে সঙ্গীদের উদ্দেশে, ভঙ্গি দেখে অনুমান করে নিল রানা, হাড়ে চিড় ধরেছে। কারও সাহায্য ছাড়া হাঁটতে পারবে না বলে জানাচ্ছে। ওর শুশ্রূষা করার জন্য এগিয়ে গিয়েছিল যারা, মোবাইল বের করল তাদের একজন। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলল পিজিন ভাষায়।

তারপর লাইন কেটে দিয়ে তাকাল রানার দিকে, ইঙ্গিতে দেখাচ্ছে আহত লোকটাকে। 'নট ওয়াক। হি গো ব্যাক। টু গো উইথ ইউ। ইউ সার্চ।'

অর্থাৎ আহত লোকটা হাঁটতে পারবে না আর, তাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে যেতে হবে একজন মিউটিনিয়ারকে। রানার সঙ্গে থাকছে দু'জন। খোঁজাখুঁজি চালিয়ে যেতে হবে।

মাথা ঝাঁকিয়ে বুঝতে পারার ইঙ্গিত করল রানা, মনে মনে খুশি হয়েছে। নিজের জন্য পথ করে নিয়ে হাজির হলো গুহামুখের কাছে, জ্বেলে নিল টর্চলাইট। ভেতরে ঢুকল।

কীসের যেন বাজে একটা গন্ধ আসছে।

চলার গতি ধীর করল রানা, ঘাড় ঘুরিয়ে জানতে চাইল, 'ভেতরে ভালুক-টালুক আছে নাকি?'

'নট নো,' জবাব দিল একজন মিউটিনিয়ার।

'তা হলে পিস্তলটা প্রস্তুত রেখো দয়া করে।'

কিছু বলল না মিউটিনিয়াররা।

এগিয়ে গেল রানা, মাথা অনেকখানি ঝুঁকাতে বাধ্য হলো। প্রবেশপথটা উচ্চতায় মনে হয় চার ফুটও হবে না। মেঝের এখানে-সেখানে আলগা পাথরের ছড়াছড়ি। পা-কাটা জঙ্গির কথা স্মরণ করে সাবধান থাকল রানা।

কিছুদূর এগোনোর পর চওড়া হলো পথটা, কিন্তু ছাদ এখনও আগের মতোই নিচু আছে। মূল গুহায় হাজির হওয়ার পর থামল রানা।

প্রথম গুহাটার সঙ্গে যদি তুলনা করা হয়, তা হলে এটাকে ছোট্ট বলতে হবে। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বিশ ফুট বাই দশ ফুটের বেশি হবে না। প্রতিটা দেয়ালে আলো ফেলে ফেলে ভালোমতো দেখল রানা, তারপর মাথা নাড়ল। কিছুই নেই এখানে, এমনকী অন্য কোনও প্রবেশপথও না। কর্নেল কামাসাকু এখানে এসেছিল বলে মনে হচ্ছে না। এবং কোথাও কোনও কঙ্কালও নেই। সঙ্গের দুই মিউটিনিয়ারকে বেরিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করল রানা।

উজ্জ্বল সূর্যালোকে এসে ভ্রূ কুঁচকে ফেলল দুই মিউটিনিয়ার। একজন বলল রানাকে, 'নাউ হোয়াট?'

জবাব না দিয়ে ব্যাকপ্যাক থেকে কম্পাস বের করল রানা, মনোযোগ দিয়ে দেখল অথবা দেখার ভান করল। বিনোকিউলার বের করে ঝরনাটা দেখল, দেখল বিস্তৃত ঢালের পুরোটা। তারপর গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল, 'নাউ সার্চ। খোঁজ অব্যাহত রাখা ছাড়া

কোনও বিকল্প নেই আমাদের হাতে।'

পকেট থেকে মোবাইল বের করে পিজিন ভাষায় কিছুক্ষণ কথা বলল একজন মিউটিনিয়ার।

'পানির ক্যান্টিন খালি হয়ে আসছে আমাদের,' লোকটার কথা শেষ হলে জানান দিল রানা। 'ঝরনা থেকে ভরে আনতে হবে ওগুলো। আরও ঠিক কতদূর যেতে হবে, জানি না আমি।' হাতঘড়ি দেখল। তিনটা বাজে প্রায়। 'খাওয়ার ব্যবস্থা কী আমাদের?'

'বিস্কিট।'

ঝরনা থেকে পানি নিয়ে এসে আবার এগোতে শুরু করল ওরা।

ট্রেইলটা দুর্গম হয়ে উঠছে আস্তে আস্তে, খেয়াল করল রানা। ওকে মাঝখানে রেখে একসারিতে এগোচ্ছে দুই মিউটিনিয়ার, মাচেটি ব্যবহার করে একটু পর পরই পথ পরিষ্কার করে নিতে হচ্ছে সামনের জনকে, পেছনের মিউটিনিয়ারের হাতে পিস্তল। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গরম বাড়ছে যেন। থামতে হচ্ছে প্রতি বিশ মিনিট পর পর; একটানা পথশ্রম ক্লান্তির শেষসীমায় নিয়ে গেছে দুই মিউটিনিয়ারকে, ক্লান্তি বোধ করছে রানা নিজেও। বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ অনেক বেশি; ঘামে ভিজে চুপচুপে হয়ে যাওয়া শার্ট শুকাচ্ছে না, পুরোপুরি শুকাবে বলে মনেও হয় না। যে-হারে পানি গিলছে দুই মিউটিনিয়ার্স, ওদের ক্যান্টিন খালি হতে আর দেরি নেই। তখন কোনও খাঁড়ির সন্ধান যদি পাওয়া না যায়, ঠিক কী হতে পারে বুঝতে পারছে না রানা।

জড়াজড়ি করে গজিয়ে ওঠা কয়েকটা গাছের ছায়ায় বসে পড়ল ওরা "লাঞ্চের" জন্যে। বিস্কিট চিবাতে চিবাতে চোখে বিনোকিউলার ঠেকাল রানা আবার, আশপাশের ঘন জঙ্গল আর ট্রেইল দেখছে। 'ঝরনা ছাড়িয়ে,' বলল ও, 'কিন্তু কতদূর?'

'ইউ নো,' বলল এক মিউটিনিয়ার। 'উই নট নো।'

'আমিও নট নো। যদি জানতাম, সাধ করে তোমাদেরকে

সঙ্গে নিয়ে এই গরমে ঘুরে বেড়াতাম না।...আচ্ছা, একটা কথা বলো তো। জাপানি কর্নেল গুহার ভেতরে গুপ্তধন লুকানোর পর গুহামুখ গোপন করবার জন্যে বিশেষ কোনও ব্যবস্থা নিয়েছিল?'

'নট নো।'

'ব্যাপারটা অদ্ভুত, কিন্তু অসম্ভব না। ধরো গ্রেনেডের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে...অথবা মর্টার চালিয়ে...'

'নট নো।'

'সেক্ষেত্রে যে-কাজ করতে হবে আমাদেরকে তা হলো, চোখকান খোলা রাখতে হবে, পরের যে-কোনও গুহায় ঢোকার আগে কোনও অস্বাভাবিকতা আছে কি না, খেয়াল করতে হবে।'

'ইউ ট্রাই। উই টায়ার্ড।'

'তা হলে কি আজকের মতো এখানেই ক্ষান্ত দেব?'

জবাব দেয়ার আগে আবারও মোবাইলে কথা বলে নিল এক মিউটিনিয়ার। তারপর, দরকার না থাকার পরও, হাতের পিস্তল নাচিয়ে বলল, 'উই সার্চ।'

আবার এগোতে শুরু করল ওরা। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর, একসঙ্গে পড়ে থাকা কতগুলো বোল্ডার দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানার, সঙ্গের দুই রেবেলের উদ্দেশে বলল ও, 'মনে হচ্ছে ভূমিধস। চলো কাছে গিয়ে দেখি।'

কাছে গিয়ে দেখা গেল, বোল্ডারগুলোর আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে নিচু একটা গুহার মুখ; ওগুলো এমনভাবে পড়ে আছে যে, কাছে না এলে গুহাটার অস্তিত্ব ঠাহর করা মুশকিল হয়ে যেত।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দুই মিউটিনিয়ার। রানার দিকে তাকিয়ে একজন বলল, 'ইউ গেস রাইট।'

কোনও বোল্ডারের চোখা প্রান্তের সঙ্গে ঘষা লেগে শরীরের কোথাও যাতে না কাটে, সেজন্য শরীরটা সাবধানে ডানে-বাঁয়ে করে, কখনও মুচড়ে, কখনও কুঁজো হয়ে হাজির হলো রানা গুহামুখটার কাছে। বেশ কয়েক মিনিট পর ওর পাশে এসে দাঁড়াল দুই মিউটিনিয়ার।

বইঘর.কম

গুহার ভেতরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। ভেতর থেকে হালকা বাতাস এসে লাগছে গায়ে, তারমানে অন্য কোনওদিক থেকে ঢোকার রাস্তা আছে গুহায়। নিচু আর সরু প্রবেশমুখের কথা বাদ দিয়ে বললে, আগের গুহাগুলোর চেয়ে এটা আকারে অনেক বড়। মেঝে এবড়োখেবড়ো, আলকাতরার মতো কালো অন্ধকার চারদিকে। টর্চলাইটের আলো সেই অন্ধকার আরও বাড়াচ্ছে যেন। যত এগোচ্ছে ওরা, ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে মেঝে। আশপাশের বাতাস কেমন ভেজা ভেজা। আরও ভেতরে কোথাও গুহার ছাদ চুইয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ছে, টুপটুপ আওয়াজ পাওয়া যায়।

কেউ দেখছে—অস্বস্তিকর অনুভূতিটা আরেকবার ছ্যাঁকা দিল রানাকে।

এদিকওদিক তাকানোর পর এক মিউটিনিয়ার বলল, 'নো বক্স।'

'অ্যাণ্ড নো কঙ্কাল,' বলল রানা, টর্চলাইটের আলো ফেলে ফেলে এদিকওদিক তাকাচ্ছে।

বেশ কিছু স্ট্যালাকটাইট, সম্ভবত গুহাটার জন্মলগ্ন থেকে, ঝুলছে ছাদে; কালের ছোবলে ক্ষয়ে গিয়ে ভোঁতা হয়ে গেছে বেশিরভাগই, কোনও কোনওটা আবার সাংঘাতিক চোখা। গা বাঁচিয়ে এগোতে হচ্ছে ওদেরকে। ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে ছোটবড় পাথর, সবগুলো পাথরের আড়ালে কী আছে তা জানতে কম করে হলেও দু'মাস সময় লাগবে। যত এগোচ্ছে ওরা, ততই তাপমাত্রা কমছে বলে মনে হচ্ছে; মনে হচ্ছে, গুহার ভেতরে এসি চলছে। রানা অনুমান করল, ছোটবড় একাধিক গুহার মুখ উন্মুক্ত হয়েছে সামনে কোথাও, এবং সেগুলো কোনও না কোনওভাবে বাইরের মূল প্রান্তরের সঙ্গে যুক্ত; বাইরে থেকে বাতাস ঢুকে গুহার ঠাণ্ডা ছাতের সংস্পর্শে এসে শীতল হয়ে যাচ্ছে।

'ওয়েলকাম এগেইন, মিস্টার রানা!' বদ্ধ গুহার ভেতরে

গমগম করে উঠল একটা কণ্ঠ।

পাঁই করে ঘুরল রানা, ঘুরল দুই মিউটিনিয়ারও।

রানার টর্চলাইটের উজ্জ্বল আলো দুই রেবেলের পিঠে প্রতিহত হচ্ছে, কেবল একটা আভা যেতে পারছে সামনে। তবে তাতে, দশ-বারো গজ দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মানবকাঠামোটা চিনতে কষ্ট হচ্ছে না।

এতক্ষণ যে-পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ছিল লোকটা, সেটা ছেড়ে এক পা আগে বাড়ল।

ফ্যান্সি স্টোর থেকে কেনা ক্যামোফ্ল্যাজ শার্ট আর ট্রাউজার পরে আছে সে, পায়ে কেডস। মাথায় ক্যামোফ্ল্যাজ ক্যাপ। গলায় ঝুলছে একটা বিনোকিউলার, কোমরে পানির ক্যান্টিন, ডান হাতে একটা রিভলভার—নলটা তাক করা দুই মিউটিনিয়ারের দিকে।

মোফাট ফুগুই।

'যে চেনে আর যে চেনে না,' আবারও গমগম করে উঠল ফুগুইয়ের কণ্ঠ, 'তাদের দু'জনের মাঝখানে কত তফাৎ, তাই না, মিস্টার রানা? ছোটবেলা থেকেই আমার শখ ছিল এই দ্বীপের গুহাগুলোর ভেতরে ঘুরে বেড়ানো; কাজটা করতে গিয়ে কতবার যে হারিয়ে গেছি নিজেও জানি না। স্রেফ কপালগুণে বেঁচে গেছি কতবার। এবং কাজটা করতে গিয়ে আশ্চর্য একটা ব্যাপার জানতে পেরেছি। এই দ্বীপের বেশিরভাগ গুহাই, কোনও না কোনও প্রাকৃতিক সুড়ঙ্গপথে, একটা আরেকটার সঙ্গে যুক্ত। কথাটা যারা জানে, সুড়ঙ্গগুলো যারা চেনে, তারা ইচ্ছা করলে দ্বীপের বেশিরভাগ গুহায়, যে-কোনও সময় হাজির হয়ে ঘাপটি মেরে থাকতে পারে, তা-ই না?'

'তুমি আমাদেরকে ফলো করছিলে, না?' বলল রানা।

'অবশ্যই। এবং আমি জানি কাজটা সফলভাবে করতে পেরেছি।'

'ফলো করার কারণ?' আবারও জিজ্ঞেস করল রানা।

'গুপ্তধন। ছা-পোষা পুলিশের চাকরি আর কতদিন, মিস্টার

বইঘর.কম

রানা? নামকাওয়াস্তের বেতন দিয়ে কি সংসার চালানো যায়, বলুন? রাজার হালে জীবন কাটাতে কার না ইচ্ছা করে? ...রিচার্ড যেদিন গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করে প্রস্তাব করল, ওর কথামতো কাজ করলে প্রতি মাসে বাড়তি কিছু দেবে আমাকে, রাজি হয়ে গেলাম। যেদিন বলল, আপনাকে চোখে চোখে রাখলে, আরও কিছু দেবে, রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু যেদিন জানতে পারলাম, শামানের গুপ্তধনের পিছনে লেগেছেন আপনি আসলে, টাইট দেয়া বন্ধ করলাম আপনাকে। রিচার্ডও চায়নি অবশ্য সেটা। যা-হোক, সুযোগের অপেক্ষায় থাকলাম; নিজের কপাল দেখে নিজেরই হিংসা হচ্ছে আমার এখন। ঠাঠা পড়ে মরল রিচার্ড, দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বিদায় নিল দুই মিউটিনিয়ার, আপনার সঙ্গে এখন মাত্র দু'জন যাদেরকে...' কথা শেষ না করে টান দিল ফুগুই রিভলভারের ট্রিগারে।

একসঙ্গে কয়েকটা ঘটনা ঘটল।

লাইন অভ ফায়ার থেকে সরে যাওয়ার জন্য একদিকে ডাইভ দিল রানা।

বদ্ধ গুহায় বোমা বিস্ফোরণের মতো শোনাল রিভলভারের পর পর দুটো গর্জন।

মরার আগে আর্তনাদ করে উঠল এক মিউটিনিয়ার।

ওদের কোনও একজনের পকেটে রাখা মোবাইল বেজে উঠল।

'মিস্টার রানা!' চিৎকার না, যেন হুঙ্কার ছাড়ল ফুগুই।

জবাব দেয়ার মতো অবস্থায় নেই রানা, কারণ গড়াতে গড়াতে চলে যাচ্ছে ও একটা সুড়ঙ্গের ভেতরে। ভেবেছিল ডাইভ দিয়ে পড়বে গুহার মেঝেতে, কিন্তু আসলে পড়েছে চওড়া একটা সুড়ঙ্গমুখের ভেতরে, আশপাশে পতন ঠেকানোর মতো কিছুই না থাকায় নেমে যাচ্ছে সুড়ঙ্গটার গভীর থেকে গভীরে।

'মিস্টার রানা!' সুড়ঙ্গমুখের কাছ থেকে আবারও শোনা গেল ফুগুইয়ের চিৎকার।

সলোমন দ্বীপপুঞ্জের পুলিশ কমিশনার যোশো ফ্র্যান্সিসকে দেখে মনে হচ্ছে, মেহগনি কাঠ কুঁদে বানানো হয়েছে তাঁর মুখটা।

পিএস সার্জেন্ট পিটারকে নিয়ে তিনি নিজে এসেছিলেন হেণ্ডারসন ফিল্ডে, রিসিভ করেছেন সোহেল আর মুরল্যাণ্ডকে, এখন তাঁরা চারজনে রয়্যাল পুলিশের একটা গাড়িতে করে ছুটে চলেছেন মেণ্ডানার দিকে। জরুরি পরিস্থিতিতে শুধু প্রয়োজনীয় কথা হয়, সেটা তাঁরা সেরে নিয়েছেন ইতোমধ্যে।

হোটেলে পৌঁছে প্রথমেই ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করলেন ফ্র্যান্সিস; কেন এসেছেন, কী করতে চান খুলে বললেন। পিটার আর মুরল্যাণ্ড রয়ে গেল রিসিপশনের সামনে, কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার আছে ওখানকার লোকদের। রানার রুমের চাবি নিয়ে তিন তলায় চলে এল সোহেল, ওর পেছনে হাঁপাতে হাঁপাতে হাজির হলেন ফ্র্যান্সিস।

লক খুলে পাল্লাটা ঠেলে দেয়ালের সঙ্গে লাগিয়ে দিল সোহেল, বিকেলের আলোয় খুব একটা আলোকিত না রুমটা। গোবরাটের কাছে পাউডারের অস্তিত্ব দেখে যা বোঝার বুঝে নিল ও। ঘরের ভেতরে ঢুকল। চৌকাঠের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে আছেন ফ্র্যান্সিস; তাঁর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, রুমের ভেতরে অতিকায় কোনও জন্তু থাকার আশঙ্কা করছেন তিনি।

আসবাব বলতে বেশি কিছু নেই রুমে, দেখছে সোহেল। প্রথমেই একটা খাট আর কুঁচকে থাকা চাদর দেখলে বোঝা যায় কেউ শুয়েছিল সেখানে। একধারে একটা ড্রেসিং টেবিল, তার ঠিক উল্টোদিকে ছোট একটা সোফা। খাটের সঙ্গে বেডসাইড ড্রয়ার আছে, আর আছে একটা ক্লযিট।

অপহৃত হবে বিসিআই-এর একজন এজেন্ট, অথচ সম্ভাব্য অপহরণ সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা থাকবে না তার—এটা হতে পারে না, তা-ও আবার রানার বেলায়। সুতরাং, ধরেই নিল সোহেল, এই ঘরে কোনও না কোনও ক্লু রেখে গেছে রানা, যা শুধু

বইঘর.কম

বিসিআই না, দুনিয়ার যে-কোনও গুপ্তচর সংস্থার প্রাথমিক পাঠগুলোর একটা।

প্রথমেই দেখতে হবে এমন কোনও জায়গা, যেখানে দৃষ্টি যাবে আর দশজনের, কিন্তু সেখানে কোনও কিছু লুকিয়ে রাখার কথা কল্পনাও করতে পারবে না তারা।

খাট...ড্রেসিং টেবিল...নাহ্, জুৎসই মনে হচ্ছে না সোহেলের কাছে। সোফা...বেডসাইড ড্রয়ার...ক্লযিট...উঁহুঁ, নেহায়েত মামুলি হয়ে যায় ওসব। ট্রাভেলিং ব্যাগ? না, ওখানেও কিছু রাখবে না রানা।

তা হলে বাথরুম? হ্যাঁ, ওখানে খুঁজতে যাবে সোহেল, তবে তার আগে ঘরটা...এই ঘর কেন যেন...

স্থির হয়ে থাকা সিলিংফ্যানের ওপর নজর পড়ল ওর। এগিয়ে গেল সুইচবোর্ডের দিকে, জ্বালিয়ে দিল ঘরের লাইট। ড্রেসিংটেবিলের কাছ থেকে ছোট্ট টুলটা নিয়ে এসে উঠে দাঁড়াল ওটার ওপর। একে একে চেক করল ফ্যানের সবগুলো ব্লেড, পাওয়া গেল শুধু পুঁচকে একটা টেপ রেকর্ডার। এটা ডক্টর শমশের আলীর তৈরি একটা গ্যাজেট।

সন্দেহ নেই, এটার কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় এখানে রেখেছে রানা। কিন্তু ভেতরে ক্যাসেট নেই কেন?

টুল থেকে নামল সোহেল, গিয়ে ঢুকল বাথরুমে। দ্রুত চেক করল, কিন্তু চোখে পড়ার মত কিছু পেল না সেখানে। থাই দরজা সরিয়ে বারান্দাটা দেখল ও একনজর, বারোটা বেজে যাওয়া কয়েকটা ফুলের টব দেখে বোঝা গেল আগেও একবার সার্চ করা হয়েছে এ-রুম, এবং সেটা সম্ভবত রানা যখন ছিল তখনই।

একটা মুহূর্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল সোহেল, কী করবে ভাবছে; হঠাৎ মনে পড়ে গেল সুইচবোর্ডটার কথা। মিস্টার ফ্র্যান্সিসকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত পায়ে ফিরে গেল সে বোর্ডটার কাছে; এতক্ষণে রুমের ভেতরে ঢুকেছেন কমিশনার, নির্বিকার দৃষ্টিতে দেখছেন সোহেলের কাজ।

সুইচবোর্ড বরাবর নিচে নামছে সোহেলের দৃষ্টি, টাইলসের স্ক্যাটারের কাছে স্থির হলো সেটা। কে যেন পেন্সিল দিয়ে কিছু একটা লিখে রেখেছে সেখানে, সম্ভবত রানা নিজে। বসে পড়ল সোহেল।

বাংলা উচ্চারণে ইংরেজিতে লেখা আছে:

পাউরুটি খাই কিন্তু রুটি খাই না, কারণ হিন্দিতে ভয় পাই।

শালা, মনে মনে বলল সোহেল, সবখানে হেঁয়ালি, না?

রানা বোঝাতে চেয়েছে, পাউডার।

পাউডার? মানে...পাউডারের কোনো ডিব্বা দেখতে বলেছে রানা? উঠে দাঁড়াল সোহেল, এদিকওদিক তাকাচ্ছে।

কামরায় নেই, বাথরুমে পাওয়া গেল ক্যানটা। শুয়ে আছে। দেখলে মনে হয়, শেষ হয়ে গেছে, বেসিনের তাকে ফেলে রাখা হয়েছে অবহেলায়। এগিয়ে গিয়ে ক্যানটা তুলে নিল সোহেল। খুলে ফেলল ক্যাপ।

ক্যানটা উঁচু করে ধরে ভেতরে কী আছে জানার জন্য ওটা উপুড় করামাত্র ভেতর থেকে একটা ছোট্ট ক্যাসেট বেরিয়ে এসে পড়ল ওর হাতে, মেঝেতে পড়ে যাওয়ার আগেই জিনিসটা ধরে ফেলল ও, ডান হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের সাহায্যে ধরে দেখল কিছুক্ষণ, দেখাল মিস্টার ফ্র্যান্সিসকে। তারপর রেখে দিল শার্টের পকেটে। 'এর ভেতর জরুরি তথ্য পাওয়া যাবে।'

ক্যানের ভেতরে ভাঁজকরা কাগজ দেখা যাচ্ছে, ওটা বের করে আনল সোহেল। কাগজের ভাঁজ খুলে আদ্যোপান্ত দ্রুত পড়ল রানার লেখাটা। তারপর তাকাল মিস্টার ফ্র্যান্সিসের দিকে। 'দ্য মিউটিনিয়ার্সের হাতে ধরা পড়েছে রানা। আর এই ক্যাসেটের ভেতর রয়েছে আপনাদের জন্যে জরুরি কিছু তথ্য।'

'আমি...দুঃখিত।'

'দ্য মিউটিনিয়ার্স শুধু ইসাটাবুর খনিজসম্পদের রাষ্ট্রীয়করণই চাইছে না, রাজা শামানের গুপ্তধনও চায়। এখানে আসার পর রানা জড়িয়ে গিয়েছিল ওই গুপ্তধনের সঙ্গে। ওকে অপহরণ করা

বইঘর.কম

হয়েছে, কারণ দ্য মিউটিনিয়ার্স চাইছে, ওদের হয়ে গুপ্তধন খুঁজুক রানা। ওটা খুঁজে পেলে ওরা রানাকে বাঁচিয়ে রাখবে না...বাঁচিয়ে রাখার কথা না।'

'যদি ইতোমধ্যেই...' সোহেলকে সুইচবোর্ডটার দিকে এগোতে দেখে থেমে গেলেন মিস্টার ফ্র্যান্সিস।

বোর্ডটার কাছে গিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে গোড়ালির ওপর বসে পড়েছে সোহেল আবার। 'রানার জায়গায় যদি আমি থাকতাম, তা হলে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, বাইরের সাহায্য আসার আগপর্যন্ত, যেভাবেই হোক সময়ের অপচয় করে যাওয়ার চেষ্টা করতাম। আমি যখন জানি গুপ্তধন পাওয়া আর আমার মরণ এক কথা তখন...এটা কী?' ফুগুইয়ের মোবাইল নম্বর লিখেছিল রানা, নম্বরটার ওপর চোখ পড়েছে সোহেলের।

ওর দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন মিস্টার ফ্র্যান্সিস, একইভাবে বসে পড়লেন। তাকালেন নম্বরটার দিকে। একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখার পর বললেন, 'মোবাইল নম্বর বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'মোবাইল নম্বর?'

মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার ফ্র্যান্সিস। 'সলোমন দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে বড় মোবাইল টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিস প্রোভাইডার আওয়ার টেলিকমের নম্বর ওটা।'

চট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল সোহেল, রায়হানকে ফোন করে জেনে নিল রিচার্ডের মোবাইল নম্বর। 'আমার বন্ধুকে খুঁজে বের করার ক্লু পেয়ে গেছি, মিস্টার ফ্র্যান্সিস। এই নম্বর দুটো ব্যবহার করছে যে বা যারা, তাদের সঙ্গেই আছে অথবা ছিল রানা। যত জলদি সম্ভব যোগাযোগ করুন আওয়ার টেলিকমে, ওদের মোবাইল ট্র্যাকিং সিস্টেম ফ্যাসিলিটির সাহায্যে জেনে নিন দ্বীপের ঠিক কোন্ জায়গায় আছে এখন সিম দুটোর মালিক। ওখানেই যেতে হবে আমাদেরকে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পকেট থেকে নিজের মোবাইল বের করলেন

মিস্টার ফ্র্যান্সিস।

সোহেল বের করল ওর স্যাটেলাইট ফোন। জরুরি কয়েকটা কল করতে হবে।

বত্রিশ

গিযবর্ন, নিউযিল্যাণ্ড।

নিজের ইয়টের ডেকে কাঠের আরামকেদারায় আরাম করে শুয়ে আছে পামার। নিয়মিত বিরতিতে যদি ভোগ করা যায় নিত্যনতুন নারীদেহ, তা হলে আরামে থাকারই কথা একজন ভোগবাদী পুরুষের। সাগরে ভাসতে ভাসতে সূর্যাস্ত দেখা, তারপর চমৎকার ডিনার, তারপর কিছু সময়ের জন্য কেবিনের একমাত্র বিছানাটা তার সঙ্গে ভাগাভাগি করা...আর কোন্ নতুন সংজ্ঞা হতে পারে আরামের?

মোবাইলে কথা বলছে জেসিকা, ওকে কেবিনে রেখে ডেকে এসেছে পামার। কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে নিজের মোবাইলে শুনছে জ্যায, শ্যাম্পেনের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে তাকিয়ে আছে বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত শহরের দিকে, মাঝেমধ্যে তাকাচ্ছে লাইটহাউসটার দিকে। অপেক্ষা করছে—কিছুক্ষণ পরেই চাঁদ ওঠার কথা। দামি কিউবান সিগারে টান দিচ্ছে একটু পর পর। ছাই ঝাড়ছে আরামকেদারাটার পাশেই ছোট্ট একটা টেবিলের ওপর রাখা স্ফটিকের অ্যাশট্রেতে।

ওর মোবাইল বেজে উঠল। ইসাটাবু থেকে ফোন এসেছে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে গেছে জ্যায, এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবেই ভাঁজ পড়েছে পামারের কপালে। কলটা রিসিভ করল সে। 'বলো।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ওপ্রান্ত থেকে বলা হলো, ‘ঢেউয়ের শব্দ পাচ্ছি মনে হয়?’

পামারের বিরক্তি বাড়ল। ‘সারাই করিয়েছি ইয়টটা। একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছি।’

‘বাহ্, এদিকে পেরেশানি সব যাচ্ছে আমার ওপর দিয়ে।’

‘ফালতু বোকো না! যদি ভেবে থাকো আরামে আছি আমি, ভুল ভাবছ। দ্য মিউটিনিয়ার্স তাদের উদ্দেশ্য হাসিল করতে না পারলে, মাসুদ রানা গুপ্তধন উদ্ধার করতে না পারলে কিছুই হবে না তোমার, কিন্তু আমার কী হবে? স্রেফ পথের ফকির হয়ে যাব আমি। পথের ফকির। বালির বাঁধ দিয়ে বন্যার পানি ঠেকিয়ে রেখেছি কোনওরকমে, পানির চাপ বাড়ছে প্রতিদিনই, যে-কোনও সময় ভেঙে পড়বে বাঁধ, তখন সবার আগে তলিয়ে যাবে কে?’

‘মাসুদ রানা গায়েব হয়ে গেছে।’

‘কী?’

‘বললাম, মাসুদ রানার কোনও খবর নেই। এবং সেটা জানানোর জন্যই ফোন করেছি। অফিসের ফোনে ট্রাই করেছি অনেকবার, না পেয়ে শেষে বাধ্য হয়ে...’

‘মাসুদ রানার কোনও খবর নেই মানে কী?’

‘মানে, লোকটার সঙ্গে শেষপর্যন্ত মিউটিনিয়ার ছিল দু’জন। একটু পর পরই ফোন দেয়া হচ্ছিল ওদের মোবাইলে, জেনে নেয়া হচ্ছিল সর্বশেষ অবস্থা। কিন্তু হঠাৎ করেই আর ফোন ধরছে না ওরা, দু’জনের কেউই না। মোট চারজন ছিল ওরা শুরুতে, একজন আহত হওয়ায় ওকে নিয়ে ফিরে আসছিল আরেকজন, বাকি দু’জন ছিল মাসুদ রানার সঙ্গে।’

‘তা হলে...এখন কী হবে?’

‘সুস্থ লোকটাকে বলেছি, আহত লোকটাকে জঙ্গলের ভেতরে ফেলে রেখে ফিরে গিয়ে যেন দেখে কী হয়েছে আসলে।’

‘কোনও দুর্ঘটনায় পড়েনি তো ওরা?’

‘কী জানি...বুঝতে পারছি না।’ ৮

'তোমার যে লোক ফিরে যাচ্ছে এখন, তার নাম কী?'

'সবাই জনি নামে ডাকে...জনি ওয়াকার।'

'ওরা চারজনে মাসুদ রানার সঙ্গে মিলে চক্রান্ত করেনি তো?'

'চক্রান্ত?'

'হ্যাঁ, হয়তো নিজেরাই মেরে দিতে চাইছে গুপ্তধন?'

'মাসুদ রানাকে দেখে লোভী মানুষ বলে মনে হয়নি আমার। গুপ্তধন যদি মেরে দেয়ার ইচ্ছা থাকে লোকটার, আরও অনেক কায়দা অবলম্বন করতে পারবে সে, কাউকে হাত করার দরকার ওর হবে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া...একটু আগেও কথা বললাম জনির সঙ্গে, ওর কণ্ঠ অথবা কথা বলার ভঙ্গি শুনে অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়নি আমার।'

'তা হলে...অপেক্ষা করা ছাড়া আপাতত আর কিছু করার আছে বলে মনে হচ্ছে না। জনি কী জানায়, দেখো আগে।'

'যদি জানতে পারি আসলেই কোনও চালাকি করেছে মাসুদ রানা?'

'তা হলে কী করতে হবে রেমি তানাঘাইকে, জানো তুমি। রাখছি।'

কেবিনের দরজাটা একটুখানি খুলে গেল এমন সময়, পাল্লার ওপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে জেসিকা, সম্পূর্ণ নগ্ন। প্রেমময় কণ্ঠে ডাকল, 'অ্যালবার্ট?'

চমকে উঠল পামার, ধড়াস করে উঠল ওর হৃৎপিণ্ডটা; হাত থেকে আরেকটু হলে পড়ে গিয়েছিল মোবাইল, কোনওমতে সামলে নিয়ে কেটে দিল লাইন। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে ঘাবড়ে-যাওয়া কণ্ঠে বলল, 'ডার্লিং?'

'বাইরেই বসে থাকবে সারারাত? ঘরে আসবে না? মাত্র একবারেই মন ভরে গেল? তোমার মতো আজব ব্যাচেলর আর কখনও দেখিনি, বিশ্বাস করো!'

'আসছি, ডার্লিং,' উঠে পড়ল পামার। ডিউটি আছে।

কিছুতেই পতন ঠেকাতে পারছে না রানা।

ওর একহাতে জ্বলন্ত টর্চলাইট, এই অন্ধকারে জিনিসটা হাতছাড়া করতে চাচ্ছে না ও। অন্য হাতটা কাজে লাগিয়ে খামচে ধরার চেষ্টা করছে এটা-সেটা, কিন্তু ধরার মতো যা-ই লাগছে হাতে ছুটে যাচ্ছে সেটাই। তারপরও ভাগ্য সহায় হয়েছে রানার অন্তত দু'দিক দিয়ে—পা দুটো নিচের দিকে দিয়ে পড়ছে ও, এবং সুড়ঙ্গটা যথেষ্ট চওড়া।

'মিস্টার রানা!' সুড়ঙ্গমুখের কাছ থেকে আবারও শোনা গেল ফুগুইয়ের ক্রুদ্ধ চিৎকার।

নিজের বিপদ ভুলে গেল রানা, কী ঘটতে চলেছে ওর ভাগ্যে ভেবে দেখল না সেটাও, রেমির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ওর।

একটু পর পর ফোন করা হচ্ছিল ওর সঙ্গে থাকা দুই মিউটিনিয়ারকে, ওদের কাছ থেকে জেনে নেয়া হচ্ছিল রানার খবর, গুলি করে দু'জনকেই মেরে ফেলেছে ফুগুই, লাইন অভ ফায়ার থেকে সরতে গিয়ে সুড়ঙ্গে পড়েছে রানা। আবারও ফোন করা হবে দুই মিউটিনিয়ারকে—ফুগুই গুলি করার আগে ওদের একজনের মোবাইলে ফোন এসেছিল, কিন্তু আর কোনওদিন জবাব দিতে পারবে না ওরা কেউ, ফলে যে ফোন করছে সে যা বোঝার বুঝে নেবে, এবং...

রেমির কথা চিন্তা করে সুবোধ বালক হয়ে ছিল রানা; মেয়েটা যদি বন্দি না থাকত তা হলে যে-কোনও সময় যে-কোনও সুযোগ নেয়ার চেষ্টা করত ও।

সুড়ঙ্গটা শেষ হয়ে গেল হঠাৎ করেই, দশ-বারো ফুট ওপর থেকে কাদামাটির ওপর আছড়ে পড়ল রানা। হাত থেকে ছুটে গেল টর্চলাইট, কিন্তু ভাঙল না। চিৎ হয়ে পড়ে থাকল রানা কিছুক্ষণ; শার্ট-ট্রাউজার নষ্ট হয়ে গেছে কাদায়, পরোয়া করল না। মুখ হাঁ করে দম নিচ্ছে।

উঠে বসার চেষ্টা করল রানা, পারল না। উঁচু থেকে আছড়ে পড়ে বেশ চোট পেয়েছে কোমর ও পিঠে। হাত থেকে ছুটে গিয়ে

গড়িয়ে কয়েক ফুট দূরে চলে গেছে টর্চলাইট, কয়েক গড়ান দিয়ে সেটার কাছে গেল ও।

গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে।

একটু আগে যে-জায়গায় ছিল রানা, ভোঁতা একটা আওয়াজ পাওয়া গেল তার কাছেই, লাফিয়ে উঠল কিছু কাদামাটি।

'মিস্টার রানা!' আবারও চেঁচাল ফুগুই। 'আমি নেমে এলে কিন্তু ভালো হবে না আপনার!'

মনের বিরুদ্ধে জোর খাটিয়ে উঠে বসল রানা, তুলে নিল টর্চটা, উঠে দাঁড়াল। সামনে আলো ফেলল, ঘুটঘুটে অন্ধকারে তেমন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আগে বাড়ল ও, এবার আলো ফেলল নিচের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠে গতিরোধ করল নিজের, বুকের খাঁচায় জোরে বাড়ি মেরেছে হৃৎপিণ্ডটা।

আরেক পা আগে বাড়লে আরও একটা খাদে পড়ে যেত ও।

পিছিয়ে এল, টর্চের আলো ফেলল ডানে-বাঁয়ে। বাঁয়ের পথটা, যতদূর মনে হচ্ছে, পাথরধ্বসের কারণে বন্ধ। ডানদিকে, খাদের কিনারার সঙ্গে লেগে থেকে, এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে একটা পথ; কতদূর পর্যন্ত গেছে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। টর্চের আলো নিচের দিকে ধরে রেখে দৌড় দিল রানা।

আঁকাবাঁকা পথটা নেমে গেছে ভূগর্ভের আরও ভেতর দিকে। দু'-তিনবার পিছলে পড়তে গিয়েও সামলে নিল রানা কোনওরকমে, ইচ্ছে থাকলেও গতি বাড়াতে পারছে না। বোঝা যাচ্ছে, জোরে বৃষ্টি হলে পানির স্রোত মাটির কোনও না কোনও গর্ত দিয়ে ঢুকে পড়ে এ-জায়গায়, ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে যায় নিচে।

একটা বাঁক দেখা যাচ্ছে সামনে, ওটার কাছাকাছি পৌঁছে একটু দম নেয়ার জন্য থামল রানা। গুলির আওয়াজ শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে—সুড়ঙ্গপথে নেমে এসেছে ফুগুই, গুলি করেছে। রানার কাছাকাছি পাথরের দেয়ালে আঘাত করল বুলেট, ভোঁতা আওয়াজ তুলে দিক বদলে চলে গেল অন্যদিকে।

বইঘর.কম

আবার ছুট লাগাল রানা। ওর দৌড়ানোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাঁপছে টর্চের আলো।

ঠিক ক'টা বুলেট আছে ফুগুইয়ের রিভলভারে? দৌড়াতে দৌড়াতে ভাবল রানা। চারটে খরচ করে ফেলেছে লোকটা ইতোমধ্যেই, ধরে নেয়া যেতে পারে আরও কমপক্ষে দুটো আছে শয়তানটার রিভলভারে। বাড়তি বুলেট কি ক্যারি করছে সে? অথবা অন্য কোনও অস্ত্র, যেমন হাণ্টিং নাইফ? লোকটার কোমরে ছোরা দেখেছিল কি না, মনে করতে পারল না রানা। একটা মুহূর্তের জন্য নিজেকে অসহায় বলে মনে হলো ওর।

পাহাড়ি দেয়াল বরাবর কিছুদূর যাওয়ার পর, মাঝখানে আরেকটা দেয়াল রেখে দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল পথটা। বাঁয়েরটা ভীষণ সরু, ওটা ধরে এগোনোটা বিপজ্জনক হতে পারে বলে মনে হল ওর। ডানের পথের প্রবেশমুখের কাছে যখন হাজির হলো ও, ভূগর্ভের শব্দহীনতায় কারও আছাড় খাওয়ার আওয়াজ ভেসে এল পেছন থেকে। গলা ফাটিয়ে পিজিন ভাষায় কিছু বলল ফুগুই, গালি দিল সম্ভবত।

দেরি না করে ডানে চলল রানা।

এখানকার বাতাস কেমন ভেজা ভেজা। বুক ভরে দম নেয়া যাচ্ছে, দূষিত কোনও গ্যাস অথবা পচা কোনওকিছুর গন্ধ বাড়ি মারছে না নাকে। তারমানে, ধরে নেয়া যেতে পারে, বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ স্বাভাবিক আছে এখন পর্যন্ত; এবং যেহেতু পর্যাপ্ত অক্সিজেন আছে, সেহেতু ধারণা করা যায়, ভূপৃষ্ঠ থেকে তাজা বাতাস ঢুকছে কাছেপিঠের কোনও প্রাকৃতিক ফাটল দিয়ে।

দূরে বেজে উঠল ফুগুইয়ের মোবাইল, মাটির এত নিচেও সিগনাল কাজ করছে টের পেয়ে এই অবস্থাতেও খানিকটা আশ্চর্য না হয়ে পারল না রানা। মূল দেয়ালটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, দেয়ালের গায়ে বেশ বড় একটা ফাটল দেখতে পেয়ে থমকে গেল, আলো ফেলল ওটার ভেতরে।

হ্যাঁ, রানার মতো লম্বাচওড়া কেউ জায়গা করে নিতে পারবে ভেতরে; তবে ওটার দেয়ালের সঙ্গে বুকপিঠ লাগিয়ে দাঁড়াতে হবে তাকে।

যেদিকে যাচ্ছিল, সেদিকেই এগোতে থাকল রানা; কিন্তু দশ-বারো ফুট যাওয়ার পরই থামল, কাদামাটিতে ওর জুতোর ছাপের ওপর পা রেখে রেখে পিছিয়ে এল। ফাটলটার কাছাকাছি পৌঁছে থামল, ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে নিজেকে মিশিয়ে ফেলল পাহাড়ি দেয়ালের সঙ্গে, তারপর চট করে ঢুকে পড়ল ফাটলের ভেতরে, জায়গা করে নিল নিজের জন্য। নিভিয়ে দিল টর্চলাইট।

ইঁদুরবিড়াল খেলা কখনওই পছন্দ না রানার, কাজেই একটা সুযোগ নেবে ও। ফুগুইয়ের কাছে আছে একটা পিস্তল আর কমপক্ষে দুটো বুলেট, রানার আছে লোকটার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ার জন্য একটামাত্র সুযোগ।

টর্চলাইটের সুইচ থেকে আঙুল সরিয়ে রাখল রানা, যেন ওটায় টিপ পড়ে না যায়।

টের পেল রানা, কপাল ঘেমে যাচ্ছে ওর, তালুর ঘামের কারণে পিচ্ছিল হয়ে আসছে হাতেধরা টর্চলাইট।

গলা খাঁকারি দেয়ার আওয়াজ পাওয়া গেল বাইরে থেকে। এদিকওদিক দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে আরেকটা টর্চের মৃদু আলো।

রানার জুতোর ছাপ অনুসরণ করে আসছে ফুগুই।

ছোট স্পুলটা মিনি-রেকর্ডারে ঢুকিয়ে ইয়ারফোনে রানার রেকর্ডকরা ফাইলটা শুনলেন ফ্র্যান্সিস, তারপর থমথমে চেহারায় রেকর্ডারটা বাড়িয়ে দিলেন সোহেলের দিকে। কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে ফাইলটা শুনল সোহেল। রিসিপশন ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা; হোটেলের ম্যানেজার, কর্মকর্তা আর কর্মচারীদেরকে এখনও জিজ্ঞাসাবাদ করছে সার্জেন্ট পিটার। ফাইলটা যখন শোনা শেষ হলো সোহেলের, পিটারের

জিজ্ঞাসাবাদও শেষ হলো; এবং একইসঙ্গে আওয়ার টেলিকম থেকে ফোন এল ফ্র্যান্সিসের মোবাইলে।

হ্যালো বলা ছাড়া একটা শব্দও উচ্চারণ না করে ওপ্রান্তের সব কথা শুনলেন তিনি, তারপর লাইন কেটে দিয়ে সোহেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মোবাইল নম্বর দুটো কাদের নামে আছে, জানা গেছে।'

'কাদের নামে?'

'একজনের নাম রিচার্ড ও'ব্র্যায়ান, ওরফে রাইস রিচার্ড, নিউযিল্যাণ্ডের নাগরিক। অনেকদিন ধরে আছে ইসাটাবুতে, সিমটা বেশ পুরনো।'

'এ-মুহূর্তে কোথায় অবস্থান করছে লোকটা?'

'জানে না আওয়ার টেলিকম।'

'মানে?'

'মানে বন্ধ অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে সিমটা।'

'শেষ কোথায় ছিল?'

'বেইয স্টেশন টোয়েন্টি সেভেনের কাছে।'

'বেইয স্টেশন টোয়েন্টি সেভেন?'

'আওয়ার টেলিকমের শ্লোগান হচ্ছে, উই কভার দ্য হোল আইল্যাণ্ড, টোয়েন্টি ফোর সেভেন। সলোমন দ্বীপপুঞ্জের এগারো হাজার বর্গমাইল পুরো কভারেজ দেয়ার চেষ্টা করেছে ওরা ব্যবসা শুরু করার সময় থেকেই, পেরেছেও। যেহেতু দ্বীপের বেশিরভাগ জায়গাই ট্রপিকাল রেইন ফরেস্ট, বেইয স্টেশন, মানে নেটওয়ার্ক কভারেজ অ্যান্টেনাগুলোর নাম দিয়েছে ওরা ওয়ান, টু, থ্রি...এভাবে।'

মাথা ঝাঁকাল সোহেল। 'টোয়েন্টি সেভেন এখান থেকে কতদূরে?'

'জেনে বলতে হবে।'

'দ্বিতীয় নাম্বারটা কার?'

'মোফাট ফুগুই।'

'ইউ মীন, সার্জেন্ট ফুগুই? যার কথা বলেছে রিচার্ড রানার রেকর্ডকরা ফাইলে?'

'হ্যাঁ। লোকটা...করাপ্টেড। অনেকদিন থেকে আমাদের সন্দেহের তালিকায় আছে সে আর ওর গুটিকয়েক সাঙ্গোপাঙ্গ, কিন্তু প্রমাণের অভাবে কিছু করতে পারছিলাম না আমরা। এবার...'

'ফুগুই আছে কোথায় এখন?'

'বেইয স্টেশন থার্টি টু'র কাছে।'

'সিমটা চালু আছে?'

'আছে।'

'চলুন তা হলে।'

মেগুনা থেকে বের হয়ে গাড়িতে উঠল সোহেলরা।

'রেইন ফরেস্টের দিকে যাব আমরা?' জিজ্ঞেস করলেন ফ্র্যান্সিস।

মাথা নাড়ল সোহেল। 'এখনই না।'

'তা হলে?'

অন্য একটা নাম বলল সোহেল।

নামটা শুনে খানিকটা আশ্চর্য হলেন ফ্র্যান্সিস। 'ওখানে কেন?'

'যেতে যেতে বলি?'

ড্রাইভারকে গাড়ি ছাড়ার আদেশ দিলেন ফ্র্যান্সিস। তারপর সোহেলকে বললেন, 'এক্সট্রা ফোর্স কল্ করি আমি?'

'করুন। ...রয়্যাল পুলিশের হেলিকপ্টার আছে?'

'আছে। ব্যবহার করতে চাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। আমাদের অনেক সময় বেঁচে যাবে তা হলে। আওয়ার টেলিকমের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সরাসরি বেইয স্টেশন থার্টি টু'র কাছে চলে যেতে পারব আমরা, ঠিক ওখানেই না হোক কাছাকাছি কোনও ফাঁকা জায়গায় ল্যাণ্ড করতে পারব।'

'গুড আইডিয়া,' নিজের মোবাইল বের করলেন ফ্র্যান্সিস। 'প্রধানমন্ত্রী সোগাভেরকে জানাচ্ছি আমি সব। দ্য মিউটিনিয়ার্সকে

নির্মূল করতে চলেছি আমরা, শুনলে খুশি হবেন তিনি।'

রানাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল ফুগুই।

চট করে ফাটলের বাইরে চলে এল রানা নিঃশব্দে, পায়ের আঙুলগুলোর ওপর ভর দিয়ে যত দ্রুত ও নিঃশব্দে সম্ভব গিয়ে হাজির হলো ফুগুইয়ের ঠিক পেছনে, টর্চলাইটটা দু'হাতে উঁচু করে ধরে যত জোরে সম্ভব নামিয়ে আনল লোকটার চাঁদিতে।

কাঁচ ভাঙার আওয়াজ পাওয়া গেল।

টলে উঠল ফুগুই, হাত থেকে খসে গেছে ওর টর্চ, রিভলভারটাও ছুটে যাচ্ছিল, শেষমুহূর্তে ওটা আঁকড়ে ধরে রাখতে পারল সে। কিন্তু ওকে সময় দিল না রানা। ডান হাতের কব্জিতে জোরালো কিন্তু নিখুঁত একটা লাথি মারল। এবার আর অস্ত্র ধরে রাখতে পারল না লোকটা।

পেছনদিকে বাঁ হাতের কনুই চালাল ফুগুই, অন্ধকারের কারণে আঘাতটা আসতে দেখল না রানা, নাকেমুখে জোরালো একটা ধাক্কা খেয়ে আপনাআপনি পিছিয়ে গেল কয়েক পা। ধরেই নিয়েছিল অকেজো হয়ে গেছে টর্চটা, তারপরও সুইচ টিপে দিল; কয়েকবার মিটমিট করে শেষপর্যন্ত জ্বলে উঠল আলো, রাউনুদের গ্রাম থেকে রিচার্ডের সঙ্গে রওয়ানা হওয়ার পর এই প্রথম স্বস্তি বোধ করল রানা। ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিল ও টর্চটা, নোনতা স্বাদ টের পেল জিভে। ফুগুইয়ের কনুইয়ের আঘাতে নতুন করে কেটে গেছে ওর ওপরের ঠোঁট। কিছুটা কুঁজো হয়ে দাঁড়াল, বাঁ পা সামনে, মুঠি পাকিয়েছে ডান হাত।

আহ্বানটা কীসের, বুঝতে অসুবিধা হলো না ফুগুইয়ের। কোমরের খাপ থেকে একটানে বের করল সে ফুটখানেক লম্বা হান্টিং নাইফ।

'সেডানের ড্রাইভারকে তুমিই খুন করেছ, তাই না?' ফুগুইকে কিছুটা হলেও অপ্রস্তুত করে দেয়ার উদ্দেশ্যে বলল রানা।

থমকে গেল ফুগুই। 'তুমি জানলে কী করে?'

'অনুমান করেছি। খবর পেয়ে গিয়েছিলে তুমি গোরস্থানে যাচ্ছি আমরা, কেন যাচ্ছি তা-ও জানতে পেরেছিলে সম্ভবত। ডিউটিতে ফাঁকি দিয়ে হাজির হয়ে গিয়েছিলে সেখানে। ড্রাইভার দেখে ফেলে তোমাকে, চিনতে পারে। তোমার মুখোশটা যাতে খুলে না দেয় সে রিচার্ডের কাছে সেজন্য...'

কথা শেষ করতে পারল না রানা, কারণ ওকে লক্ষ্য করে লাফ দিয়েছে ফুগুই, কোপ মারার ভঙ্গিতে তুলে ধরেছে ছুরিটা।

ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে সরে গেল রানা, ওর শরীরের ইঞ্চি ছয়েক দূর দিয়ে চলে গেল হান্টিং নাইফের ফলা। টার্গেট মিস করায় সামনে ঝুঁকেছে ফুগুই, এমনি সময়ে জোরালো একটা রদ্দা খেল ঘাড়ের পেছনে। সেই সঙ্গে সাইডকিক এসে পড়ল ওর হাঁটুর পাশে। সরতে গিয়ে পিছলে গেল ফুগুই, ব্যালেন্স হারিয়ে আছাড় খেল সশব্দে।

আবার পজিশন নেয়ার সময় ভাঙা কাঁচের একটা টুকরো খসিয়ে নিল রানা টর্চ থেকে, চেপে ধরল ওটা মুঠিপাকানো হাতের তর্জনী আর মধ্যমার ফাঁকে; মারাত্মক ভঙ্গিতে বেরিয়ে আছে কাঁচের চোখা একটা প্রান্ত।

উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে ফুগুই, ওকে বিভ্রান্ত করে দেয়ার জন্য জ্বলন্ত টর্চলাইটটা এদিকসেদিক নাচাচ্ছে রানা, কিছুতেই স্থির রাখছে না উজ্জ্বল আলো, ঘুরিয়েফিরিয়ে বার বার সেটা ফেলছে ফুগুইয়ের চোখের ওপর।

রানার ধোঁকাটা অনেক দেরিতে টের পেল সার্জেন্ট, আলোর খেলা দেখানোর সময় আলগোছে দুই পা এগিয়েছে রানা, এবং প্রথম সুযোগেই ধাঁই করে একটা লাথি বসিয়ে দিয়েছে ফুগুইয়ের সোলার প্লেক্সাসে।

ছিটকে কয়েক হাত দূরে গিয়ে পড়ল ফুগুই, কিন্তু ছুরিটা হাতছাড়া করল না।

আবারও এগিয়ে গেল রানা, এবার দ্রুত গতিতে।

উঠে বসেছে ফুগুই, রানাকে কাছাকাছি পাওয়ামাত্র অন্ধ

আক্রোশে ছুরি চালাল একপাশ থেকে আরেকপাশে। ঠিক সময়ে রানার লাথি এসে পড়ল ওর কনুইয়ের পেছনে। ছুরিটা উড়ে চলে গেল অন্ধকারে, পরমুহূর্তে আরেক লাথিতে ভেঙে দিল রানা ওর কণ্ঠার হাড়। হতবাক হয়ে চেয়ে রইল ফুগুই রানার দিকে। একজন পুলিশ সার্জেন্টকে কেউ মারতে পারে এভাবে? শ্বাস নিতেও পারছে না, ছাড়তেও পারছে না। দুইহাতে নিজের গলা চেপে ধরে উঠে দাঁড়াচ্ছে, এমন সময় ছুটে এল রানার শেষ ঘুসি। চোখা কাঁচ বিঁধে গেল ওর চোখে—তখন আর ব্যথা পাওয়ারও ক্ষমতা নেই দুর্ধর্ষ অফিসারের, কাত হয়ে শুয়ে পড়ল ও, বার কয়েক পা ছুঁড়ল, দমটা বেরিয়ে যেতেই থেমে গেল খিঁচুনি।

ট্রাউজারের পকেট থেকে বের করে নিল রানা ফুগুইয়ের মোবাইলটা, বাড়তি বুলেটের খোঁজে হাত ঢুকিয়ে দিল অন্য পকেটে। নেই। চোখ গেল ওর বেল্টের দিকে। ওখানে একটা পাউচে পাওয়া গেল কয়েকটা বুলেট।

রিভলভারটা খুঁজে বের করল রানা এবার। তুলে নিয়েই ফাঁকা গুলি করল একবার। তারপর গুলি ভরে পূর্ণ করে নিল সিলিণ্ডারের চেম্বারে।

গুহার ভেতরটা একনজর দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল জনি ওয়াকার। মোবাইল বের করে ফোন করল সে।

‘কী খবর বলো।’

‘ওরা দু’জন মারা গেছে।’

‘কীভাবে?’

‘গুলি করা হয়েছে।’

‘আর মাসুদ রানা?’

‘উধাও।’

‘ভালোমতো দেখেছ?’

‘দেখেছি।’

‘কী ধারণা তোমার—কাজটা মাসুদ রানারই?’

‘কোনও সন্দেহ নেই।’

‘পিস্তল পেল কোথায়?’

‘জানি না, কিন্তু পেয়েছে যেভাবেই হোক। ওদের দু’জনকে খুন করে পালিয়ে গেছে লোকটা।’

‘তুমি শিয়োর?’

উত্তরটা দিতে পারল না জনি, কারণ যে-সুড়ঙ্গে পড়ে গেছে রানা সেখান থেকে ভেসে এল একরাউণ্ড গুলির আওয়াজ। আশ্চর্য হয়ে সুড়ঙ্গটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল জনি।

‘হ্যালো...হ্যালো...জনি...কী হয়েছে?’ অস্থির হয়ে গেছে মোবাইলের অন্যপ্রান্তের মানুষটা। ‘গুলির আওয়াজ পাচ্ছি কেন?’

‘আমিও জানি না কেন,’ ধীরে ধীরে বলল জনি। ‘আমার মনে হয় এখন পর্যন্ত পালাতে পারেনি মাসুদ রানা।’

মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন মানাশেহ সোগাভের। এইমাত্র কথা শেষ করেছেন তিনি নিজের মোবাইলে।

তা হলে ফুগুইও বিশ্বাসঘাতকতা করল তাঁর সঙ্গে?

মোফাট ফুগুই—যাকে দেখলে, কোনও মিল না থাকার পরও, চার্লি চ্যাপলিনের কথা মনে পড়ে যেত সোগাভেরের। মোফাট ফুগুই—যে গাছেরটাও খেয়েছে, তলারটাও কুড়িয়েছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে, সোগাভেরের সম্পূর্ণ অজান্তে, বিক্রি করে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে গাছটাও! মোফাট ফুগুই—ওরওয়েন ঝনয়াকে ফাঁসানোর কথায় যে রাজি হয়ে সোগাভেরকে বলেছিল, ‘আমার একটা প্রমোশনের ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন, স্যর?’

লোকটা যদি ধরা পড়ে তা হলে কী হবে?

ফুগুইয়ের জন্য তেমন কিছু হবে না হয়তো—দুর্নীতিবাজ পুলিশ অফিসার অনেক আছে ইসাটাবুতে, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে সোগাভেরের কী হবে? যদি লোক জানাজানি হয়, ঝনয়াকে শায়েস্তা করার জন্য ফুগুইকে অবৈধ সুবিধা দিয়েছিলেন কিংবা দিতে চেয়েছিলেন সোগাভের?

বইঘর.কম

উঠে দাঁড়ালেন সোগাভের, পায়চারি করলেন কিছুক্ষণ। যদি জানাজানি হয় ওসব, তা হলে সামনের নির্বাচনে কেলেঙ্কারিটার প্রভাব তাঁর দলের ওপর তেমনভাবে পড়বে না হয়তো, কিন্তু তাঁর নিজের ভরাডুবি নিশ্চিত।

বিশেষ একটা নম্বরে ফোন করলেন সোগাভের। 'আওয়ার টেলিকমের এমডিকে কল দাও। এখনই। আমার নাম বলবে। বলবে, আমি জরুরি ভিত্তিতে কথা বলতে চাই তার সঙ্গে।'

মিনিটখানেকের মধ্যেই সোগাভেরের মোবাইলে ফোন করলেন আওয়ার টেলিকমের এমডি। 'স্যর, আমার মতো একজন অধমকে স্মরণ করেছেন আপনি...'

'সলোমন দ্বীপপুঞ্জে ব্যবসা করার ইচ্ছে আছে?' এমডি'র তেল মারার ইচ্ছেটাতে পানি ঢেলে দিলেন সোগাভের।

'জী, স্যর?'

'বললাম, সলোমন দ্বীপপুঞ্জে আর ব্যবসা করার ইচ্ছে আছে তোমার?'

'স্যর, যা হয়েছে আমাদের পক্ষ থেকে অন্যায় হয়েছে, অপরাধ হয়েছে; আমি মাফ চাই। কী করতে হবে আমাকে, সেটা শুধু বলুন।'

'একটা নম্বর বলব, সেটা এ-মুহূর্তে বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা করবে তুমি। আমার মরা বাপও যদি কোনও হদিস জানতে চায় সিমটার, কিচ্ছু বলবে না তাঁকে। কিচ্ছু না। মনে থাকবে?'

'অবশ্যই থাকবে, স্যর। নম্বরটা বলুন।'

ফুগুইয়ের নম্বরটা বললেন সোগাভের।

সেটা লিখে নিলেন এমডি। 'আর কিছু, স্যর?'

'সিমটা কেন হুট করে ডিঅ্যাক্টিভেট হয়ে গেল, কেউ যেন কিছু জানতে না পারে সে-ব্যাপারে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, স্যর।'

লাইন কেটে দিলেন সোগাভের। পায়চারি করলেন আরও কিছুক্ষণ। তারপর, মুখস্থ করে রাখা একটা নম্বরে ফোন করলেন।

জড়ানো গলায় ওপ্রান্ত থেকে বলা হলো, ‘স্যর?’

‘নতুন একটা কাজ আছে। বলব?’

‘স্যর, আমি যদি নরকেও থাকি, আপনার জন্য প্রস্তুত অবস্থায় থাকব।’

‘আমি কি একটা নাম বলে তোমার প্রস্তুতি কেমন যাচাই করে দেখব?’

‘বলুন, স্যর।’

নামটা বললেন সোগাভের।

‘ধরে নিন কাজ হয়ে গেছে, স্যর।’

তেত্রিশ

ফুগুইয়ের রিভলভারে এখন গুলি আছে মোট ছয়টা। প্রতি দশ মিনিট পর পর যদি একবার করে ফাঁকা গুলি করে রানা, এবং গুহাটার কাছেপিঠে যদি থাকে কোনও মিউটিনিয়ার, তা হলে হয়তো ধারণা করবে পালিয়ে যায়নি রানা। সেক্ষেত্রে...রেমি প্রাণে বাঁচলেও বাঁচতে পারে। এটা ছাড়া আরেকটা উপায় আছে...বিশেষ একটা নম্বর যদি খুঁজে পাওয়া যায় ফুগুইয়ের মোবাইলে তা হলে হয়তো...

ফুগুইয়ের কণ্ট্যাক্ট লিস্ট ঘাঁটল রানা, কিন্তু পেল না নম্বরটা। তারমানে, মানুষটার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না ফুগুইয়ের। অথবা থাকলেও, নম্বরটা হয়তো অন্য কোনও নামে সেইভ করেছিল ফুগুই, জানা না থাকায় বুঝতে পারছে না রানা। নম্বরটা পেলেও লাভ হতো কি না সন্দেহ, কারণ, খেয়াল করল রানা, হঠাৎ করেই আর নেটওয়ার্ক পাচ্ছে না সেটটা।

বইঘর.কম

গুহার ভেতর অনেক নিচে চলে এসেছে নাকি ও?

কিন্তু...কই, তেমন গরম তো লাগছে না? আগের মতোই ভেজা ভেজা আছে বাতাস। এতক্ষণ, ফুগুইয়ের সঙ্গে মারামারি করছিল বলে খেয়াল করেনি, কিন্তু অস্পষ্ট একটা কুলুকুলু ধ্বনি শোনা যাচ্ছে আরও নিচের কোনও জায়গা থেকে। কোনও নদী, ধারণা করল রানা। পাঁচ-সাত মিনিট একটানা চলার পর একটা প্রবহমান কালো জলধারার সামনে এসে দাঁড়াল ও।

নদী বলা যাবে না, কারণ এটা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ততটা বড় নয়, পানির তোড়ে ফুলেফেঁপে ওঠা একটা খাঁড়ি বললে মানায় বেশি। নিয়মিত বিরতিতে ভারী বৃষ্টিপাত হয় ইসাটাবুতে, সে-হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে, এই খাঁড়ি দিয়ে নিয়মিতই দুরন্ত গতিতে ছুটে চলে জলস্রোত।

খরস্রোতা হলেও খাঁড়িটা বেশি চওড়া না, পানিও বড়জোর কোমরসমান। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও খাঁড়ির ধারে, ব্যাকপ্যাক থেকে বের করল কুণ্ডলী পাকানো বেশ লম্বা দড়ির বাণ্ডিল। টর্চের আলো ফেলে আশপাশে বড় কোনও পাথর খুঁজছে। বিশ-পঁচিশ ফুট দূরে অনেকটা আয়তাকার একটা পাথর দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল সেটার দিকে।

কাছে পৌঁছে জ্বলন্ত টর্চটা মাটিতে নামিয়ে রাখল রানা, হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে টের পাওয়ার চেষ্টা করছে পাথরটার ওজন কত হতে পারে। মনে হলো, পাথরটা ওকে ভেসে যাওয়ার কবল থেকে রক্ষা করতে পারবে।

দড়ির একপ্রান্তে ছোট্ট একটা লুপ তৈরি করল, অন্যপ্রান্তটা ঢুকিয়ে দিল সেখান দিয়ে—অনেকটা ল্যাসোর কায়দায়। মালার মতো করে ফাঁসটা পরিয়ে দিল পাথরের গায়ে, পাথরের সঙ্গে শক্তভাবে আটকে গেল সেটা।

হ্যাঁচকা একটা টান মেরে দেখল রানা শক্তভাবে আটকিয়েছে কি না। হ্যাঁ, ঠিক আছে।

টর্চ নিভিয়ে ঢুকিয়ে রাখল সেটা ব্যাকপ্যাকে। ফাঁকা গুলি

করল আবারও, গুলি ভরে পূর্ণ করল সিলিণ্ডারের চেম্বার। অস্ত্রটা কোমরে গুঁজে রাখতে গিয়েও সিদ্ধান্ত বদল করল, ওয়াটারপ্রুফ ব্যাকপ্যাকের ভেতর রাখল সেটা। কোমরের সঙ্গে পেঁচিয়ে গিঁঠ দিল দড়ির মুক্তপ্রান্ত। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল এক মিনিট, চোখে অন্ধকার সইয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু কালিগোলা মনে হচ্ছে চারপাশের অন্ধকার, এখানে বিড়ালও ঠিকমতো দেখতে পাবে কি না সন্দেহ। আগে বাড়ল রানা, খাঁড়ির ধারে এসে দ্বিধা করল একটা মুহূর্ত, তারপর নেমে পড়ল পানিতে।

পানি ঠাণ্ডা। স্রোত, যতটা ভেবেছিল রানা, তারচেয়েও তীব্র। পানিতে হাঁটু পর্যন্ত ডুবতে না ডুবতেই মনে হলো ওর, পায়ে বুঝি কামড় বসিয়ে দিয়েছে কোনও পাগলা কুকুর, টানছে এখন! পানির নিচে পাথরগুলো পিচ্ছিল, বার বার হড়কে যাচ্ছে রানার পা। দু'হাতে শক্ত করে ধরে আছে ও দড়িটা, ইঞ্চি ইঞ্চি করে ছাড়ছে হাত থেকে, ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোচ্ছে। জোরালো স্রোত ধাক্কা মারছে ওর হাঁটুতে, ছিটকে উঠছে পানি, ভিজে যাচ্ছে চোখমুখ। কোমর পানিতে গিয়ে একইসঙ্গে দু'পা পিছলে গেল রানার, তাল সামলানোর আগেই টের পেল, দড়িটা শক্ত করে ধরে থাকায় ভেসে চলেছে ও যেদিক থেকে নেমেছিল সেদিকেই।

ধস্তাধস্তি করে আবার উঠে দাঁড়াল রানা। ততক্ষণে কয়েক ঢোক পানি চলে গেছে পেটে। হাঁ করে কিছুক্ষণ দম নিল, তারপর নব উদ্যমে এগোল আবার।

বারকয়েক লম্বা দম নিতেই স্বাভাবিক হয়ে এল শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি, তারপর সাবধানে এগোল সামনে। অল্পক্ষণেই হাজির হয়ে গেল খাঁড়ির অপর পাড়ে।

দড়িটা ছেড়ে দিয়ে ব্যাকপ্যাকটা কোনওরকমে খসাল ও কাঁধ থেকে, তারপরই চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল পাথুরে মাটিতে। রিভলভার বের করে ফাঁকা গুলি করল আবারও।

যেখানে এসেছে সোহেলরা, নতুন একটা মোবাইল নম্বর পাওয়া

বইঘর.কম

ছাড়া আর কোনও লাভ হলো না সেখানে। যাকে খুঁজছে ওরা, সে নেই। আজ সকাল থেকে কয়েকবার ফোন করা হয়েছে তার মোবাইলে, কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক কল রিসিভ করছে না সে।

পুলিশ হেডকোয়ার্টারের দিকে ফিরে চলেছে ওরা। ওখান থেকে চড়বে হেলিকপ্টারে।

ফ্র্যান্সিসকে সোহেল বলল, 'নতুন নম্বরটা জানিয়ে দিন আওয়ার টেলিকমে। সিমটা কোথায় আছে এ-মুহূর্তে, জানাতে বলুন। ফুগুইয়ের নম্বরের আপডেট কী?'

আওয়ার টেলিকমের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন ফ্র্যান্সিস, পিজিন ভাষায় কথা বললেন কিছুক্ষণ। তারপর সোহেলকে বললেন, 'ফুগুইয়ের নম্বরটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।'

'বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, মানে?'

'মানে জানে না কেউই। অথবা জানলেও বলতে চাচ্ছে না।'

'কী বলছেন এসব?'

'ওরা বলছে, ওপর থেকে আদেশ দেয়া হয়েছে ওদেরকে এবং যা বলা হয়েছে তা-ই করেছে ওরা, বিস্তারিত কিছু বলতে পারবে না। বিস্তারিত যদি কিছু জানার থাকে, তা হলে আমাকে যেতে বলছে ওদের অফিসে।'

'কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা সম্ভব না। দ্য মিউটিনিয়ার্সের বিরুদ্ধে অভিযানে আমাদের কথামতো চলবে না আপনার অফিসাররা।'

'তা হলে কী করব?'

জবাব দেয়ার আগে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল সোহেল। তারপর বলল, 'যা করতে যাচ্ছি আমরা তা-ই করব। নতুন নম্বরটা ট্রেস করা যায় কি না, চেষ্টা করে দেখুন।'

ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে মাথার চুল, শার্ট, ট্রাউজার। সারাদিনের পরিশ্রমে ভেঙে আসতে চাইছে শরীরটা। কিন্তু অবসাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তাকে যত পাত্তা দেয়া হয় সে তত বেশি করে পেয়ে বসে।

তাই উঠে বসল রানা—যতটা না নিজের জন্য, তারচেয়ে বেশি রেমির কথা ভেবে। যেভাবেই হোক বেরোতে হবে ওকে গুহার গোলকধাঁধা থেকে।

একদিক দিয়ে কপাল ভালো ওর—কেনার সময় ওয়াটারপ্রুফ ব্যাকপ্যাক কিনেছিল, তাই ওটা কুড়িয়ে নিয়ে ভেতর থেকে টর্চলাইট বের করে যখন সুইচ টিপল, কিছুটা হলেও দূর হলো আশপাশের অন্ধকার। নাক বরাবর রওয়ানা হলো ও। খানিকটা এগিয়ে একটা বাঁক ঘুরে ঢুকে পড়ল নতুন একটা গুহায়।

গুহাটা তেমন চওড়া না, তবে অনেক লম্বা। এদিকসেদিকে আলো ফেলে হাঁটতে হাঁটতে রানার মনে পড়ে গেল ফুগুইয়ের কথা। লোকটা বলেছিল, ইসাটাবুর বেশিরভাগ গুহাই নাকি একটার সঙ্গে আরেকটা কোনও না কোনওভাবে সংযুক্ত।

যত এগোচ্ছে রানা, গুহার প্রশস্ততা বাড়ছে তত, ছাদও যেন উঁচু হচ্ছে সমান তালে; এখন যেখানে আছে রানা সে-জায়গার ছাদ ত্রিশ ফুট উঁচুতে হবে। খেয়াল করল ও, খুবই আস্তে আস্তে হলেও ওপরের দিকে উঠছে ও, এবং সামনে আবারও কুলুকুলু আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল ও। আর দড়ি নেই ওর সঙ্গে।

তবে খাঁড়িটার ধারে যখন এসে দাঁড়াল, স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল—আগেরটার মতো খরস্রোতা নয় এটা, বরং পানির বয়ে চলার গতি স্বাভাবিকই বলা চলে।

ওটা পার হওয়ার পর ধীরে ধীরে আরও উঁচু হলো পথ, লম্বা টানেলের মতো একটা গুহায় ঢুকে পড়ল রানা এবার। আরও একবার ফাঁকা গুলি করে তাকাল এদিকসেদিকে। অনেক স্ট্যালাগমাইট গজিয়ে আছে এখানকার মেঝেতে, আশপাশে তাকালে মনে হয় অতিকায় কোনও জন্তুর মুখগহ্বরে ঢুকে পড়েছে—জন্তুটার বড় বড় দাঁতের মতো দেখাচ্ছে স্ট্যালাগমাইটগুলো।

টর্চটা মিটমিট করে উঠল এমন সময়, নিভে গিয়ে

বইঘর.কম

আপনাআপনি জ্বলে উঠল আলো, তারপর নিভেই গেল পুরোপুরি। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। আলো ছাড়া আলকাতরার মতো কালো এই অন্ধকারে এগোবে কী করে ও?

টর্চের সুইচ নিভিয়ে দিল রানা, তারপর জ্বালাল আবার। কোনও লাভ হলো না। বার কয়েক থাবড়া দিল টর্চের গায়ে, তারপর সুইচ নিভিয়ে আবার জ্বালাল। এবার জ্বলে উঠল আলো, তবে মিটমিট করছে।

এগোনোর গতি দ্রুত করল রানা।

স্ট্যালাগমাইটে ভরা গুহাটা পার হয়ে ফাঁকা একটা জায়গায় হাজির হয়েছে মাত্র, টর্চটা নিভে গেল আবার। বেশ কিছুক্ষণ চেষ্টা করল রানা, কিন্তু "প্রাণ" ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হলো সেটার।

নিকষ কালো অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে রানা, কী করা যায় ভাবছে। যেভাবে এগোচ্ছিল, অনুমানের ওপর ভিত্তি করে এগোতে থাকবে সেভাবে? নাকি...

অন্ধকার বলেই হয়তো ব্যাপারটা খেয়াল করতে পারল ও।

ঠিক কতদূরে বুঝতে পারছে না, পাহাড়ি দেয়ালের একদিকে একটুখানি যেন ফিকে মনে হচ্ছে অন্ধকার, মনে হচ্ছে...একচিলতে আলো যেন ঢুকে পড়ছে প্রাকৃতিক ওই ফাটল গলে।

টর্চটা ফেলে দেবে কি না ভাবল রানা, কিন্তু বাতিল করে দিল চিন্তাটা। একটা ব্যাকপ্যাক যখন আছে, তখন বাতিল হোক আর যা-ই হোক, একটা টর্চ বহন করতে অসুবিধা কী? ওটা ঢুকিয়ে রাখল ও ব্যাকপ্যাকে, তারপর অন্ধের মতো হাঁটা ধরল আলোর ওই উৎসটার দিকে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর গিয়ে দাঁড়াল ও জায়গামতো, ফাঁকা গুলি করল।

বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা ছোটবড় পাথরে ভরা একটা খাড়া ঢাল মিশে আছে পাহাড়ি দেয়ালের সঙ্গে, দেয়ালটার একটা ফাটল দিয়ে ভেতরে ঢুকছে চাঁদের আলো।

সরু ঢালটা বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা। কিছুদূর গিয়েই পিছলে গেল, অনেকগুলো ছোটবড় পাথরসহ গড়িয়ে পড়ে গেল নিচে। উঠে দাঁড়াল আবার, ঢাল বেয়ে উঠল, আগের বারের চেয়ে কিছু বেশি দূরে যেতে না যেতেই গড়িয়ে পড়ে গেল আবারও। হাল ছাড়ল না, আবার উঠল ঢাল বেয়ে, এবার অনেক কষ্ট করে পৌঁছুতে পারল ফাটলটার কাছে। ওটার সামনে মাঝারি সাইজের একটা পাথর প্রতিবন্ধক হয়ে স্থির হয়ে আছে, বুক-পেট ঢালু মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে দু'হাতে ধাক্কা মারল রানা পাথরটার গায়ে। নড়ে উঠল পাথর, কিন্তু স্থানচ্যুত হলো না।

এবার শরীরটা একটু উঁচু করল রানা, আগের চেয়েও জোরে ধাক্কা দিল পাথরের গায়ে। ভোঁতা একটা আওয়াজ তুলে আলগা কিছু মাটিসহ খসে পড়ল পাথরটা, কিন্তু একইসময়ে ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলল রানাও, ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে এল আবার। মাটিতে পড়ে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকল কিছুক্ষণ, দম নেয়ার সুযোগ দিচ্ছে ফুসফুস দুটোকে। আলগা মাটির ছোটখাটো একটা ঝড় উঠেছে আশপাশের বাতাসে, রানার নাক দিয়ে ঢুকে পড়েছে ধুলো, পর পর দু'বার হাঁচি দিতে বাধ্য হলো ও। তারপর শেষবারের মতো উঠতে শুরু করল ঢাল বেয়ে, ফাটলটার কাছে পৌঁছে থামল। আরও একবার গুলি করল।

তেমন একটা চওড়া না ফাটলটা, আবার একদম ছোটও না। ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট—অনুমান করল রানা। যদি ওপাশে যেতে হয় ওকে, যথেষ্ট কসরত করতে হবে।

ব্যাকপ্যাকটা প্রথমেই কাঁধ থেকে নামাল ও, ওটার ভেতরে ঢোকাল রিভলভার, তারপর ব্যাকপ্যাক ঢুকিয়ে দিল ফাটল দিয়ে, পৌঁছিয়ে দিল ওপাশে। তারপর পুরো এক শ' আশি ডিগ্রি মোচড় দিল নিজের শরীরটাকে, পা দুটো ঢোকাল ফাটল দিয়ে। কোমর পর্যন্ত গিয়ে আটকে গেল ওর শরীরটা, মোচড়ামোচড়ি শুরু করল ও, যতরকমভাবে সম্ভব এঁকেবেঁকে ইঞ্চি ইঞ্চি করে বের করছে নিজেকে। আবার আটকাল কাঁধের কাছে। নানান কায়দা-কসরত

আর কাঁধ উঁচুনিচু করে, শ্বাস সম্পূর্ণ বের করে দিয়ে চেষ্টা করল।

শেষপর্যন্ত ফাটলের অন্যপাশে খোলা বাতাসে বেরিয়ে এল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে, কে যেন, প্রচণ্ড শক্তিতে মুঠ করে চেপে ধরল ওর চুল, পরমুহূর্তে ওর মাথাটা চেপে ধরল নিজের দুই পায়ের ফাঁকে কুস্তির প্যাঁচ দিয়ে। লোকটার পায়ে কামড় বসিয়ে দিতে যাচ্ছিল রানা, নিজের নাকেমুখে একটা রুমালের অস্তিত্ব অনুভব করে কেমন ঝিমঝিম করে উঠল ওর মাথাটা। দম চেপে রাখতে গিয়েও পারল না ও—ওর মাথায় জোরে ঘুসি মেরেছে লোকটা; শ্বাস নিতে গিয়ে টের পেল, কড়া চেতনানাশক ওষুধ ঢুকে যাচ্ছে নাক দিয়ে।

'জনি ওয়াকার রাইট,' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল লোকটা, 'ইউ কিল দেম, দেন হাইড, দেন কামব্যাক অ্যাট নাইট। বাট হোয়াই ইউ শুট?'

জবাবটা দিতে পারল না রানা, ওর চোখের সামনে আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে আসছে চাঁদটা।

গিযবর্ন, নিউযিল্যাণ্ড।

ফোন করে ইসাটাবুর আপটুডেট খবর জানার জন্যে ভেতরে ভেতরে উসখুস করছে পামার, কিন্তু জেসিকার কবল থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাচ্ছে না সে। একটা মেয়ের দেহ ও মনে যে এত প্রেমক্ষুধা থাকতে পারে, কল্পনা করতে পারেনি ও। বয়ফ্রেণ্ড বলে কেউ কি কখনও ছিল না মেয়েটার? কিন্তু...মেয়েটার শরীর তো বলছে...

'তুমি আবারও আনমনা হয়ে গেছ, ডার্লিং,' অভিযোগের সুরে বলল জেসিকা, আরও কাছে ঘেঁষে শুল পামারের, জড়িয়ে ধরল ওকে। 'বিশেষ কাউকে মনে পড়ছে? দেখো, মিথ্যা বোলো না শুধু শুধু। বিছানায় তোমার পারফর্মেন্স দেখেই বুঝেছি, তুমি ব্যাচেলর হতো পারো, কিন্তু ব্রহ্মচারী নও।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল পামার। 'ঠিক বলেছ। আমার পিএস মনিকার সঙ্গে সম্পর্ক আছে আমার।'

'অস্বাভাবিক না। কোটিপতি ব্যবসায়ীদের ও-রকম থাকেই। মেয়েরাও কোটিপতি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কিছু না কিছু আদায় করার জন্যে...' কথা শেষ না করে খিলখিল করে হাসল জেসিকা। 'কিন্তু মনিকার জন্য তোমার মন উদাস হয়ে আছে বলে তো মনে হয় না। ব্যবসার চিন্তা কি ঘুরপাক খাচ্ছে তোমার মাথায়?'

জবাব দিল না পামার, আনমনা হয়ে পড়েছে।

ইসাটাবুর পার্টনারকে কখনও মোবাইল থেকে কল দেয়নি সে, কথা ছিল কখনও দেবেও না; কিন্তু কে ভেবেছিল মাসুদ রানা নামের কোথাকার কোন্ এক লোক সব ছক বদলে দেবে এভাবে? অফিসে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে পামারের, অফিস আওয়ার অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে জানার পরও—বিশেষ সেই ফোন থেকে একটুখানি কথা না বললেই নয় যেন।

আর ওই মানুষটাই বা কেমন! এমনিতে হুটহাট ফোন দিয়ে বসে, এখন এত সময় চলে যাচ্ছে...অথচ...

উঠে বসল জেসিকা, চাদর খসে পড়ল ওর নগ্ন বুক থেকে। 'একরাতেই মন ভরে গেল তোমার, অ্যালবার্ট?'

মেয়েটার বুকের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর পামার বলল, 'না, ভরেনি। বলো কী বলতে চাও।'

'তোমার ইন্টারভিউ যখন নিচ্ছিলাম, একাধিকবার মনে হয়েছে আমার, সব কথা যেন বলোনি তুমি আমাকে; মনে হয়েছে, তোমার কোম্পানির আসল অবস্থা গোপন করে গেছ।'

'হ্যাঁ, করেছি। দিন দিন খারাপ হচ্ছে আমার কোম্পানির অবস্থা। ওটা একসময় ছিল একটা সাম্রাজ্যের মতো, আস্তে আস্তে সূর্য ঢলে পড়ছে সে-সাম্রাজ্যের।'

কৌতূহল ফুটল জেসিকার চোখেমুখে। 'কারণ কী?'

পামার সিদ্ধান্ত নিল, কিছু কথা বলবে সে মেয়েটাকে। বলতে

বইঘর.কম

শুরু করল, 'দিন দিন আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে কমোডিটি প্রাইস। প্রতিদিন কাজ করার কথা আমাদের ট্যাঙ্কারগুলোর, অথচ বিভিন্ন কারণে সেগুলোর কাছ থেকে পঁচিশ শতাংশ সার্ভিস কম পাচ্ছি আমরা। শরীরের কোথাও গুরুতর জখম হলে সেখান দিয়ে যেমন রক্ত পড়তেই থাকে, ব্যাণ্ডেজ না লাগানো পর্যন্ত থামার লক্ষণ দেখা যায় না, শিপিং সেক্টরে আমাদের টাকা খরচ হচ্ছে সেভাবে—অনেকভাবে চেষ্টা করেও বন্ধ করতে পারছি না। বাঘের ঘরে ঘোগ বলে একটা কথা আছে; আমাদের কোম্পানিতে কে বা কারা সেই ঘোগের ভূমিকা পালন করছে বুঝতে পারছি না আমরা—কমোডিটি প্রাইস সামাল দিতে এত হিমশিম খাওয়ার কথা নয় আমাদের। স্বর্ণখনিতে কিছু ইনভেস্টমেন্ট ছিল, নয় মিলিয়নের বিশাল একটা দায় পরিশোধের সময় ঘনিয়ে এসেছে এ-মাসে, এবং সেটা পুরোটাই যাবে ক্ষতির হিসেবে; বছরের এই কোয়ার্টার শেষে আমাদের কোম্পানির নেট লসের পরিমাণ দাঁড়াবে আটাশ মিলিয়ন।'

চুপ করে আছে জেসিকা, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে পামারের দিকে, চোখেমুখে খেলা করছে অদ্ভুত দ্যুতি।

উঠে বসল পামারও। 'নয় মিলিয়নের দায়টা শোধ করার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় কি না, চেষ্টা করেছি অনেকভাবে। কোনও লাভ হয়নি। ওরা যদি মামলা করে আমাদের নামে, মার্কেটে ফেইসভ্যালুও হারাবে আমাদের শেয়ার।'

'সবচেয়ে বড় সমস্যাটা কী? খনিজসম্পদ উত্তোলন ও বিপণন?'

'না। কমবেশি যা-ই হোক, রিযার্ভ আছে আমাদের, কিন্তু বেশিরভাগ মার্কেটেই আমাদের প্রতিযোগীরা আমাদের চেয়ে কম দামে বিক্রি করছে। খরচের টাকাটাও তুলতে গিয়ে গত কয়েক কোয়ার্টার ধরে সমানে লস্ দিয়ে যেতে হচ্ছে আমাদের।'

'ভুলটা কোথায় হয়েছিল? স্বর্ণখনিতে ইনভেস্টমেন্ট?'

'হ্যাঁ। মার্কেট যাচাই করতে ভুল হয়েছিল আমাদের, এবং

সেটার খেসারত দিতে হচ্ছে এখন। আমরা ভেবেছিলাম, দিনে পঁচিশ টন বুলিয়ন বেচতে পারবে এমন কোম্পানি নেই, আর থাকলেও দু'-একটার বেশি হবে না। কিন্তু আমাদেরকে মাঠ থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য মার্জ হয়ে গেল কয়েকটা প্রতিষ্ঠান; ওরা শুধু এখন দৈনিক পঁচিশ টনেরই জোগান দিচ্ছে না, তারচেয়েও বড় কথা, আমাদের চেয়ে কম দামে দিচ্ছে। হাত-পা বেঁধে পানিতে ফেলে দেয়া হয়েছে আমাদেরকে, অথচ কারও বিরুদ্ধেই কিছু করার নেই। যে-খাতগুলো লাভজনক ছিল, সেখান থেকে ভর্তুকি দিয়ে দিয়ে কতদিন চালানো যেতে পারে রুগ্ন সেক্টরগুলোকে?'

'বলতে যদি অসুবিধা না থাকে...ব্যক্তিগতভাবে তোমার অবস্থা কী?'

'বলতে আর অসুবিধা কী? তুমি ইনকাম ট্যাক্সের লোকও না, আর তোমাকে বললে আমার ব্যক্তিগত সম্পদ লাপাত্তাও হয়ে যাবে না। ...কয়েকটা অফশোর অ্যাকাউন্টে দশ মিলিয়নের মতো আছে আমার। এক জায়গায় একটা গোপন সিন্দুকে আছে কিছু সোনা—বাজারদর অনুযায়ী তিন মিলিয়নের মতো। এখানে-সেখানে খুচরোখাচরা কয়েক লক্ষ আছে আরও।'

'এই ইয়টটাও আছে।'

'হ্যাঁ, আছে, তবে এটা আমার অ্যাসেট না, লায়াবিলিটি। যে-বাড়িতে থাকি, মর্টগেজ দেয়া হয়েছে সেটাও। একটা অবকাশযাপনকেন্দ্রে কিছু বিনিয়োগ করেছিলাম, কয়েক সপ্তাহ আগে বন্ধক দিতে হয়েছে আমার সেই শেয়ারও, কারণ হাই স্টেকে ব্রিজ খেলা আমার একটা শখ...নেশাও বলতে পারো।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল জেসিকা, তারপর বলল, 'এসব থেকে...বের হতে পারবে কখনও, অ্যালবার্ট?'

'বের হতে পারব কি না জানি না, তবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। ইউরোপিয়ানরা যখন টের পেয়েছিল, শিল্পবিপ্লবের সময় হয়েছে, কিন্তু শিল্প স্থাপনের মতো পুঁজি নেই তাদের কাছে, তখন কী করেছিল? পুঁজি সংগ্রহের জন্য ব্যবসা সম্প্রসারণের নামে শুরু

করেছিল সাম্রাজ্যবাদ। খনিজসম্পদ আহরণের মোটামুটি সহজ একটা উপায় খুঁজে পেয়েছি, যেখানে বিপণনব্যবস্থার জন্য ইচ্ছেমতো দর কষাকষি করতে পারব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে, আই মীন পারার কথা।'

'কোথায় সেটা?'

'বলব, তবে আর কয়েকটা দিন পর। তখন তোমার সাহায্যের দরকার হবে আমার, জেসিকা।'

'কীরকম?'

'তোমার পত্রিকায় ছেপে দেবে, আমার কোম্পানি কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সুবিধা দিতে যাচ্ছে অমুক দেশের তমুক প্রতিষ্ঠানকে। এটা আসলে গৌণ কথা, তোমার আসল কাজ হবে আমার কোম্পানি আসলে কতটা সুসংহত, তা প্রচার করা। খবরটা যাতে ছড়িয়ে যায়, সে-ব্যবস্থা করব আমি। তারপর সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই মার্কেটে দ্বিগুণ হয়ে যাবে আমার কোম্পানির শেয়ারের দাম।'

একটুখানি হাসল জেসিকা। 'বিনিময়ে আমি কী পাব?'

উত্তরটা দিতে যাচ্ছিল পামার, কিন্তু তার আগেই, কিছু একটা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে বাড়ি মারা হলো ওর কেবিনের বন্ধ দরজায়; লক ভেঙে গিয়ে একঝটকায় খুলে গেল দরজাটা।

চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল জেসিকা, একনজরেই বুঝল ঝড়ের গতিতে কারা ঢুকছে কেবিনের ভেতর, মৃদু একটা আর্তচিৎকার আপনাআপনি বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে। থাবা মেরে চাদরটা টেনে নিল সে, নিজের গলা পর্যন্ত ঢেকে ফেলল সেটা দিয়ে।

'মিস্টার অ্যালবার্ট পামার?' মুহূর্তের মধ্যে বিছানা ঘিরে ধরেছে কমপ্লিট স্যুটপরা ছ'জন লোক, তাদের মধ্যে যাকে নেতা বলে মনে হচ্ছে সে বলল কথাটা।

'আপনি কে?' বুকের ভেতরে হাতুড়ির বাড়ি পড়তে শুরু হয়েছে পামারের, তারপরও তেজ দেখানোর চেষ্টা করল।

‘আপনারা কী চান এখানে? আমার ইয়টে এভাবে হাজির হওয়ার দুঃসাহস হলো কী করে আপনাদের?’

একটা পরিচয়পত্র বের করে দেখাল লোকটা।

‘আমি নিউযিল্যাণ্ড ক্রাইম কমিশনের চীফ ইন্সপেক্টর রবিন্স। ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট।’

চৌত্রিশ

জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রথমেই টের পেল রানা, ভেজা ভেজা জমিনে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে ও। একটা মুহূর্তের জন্য সন্দেহ হলো, বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে; কেমন একটা নোনতা গন্ধে ভরা বাতাস জানিয়ে দিল ওকে, পরিবেশটা কোনও কবরের ভেতরের না। এখনও ঝিমঝিম করছে মাথাটা।

দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে এল, স্বাভাবিক হলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। কিন্তু ঘোলাটে হয়ে গেল আবার। দাঁতে দাঁত চেপে কয়েকবার চোখ পিটপিট করল রানা, তারপর চোখ খুলে তাকাল পূর্ণদৃষ্টিতে। উঠে বসার চেষ্টা করল, পারল না। পাশ ফেরার চেষ্টা করল, পারল না। অসহায় বোধ করল, এদিকওদিক তাকাচ্ছে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, নিচু ছাদের কোনও একটা ডানজনে আছে ও। লম্বাচওড়ায় বেশি বড় না ঘরটা, কালের ছোবলে ক্ষতবিক্ষত প্রাকৃতিক দেয়ালের জায়গায় জায়গায় লবণ জন্মে আছে। খুব কাছেই কোথাও সাগর আছে বলে মনে হচ্ছে, কারণ ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। বিদ্যুৎসংযোগ নেই এখানে, আলোর উৎস বলতে একদিকের দেয়ালের হুকে আটকানো বড়সড় একটা জ্বলন্ত মশাল।

বইঘর.কম

ওটা থেকে একটু দূরে, দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব সুন্দরী এক শ্বেতাঙ্গিনী; নির্নিমেষ দেখছে ওকেই, দৃষ্টিতে একইসঙ্গে তাচ্ছিল্য ও কৌতুক।

নাম্বানা ভেলর।

'অ্যারেস্ট?' হাঁ হয়ে গেছে পামার, তারপর সামলে নিয়ে বলল, 'কোন্ অভিযোগে?'

'সুনির্দিষ্ট অভিযোগপত্র কিছুক্ষণের মধ্যেই পেয়ে যাবেন আপনি। তবে যেহেতু জানতে চেয়েছেন সেহেতু বলে রাখি—মানি লণ্ডারিং, খুনের ষড়যন্ত্র, খুন, অপহরণ, জালনোটের ব্যবসা এবং বেশকিছু আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে আপনাকে। আমাদের সামনে চুপ করে থাকার অধিকার আছে আপনার এবং জিজ্ঞাসাবাদের সময় একজন উকিলকে সঙ্গে রাখতে পারবেন আপনি। এবার বিছানা ছেড়ে নামুন...আস্তে আস্তে। ফায়ারআর্মস ক্যারি করছি আমরা এবং বাইরে পুলিশ আছে।'

বিছানা ছেড়ে নামল পামার, এখনও যেন ঠিক বুঝতে পারছে না কী হচ্ছে, বুঝতে পারছে না কোথায় ভুল হয়েছে ওর।

আস্তে আস্তে সব মনে পড়ে গেল রানার। বুঝতে পারল, হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে ওকে।

'কোথায় আছি আমি?' জানতে চাইল ও।

প্রশ্নটার মধ্যে কী মজা পেল ভেলর তা সে নিজেই জানে—হা হা করে হেসে ফেলল। হাসি থামলে বলল, 'দ্য মিউটিনিয়ার্সের আস্তানায়। একটু বাড়িয়ে যদি বলি, বাঘিনীর গুহায়।'

'বাঘিনী কি সমুদ্রের আশপাশের কোনও গুহা বেছে নিয়েছে?'

'যদি কখনও পালানোর প্রয়োজন হয়, সেই কথা ভেবে নিজের গবেষণাগার থেকে সাগর পর্যন্ত কৃত্রিম একটা সুড়ঙ্গ খনন করিয়েছিলেন কর্নেল কামাসাকু গ্রামবাসীদের দিয়ে। সে-কাজে

তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী আমার দাদা টকু...'

'টকু? ওই ভয়ঙ্কর, ঘৃণিত লোকটা তোমার দাদা?'

হাসল ভেলর। 'চমকে দিয়েছি নিশ্চয়ই? লোকজনকে চমকে দিতে মাঝেমধ্যে ভালোই লাগে আমার।'

'জেনে খারাপ লাগছে, তুমি একজন বিশ্বাসঘাতকের বংশধর।'

রানা ভেবেছিল কথাটা শুনে চেহারা কালো হয়ে যাবে ভেলরের, কিন্তু তার বদলে আবারও হা হা করে হাসল মেয়েটা। 'বিশ্বাসঘাতক? ভাষা পরিবর্তনশীল...জানো নিশ্চয়ই...খুব প্রচলিত শব্দও একসময় অর্থ পাল্টায়। বিশ্বাসঘাতক টার্মটাও ঠিক তেমন। আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে-কোনও সুবিধা গ্রহণ করতে পারি আমি, সে-অধিকার আছে আমার। কারণ আমি যদি না করি কাজটা, আর কেউ-না-কেউ করবে। সেক্ষেত্রে সুযোগটা যদি আমিই নিই প্রথমে, দোষটা কোথায়? তা ছাড়া, আমাকে বিশ্বাসঘাতকের বংশধর বলছ, তুমি নিজে কী? আমি বিশ্বাস করেছিলাম তোমার দ্বারা কোনও ক্ষতি হবে না আমার, আমার কথামতো সুবোধ বালক হয়ে থাকবে তুমি। গুহার ভেতরে সুযোগ পেয়ে কেন খুন করতে গেলে আমার দুই-দুইজন লোককে? পালানোর জন্যে? পালাতে পেরেছ শেষপর্যন্ত?'

'তোমার লোকদের খুন করিনি আমি, ভেলর।'

'ওহ্...সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই কর্নেল কামাসাকুর প্রেতাত্মা করেছে কাজটা?'

'তোমার বিশ্বস্ত, আজ্ঞাবহ সার্জেন্ট যদি কর্নেল কামাসাকুর প্রেতাত্মা হয়ে থাকে, তা হলে তোমার প্রশ্নটার জবাব হ্যাঁ।'

'কী বললে?'

'বললাম, ফুগুই খুন করেছে তোমার দুই সুযোগ্য বিদ্রোহী বীরকে। গুপ্তধনের লোভে আমাদেরকে ফলো করতে শুরু করে সে। আঠার মতো লেগে ছিল সে আমাদের পেছনে, ক্যামোফ্ল্যাজ

পোশাকে অনুসরণ করছিল। পরে আমার কাছে বলেছে, ইসাটাবুর প্রায় সব গুহা ভালোমতো চেনে সে, এবং গুহাগুলোর বেশিরভাগই নাকি একটা আরেকটার সঙ্গে যুক্ত। সে যে ওভাবে হাজির হয়ে যাবে, কল্পনাও করতে পারিনি আমি। তোমার পোষা বাঁদর নেচেছে আসলে নিজের কথায়।'

কাঁধ ঝাঁকাল ভেলর। 'এখন আর কিছুতেই এসে যায় না কিছু। সময় শেষ তোমার, রানা, সময় শেষ ভাউযা আর রেমিরও।' পরনের স্কার্টের পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করল সে।

কাপড় পরা শেষ হতেই পামারের হাতে হ্যাণ্ডকাফ পরাল রবিন্স। বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে, ইয়ট থেকে নামানো হলো প্যাট্রোল বোটে, তীরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেল সেটা। পেছন পেছন চলেছে পুলিশের একটা বোট।

পামারের বুকের ভেতরে হাতুড়ির বাড়ি পড়া অব্যাহত আছে এখনও, একইসঙ্গে চিন্তার ঝড় বইছে ওর মস্তিষ্কে। কোন্ সূত্র ধরে ওর কাছে হাজির হলো এনসিসি? পুলিশ ওর সন্ধান পেল কী করে? ওর বিরুদ্ধে কী প্রমাণ জোগাড় করতে পেরেছে ওরা?

পামার ভেবেছিল, এনসিসি'র হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া হবে ওকে, কিন্তু ওকে হাজির করা হলো পুলিশ হেডকোয়ার্টারে, হ্যাণ্ডকাফ খুলে নিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হলো একটা প্রিযন সেলে।

রবিন্স জানতে চাইল, 'কোন্ উকিলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান আপনি?'

জবাব দেয়ার আগে একটু ভাবল পামার। বড় উকিলের দ্বারস্থ যে হতে হবে ওকে, সন্দেহ নেই সে-বিষয়ে। এবং প্রথমেই যদি বড় উকিলের নাম বলে সে, তাকে খবর দিয়ে হাজির করাতে সময় লাগবে এনসিসি'র। চিন্তা করার অবকাশ পাবে পামার।

একটা নাম বলল সে।

সেটা শুনে একটা ভ্রূ একটুখানি উঁচু করল রবিন্স। পামারকে

বলল, ‘আপনার কেস নিতে রাজি করাতে পারবেন তাঁকে?’

‘পারব। দরকার হলে আমার যা আছে সব দিয়ে দেব। তিনি নিজেই নিজের ব্যাপারে গর্ব করে বলেন, “টাকার কাছে বিক্রি হই আমি, কারণ স্বয়ং ঈশ্বরও মুখ ঘুরিয়ে নেন যে-আসামির ওপর থেকে, তাকে জেলের বাইরে বের করে আনতে পারি একমাত্র আমিই।” ’

একটুখানি হাসল রবিন্স। ‘দেখা যাক সত্যি পারে কি না।’

‘গুলি ক\ে যদি মারি তোমাকে,’ রানার দিকে না, হাতেধরা পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে বলল ভেলর, ‘তা হলে একমুহূর্তে শেষ হয়ে যাবে সবকিছু। ‘কিন্তু আমি চাই প্রচণ্ড কষ্ট পেয়ে মরো তুমি। কারণ, একচ্ছত্র ক্ষমতা নিয়ে রাজত্ব করছিলাম আমি ইসাটাবুতে, সব এলোমেলো করে দিয়েছ তুমি। ...নাহ্, সামান্য একটা বুলেট তোমার শাস্তি হতে পারে না। তারচেয়ে বরং ডুবে মরো। জোয়ারের পানি আসছে। হাত-পা বাঁধা থাকায় কিছুই করতে পারবে না।’

‘জোয়ারের পানি আসছে মানে?’

‘সুড়ঙ্গটার শেষমাথায় আছো তুমি এখন। এরপরেই সাগর। মাঝখানের ফাটলে লাগানো আছে স্টিলের একটা ঝাঁঝরি। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে জোয়ার, সাগরের পানি ঢুকতে শুরু করবে এখানে,’ ইশারায় একদিকের দেয়ালের সঙ্গে সংযুক্ত একটা লোহার গ্রিল দেখাল ভেলর, ‘আস্তে আস্তে ভর্তি হয়ে যাবে এই ঘর। পালাবার উপায় নেই, পানিতে ডুবে মরবে তুমি তখন।’

‘আমি মরলে গুপ্তধনের কী হবে? ওটা উদ্ধার করবে কীভাবে?’

‘যে-পর্যন্ত পথ দেখিয়েছ তুমি, আমার জন্যে তা-ই যথেষ্ট। বাকিটা আমি মিউটিনিয়ারদের দিয়ে...ও, ইতোমধ্যে বুঝে গেছ নিশ্চয়ই...আমিই আসলে নেতৃত্ব দিচ্ছি দ্য মিউটিনিয়ার্সকে?’

‘ইতোমধ্যে না, অনেক আগে থেকেই জানি, ওদের সঙ্গে

যোগাযোগ আছে তোমার। আর...তুমি নেতা...কথাটা বোধহয় ঠিক না। দ্য মিউটিনিয়ার্সের আসল নেতা আছে নিউযিল্যাণ্ডের গিযবর্নে, তার নাম অ্যালবার্ট পামার, তোমার স্বামী।'

চমকে উঠল ভেলর, অবিশ্বাস ভরা দৃষ্টিতে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'তুমি জানলে কীভাবে?'

'চমকে গেলে? লোকজনকে চমকে দিতে আমারও মাঝেমধ্যে মজাই লাগে।'

'তুমি জানলে কীভাবে?' কণ্ঠ উঁচু হলো ভেলরের, বলার ভঙ্গি শুনলে বোঝা যায় উত্তরটা দাবি করছে সে রানার কাছ থেকে।

কীভাবে জানতে পারল, তা বিস্তারিত বলল রানা।

শুনে চুপ হয়ে গেল ভেলর।

'যা জানার বাকি ছিল আমার তা হলো তোমাদের এই আস্তানা,' বলল রানা। 'আফসোস, এমন একটা সময়ে জানতে পারলাম, যখন করার মতো তেমন কিছুই নেই আমার।'

রানার মুখে ওর অসহায়ত্বের কথা শুনে খুশি হলো ভেলর, কথা ফিরল ওর মুখে। 'আমাদের আস্তানা একইসঙ্গে দ্য মিউটিনিয়ার্সের হেডকোয়ার্টার, নোট জাল করার কারখানা এবং একটা গবেষণাগার।'

'গবেষণাগার?'

'বলছি। সুড়ঙ্গের শেষমাথায় কয়েকটা ঘর আছে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন বানানো হয় এই স্থাপনা তখন থেকেই; যে-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কর্নেল কামাসাকুকে পাঠানো হয়েছিল এখানে, প্রথম প্রথম অনেকটা একইরকমের উদ্দেশ্য ছিল আমারও। তাই এই পাতালকক্ষ ছাড়া এখানকার প্রায় সব জায়গায় সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওপরে হসপিটাল বেড আছে, মেডিকেল ইক্যুইপমেন্টস আছে। কাছের একটা নদীর খরস্রোত কাজে লাগিয়ে জেনারেটরও চালানো হচ্ছে।'

'কেন?'

'ওই যে বললাম, টাকা জাল আর গবেষণা।'

'একটা গুহায় অনেকগুলো কঙ্কাল দেখেছি আমি। শুনেছি, এই দ্বীপে নাকি আগে একসময় প্রায়ই গায়েব হয়ে যেত কিশোর-কিশোরীরা। তোমার সেই গবেষণার সঙ্গে কি ওসবের কোনও যোগাযোগ আছে?'

'দুইয়ে দুইয়ে চার মেলানোয় জুড়ি নেই তোমার, রানা। তুমি আমার শত্রু না হলে আর অ্যালবার্ট আমার স্বামী না হলে তোমার প্রেমেই পড়ে যেতাম হয়তো। ...হ্যাঁ, আমার গবেষণার সঙ্গে যোগাযোগ আছে কঙ্কালগুলোর, হারিয়ে-যাওয়া কিশোর-কিশোরীদের। জানো কি না জানি না, প্রাণীদেহের ওপর যখনই নতুন কোনও ওষুধের প্রভাব সম্পর্কে গবেষণা চালানো হয়, কোনও না কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কঙ্কালগুলো যাদের ছিল, তারা সেই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার শিকার।'

'কীসের গবেষণা?'

'কয়েকটা ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানির রিসার্চ এজেন্ট হিসেবে কাজ করছিলাম আমি ইসাটাবুতে। কিশোর-কিশোরীদের ধরে আনার জন্যে তাই একটা দল গঠন করতে হয় আমাকে। প্রথমদিকে কোনও নাম ছিল না আমার দলের, কারণ রিসার্চ এজেন্ট হিসেবে কাজ করা ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্যও ছিল না আমার। কিন্তু ইসাটাবু বড় কোনও জায়গা নয়, অপহরণের মাত্রা যখন বাড়তে থাকে তখন সতর্ক হয়ে যায় ছেলেমেয়েদের মা-বাপরা, "গিনিপিগের" অভাবে অর্ডার হারাই আমরা। কাজ নেই, বাড়তি পয়সাও নেই, চীফ মেডিকেল অফিসার হিসেবে পাওয়া বেতনের টাকা দিয়ে একটা দল চালানো মুশকিল হয়ে পড়ে আমার জন্য। অ্যালবার্টই বুদ্ধি বাতলে দেয় তখন—জাল নোট ছাপানোর কারবার শুরু করি আমরা এখানে। কাজের সুবিধার্থেই দু'জায়গায় থাকছিলাম আমি আর অ্যালবার্ট; কখনও আমি যাই নিউযিল্যাণ্ডে, কখনও ও আসে এখানে। মোটের ওপর ভালোই চলছিল সবকিছু। হঠাৎ করেই ব্যবসা সাংঘাতিক খারাপ হয়ে গেল

ওর। তখন রিচার্ডকে নিয়োগ দিই আমরা, লোকটা একজন জেলঘুঘু। কীভাবে কী করব, আমরা তিনজনে মিলে পরিকল্পনা করি। নতুন নাম পায় আমার সেই দল—দ্য মিউটিনিয়ার্স।'

'ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানিগুলোর নাম কী?'

'নাম বলা যাবে না। তবে ওরা হয় ইউরোপিয়ান নয়তো আমেরিকান এবং চেনে সবাই এক ডাকে। পৃথিবীর আরও অনেক জায়গায় আমার মতো আরও অনেক রিসার্চ এজেন্ট আছে ওদের। এজেন্ট নিয়োগ দেয়ার এই প্রক্রিয়াটাও নতুন কিছু না। শীতলযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে নতুন ভ্যাকসিন আর ট্রিটমেন্টের গবেষণার জন্য আফ্রিকা ছিল ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানিগুলোর পছন্দের তালিকায় এক নম্বরে। গরিব দেশের কালো কালো মানুষরা বাঁচল না মরল তাতে কার কী যায়-আসে, বলো? ওরা তো এমনিতেই অনাহারে, অর্ধাহারে অথবা জাতিগত দাঙ্গায় শত শত মরছে প্রতিদিন। পাহাড়ে-জঙ্গলে কঙ্কাল পড়ে থাকলে কেউ ভ্রূ-ও কোঁচকাবে না। কিন্তু সে-বাজার আস্তে আস্তে সরে আসতে লাগল সলোমন দ্বীপপুঞ্জের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয়।' হাসল ভেলর। 'গরিবদের ওপর অত্যাচার চালানো খুব সহজ। কারণ হাতেগোনা কয়েকটা ঘটনা বাদ দিয়ে বললে এখানে কখনও বিচার হয় না কোনও অন্যায়ের।'

'তুমি আর তোমার নিয়োগদাতারা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করেছ।'

'আন্তর্জাতিক আইন?' হাসল ভেলর। 'খোঁজ নিলে জানা যাবে, যারা আইন বানায়, তাদেরই কেউ না কেউ কোনও না কোনওভাবে ওই ফার্মাসিউটিকাল কোম্পানিগুলোর সঙ্গে জড়িত। ...আন্তর্জাতিক আইন আন্তর্জাতিক আইন বলে সবচেয়ে বেশি চেঁচায় কোন্ দেশ? যদি বলি সে-দেশই আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে সবচেয়ে বেশি, অস্বীকার করতে পারবে না। গিনি আর লাইবেরিয়াতে ডিফেন্সিভ বায়োওয়েপন ল্যাবরেটরি স্থাপন করেনি ওরা? তখন আন্তর্জাতিক আইন কোথায় ছিল, বলো তো?'

'সেসবের সঙ্গে, নিরপরাধ কিশোর-কিশোরীদের ধরে এনে এনে গবেষণার নামে হত্যা করার পার্থক্য আছে।'

'তা-ই? ওই ওষুধ কোম্পানিগুলোই যখন ওদের ওষুধবেচা টাকা খরচ করে ভাতকাপড় দেয় গরিব ছেলেমেয়েদের, তাদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করে, তখন তোমরাই কিন্তু হাততালি দাও, সাধু সাধু করো। তোমরা, আমার চেয়ে কোনও দিক দিয়ে ভালো না। মাখনটা ঠিকই চাও তোমরা, কিন্তু ওটা কীভাবে পৌঁছে যাচ্ছে তোমাদের বাসা পর্যন্ত তা নিয়ে ভাবো না কখনওই। যা-হোক, পানি ঢুকতে শুরু করেছে ঝাঁঝরির ফাঁক দিয়ে—খেয়াল করেছ কি না জানি না, থাকো তুমি এখানে, তোমার ন্যায়-অন্যায়সহ ডুবে মরো।' চলে যেতে উদ্যত হলো ভেলর।

মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। বাঁচতে হবে ওকে, এবং একইসঙ্গে মারতে হবে শত্রুকে, কিন্তু কোনও উপায় অবলম্বন করতে পারছে না ও; যদি আবেগতাড়িত করে দিতে পারে মেয়েটাকে, শুধু তা হলেই হয়তো...

'ভেলর?' ডাকল রানা।

ঘুরে তাকাল মেয়েটা।

'মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার আগে,' বলল রানা, 'পৃথিবীর সব কারাগারেই কয়েদিদের শেষইচ্ছা পূরণ করার ব্যবস্থা থাকে।'

'হ্যাঁ, থাকে। তোমার ইচ্ছাটা কী?'

'চুমু খেতে চাই তোমাকে।'

'কী?'

'বললাম, তোমাকে চুমু খেতে ইচ্ছে করছে খুব।'

অবিশ্বাসের ছাপ পড়ল ভেলরের চেহারায়, কৌতুক খেলা করছে ওর দু'চোখে, উপহাসের হাসিতে বেঁকে যাচ্ছে ওর ঠোঁটের এক কোনা। 'ঠিক বুঝতে পারছি না আমি। তুমি পাগল নাকি, রানা? আমি বিবাহিত, এবং আমার স্বামীকে ভালোবাসি। ...যা বলেছ, বলেছ, তার বেশি কিছু বোলো না, এখানে আমার সঙ্গে আমার দু'জন লোক আছে।'

'কোথায় ওরা? দেখতে পাচ্ছি না কেন আমি সেই মহাপুরুষদের?'

ভেলরকে কিছু বলতে হলো না, অন্ধকার দুই কোনা থেকে এগিয়ে এসে মশালের আলোয় দাঁড়াল দুই মিউটিনিয়ার।

ওদেরকে দেখে নিয়ে রানা বলল, 'তুমি কি সতী, ভেলর?'

'রানা!' ধমক দিল মেয়েটা, পিস্তলটা চেপে ধরেছে, আবেগতাড়িত হয়ে পড়ছে।

'আচ্ছা যাও, জবাব দেয়া লাগবে না প্রশ্নটার। ধরে নিচ্ছি স্বামীর প্রতি সৎ ছিলে তুমি তোমাদের দাম্পত্যজীবনের পুরোটা সময়। কিন্তু একই কথা কি পামারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য?'

'মানে?'

জবাব দিতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু তার আগে বেজে উঠল ভেলরের মোবাইল। স্কার্টের পকেট থেকে ওটা বের করল সে, স্ক্রিনের দিকে একনজর তাকিয়ে দেখল কে ফোন করেছে, রিসিভ না করে কেটে দিল কল। রানার দিকে তাকাল। 'কী যেন বলছিলে?'

'বলছিলাম, তোমার সতিত্বের তো কোনও তুলনা হয় না; কিন্তু তোমার পতিদেবতার কী অবস্থা?'

'ঝেড়ে কাশো, রানা।'

'মেয়েটার নাম মনিকা। পামারের পিএস।'

স্থির দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে আছে ভেলর, ওর হাতের তালুতে আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে আসছে পিস্তলটা। একটা মাত্র নাম...পরিচিত একটা মেয়ের নাম মুহূর্তের মধ্যে যেন জোরে ঝাঁকুনি দিয়েছে ওকে। আবারও বেজে উঠল ওর মোবাইল, আবারও লাইন কেটে দিল সে। যেন গোপন কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে রানাকে এমনভাবে বলল, 'তুমি...জানলে কীভাবে?'

আবারও একটুখানি হাসল রানা। 'অবান্তর হয়ে গেল না প্রশ্নটা? একজন ট্যুরিস্ট হয়েও যেখানে জানতে পেরেছি তোমার আর পামারের সম্পর্কের কথা, একজন ট্যুরিস্ট হয়েও যখন বলে

দিচ্ছি পামারের পিএসের নাম আর মেয়েটার সঙ্গে ওর সম্পর্কের কথা, সেখানে তোমার স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস কীভাবে জানতে পারলাম জিজ্ঞেস না করে, কথাটা সত্যি কি না জেনে নাও না লোকটার কাছ থেকে।'

চুপ করে আছে ভেলর। নিজের লোকদের সামনে এত বড় অপমান সহ্য করতে হবে, কল্পনাও করেনি কখনও।

'বাস্তবকে স্বীকার করে নাও, ভেলর,' বলে চলল রানা। 'বুভুক্ষু পুরুষ পামার, হাজার মাইলের ব্যবধান তোমাদের দু'জনের মাঝখানে, শরীরের ক্ষুধা চেপে রাখতে পারবে সে কতদিন? তোমার চেয়েও সুস্বাদু, অতি লোভনীয় খাবার যদি পায়, ছাড়বে কেন? আমার কথা বিশ্বাস না হলে পামারকে ফোন করে জেনে নাও নিজেই।'

হঠাৎই জ্বলে উঠল ভেলরের দু'চোখ। পামারকে ফোন করল মোবাইল দিয়ে।

কোনও জবাব নেই।

'নিশ্চয়ই ব্যস্ত আছে মনিকাকে নিয়ে।'

নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দাঁতে দাঁত চাপল ভেলর, পামারকে ফোন করল আবার।

এবারও জবাব নেই কোনও।

মাথায় খুন চেপে গেল ভেলরের। লাভ হচ্ছে না, তারপরও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বার বার।

ইয়টের মালিক আর স্লেটার ক্যাপ্টেনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে এনসিসি, কলগার্ল ভেবে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়ওনি জেসিকার দিকে; কেবিনের ভেতরে, খাটে বসে আছে জেসিকা, ঠিক বুঝতে পারছে না কী করা উচিত ওর। চলে যাওয়া দরকার, এই মাঝসাগরে নোঙরফেলা একটা ইয়টে সবকিছু বিষের মতো লাগছে ওর কাছে, কিন্তু চলে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। ইয়টটা বন্দরে ভেড়ানো থাকলে না-হয় একটা কথা ছিল।

সম্মানহানির ভয়ে ফোনও করতে পারছে না পরিচিত কাউকে। সাহায্যের আশায় ফোন করেছিল পুলিশকে, ওরা বলেছে মিস্টার পামারের ইয়ট এই মুহূর্তে এনসিসি'র এখতিয়ারে আছে, জেসিকাকে উদ্ধার করা অনুমতিসাপেক্ষ ব্যাপার। একটু ধৈর্য ধরার অনুরোধ করা হয়েছে ওকে।

বিছানায় পড়ে আছে পামারের মোবাইল, বাজছে ওটা। প্রথমবার গুরুত্ব দিল না জেসিকা। কিন্তু যে কল করছে সে বোধহয় বিরতিহীন ফোন দেয়ার প্রতিযোগিতায় মেতেছে, সমানে বাজছে ফোনটা।

এগিয়ে গিয়ে সেটটা তুলে নিল জেসিকা, তাকাল স্ক্রিনের দিকে।

আরে, আজব নম্বর তো! জেসিকা নিশ্চিত, এই নম্বর নিউযিল্যাণ্ডের না। কৌতূহলী হয়ে কল রিসিভ করল সে।

'হ্যালো?' ওপ্রান্ত থেকে হুঙ্কার শোনা গেল ভেলরের।

কিছু বলল না জেসিকা। ওর কৌতূহল বাড়ছে উত্তরোত্তর।

'হ্যালো? কিছু বলছ না কেন?' শোনা গেল ভেলরের গলাফাটানো চিৎকার।

তবুও কিছু বলল না জেসিকা।

'তুমি মনিকা?' আবারও চেঁচাল ভেলর।

"ব্যাচেলর" একজন পুরুষের মোবাইলে একটা মেয়ের মুখ থেকে পামারের পিএস-এর নাম শুনে একইসঙ্গে কৌতুক আর কৌতূহল বোধ করল জেসিকা, অস্ফুট কণ্ঠে বলে ফেলল, 'না, আমি মনিকা নই। তুমি কে?'

'বেশ্যা মাগী,' বাঘিনীর মতোই গর্জে উঠল ভেলর, 'কে তুই?'

অপরিচিত একটা নম্বর থেকে আসা একটা কলে এ-রকম ব্যবহার আশা করেনি জেসিকা, নিজের অবস্থায় এমনিতেই বিরক্ত ছিল সে, জঘন্য সম্বোধনটা শোনামাত্র ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। চিৎকার করে বলল, 'আমি যদি বেশ্যা হই তা হলে তুইও বেশ্যা।'

থতমত খেয়ে গেল ভেলর, কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর

আগের চেয়ে দ্বিগুণ ক্রোধে আর দ্বিগুণ তেজে বলল, 'তোর নাম মনিকা?'

দাঁতে দাঁত পিষে জেসিকা বলল, 'না, আমি জেসিকা। মনিকা পামারের পিএস, এবং ওর রেগুলার বেড-পার্টনার। আমি ইরেগুলার। তুই কে? শুয়োরের বাচ্চাটার তিন নম্বর বেড-পার্টনার নাকি? টাকাপয়সা কিছু চাওয়ার আছে হারামজাদাটার কাছে? যদি তা-ই হয় তা হলে শুনে রাখ্, একটু আগে...'

আর কিছু শোনার প্রয়োজন বোধ করল না ভেলর, যা বোঝার বুঝে নিয়েছে সে, লাইন কেটে দিল।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো স্থির হয়ে গেছে ভেলর। আস্তে আস্তে লাল হয়ে যাচ্ছে দুই চোখ, অশ্রু টলমল করছে সেখানে, স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে ফোঁপাচ্ছে সে। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক পিস্তলটা ছেড়ে দিয়েছে হাত থেকে, মেঝের একটা গর্তের ভেতরে পড়েছে ওটা; এমনভাবে তাকিয়ে আছে নিজের মোবাইলের দিকে যেন ওটা কোনও যন্ত্র না, ওর সতীন।

মনাশ ইউনিভার্সিটির মেডিকেল স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ভেলরের। প্রথম প্রথম পাত্তা দিত না সে পামারকে; দেবেই বা কেন—ওর রূপমুগ্ধ রোমিওদের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না তখন। ওর মন জিতে নেয়ার জন্য কত চেষ্টাই না করেছিল পামার! যে-কোনও ছুতোয় গাঁটের পয়সা খরচ করে গিফট কিনে দেয়া, যে-কোনও বাহানায় এখানে-সেখানে নিয়ে গিয়ে হরেক স্বাদের দেশি-বিদেশি খাবার খাওয়ানো, যে-কোনও অছিলায় স্কুল থেকে হোস্টেলের পথে অথবা হোস্টেল থেকে স্কুলের পথে ভেলরের সঙ্গী হয়ে যাওয়া। তারপরও ওর মন পুরোপুরি জিততে পারেনি লোকটা; জিতেছিল যেদিন ভেলর স্বীকার করে নিয়েছিল পামারের বলা "ইলেভেন নাইন নাইনটিন স্কয়ার" ধাঁধাটার মানে হাজার চেষ্টা করেও বের করতে পারছে না।

পামার বলেছিল, 'বলে দিচ্ছি, কিন্তু একদম চুপ করে শুনতে

হবে তোমাকে, কোনও বাধা দেয়া যাবে না।’

রাজি হয়েছিল ভেলর।

ওর দিকে এগিয়ে গিয়ে ওর ঠোঁটে আলতো করে চুমু খেয়ে পামার বলেছিল, ‘বোকা বুদ্ধিমতী, ধাঁধাটার মানে কে আই ডাবল এস...কিস।’

তারপর ওকে হতভম্ব করে দিয়ে ওর প্রিয় একটা সাদা গোলাপ দিয়েছিল ওকে লোকটা, চলে যাওয়ার আগে বলেছিল, ‘বাক্যটা তিনটা মাত্র শব্দ দিয়ে; প্রথম শব্দটা দিয়ে আমরা দেখি, শেষের শব্দটার মানে ভেড়ী, আর মাঝখানেরটা অনুমান করার দায়িত্ব তোমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি।’

ডুব দিয়েছিল পামার কথাটা বলে।

হন্যে হয়ে লোকটাকে খুঁজে বের করে ভেলর বলেছিল, ‘আমিও তোমাকে ভালোবাসি।’

তারপর...তার পরের স্মৃতি আর ঘাঁটতে চায় না ভেলর।

ঠিকই বলেছিল পামার—বোকা বুদ্ধিমতী। বোকা না হলে যৌনক্ষুধায় ক্ষুধার্ত একটা লোককে একা রেখে এত দূরে থাকে কেন ভেলর? বোকা না হলে অন্ধের মতো বিশ্বাস করেছে কেন লোকটাকে? বোকা না হলে ঢেউয়ের গর্জনের নিচে প্রায় চাপাপড়া, কোনও মেয়ের প্রেমময় কণ্ঠে “অ্যালবার্ট” ডাকটা শুনেও কেন শুনল না সে?

তারমানে, অসুস্থতার অজুহাতে অফিস আওয়ার শেষ হওয়ার আগেই বাসায় ফিরে যাওয়ার পেছনে বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল পামারের?

ব্যবসা খারাপ যাচ্ছে, যেখানে ইয়টটা বিক্রি করে দেয়ার কথা ছিল লোকটার, তা না করে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দিয়ে সেটা সারাই করিয়ে সাগরে ভেসে পড়ার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল?

ভেলরের মোবাইল ফোনটা আবারও বেজে উঠল এমন সময়। স্ক্রিনের দিকে তাকানোমাত্র রোষে কাঁপতে শুরু করল সে, দাঁতে দাঁত পিষল, যেন আগুন জ্বলে উঠল ওর দু’চোখে।

পাতালকক্ষটার যেদিক থেকে পানির শব্দ আসছে সেদিকে ছুঁড়ে মারল সে মোবাইলটা সর্বশক্তিতে। পাঁই করে ঘুরল সঙ্গে সঙ্গে, মনেও থাকল না পিস্তলের কথা, লোহার দরজাটা পার হয়ে মাটি কেটে বানানো সিঁড়ির ধাপ টপকে উঠতে শুরু করল। চোখ মুছতে মুছতে সিদ্ধান্ত নিল, পাই পাই হিসেব বুঝে নেবে সে পামারের কাছ থেকে।

কোনও মিউটিনিয়ারের সঙ্গে কোনও কথা না বলে, নিজের পার্সটা নিয়ে আস্তানার বাইরে চলে এল ভেলর; ঢুকে পড়ল জঙ্গলের একটা চিরচেনা গোপন পথে। ছুটছে, অসুবিধা হচ্ছে না ক্ষয়া চাঁদের আলোতেও। একটা উড়ন্ত হেলিকপ্টারের আওয়াজ পেল, কাছাকাছিই কোথাও আছে সেটা; থাকুক, ভেলরের কী? আজ রাতে শেষ যে-ফ্লাইট রওয়ানা হবে নিউযিল্যাণ্ডের উদ্দেশে, সেটা ধরতেই হবে ওকে যে-কোনওভাবে।

হেডকোয়ার্টার থেকে মাইল দেড়েক দূরে আসার পর ফাঁকা একটা জায়গা আছে, এখানে একধারে পার্ক করে রেখেছে ভেলর নিজের জিপ; ওটাতে চড়ে বসল সে, রওয়ানা হলো আঁকাবাঁকা একটা ট্রেইল ধরে বিপজ্জনক গতিতে। গন্তব্য একটাই: হেণ্ডারসন ফিল্ড।

পাই পাই হিসেব বুঝে নিতে হবে পামারের কাছ থেকে।

পঁয়ত্রিশ

হতভম্ব হয়ে গেছে পাতালকক্ষের ভেতরে থাকা দুই মিউটিনিয়ার। যা শুনল ওরা, যা ঘটতে দেখল চোখের সামনে, কোনওদিন কল্পনাও করতে পারেনি সে-রকম কিছু হতে পারে।

করণীয় ঠিক করতে পিজিন ভাষায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করল ওরা।

'ম্যাডাম তো কিছু বলে গেলেন না,' বলল একজন। 'কী করব এখন?'

'হাত-পা বাঁধা শালাটাকে ঠুকে দিয়ে ওপরে চল্,' বুদ্ধি দিল অন্যজন, 'বোতলের অভাব নেই, ম্যাডাম ফিরে আসার আগপর্যন্ত মৌজ করা যাবে।'

'ঠোকাঠুকির দরকার কী? শালা তো এমনিতেই মরবে।'

বাড়ন্ত পানির দিকে তাকাল অন্য লোকটা, হাসল। ঠিকই বলেছে ওর সঙ্গী। গুহার দেয়ালের ওপাশে গর্জন করছে ঢেউ, আর এপাশে ঝাঁঝরি দিয়ে সমানে ঢুকছে পানি; মশালের আলোয় কালচে দেখাচ্ছে। দু'-চার মিনিটের মধ্যেই সয়লাব হয়ে যাবে মেঝে, তারপর আস্তে আস্তে...

'ঠিক আছে,' বলল সে, 'চল্ তা হলে ওপরে। মদ খেতে খেতে, একটু আগে যা শুনলাম সেসব নিয়ে রসের আলাপ করা যাবে। এই লোক ডুবে মরুক এখানে; এত কষে বেঁধেছি ওর হাত-পা যে,...। চল্, চল্।'

লোহার দরজার ওপাশে চলে গেল ওরা, তারপর তালা লাগিয়ে দিয়ে উঠতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। সমানে বকবক করছে দু'জন, আস্তে আস্তে দূর থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে ওদের কণ্ঠ।

জ্বলন্ত মশালটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল বাড়ন্ত পানির দিকে।

ওকে গিলে খাওয়ার জন্য আসছে সলোমন সাগরের জোয়ার।

হেলিকপ্টারের ভেতরে বসে থাকা সোহেল আরও একবার তাকাল নিচের দিকে, হতাশ হলো, হেডফোনের সঙ্গে সংযুক্ত মাইক্রোফোনে বলল, 'বড় বড় গাছগুলোর শামিয়ানা ভেদ করে নিচে যেতে পারছে না সার্চলাইটের আলো। আমরা যদি দিনের

বেলাতেও আসতাম এখানে, খুব একটা সুবিধা করতে পারতাম বলে মনে হয় না।'

'হতাশ হওয়ার মতো খবর আরও আছে আমাদের কাছে,' জানালেন ফ্র্যান্সিস। 'নাম্বানা ভেলরের নম্বর আর ট্র্যাক করা যাচ্ছে না। যে-কোনও কারণেই হোক, নিজের মোবাইল সুইচঅফ করে দিয়েছে সে, অথবা...অন্যকিছু হয়েছে।'

'রানাকে ট্র্যাক করার মতো তিনটে সূত্র ছিল আমাদের হাতে,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'তিনটাই খোয়ালাম আমরা। শুরু থেকেই বন্ধ ছিল রিচার্ডের নম্বর, হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল ফুগুইয়েরটা, এবার বন্ধ হলো ভেলরের।'

সোহেল বলল, 'মিস্টার ফ্র্যান্সিস, শেষবার ভেলরের অস্তিত্বের জানান দিয়েছে যে-বেইয ট্রান্সমিশন অ্যান্টেনা, সেটার কাছে হেলিকপ্টার নিয়ে যেতে বলুন পাইলটকে। ওটার কাছাকাছি যে-কোনও ফাঁকা জায়গায় ল্যাণ্ড করতে চাই আমি। আমরা চারজনে দুটো দলে ভাগ হয়ে খুঁজতে শুরু করব, রেডিয়োর মাধ্যমে যোগাযোগ থাকবে আমাদের মধ্যে। কেন যেন মনে হচ্ছে আমার, জঙ্গলের ভেতরে পরিত্যক্ত কোনও স্থাপনায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে অথবা হয়েছিল রানাকে, এবং এখন পর্যন্ত সেখানেই আছে ও। সে-রকম কোনও স্থাপনা খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরকে।'

মাথা ঝাঁকালেন ফ্র্যান্সিস, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিলেন পাইলটকে।

হেণ্ডারসন ফিল্ড।

এয়ারপোর্টের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দুই মিউটিনিয়ার। সিদ্ধান্তহীনতার ছাপ দু'জনের চেহারাতেই।

'কী করা যায়, বল্ তো?' ওদের একজন জিজ্ঞেস করল আরেকজনকে পিজিন ভাষায়। 'এতবার কল করছি, ম্যাডাম তো ফোন ধরলেনই না, এখন তো মোবাইল বন্ধই করে দিয়েছেন।'

'আমার মনে হয় কোনও ঘাপলা হয়েছে।'

‘কী ঘাপলা?’

‘জানি না, কিন্তু লক্ষণ সুবিধার মনে হচ্ছে না। এ-রকম হওয়ার তো কথা না, বিশেষ করে এই ইমার্জেন্সি মুহূর্তে।’

মাথা ঝাঁকাল অন্যজন। ‘তা হলে আমাদের করণীয় কী? হেডকোয়ার্টারে যাবি?’

‘না গেলেই ভালো হবে মনে হয়। চল্ বাসায় ফিরে যাই, কাল সকালে না হয় যাব আস্তানায়।’

‘অন্য কাউকে ফোন করবি?’

‘কী দরকার? অন্য শালাদের নাক যে-রকম উঁচু, ফোন করলে হয় ধরবে না নয়তো ঠিকমতো কথাই বলবে না। ম্যাডাম আমাদেরকে একটু অন্যচোখে দেখেন বলে হিংসায় জ্বলেপুড়ে মরে ওই কুত্তার বাচ্চারা।’

‘ঠিক বলেছিস। চল্ বাসাতেই ফিরে যাই।’

গড়াতে শুরু করল রানা। এগিয়ে যাচ্ছে পানির দিকে।

দড়ির বাঁধন যত শক্তই হোক না কেন, পানিতে ভিজলে একটু না একটু নরম আর পিচ্ছিল হয়। গায়ে পানির স্পর্শ লাগামাত্র থামল রানা, শরীরটা ঘুরিয়ে নিল কিছুটা, হাঁটু পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে রাখল কিছুক্ষণ। হাতের কবজিও ডুবে গেল। পাতাল কক্ষের ভেতরে মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়ছে পানির পরিমাণ।

আবারও গড়াতে শুরু করল ও, ফিরে যাচ্ছে লোহার দরজাটার কাছে। ওটার কাছাকাছি পৌঁছে থামল, ডান পা দিয়ে লাথি মারছে বাঁ পা'র কেডসের গোড়ালিতে, কেডস খুলে ফেলার চেষ্টা করছে। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে খুলে ফেলতে পারল কেডসটা, এবার খুলল ডান পায়েরটাও।

জবাইকরা মুরগি যেভাবে পা ছুঁড়তে থাকে, সেভাবে পা ছুঁড়তে শুরু করল রানা। পায়ের বাঁধন আলগা হয়ে গেল কিছুটা, কিন্তু গিঁঠ খুলল না। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ও বাড়ন্ত পানির দিকে। এভাবে পা ছোঁড়াছুঁড়ি করতে থাকলে হয়তো একসময় আলগা

করতে পারবে দড়ির বাঁধন, কিন্তু যে-গতিতে পানি বাড়ছে, ততক্ষণে ওর নাকমুখ ডুবিয়ে দিয়ে অনেক ওপরে উঠে যাবে জোয়ারের পানি।

কসরত করে পিছমোড়া করে বাঁধা হাত দুটো শরীর গলিয়ে পেছন থেকে সামনে নিয়ে এল রানা। হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে বের করল পায়ের গিঁঠ, সঙ্গে সঙ্গে সচল করল দুই হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী। দাঁতে দাঁত চেপে মিনিটখানেকের চেষ্টায় খুলে ফেলল গেরো। হাতটা সরিয়ে নিতে যাবে, এমন সময় টের পেল, আরও একটা গেরো দিয়ে রেখেছে বিদ্রোহী বীরেরা। কিছুক্ষণের চেষ্টায় ওটাও খুলে ফেলল ও।

একটুও সময় নষ্ট করল না, এবার দাঁতের সাহায্যে একটু একটু করে আলগা করে ফেলল হাতের বাঁধন।

ততক্ষণে ওর পায়ের পাতা স্পর্শ করেছে সাগরের পানি।

হাতে সময় নেই। যত জলদি সম্ভব পায়ে গলাল কেড্‌স দুটো।

ঘাড় ঘুরিয়ে বাড়ন্ত পানির অবস্থা দেখে নিল ও। যে-গর্তে পড়েছে ভেলরের পিস্তলটা, ওটা ঢেকে যাচ্ছে পানিতে।

দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল সেই গর্তটার দিকে। একটু হাতড়াতেই পেয়ে গেল পিস্তল, ওটা তুলে নিয়ে ঢোকাল প্যান্টের পকেটে। তারপর এগিয়ে গেল লোহার দরজাটার কাছে। দু'হাতে জোরে ধাক্কা মারল কয়েকবার।

গুহার দেয়ালের যে-জায়গাগুলো ছিদ্র করে বসানো হয়েছে পাল্লা, সেগুলো থেকে খসে পড়ল কিছু মাটি আর লবণ।

তারমানে সাগরের লোনা পানি বছরের পর বছর ধরে দিনে দু'বার করে ঢুকে এসে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে এই কৃত্রিম পাতালকক্ষের দেয়াল ও কপাটের। জায়গায় জায়গায় লবণ জমে আছে।

বসে পড়ল রানা, বেঁধে নিল কেডসের ফিতে। উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালের হুক থেকে খুলে নিল মশালটা। ওটা এক হাতে উঁচু

করে ধরে দেখল পাতালকক্ষের কোথাও পাল্লাসংলগ্ন দেয়ালে আঘাত করার মতো জুৎসই কিছু পাওয়া যায় কি না। কিন্তু সে-রকম কিছুই পাওয়া গেল না। রানার সঙ্গী হিসেবে এই পাতালকক্ষে আছে কেবল বেশকিছু ছোটবড় স্ট্যালাগমাইট।

এই দরজা ভেঙেই বের হতে হবে, কিন্তু ভাঙবে কী দিয়ে?

নিজের এই অবস্থা, তার পরেও অসহায় রেমির কথা মনে আসছে বার বার।

একটামাত্র টিমটিমে বাতি জ্বলছে ষাট গজ দূরের ওই পুরনো বাড়িটাতে। ক্ষয়া চাঁদের আলোয় কেমন ভুতুড়ে মনে হচ্ছে একতলা বাড়িটা। দেখে মনে হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমলের। ওটার সামনে দু'চাকায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা বিধ্বস্ত কামান। টিমটিমে বাতিটা নিঃশব্দে বলে দিচ্ছে, এখনও কেউ বাস করে এখানে, এবং যেভাবেই হোক বিদ্যুতের ব্যবস্থা করতে পেরেছে ওরা। ইসাটাবুর এত জায়গা বাদ দিয়ে এই গহীন জঙ্গলে যারা ঘাঁটি গেড়েছে তারা নিঃসন্দেহে দুষ্কৃতকারী।

সঙ্গে করে আনা নাইট-ভিশন বিনোকিউলারটা নামাল সোহেল চোখ থেকে। নিচু গলায় বলল, 'দ্য মিউটিনিয়ার্সের আস্তানা।'

মাথা ঝাঁকালেন ফ্র্যান্সিস। 'কোনও সন্দেহ নেই।'

'কী করবেন?' জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড। 'ব্যাকআপ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা কি উচিত হবে আমাদের?'

'ওরা সংখ্যায় কতজন জানি না আমরা,' বলল সার্জেন্ট পিটার।

'কিন্তু এটা জানি, সংখ্যায় যতজনই হোক, প্রস্তুত অবস্থায় নেই ওদের কেউই। এবং সেটাই আমাদের জন্য প্লাস পয়েন্ট।'

'কিন্তু...' ফ্র্যান্সিসের কণ্ঠে দ্বিধা, 'আমরা চারজনই এগিয়ে গেলে ব্যাকআপ ফোর্সের জন্যে এখানে গাইড হিসেবে থাকবে কে?'

'তা হলে আপনি থাকুন এখানে,' বলল সোহেল, 'মুরল্যাণ্ড

আর সার্জেন্ট পিটারকে সঙ্গে নিয়ে এগোই আমি। তিনদিক দিয়ে হামলা করব আমরা তিনজন, ওরা পাল্টা জবাব দেয়ার চেষ্টা করলে কোনও দয়ামায়া দেখাব না।'

'রেডিয়ো আছে পিটারের সঙ্গে,' বললেন ফ্র্যান্সিস। 'আমার সঙ্গে অথবা ব্যাকআপ ফোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে সে দরকার হলে।'

আর কোনও কথা না বলে শোল্ডার হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল সোহেল।

ওর দেখাদেখি মুরল্যাণ্ড আর পিটারও।

মশালটা একহাতে উঁচু করে ধরে প্রায় দুই ফুট উঁচু আর বেসবল ব্যাটের মাথার সমান চওড়া একটা স্ট্যালাগমাইটের সামনে বসে পড়ল রানা, বাড়ন্ত পানিতে কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল ওর। হাঁটু দুটো ভাঁজ করে প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল স্ট্যালাগমাইটের ভিত্তিতে। পানি না থাকলে হয়তো রানার এক লাথিতেই মেঝে থেকে আলগা হয়ে যেত ওটা, কিন্তু যত জোরে মারতে চেয়েছে লাথিটা পানির কারণে তত জোরে হয়নি। একই কায়দায় বিনা বিরতিতে পর পর আরও কয়েকবার লাথি মারল ও স্ট্যালাগমাইটটার ভিত্তিমূলে। এবার আর অটল থাকতে পারল না ওটা। একহাতে ওটাকে তুলে নিয়ে, মশালটা যথাস্থানে আটকে দিল আবার।

তারপর পানিতে ছপ্‌ছপ্‌ আওয়াজ তুলে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। স্ট্যালাগমাইটের দুটো ঘা খেয়েই আলগা হয়ে গেল এক দিকের কবজা। আরও ক'ঘা দিতেই নিচের দিকে লোহার পাত বাঁকা হয়ে গেট পেরিয়ে ওপাশে যাওয়ার মত ফাঁক দেখা দিল দরজায়। ওপাশে অন্ধকার।

পানি বাড়ছে। আবার হড় হড় করে বেরিয়ে যাচ্ছে ফাঁক গলে।

এই রে! এবার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আড়াল নিতে হবে।

লোকজন ছুটে এলে বিপদ হবে।

ফাঁক গলে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা।

সোলার প্যানেলের সাহায্যে সঞ্চয় করে রাখা বিদ্যুতের সাহায্যে রাতের বেলায় আলো জ্বলে মিউটিনিয়ারদের আস্তানায়; বিদ্যুৎসংযোগ অকেজো করার জন্য গেল মুরল্যাণ্ড।

সেখানে পাহারায় ছিল একজন মিউটিনিয়ার, মুরল্যাণ্ডকে দেখে ফেলল সে। মুরল্যাণ্ডও দেখল লোকটাকে।

এত রাতে কাউকে আশা করেনি লোকটা ওদের আস্তানায়, তা-ও আবার বলতে গেলে রণসাজে সজ্জিত অবস্থায়; একটা মাচেটি তুলে নিয়ে কোপ মারার ভঙ্গিতে উঠাল মাথার ওপর, চিৎকার করে কিছু বলল পিজিন ভাষায়, তারপর ছুটে এল মুরল্যাণ্ডের দিকে।

জবাবে নিজের ভারী ম্যাগনাম তুলল মুরল্যাণ্ড, বিনা দ্বিধায় ছুটেআসা লোকটার বুকে গুলি করল পর পর দু'বার।

যে-কোনও জরুরি প্রয়োজনের কথা ভেবে নিজের পার্সে সবসময় তিনটে পাসপোর্ট রাখে ভেলর। জন্মসূত্রে একইসঙ্গে অস্ট্রেলিয়া আর সলোমন দ্বীপপুঞ্জের নাগরিক সে, বিবাহসূত্রে নিউযিল্যাণ্ডের। তাই ইসাটাবুতে থাকতে কিংবা অস্ট্রেলিয়া-নিউযিল্যাণ্ডে যেতে ভিসার দরকার হয় না ওর।

হেণ্ডারসন ফিল্ডেই কয়েকটা দেশের বিমানসংস্থার অফিস আছে; ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে এয়ার নিউযিল্যাণ্ডের একটা টিকিট কিনে ওয়েটিং লাউঞ্জে গিয়ে বসল ভেলর। সময় যত যাচ্ছে, তত বাড়ছে ওর ক্ষোভ; পামারের প্রতি জিঘাংসু মনোভাবটা তীব্র হচ্ছে আরও। ঠিক করল, কোনও কথা বলবে না সে পামারের সঙ্গে, কিচ্ছু না; শুধু জানতে চাইবে মনিকা আর জেসিকার পরিচয়, জানতে চাইবে ওদের সঙ্গে কী সম্পর্ক গড়ে তুলেছে পামার। তারপর...ওদের বিলাসবহুল বাড়ির কোথায়

সবসময় লুকানো থাকে একটা নাইন মিলিমিটার মেশিন-পিস্তল, জানে ভেলর।

নিজের হাতে খুন করবে সে পামারকে।

সুললিত নারীকণ্ঠের ঘোষণা শোনা গেল: 'নিউযিল্যাণ্ডগামী যাত্রীদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদের নিয়ে রওনা হবে এয়ার নিউযিল্যাণ্ডের ফ্লাইট নম্বর থ্রি ফাইভ টু সেভেন। আপনারা যারা ওয়েটিং লাউঞ্জে আছেন, ডিপার্চারে রিপোর্ট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে তাঁদেরকে।'

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ভেলর।

গুলির আওয়াজ হওয়ামাত্র সার্জেন্ট পিটারকে ইশারা করল সোহেল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের ছ'ফুট ছ'ইঞ্চি উচ্চতার দশাসই শরীরটা নিয়ে সদরদরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পিটার। ওর ওজন সহ্য করতে পারল না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমলের পুরনো দরজা, খুলে আলগা হয়ে গেল হুড়কো, দুটো পাল্লা হাঁ হয়ে গেল দু'দিকে। পিস্তল হাতে বিদ্যুৎগতিতে ভেতরে ঢুকে পড়ল সোহেল।

একটা ছেঁড়া সোফায় শুয়ে ছিল একটা লোক, তার উল্টোদিকে একটা রকিংচেয়ারে দোল খাচ্ছিল আরেকজন, সোহেলকে দেখামাত্র যার যার আগ্নেয়াস্ত্রের দিকে হাত বাড়াল ওরা। কিন্তু বাড়ানো অবস্থাতেই থেমে গেল ওদের হাত—দু'জনের বুকে পর পর দু'বার গুলি করেছে সোহেল।

সুড়ঙ্গটার শেষ প্রান্ত থেকে দু'রাউণ্ড গুলির আওয়াজ পেয়ে থেমে দাঁড়াল রানা। কে গুলি করে কার ওপর?

একটু পরেই আরও কয়েক রাউণ্ড গুলিবর্ষণের আওয়াজ পাওয়া গেল। সিঁড়ি বেয়ে অনেকদূর চলে এসেছে লবণাক্ত পানি। মৃদু ছপ্ ছপ্ শব্দ তুলে উঠে এল ও শুকনো জায়গায়। এবার খুঁজে বের করতে হবে রেমিকে।

বইঘর.কম

ছুটে আসছে কারা যেন।

এদিকওদিক তাকাচ্ছে সোহেল। একসারিতে কয়েকটা হসপিটাল বেড দেখা যাচ্ছে, সঙ্গের মেঝেতে খাড়া করে রাখা হয়েছে কয়েকটা অক্সিজেন ট্যাঙ্ক। ওগুলোর আড়ালে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল ও।

চট করে এদিকওদিক তাকাল পিটার, নিজেকে আড়াল করার মতো উপযুক্ত কোনও জায়গা দেখতে না পেয়ে দ্রুত চলে গেল দরজার বাইরে, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল, হাতে প্রস্তুত পিস্তল।

তিনজন লোক এসে হাজির হলো ঘরটাতে, তিনজনের হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র। একনজরেই বুঝে নিল ওরা কী হয়েছে ঘরের ভেতরে, সঙ্গে সঙ্গে তিনজন ছড়িয়ে পড়ল তিনদিকে।

একটা অক্সিজেন ট্যাঙ্কের আড়াল থেকে গুলি করল সোহেল। কিন্তু মিস করল এবার, উবু হয়ে ছুট লাগানো এক মিউটিনিয়ারের কোমরের ইঞ্চিখানেক ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট। এক মুহূর্ত দেরি না করে দ্বিতীয়বার গুলি করল ও, কিন্তু ততক্ষণে ডাক্তারি জিনিসপত্রে ঠাসা একটা আলমারির আড়ালে চলে গেছে লোকটা।

ওর দুই সঙ্গী সরে গেছে ঘরের দুই কোণে, সমানে গুলি করছে ওরা অক্সিজেন ট্যাঙ্কগুলো লক্ষ্য করে। নিশানা তত ভালো না ওদের; লোহার হসপিটাল বেডগুলোর এখানে-সেখানে প্রতিহত হয়ে বিশ্রী ধাতব আওয়াজ তুলছে বুলেট, কোনও কোনওটা ফুটো করে দিচ্ছে ট্যাঙ্কগুলোকে।

পাল্টা গুলি করতে পারছে না সোহেল, বেকায়দায় পড়ে গেছে।

ঝট্ করে দরজা-দিয়ে উঁকি দিল পিটার, বুঝে নেয়ার চেষ্টা করল শত্রুপক্ষের অবস্থান, পাল্লার আড়াল থেকে ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল পিস্তলধরা হাত, গুলি করল পর পর তিনবার।

আর্তচিৎকার করে লুটিয়ে পড়ল ঘরের এককোণে পজিশন

নেয়া মিউটিনিয়ার।

আলমারির আড়ালে থাকা লোকটা সক্রিয় হলো এমন সময়, নিজের মাথা আর পিস্তলধরা হাত বের করল সে, খোলা দরজার উদ্দেশ্যে পর পর পাঠিয়ে দিল তিনটা বুলেট।

চট করে সরে গেল পিটার। দেখল, মুরল্যাণ্ড ছুটে আসছে ওর দিকে। আরেকদিকের পাল্লার কাছে পজিশন নিল সে।

খালি হয়ে গেছে সোহেলের পিস্তল, শোল্ডার হোলস্টার থেকে দ্বিতীয় পিস্তলটা বের করল ও। মাঝে মাঝে গুলি করে আলমারির পেছনে এবং ঘরের আরেক কোণে থাকা দুই মিউটিনিয়ারকে সন্ত্রস্ত রাখার চেষ্টা করছে। একইসঙ্গে চাইছে পিটার ও মুরল্যাণ্ডের জন্যে সুযোগ সৃষ্টি করতে। উদ্দেশ্য সফল হলো ওর, দু'দিকের দুই পাল্লার আড়াল থেকে একইসঙ্গে মাথা আর পিস্তলধরা হাত বের করল পিটার আর মুরল্যাণ্ড, একইসঙ্গে গুলি করল দু'জন।

ঝাঁঝরা হয়ে গেল ঘরের অপর কোণে পজিশন নেয়া মিউটিনিয়ার।

লড়াই চলছে যে-ঘরে, তার পাশের ঘরের দরজার আড়ালে লুকিয়ে আছে আস্তানার শেষ মিউটিনিয়ার। কোনও আগ্নেয়াস্ত্র নেই লোকটার হাতে, আছে শুধু দুটো গ্রেনেড। একবার মাত্র উঁকি দিয়ে বুঝে নিল সে কোন্‌দিকে মোড় নিয়েছে লড়াইয়ের পরিস্থিতি, দেখল হসপিটাল বেড আর অক্সিজেন ট্যাঙ্কের আড়ালে থাকা একটা লোক প্রায় নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে আলমারির আড়ালে থাকা ওর বন্ধু মিউটিনিয়ারকে, আর সেই সুযোগে শত্রুপক্ষের দু'জন লোক ঢুকে পড়ছে ভেতরে।

একটা গ্রেনেডের পিন খুলে ফেলল লোকটা, গ্রেনেডটা গড়িয়ে দেবার জন্যে হাত তুলল কোমরের কাছে।

এমন সময় কয়েকটা ঘটনা ঘটল একইসঙ্গে।

ফুরিয়ে গেল সোহেলের পিস্তলের বুলেট, এক্সট্রা ম্যাগাযিনের খোঁজে পকেটে হাত ঢোকাল ও।

কোমরের কাছে গুঁজে রাখা একটা বেরেটা নাইন মিলিমিটার

বইঘর.কম

সেমিঅটোমেটিক বের করল আলমারির পেছনে থাকা মিউটিনিয়ার, সেইফটি ক্যাচ অফ্ করে গুলি শুরু করল।

একটা ডাইভ দিয়ে বাঁ দিকে পড়ল মুরল্যাণ্ড, গড়িয়ে সরে গেল চার-পাঁচ ফুট, চিৎ হয়েই গুলি করল।

আর্তচিৎকার ছেড়ে মেঝেতে পড়ে গেল সার্জেন্ট পিটার, ওর ডান হাঁটুর ওপর উরুতে আঘাত হেনেছে সেমিঅটোমেটিকের দুটো বুলেট।

পর পর দু'বার ঝাঁকি খেল গ্রেনেডওয়ালা মিউটিনিয়ার, দাঁড়ানো অবস্থাতেই প্রাণ গেল ওর, পিনখোলা গ্রেনেড ওর হাত থেকে খসে পড়ল ওরই পায়ের কাছে। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড ধাক্কায় ভেঙে গেল দরজার একদিকের পাল্লা, সেটার কিছুটা অংশ উড়ে গিয়ে আঘাত করল সেমিঅটোমেটিকওয়ালার মাথায়, পিস্তলটা আপনাআপনি ছুটে গেল লোকটার হাত থেকে।

নিস্তব্ধতা।

বাতাসে বারুদের পোড়া গন্ধ, বিস্ফোরিত গ্রেনেড এখনও উড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে কিছু ধুলোবালি।

সোহেলের সঙ্গে দ্রুত আলোচনা সেরে নিল মুরল্যাণ্ড, তারপর গড়াতে গড়াতে এগিয়ে গেল পিটারের দিকে—রেডিয়োতে খবর পাঠাবে ফ্র্যান্সিসের কাছে।

অক্সিজেন ট্যাঙ্কগুলোর আড়াল থেকে বের হলো সোহেল। দু'হাতে তাক করে আছে রিলোডেড পিস্তল, কিছুটা ঝুঁকে পায়ে পায়ে এগোচ্ছে আলমারিটার দিকে। একইসঙ্গে চোখ রাখছে আলমারি আর বিস্ফোরণের ধাক্কায় ভেঙে যাওয়া দরজার ওপর। জানে, পাশের ঘরে যদি আরও কোনও মিউটিনিয়ার থাকে, তা হলে এখন সহজ একটা টার্গেট সে, কিন্তু ঝুঁকি নিতেই হবে ওকে। রানার খবর জানতে হলে অন্তত একজন মিউটিনিয়ারকে পাকড়াও করতে হবে জীবিত অবস্থায়।

আলমারির আড়ালে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেল সেমিঅটোমেটিকওয়ালাকে। পাল্লার আঘাতে মাথা ফেটে

গেছে ওর, রক্ত পড়ছে সেখান দিয়ে; মরেনি লোকটা, তবে জ্ঞান হারিয়েছে। ওর কাছে গিয়ে লাথি মেরে বেরেটাটা দূরে সরিয়ে দিল সোহেল। তারপর, আগের চেয়েও ধীরগতিতে গিয়ে দাঁড়াল পাশের ঘরে যাওয়ার গোবরাটের আড়ালে। পিঠটা ঠেকাল দেয়ালের সঙ্গে, পিস্তলটা এখন একহাতে ধরে হাতটা তুলে রেখেছে কাঁধের কাছে।

ঝট্ করে উদয় হলো ও গোবরাটে—আগে পিস্তলধরা হাত তারপর শরীরের একটুখানি। উঁকি দিল।

বিস্ফোরিত গ্রেনেড চুরমার করে দিয়েছে ঘরের একমাত্র বাল্‌ব্‌টাকে, উড়িয়ে নিয়ে গেছে একদিকের জানালার একটা পাল্লাও; সেখান দিয়ে ঢোকা একফালি চাঁদের আলোর কথা বাদ দিয়ে বললে ভেতরটা অন্ধকার। মাংসের দলায় পরিণত হওয়া গ্রেনেডওয়ালাকে দেখা যাচ্ছে দরজার কাছে—পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায় লাশ হয়ে গেছে লোকটা।

খেয়াল করল ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে একটা চেয়ার, এবং...চমকে উঠল সোহেল...নিশ্চল একটা ছায়ামূর্তি বসে আছে সেখানে।

মুহূর্তের মধ্যে নড়ে উঠল সোহেল, পিস্তলের নিশানা বদল করছে চেয়ারের দিকে।

'এই যে, শালা, শঙ্গৈলডা বালা?' ছড়ার ঢং-এ বলা অতি পরিচিত কণ্ঠের পরিহাসতরল বাংলা আঞ্চলিক উচ্চারণ স্থবির করে দিল সোহেলকে।

এতবার প্লেনে যাতায়াত করেছে ভেলর, তারপরও টেক-অফের সময় মাথা ঘোরে ওর, বমি বমি লাগে, যদিও বমি হয় না কখনোই। কিন্তু আজ সামনের সীটের পেছন থেকে ব্যাগ বের করে নিয়ে বমি করল সে। ওকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এল একজন এয়ার হোস্টেস, মেয়েটার হাতে প্লাস্টিকের ব্যাগ ধরিয়ে দিয়ে সীটে হেলান দিল ভেলর। অল্প যে-ক'জন যাত্রী আছে প্লেনে

তারা সীটবেল্ট খুলে ফেলেছে আগেই, ও-ও খুলল।

নড়েচড়ে আরাম করে বসতে যাবে সে, এমন সময় চমকে উঠল ভেলর। একটা প্লেনে বোমা সেট করার কথা ছিল মিউটিনিয়ারদের, এটাই সে-প্লেন নয়তো? রাগের মাথায় ভুলেই গিয়েছিল ও বোমার কথা। মাটির নিচের সুড়ঙ্গে বার বার যোগাযোগের চেষ্টা করছিল ওরা ওর সঙ্গে...,এই খবরটা দেবার জন্যে নয়তো?

প্রথম বোমাটা বিস্ফোরিত হয়ে কাঁপিয়ে দিল পুরো প্লেনটাকে।

থতমত খেয়ে গেল সবাই, কেউ কিছু বুঝতে পারল না, কিন্তু ভেলর ঠিকই বুঝতে পারল কী ঘটছে।

এটাই দ্য মিউটিনিয়ার্সের সেই মহাপরিকল্পনা, বা শেষ ছোবল। দু'জন মিউটিনিয়ারকে পাঠানো হয়েছিল হেণ্ডারসন ফিল্ডে, যে-কোনও একটা প্লেনে বোমা ফিট করার জন্য। কথা ছিল কোন্ প্লেনে বোমা বসিয়েছে ওরা তা ফোন করে জানাবে ভেলরকে। দায়িত্ব সম্পাদন করেছে ওরা, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে ভেলর, ফোনও করেছিল, কিন্তু ধরেনি ও...

নিজের নিয়তিকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না ভেলর, তাই গলা ফাটিয়ে প্রথম চিৎকারটা দিল সে-ই।

সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো দ্বিতীয় বোমা।

মাটি থেকে দেড় হাজার ফুট ওপরে দু'টুকরো হয়ে গেল এয়ার নিউযিল্যাণ্ডের ফ্লাইট নম্বর থ্রি ফাইভ টু সেভেন, শরীরে আগুন নিয়ে খণ্ডাংশ দুটো পড়তে শুরু করল সলোমন সাগরের বুকে।

ছত্রিশ

পিস্তলটা নামিয়ে নিয়ে সোহেল বলল, 'তুই!'

রানা বলল, 'কোনও সন্দেহ আছে?'

'না, শালা, সন্দেহ নেই। তবে কথা হলো, সিংহাসনে বসে সিনেমার ডায়লগ মারছিস, আমরা না এলে দেশে-বিদেশে গায়েবানা জানাজা পড়তে হতো তোর।'

চেয়ার ছেড়ে উঠল রানা, হেঁটে গিয়ে দাঁড়াল খোলা জানালার সামনে, চাঁদের আলোয়। ডান হাতে ধরা পিস্তলটা দেখাল সোহেলকে। 'বাজে বকিস না, চান্দু, এখনও তিন-তিনটা বুলেট আছে এটাতে। মেসেজ পাঠানোর এক শতাব্দী পরে এসে হিরোগিরি দেখাচ্ছিস?'

'তিনটা বাকি আছে মানে?'

'শুধু শুধু কি আর তোকে শালা ডাকি? গ্রেনেডওয়ালা যদি ঠিকমতো ছুঁড়তে পারত গ্রেনেডটা, গায়েবানা জানাজা আমার না, তোরই পড়তে হতো। শত টুকরো হওয়া লাশটা নিয়ে দেশে ফিরতেও পারতাম না হয়তো—কারণ আমার কোনও সন্দেহ নেই লোকটার টার্গেট ছিলি তুই। সময়মতো হাজির হয়ে জায়গামতো বুলেট পাঠানোর জন্য আমাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত ছিল তোর। ...ভাগ্যিস পিটার নামের লোকটার শুশ্রূষার দায়িত্ব নিতে বলেছিলি মুরল্যাণ্ডকে; এ-ঘরে থেকে তোদের কথা যদি না শুনতাম তখন, তা হলে দরজার গোবরাটে এসে যখন দাঁড়িয়েছিলি, আরেকটা বুলেট খরচ হয়ে যেত আমার।'

উপযুক্ত জবাব দিতে যাচ্ছিল সোহেল, ব্যাকআপ ফোর্সসহ ফ্র্যান্সিস এসে পড়ায় পারল না। অনেকগুলো ফ্ল্যাশলাইটের উজ্জ্বল

বইঘর.কম

আলোয় এবং অনেকগুলো বুটজুতোর শব্দে ভরে গেল ঘরটা।

রানার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলেন ফ্র্যান্সিস, দ্য মিউটিনিয়ার্সের মেরুদণ্ড প্রায় একক প্রচেষ্টায় ভেঙে দেয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন ওর কাছে।

'কাজ বাকি রয়ে গেছে এখনও,' জানাল রানা। 'বিদ্রোহী বীরদের স্থানীয় নেতা বা নেত্রী যা-ই বলি না কেন, নাম্বানা ভেলরকে ধরতে পারিনি আমরা। পাকড়াও করতে হবে ওদের এক নম্বর গুরু অ্যালবার্ট পামারকে, নিউযিল্যাণ্ডে থাকে লোকটা।'

পিটারকে রয়্যাল পুলিশের হাতে ছেড়ে দিয়ে ফিরে এসেছিল মুরল্যাণ্ড, দাঁড়িয়ে ছিল দরজার কাছে, রানার শেষের কথাটা শুনে বলল, 'নিউযিল্যাণ্ড ক্রাইম কমিশন ইতোমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে পামারকে, লোকটার আনুষ্ঠানিক বিচার শুরু হওয়া এখন সময়ের ব্যাপার। অ্যাডমিরাল হ্যামিল্টনের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার।'

'এবং ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে নাম্বানা ভেলর,' জানালেন ফ্র্যান্সিস।

'মানে?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'কিছুক্ষণ আগে হেণ্ডারসন ফিল্ড থেকে নিউযিল্যাণ্ডগামী একটা প্লেন ধ্বংস হয়েছে সলোমন সাগরের ওপর, মোবাইলে ফোন করে জানানো হয়েছে আমাকে। বেশি যাত্রী ছিল না ভেতরে, তাই নিহতদের তালিকা করতে বেশি সময় লাগেনি রয়্যাল পুলিশের। সে-তালিকায় নাম্বানা ভেলরের নামও আছে।'

'বোমা ফাটিয়ে প্লেন উড়িয়ে দিল কারা?' জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

'আমার মনে হয় কাজটা মিউটিনিয়ারদেরই,' বলল রানা। 'শেষ একটা চাল দেয়ার কথা ছিল ওদের, ওটার মাধ্যমে দাবি আদায় করার পরিকল্পনা করেছিল মিস্টার সোগাভেরের কাছ থেকে।'

'পরের লাগি খাদ করে,' বাংলায় বলল সোহেল, 'আপনি খাদে পড়ে মরে।'

'এখন কী করব আমরা?' জানতে চাইল মুরল্যাণ্ড।

কিন্তু রানা বা সোহেলের কেউ-ই না, জবাবটা দিল অন্য কেউ—একটা নারীকণ্ঠ; তবে কোনও শব্দ বা বাক্যের মাধ্যমে না, অস্পষ্ট একটা গোঙানির মাধ্যমে।

যেদিক থেকে এসেছে শব্দটা, ঝট করে সেদিকে মাথা ঘোরাল রানা। কয়েক লাফে গিয়ে হাজির হলো পাশের ঘরের সামনে, জোরে ধাক্কা দিল দরজায়।

খুলল না ওটা—তালা মারা আছে।

ফ্র্যান্সিসের কাছ থেকে নিজের জন্যে একটা ফ্ল্যাশলাইট চেয়ে নিল রানা, এগিয়ে গেল গ্রেনেডওয়ালার দিকে।

'কী করছিস?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'আস্তানার বাকি ঘরগুলোর চাবি থাকতে পারে লোকটার কাছে,' জরুরি কণ্ঠে বলল রানা।

বিড়ালতপস্বী বলতে যা বোঝায়, ব্যক্তিজীবনে ওরওয়েন ঝনয়া ঠিক তা-ই।

মুখে ধর্মের কথা খুব বলেন তিনি; বলেন, মিশনারিরা সলোমন দ্বীপপুঞ্জের সনাতনী ধর্ম থেকে যিশুর ধর্মে দীক্ষিত করে যারপরনাই উপকার করেছে দেশের মানুষদের, স্বর্গের পথ দেখিয়েছে তাদেরকে। যুবকযুবতীদের যদি দেখেন হাত ধরাধরি করে রাস্তায় হাঁটতে, গালি দেন; বলেন, সব ক'টাকে ধরে ধরে চাবকানো দরকার—বেলেল্লাপনা না করে বিয়ে করে ফেলতে অসুবিধাটা কোথায়? কবিতা-উপন্যাস সহ্য করতে পারেন না তিনি একটুও; তাঁর মতে, মানুষকে রঙিন স্বপ্নে ভুলিয়ে বাস্তব জীবন থেকে দূরে রাখার অপরাধে বিচার হওয়া দরকার পৃথিবীর সব কবি আর ঔপন্যাসিকের। প্রতি রোববার যে বা যারা গির্জায় যায় না, তাদেরকে যিশুর দুশমন হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন তিনি; সুরাব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সরকার নিয়মিত মোটা ট্যাক্স পাওয়ার পরও ওই লোকগুলোকে সামাজিক অবক্ষয়ের মূল কারণ

হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কাজকে ভালোবাসার পাশাপাশি পরিবারকেও ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করেন তিনি সবাইকে, স্ত্রী-সন্তানদের সময় দিতে বলেন; সামাজিক জীব মানুষের শান্তি যে সামাজিকতায়, সেটা সুযোগ পেলেই বুঝিয়ে দেন সবাইকে।

সমাজের সামনে যে-লোক ডক্টর জেকিল, সমাজের আড়ালে সে-লোকই হয়ে যায় মিস্টার হাইড; আজ রাতে, অন্য অনেক রাতের মতোই, ওরওয়েন ঝনয়াও তা-ই হয়েছেন।

গোপন লীলানিবাসে নিভৃতে মিলিত হয়েছেন তিনি এক দেহ পসারিণীর সঙ্গে, মাসে দু'-একবার এ-রকম না করলে চলে না তাঁর। এবং প্রতিবারই, মনোরঞ্জনের জন্য, নিত্যনতুন মেয়ে আনিয়ে নেন তিনি। আজ যাকে আনিয়েছেন, সে শুধু স্বর্গসুখই দিতে জানে না, ফালি করে কাটা লেবু দিয়ে সাজিয়ে চমৎকার ককটেলও বানাতে পারে। হরেক স্বাদের সুরায় ভাসতে ভাসতে এবং অল্পবয়সী মেয়েটার শরীরের বিভিন্ন ভাঁজেখাঁজে নিজের ফুরিয়েআসা যৌবন খুঁজে নিতে নিতে, ডক্টর জেকিলের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মুচকি হাসলেন ঝনয়া।

মেয়েটার নাম...আসলে নির্দিষ্ট কোনও নাম নেই ওর। বাপ-মা'র দেয়া নামটা কাউকে কখনও বলে না সে, কারণ ওটা বললে বাপ-মা'র কথা মনে পড়ে যায় ওর, অসহ্য এক অপরাধবোধের কারণে তাদেরকে মনে করতে চায় না। ভোগী পুরুষ নারী পাওয়ামাত্র নামকরণের ব্যাপারে অস্থির হয়ে যায়, মেয়েটা যাদের কাছে যায় তারাও ব্যতিক্রম নয়; যেমন ঝনয়া মেয়েটার নাম দিয়েছেন "ল্যাপটপ", কারণ আজ রাতে তিনি ঘুমিয়ে পড়ার আগপর্যন্ত তাঁর কোল থেকে নামা নিষেধ, যদিও ইতোমধ্যে সে-নিষেধাজ্ঞা কয়েকবার ভঙ্গ করতে হয়েছে মেয়েটাকে বিভিন্ন কারণে।

আরেক রাউণ্ড ককটেলের একটা গ্লাস একচুমুকে খালি করে ল্যাপটপকে নিজের দিকে টেনে নিলেন ঝনয়া, শুয়ে পড়লেন চিৎ হয়ে। হাত ধরে টেনে মেয়েটাকে এনে ফেললেন নিজের বুকের

ওপরে, বুজে আসতে চাওয়া চোখ দুটো জোর করে খুলে রেখে বললেন, 'অপ্সরা, স্বর্গসুখ দাও।'

কথামতো কাজ করল মেয়েটা। কিন্তু যখন বুঝল, যৌবনের সন্ধানে মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করে ফেলা ঝনয়া অতিক্লান্ত হয়ে গেছেন, নেশার দাপটের কাছে বার বার আত্মসমর্পণ করতে চাচ্ছে তাঁর হুঁশ, তখন খোপা বেঁধেরাখা লম্বা কাঁটাটা আলগা করে নিল সাবধানে।

জিনিসটা দেখতে যদিও কাঁটার মতো, আসলে ওটা বিশেষ ধরনের স্টিলেটো। সুইচে কায়দামতো চাপ দিতেই ক্লিক আওয়াজে বেরিয়ে এল ক্ষুরধার ফলা। এবং সেটা দিয়ে "ডক্টর ওরওয়েন" অ্যাণ্ড "মিস্টার ঝনয়া'র" গলায় পর পর তিনবার সজোরে পোঁচ দিতেই রক্তের ধারা ছুটল ফিনকি দিয়ে। স্বর্গসুখ পাওয়ার জন্য আগে পরকালে যেতে হয় মানুষকে, যমের হাত ধরে সেই গন্তব্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন তিনি অনেকটা নিজের অজান্তেই।

মৃত মানুষটার কোল থেকে ধীরেসুস্থে নামল ল্যাপটপ, গিয়ে ঢুকল বাথরুমে, সময় নিয়ে রক্তের প্রতিটা ফোঁটা ধুয়ে ফেলল শরীর থেকে। কাজটা করতে করতে গুনগুন করে গাইতে শুরু করল অনেক বছর আগের জনপ্রিয় একটা ইংরেজি গান: স্ট্রবেরিয, চেরিয অ্যাণ্ড অ্যান এইঞ্জেল কিসিং স্প্রিং, মাই সামার ওয়াইন ইয রিয়েলি মেইড ফ্রম অল দিয থিংস...

ঘরে ফিরে এসে কাপড় পরে নিল সে, এ-কাজেও কোনও তাড়াহুড়ো দেখা গেল না ওর মধ্যে। তারপর একটা সোফায় বসে পড়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ঝনয়ার লাশের দিকে, পার্সের ভেতর থেকে বের করল মোবাইল। ফোন করল সোগাভেরকে।

কলটা রিসিভ করে কিছু বললেন না সোগাভের, শুধু একটু কাশলেন।

'কাজ হয়ে গেছে,' বলল ল্যাপটপ।

আরেকবার কেশে লাইন কেটে দিলেন সোগাভের।

ঝনয়ার গোপন প্রণয়কক্ষের দরজার পুশবাটন লক টিপে দিয়ে বাইরে এল ল্যাপটপ, ওরফে অনেক নামের একজন মেয়ে, ওরফে লিলি—সোগাভেরের গুপ্ত আততায়ী দলের এক সদস্যা; তারপর টেনে আটকে দিল দরজাটা।

পিস্তলটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে চাবি দিয়ে একটা ঘরের তালা খুলছে রানা, ওর দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে সোহেল ও মুরল্যাণ্ড। দরজা খোলা হলে ঘরটার ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা তিনজন।

এদিকসেদিকে আলো ফেলে ফেলে দেখছে রানা। একদিকের দেয়ালের সঙ্গে আরও ছ'টা হসপিটাল বেড দেখা গেল। সেগুলোর পাশে দেয়ালের হুকে ঝুলছে মরচেধরা শেকল।

বিড়বিড় করে কী যেন বলল মুরল্যাণ্ড, ঠিক বোঝা গেল না।

কফিনের মতো আকারআকৃতির কিছু একটা পড়ে আছে একদিকের দেয়ালের কাছে, লোহা দিয়ে বানানো বলে সিন্দুক ভেবে ভুল হয়। কাছে গিয়ে বোঝা গেল ওটা কোনও সিন্দুক না, সাময়িক কারাগার—একটামাত্র মানুষকে বন্দি করে রাখার জন্য। ওটার ঠিক পাশেই একটা ধাতব খাঁচা—সার্কাসের জন্তু আটকে রাখার মতো। দেয়ালের এখানে-সেখানে লালচে বাদামি রঙ; বোঝা গেল কোনও এককালে রক্তের দাগ ছিল ওগুলো। কোনও কোনও খাটের নিচে, মেঝেতে ছড়িয়েছিটিয়ে পড়ে আছে কতগুলো খালি প্লাস্টিক ব্যাগ, বাতিল সিরিঞ্জ আর ওষুধের শিশি।

ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে গেল একটা তেলাপোকা।

'মধ্যযুগীয় বর্বরতা,' বলল রানার পাশে এসে দাঁড়ানো মুরল্যাণ্ড।

নারীকণ্ঠের গোঙানিটা শোনা গেল আরেকবার।

কিছুটা দূরে বন্ধ আরেকটা দরজা দেখা যাচ্ছে, ওটার ওপাশ থেকে এসেছে শব্দটা।

ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলে দরজাটা দেখল রানা, চাবির গোছার প্রতিটা চাবি কাজে লাগিয়ে খোলার চেষ্টা করল কড়ায়

ঝোলানো তালাটা। কিন্তু পারল না। তারমানে এই তালার চাবি ছিল না গ্রেনেডওয়ালার কাছে, অথবা থাকলেও...

চাবির গোছাটা ফেলে দিল রানা, পিছিয়ে গেল বেশ কয়েক পা। তালা খোলার চেষ্টা করাটা এখন ঝামেলা এবং সময়ের অপচয় মনে হচ্ছে ওর কাছে, তাই ছুটে গিয়ে প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল দু'পাল্লার পুরনো দরজাটার ওপর। ছুটে গেল কড়া, বেকার হয়ে গেল তালাটা, দুই পাল্লা দু'দিকে হাঁ করে দিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা। আলো ফেলছে এখানে-সেখানে, একটু পরই একজায়গায় স্থির হলো আলোটা।

একটা চৌকির ওপর মড়ার মতো পড়ে আছে রেমি, কিন্তু সে যে মরেনি তা বোঝা গেল ওর দুই চোখের দিকে তাকিয়ে। জীবনের আশা ছেড়ে-দেয়া কেউ যদি হঠাৎ দেখতে পায় বেঁচে থাকার কোনও সম্ভাবনা, তা হলে তার চোখে যে-দ্যুতি দেখা দেয়, ঠিক সেভাবে জ্বলজ্বল করছে মেয়েটার দুই চোখ। 'মিস্টার রানা?' উঠে বসার চেষ্টা করতে করতে কোনওরকমে বলল সে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল রানা। 'তুমি জানতে চেয়েছিলে, আমাদের আর দেখা হবে কি না। জবাব পেয়েছ?'

সেণ্ট্রাল হাসপাতালে ভর্তি করা হলো রেমিকে। জানা গেল, ডিহাইড্রেশনে ভুগছে সে; উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হলো সেটার। আঙুল কেটে ফেলার পরও মেয়েটা ইনফেকশন থেকে বেঁচে গেছে জেনে স্বস্তি বোধ করল রানা; তারপরও বার বার করে বলল কর্তব্যরত ডাক্তারকে, সে-ব্যাপারেও যেন নজর রাখা হয়। ভাউযার সঙ্গে দেখা করতে চাইল, কিন্তু লোকটা ঘুমিয়ে পড়েছে শুনে সোহেল আর মুরল্যাণ্ডকে নিয়ে ফিরে এল হোটেলে। যে-নার্স দায়িত্ব পালন করছিল ভাউযার কেবিনে, পুলিশ দেখে ঘাবড়ে গেল সে; ওকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেঙে পড়ল, স্বীকার করল সব কথা। গ্রেপ্তার করে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হলো মেয়েটাকে।

বইঘর.কম

বিদায় নিয়ে চলে যেতে চাইছিলেন মিস্টার ফ্র্যান্সিস আর পিটার, কিন্তু রানা বলল কাজ বাকি আছে এখনও। তাঁদেরকে এবং আরও কয়েকজন পুলিশ নিয়ে মেণ্ডানায় হাজির হলো ও, ম্যানেজারকে ডেকে বলল হোটেলের এক বা একাধিক কর্মচারী জড়িত ছিল দ্য মিউটিনিয়ার্সের সঙ্গে। কায়দা করে ছড়িয়ে দেয়া হলো খবরটা, ঘাবড়ে গেল রিচার্ডের ওই চর, পালাতে গিয়ে ধরা পড়ল পুলিশের হাতে। পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হলো ওকেও।

রানাকে জীবিত ফিরে পেয়ে খুশি হয়েছেন ম্যানেজার। একটা ডাবল রুমের ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি সোহেল আর মুরল্যাণ্ডের জন্য, চটপট গোসল করে নিয়ে, সে-ঘরে চলে এল রানা গল্প করার উদ্দেশ্যে।

এসেই দেখল, রেডিয়োর ব্যবস্থা আছে সেখানে, নির্দিষ্ট একটা এফএম চ্যানেল ছেড়ে রাখা হয়েছে ওটাতে; একটু আগে সলোমন দ্বীপপুঞ্জের নাগরিকদের উদ্দেশে জরুরি ভাষণ দিয়েছেন সোগাভের, সেটার ইংরেজি অনুবাদ শোনানো হচ্ছে এখন।

'...আপনারা জানেন, দ্য মিউটিনিয়ার্স নামের একটা জঙ্গি দল কিছুদিনের জন্য কত অশান্তিতে রেখেছিল আমাদের সবাইকে। কিন্তু দেখুন, একতাবদ্ধ থাকলে, একটু ধৈর্য ধরলে বড় বড় সমস্যাও কীভাবে সমাধান করা যায়! এটা আমার সরকারেরই দূরদর্শিতা ও সক্ষমতার প্রমাণ—সীমিত সামর্থ্যের সবটুকু আমরা উজাড় করে দিয়েছি আপনাদের জন্য, ফলে পতন ঘটেছে দ্য মিউটিনিয়ার্সের। যা-হোক, সলোমন দ্বীপপুঞ্জের সম্ভাবনার আকাশে কালো মেঘ দেখা দিয়েছিল, আমরা দূর করে দিয়েছি সেটা, আমি মনে করি পিছিয়ে-যাওয়া নির্বাচনই মুখ্য এখন আমাদের সবার কাছে। সে-লক্ষ্যে যত দ্রুত সম্ভব কাজ শুরু করবে আমার সরকার, এবং আমি আশা করব, দেশের সুরক্ষায় সক্ষম জনপ্রতিনিধিদের বেছে নিতে ভুল করবেন না বিজ্ঞ দেশবাসী। আমি...'

রেডিয়ো বন্ধ করে দিল সোহেল। 'লোকটা তো সাংঘাতিক ধান্দাবাজ! আরেকটু হলে পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছিল ওর; যে-লোক জানবাজি রেখে ওর মসনদ টিকিয়ে দিল, তাকে ডেকে পাঠিয়ে তার সঙ্গে দেখা করা তো পরের কথা, সুযোগ বুঝেই রেডিয়োতে হাজির হয়ে নিজের ঢোল পেটাতে শুরু করে দিয়েছে!'

'বাদ দে,' বলল রানা, 'জীবনে কম তো দেখলাম না এসব।'

'সব মিউটিনিয়ার ধরা পড়েনি,' বলল মুরল্যাণ্ড।

'যে-ক'জন পালিয়ে গেছে অথবা পালিয়ে আছে তাদের বিরুদ্ধে চিরুনি অভিযানের ঘোষণা দিয়েছেন ফ্র্যান্সিস,' বলল সোহেল।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'গুহার ভেতরের কঙ্কালগুলোর ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে রয়্যাল পুলিশের একটা ফরেনসিক টিম ইতোমধ্যেই রওনা হয়ে গেছে ওদিকে। এ-পর্যন্ত যত কিশোর-কিশোরী নিখোঁজ হয়েছে ইসাটাবুতে, তাদের তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে; কঙ্কালগুলো থেকে পাওয়া ডিএনএ থেকে বেরিয়ে আসবে বাচ্চাগুলোর পরিচয়।'

মুরল্যাণ্ড বলল, 'ভেলরের ব্যাপারটা কী, বলো তো?'

ইসাটাবুতে ছুটি কাটাতে আসার পর থেকে শুরু করে আজ সোহেল আর মুরল্যাণ্ডের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগপর্যন্ত যা যা ঘটেছে তার প্রায় সব কথাই ওদেরকে বলল রানা। বলল কীভাবে সন্দেহ করেছিল ও রিচার্ডকে।

'কিন্তু ভেলরকে সন্দেহ করলে কী করে?' বলল মুরল্যাণ্ড।

'প্রথম সাক্ষাতেই ওকে সন্দেহ হয়েছিল আমার,' বলল রানা। 'আমার সামনে ভালোমানুষি দেখাতে গিয়ে বলল সে, "দুটো কুমির হামলা করার পরও..."। আমি তো ওকে বলিনি ক'টা কুমির ছুটে গিয়েছিল ভাউযার দিকে। তা হলে সে জানল কী করে?'

'উত্তর একটাই,' বলল মুরল্যাণ্ড, 'ভাউযাকে নিয়ে তুমি

হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই কেউ একজন ঘটনাটা জানিয়ে দিয়েছিল ভেলরকে।'

'আমার সন্দেহটা আরও বাড়ল,' বলছে রানা, 'যখন বলা নেই কওয়া নেই, হাসপাতালের ইমার্জেন্সি রুমে হুট করে হাজির হয়ে গেল ফুগুই। প্রশ্ন হচ্ছে, ওটিতে রোগীর অপারেশন নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা যার, কী এমন গরজ পড়ল তার যে, ফোন করে ডেকে আনতে হলো পুলিশকে?'

'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই,' মন্তব্য করল সোহেল।

রানা বলল, 'ভেলর যে-ভুল করেছিল, একই ভুল করল ফুগুইও। ওকেও কুমিরের সঠিক সংখ্যা বলিনি আমি, কিন্তু সেটা বলে দিল সে নিজে থেকেই। ভেলরের সঙ্গে ফুগুইয়ের একটা আঁতাত টের পাই তখন। "আপনি যখন ব্যাণ্ডেজ বাঁধছিলেন তখন তিনি কিছু বলেননি আপনাকে?" এ-রকম প্রশ্ন ফুগুই যেমন জানতে চেয়েছে আমার কাছে, তেমন জানতে চেয়েছে ভেলর; উদ্দেশ্য একটাই—জানা, গোপন কথা ফাঁস হয়ে গেল না তো!'

'কিন্তু জেকব ভাউযার পরিচয় যদি আগে থেকেই জানবে লোকটা,' বলল মুরল্যাণ্ড, 'তোমার কোমরে মানিবেল্ট দেখার পরও সরাসরি চার্জ করল না কেন তোমাকে?'

'সে যদি প্রথমেই জানত ওটা ভাউযার মানিবেল্ট, অবশ্যই হাতিয়ে নেয়ার চেষ্টা করত কোনও না কোনও কৌশলে। যা-হোক, ভুল করে ভাউযার নামটা উচ্চারণ করে ফেলি আমি ভেলরের সামনে, সঙ্গে সঙ্গে আচরণ বদলে যায় মেয়েটার। ভাউযা আমাকে কী বলেছে তা জানার জন্য একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকে। সাংঘাতিক একটা ভুল করে ফেলে তখন।'

'যেমন?'

'ভাউযার সঙ্গে আমি যাতে দেখা করতে না পারি সেজন্য হুট করে বলে বসে, জ্ঞান ফিরে পেতে দেরি হতে পারে লোকটার, কারণ সে নাকি স্পাইনাল কর্ডের ওপর কুমিরের লেজের বাড়ি খেয়ে কোমার কাছাকাছি চলে গেছে। ...ডাহা মিথ্যা কথা। যে-

লোককে আমি নিজে উদ্ধার করেছি, তাকে কুমির লেজ দিয়ে বাড়ি মেরেছে কি মারেনি, আমি জানি। ...বুঝলাম, এমন এক জালে জড়িয়েছে ভাউযা, যেটার কেন্দ্রবিন্দুতে মাকড়সার মতো বসে আছে ভেলর। ওকে বাজিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিলাম তখন।

'সেজন্যই মেয়েটা তোকে ডিনারে ইনভাইট করামাত্র রাজি হয়ে গেলি?'

'হ্যাঁ। হাসপাতালে ভেলরের কাছে শুশ্রূষার জন্য যখন গিয়েছিলাম, লাভ আকৃতির একটা লকেট দুলতে দেখি ওর গলায়। আগে থেকেই ওর ওপর সন্দেহ ছিল আমার, লকেটটা আরও বাড়িয়ে দেয় সেটা। কারণ বিশেষ ও-রকম লকেট সাধারণত পরে প্রেমিকা, বাগ্‌দত্তা অথবা স্ত্রীরা। আগের রাতে আমাকে বলেছিল ভেলর, বিয়ে করেনি সে, কোনও বয়ফ্রেণ্ডও নাকি নেই ওর। ঠিক করলাম, যাচাই করব কথাটা।'

'কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'যেদিন রেমিকে কিডন্যাপ করল গুণ্ডারা, সেদিন যখন নিজের রুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ছুট লাগাল ভেলর, দৌড় দিলাম আমিও, ইচ্ছাকৃতভাবে ধাক্কা মারলাম ওকে; পড়ে যাচ্ছিল সে, শার্টের কলার ধরে ওকে তোলার ভান করে একটানে ছিঁড়ে নিলাম চেইনটা। রেমিকে কিডন্যাপ করানোর প্ল্যান তখন ঘুরপাক খাচ্ছে ভেলরের মাথায়, উত্তেজিত ছিল—আসছি সে-কথায়, তাই খেয়াল করেনি ব্যাপারটা।'

'কিন্তু...' ঠিক যেন মেলাতে পারছে না মুরল্যাণ্ড, 'গুণ্ডারা চেক করেছিল তোমাকে। চেইনটা পেল না কেন?'

'লকেটের ভেতরটা একনজর দেখে নিয়েই ফেলে দিয়েছিলাম ওটা জঙ্গলে।'

'ওটা হাতিয়ে নিয়ে লাভ কী হলো তোর?'

'বলছি। একটা ফাঁদ পেতেছিলাম আমি ভেলরের জন্যে, সেটা বলি আগে। ওর প্রাইভেট রুমে যখন ছিলাম, কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলল, "আজ যারা পিছু নিয়েছিল তোমার, তারা কি ওই

বইঘর.কম

মিলিশিয়ার সদস্য?” আমি বললাম, “যদি হয়ে থাকে, তা হলে আমার ওপর গুলি চালানোর একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।” সে বলল, “কী সেটা?” খেয়াল করে দ্যাখ্, ওকে কিন্তু একবারও বলিনি আমি, আমার ওপর গুলি করা হয়েছে নদীতীরে। অথচ সে কথাটা শুনে চমকাল না, কে গুলি করেছে অথবা ক'বার গুলি করেছে তা-ও জানতে চাইল না। জানতে চাইল আমার ওপর গুলি চালানোর উদ্দেশ্য কী ছিল।'

'অর্থাৎ তোমার ওপর যে গুলি চালানো হয়েছে, তা আগেই জানত।'

'হ্যাঁ। এবং সেটা জানতে পারামাত্র আমি বুঝে গেলাম, শিপট্রাক আর ওই দু'জন লোককে পাঠিয়েছিল কে। তারপরের কথা শোনো, আরও মজা পাবে। আমি বললাম, “ভাউযার বোনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার।” ভেলর জানত, ভাউযার কোনও বোন নেই, আমি কার কথা বলছি তা-ও জানত। জানত, ভাউযার বোন না রেমি। তাই কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মন্তব্য করল, “ইন্টারেস্টিং”, কিন্তু আর কিছু বলল না।'

'অতি চালাকের গলায় দড়ি,' বলল সোহেল, 'একজন ডাক্তার, নামপরিচয়হীন কেউ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভর্তি হয়ে আছে তার হাসপাতালে, লোকটার বোনের খবর পাওয়া গেছে জানতে পারলে যা করা উচিত তা না করে...'

'রেমির নাম শুনে আগ্রহ বা কৌতূহলের ছাপ দেখতে পাইনি আমি ভেলরের চেহারায়,' সোহেলকে থামিয়ে দিয়ে বলে চলল রানা। 'বুঝলাম, ভাউযাকে কুমিরের মুখ থেকে উদ্ধার করে ভেলরের হাতে তুলে দিয়েছি, নিজের অজান্তেই করে ফেলেছি মস্ত ভুল। লোকটাকে বাঁচাতে, মানে ওর ওপর থেকে গুণ্ডাদের মনোযোগ সরিয়ে নিজের ওপর নিয়ে আসতে সুতা ছাড়লাম সঙ্গে সঙ্গে। বললাম, “একটু-আধটু ডুব দেব সলোমন সাগরে, জানার চেষ্টা করব ঠিক কী আবিষ্কার করেছিল ভাউযা।” '

'এবং টোপ গিলতে দেরি করেনি নিশ্চয়ই ভেলর?' বলল

মুরল্যাণ্ড।

'না। কারণ জেলেপাড়ায় গিয়ে রেমির কাছ থেকে জানতে পারলাম, নতুন কোনও অ্যাটেম্পট্ নেয়া হয়নি মেয়েটার ওপর। পরে গেলাম এএনযেড ব্যাংকের হেণ্ডারসন ফিল্ড শাখায়। রেমিটেন্স ডেস্কে যে-মেয়ে কাজ করে, খাতির জমালাম তার সঙ্গে। আমার কাছে নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট গোপন করতে চেয়েছিল ভেলর, ব্যাপার কী তা কৌশলে জানতে চাইলাম ওই অফিসারের কাছে। সে বলল, সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগে বেশ কিছুদিন হলো স্থগিত করা হয়েছে অ্যাকাউন্টটা। কীসের সন্দেহজনক লেনদেন? মূলত নিউযিল্যাণ্ডসহ আরও কয়েকটা দেশ থেকে নাকি বিভিন্ন নামে টাকা জমা দেয়া হতো ওই অ্যাকাউন্টে, এবং মোটা অংকের কোনও জমার বিপরীতে কখনওই নাকি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে পারেনি ভেলর।'

'ভেলরই যে দ্য মিউটিনিয়ার্সের ইসাটাবু চীফ, জানলি কীভাবে?'

'পোসেইডনে হামলা করতে গিয়ে রেমিকে জিজ্ঞেস করেছিল হ্যাংলা, "মাসুদ রানা কোথায়?" আমার নাম জানল কী করে সে? মাকিরা-উলাওয়ায় আমার মার খেয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল ওরা, বলেছে ভেলর নিজেই। সন্দেহ থাকল না, আমার নামটা সে-ই বলেছে হ্যাংলাকে।'

'ফেইসবুকের ব্যাপারটা কী?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যাণ্ড।

'ভেলরকে ফাঁসানোর জন্য নিখুঁত একটা ক্লু পাই আমি ফেইসবুকে। অনেকেই ভাবতে পারে, ওর নামের মাঝখানের অংশটা, মানে "পি" বোধহয় ওর বাবার নাম ফিলিপ্স থেকে এসেছে। কিন্তু না, আসলে স্বামীর নামের শেষ অংশটা ব্যবহার করছিল সে—পামার। ...ভেলরের মেডিকেল গ্র্যাজুয়েশনের ছবি দেখেছি সে-রাতে, তার আগে দেখলাম অ্যাডমিরালের পাঠানো পামারের ছবি। মনাশ ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে দাঁড়িয়ে ছিল ভেলর, ভালোমতো দেখলাম ওর সহপাঠী-সহপাঠিনীদের

চেহারাগুলো। তখনই চিনতে পারি পামারকে। সন্দেহ হলো আমার, পরে লোকটার ছবি দেখতে পেলাম লকেটটার ভেতরে, ভেলরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ অবস্থায়।'

বিড়বিড় করে কী যেন বলল মুরল্যাণ্ড।

'রেমিকে কিডন্যাপ করানোর ব্যাপারে উত্তেজিত ছিল ভেলর...কী যেন বলবি বলেছিলি?'

'হ্যাঁ, সেদিন ওর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণটা পেয়ে যাই আমি। ওর রুমে তখন রেমি নেই, "জরুরি নির্দেশ" দিতে ভেলরও গেছে বাইরে। তুললাম ওর ডেস্কফোনটা, কল দিলাম আমার সঙ্গে-থাকা স্যাটেলাইট ফোনে। নম্বরটা, অ্যাডমিরাল আমাকে যে-নম্বর দিয়েছিলেন ঠিক সেটা, কান্ট্রি আর এরিয়া কোডসহ মিলে গেছে হুবহু।'

'শা-লা!'

'তখন মাচেটি হাতে পাঁচ-ছ'টা গুণ্ডা হাজির হলো ভেলরের অফিসরুমের দরজায়। যেখানে ভেলর গিয়েছিল নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, সেখানে কীভাবে ঢুকল লোকগুলো? আমার ধারণা, আমাকে আর রেমিকে হাসপাতালে ঢুকতে দেখেছিল ওর দলের কেউ না কেউ, যেভাবেই হোক যোগাযোগ করেছিল ভেলরের সঙ্গে, ওরা যাতে এত ডামাডোলের মধ্যেও ঢুকতে পারে হাসপাতালে সে-ব্যবস্থা করেছিল ভেলর নিজেই।'

'রেমিকে খুঁজতে প্রথমেই হাজির হয়ে গেল গুণ্ডারা ভেলরের অফিসরুমে?' বলল মুরল্যাণ্ড।

'সে প্রশ্ন তো আমারও। ওখানেই যে থাকার কথা রেমির, জানল কী করে ওরা? তারমানে, ইনফর্মেশনটা দেয়া হয়েছে ওদেরকে, যাতে ঝটপট সেরে ফেলতে পারে কিডন্যাপিং। তাই কালনাগিনীটা যখন পরে আমার পরিচর্যা করার বাহানা করছিল, একটা কথাও বলিনি ওর সঙ্গে।'

সোহেল বলল, 'পাউডারের ক্যানের ভেতর থেকে পাওয়া তোর সেই লেখাটা পড়ামাত্র যোগাযোগ করলাম অ্যাডমিরালের

সঙ্গে। এনসিসি'র মাধ্যমে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রেপ্তার করতে বললাম পামারকে। তোর কথাগুলো আদালতে পামারের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো যেতে পারে।'

'এবার আসল কথা,' বলল মুরল্যাণ্ড, 'গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারলে না কেন তুমি?'

'পারলাম না, কারণ কর্নেল কামাসাকুর তিন নম্বর কবিতাটার নামকরণের অনুবাদে ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু ভুল করেছিলাম।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল সোহেল আর মুরল্যাণ্ড।

'অতি উত্তেজিত অবস্থায় ছিল রিচার্ড তখন, রেমির একটা কাটা আঙুল আমার কাছে পাঠানোর পর আমাকে ছুটে যেতে দেখে ধরেই নিয়েছিল, আর ডান-বাম করব না আমি, ওর কথামতো নাচব। ঠিকই নেচেছি আমি ওর কথা অনুযায়ী, তবে মাঝেমধ্যে নিজের মতো করে একটু এদিকওদিক করে নিয়েছি নাচের মুদ্রা।'

'তুই বলতে চাইছিস, কর্নেল কামাসাকুর তিন নম্বর কবিতাটার নাম "ঝরনা ছাড়িয়ে" ছিল না?'

'না।'

'কী ছিল তা হলে?'

ভুরু কুঁচকে দুই বন্ধুকে দেখল রানা, তারপর বলল, 'এবার শালাযুগল, তোদের খরচে ডিনার খাওয়াবি, নইলে আর একটা কথাও ফাঁস করব না!'

রানার হুমকিতে কাজ হলো: মুরল্যাণ্ড ছুটল তিনজনের জন্যে ডিনারের অর্ডার দিতে। সাতকোর্সের ডিনার। তবে ম্যানেজারকে জানিয়ে রাখল বিলটা পে করবেন মিস্টার মাসুদ রানা।

সাঁইত্রিশ

সগর্জনে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়া জলপ্রপাতের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর রানার দিকে ফিরল সোহেল, বলল, 'তুই শিয়োর?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'কী যেন নাম লোকটার...রাউনু...তুই-ই কিন্তু বলেছিস, যখন কথা বলেছিলি ওর সঙ্গে, কোনও ঝরনার "ঝ"-ও উচ্চারণ করেনি সে।'

'বাজি লাগ্ তা হলে আমার সঙ্গে—ওই ঝরনা আড়াল করে রেখেছে একটা গুহার প্রবেশমুখ।'

তুলোর টুকরোর মতো সাদা আর ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে ভরে আছে সকালের আকাশ, সেদিকে একবার তাকাল সোহেল। 'বাক্সগুলো এখান পর্যন্ত আনানোর পর সরিয়ে ফেলে থাকতে পারে জাপানিরা। ওদের গ্রামে গণহত্যার কথা নিজেই স্বীকার করেছে রাউনু, ওই ঘটনার পর গুপ্তধনের ঠিক কী হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে জানে না কেউই।'

'আজ জানব,' বলল রানা।

'চলো তা হলে,' বলল মুরল্যাণ্ড। সায় দিল সোহেল।

'উঁহুঁ। আমি একা যাব।'

'একা!' আশ্চর্য হয়ে গেছে মুরল্যাণ্ড। 'কেন?'

'কারণ, মনে কর্, গুপ্তধন উদ্ধারের পুরো কৃতিত্বটা নিজেই নিতে চাইছি আমি। কারণটা যা-ই হোক, আমি অনুরোধ করছি: তোরা জবর দোস্ত আমার, জবরদস্তি করিস না...প্লিয।'

‘শালা!’ বলল সোহেল, তবে আর জোরাজুরি করল না।

মুখ বন্ধ রাখল মুরল্যাণ্ড। রানাকে ভালোমতোই চেনে সে।

সময় নষ্ট না করে ছোট্ট পুকুরটার দিকে রওয়ানা হয়ে গেল রানা। ওটা পেরিয়ে জলপ্রপাতের কাছে হাজির হতে দেরি হলো না ওর।

এখানে জলপ্রপাতের শব্দ এত বেশি যে, মনে হচ্ছে কানে তালা লেগে যাচ্ছে। জলস্রোতের একদিকের প্রান্ত ছাড়িয়ে ভেতরে উঁকি দেয়ার চেষ্টা করল রানা। না, ভালোমতো দেখা যাচ্ছে না। সাবধানে একটু সরল, অবিরাম পানির ছিটায় ভিজে প্রায় গোসল হয়ে গেছে ওর। উঁকি দিল আবারও।

হ্যাঁ, মনে হচ্ছে কালো একটা গহ্বর যেন মুখব্যাদান করে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা, “পুকুরের” ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা সোহেল আর মুরল্যাণ্ডকে দেখল। সব ঠিক আছে বোঝানোর জন্য ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিটা উঁচু করল ওদের উদ্দেশে।

তারপর ঢুকে পড়ল “ঝরনার ভেতর”।

গিযবর্ন, নিউযিল্যাণ্ড।

দুরারোগ্য রোগের নামে নাম মিস্টার পার্কিন্সনের, রোগটা তাঁর না থাকার পরও কেঁপে কেঁপে ওঠেন তিনি মাঝেমধ্যে, দোষটা সম্ভবত তাঁর বয়সেরই। মক্কেলদের টাকার কাছে বিক্রি হওয়ার আগে সবসময় যে-কাজ করেন তিনি তা হচ্ছে, মক্কেলদের কাছে পৌঁছাতে একটু সময় নেন। সময়টা কাজে লাগান—নিজস্ব নেটওয়ার্ক আছে তাঁর, সেটা ব্যবহার করে আগেভাগেই জেনে নেন মক্কেলের খবর, অভিযোগকারী সংস্থার অভিযোগের অবস্থা, মামলাটা কোন্ কোর্টে কোন্ বিচারকের কাছে যেতে পারে এবং সে-বিচারকের সঙ্গে তাঁর পূর্বপরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা আছে কি না। যদি থাকে, মক্কেলের কাছে যাওয়ার আগে সেই বিচারকের কাছে যান তিনি; যদি না থাকে তা হলেও যান। কারণ মিস্টার পার্কিন্সন

বিশ্বাস করেন, স্বয়ং ঈশ্বর মুখ ঘুরিয়ে নেন যে-আসামির ওপর থেকে, তাকে জেলের বাইরে বের করে আনাটা পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন খেলা।

নিউযিল্যাণ্ড ক্রাইম কমিশনের হেডকোয়ার্টারে হাজির হয়ে প্রথমেই তিনি খোঁজ করলেন চীফ ইন্সপেক্টর রবিন্সের, পামারের না। একটা কাজে বাইরে গিয়েছিল রবিন্স, ফিরতে একটু দেরি হলো ওর।

'বয়স কত তোমার?' রবিন্সকে জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার পার্কিন্সন।

'আটত্রিশ, স্যর।

'উঁ...আমার অর্ধেক। এই দেশের পেনাল ল' সম্পর্কে কোনও ধারণা আছে?'

'আপনার মতো নেই, স্যর।'

'জেনে খুশি হলাম। আমাদের পেনাল ল' বলছে, গ্রেপ্তার করার বারো ঘণ্টার মধ্যে যদি কোনও নাগরিকের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্র দাখিল করা না হয়, তা হলে সেই গ্রেপ্তার হয়রানির নামান্তর।'

'আনুষ্ঠানিক অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে, স্যর।'

'কপি দেখাও। আর কাউকে বলো আমাকে এক কাপ কফি খাওয়াতে। তোমরা ইয়াং জেনারেশন কি আদবকায়দা ভুলে গেছ?'

অভিযোগপত্রের কপি আর কফি দুটোই একসঙ্গে চলে এল মিস্টার পার্কিন্সনের কাছে। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে কপিটা দেখতে লাগলেন তিনি। এবং তাঁর কফি খাওয়া আর কপি পড়া শেষও হলো একসঙ্গে।

কাপটা নামিয়ে রেখে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, 'মোট তিনটা ভুল করেছ তুমি, রবিন্স। তোমাকে চীফ ইন্সপেক্টর বানাল কে, যাওয়ার আগে তার সঙ্গে কথা বলে যাব আমি।'

'কী হয়েছে, স্যর?' কিছুটা ঘাবড়ে গেছে রবিন্স।

'অভিযোগপত্রের দু'জায়গায় মিস্টার পামারকে আসামি বলেছ তুমি। পেনাল ল' বলছে, মামলা কোর্টে যাওয়ার আগপর্যন্ত কাউকে আসামি বলে সম্বোধন করতে পারো না তুমি। গতকাল রাতে কী অবস্থায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে মিস্টার পামারকে, ছোট করে হলেও সে-বিবরণ দিয়েছ। এটা করতে পারো না তুমি, কারণ এটা নাগরিক অধিকারের লঙ্ঘন। যে-অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়েছেন মিস্টার পামার, তা সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার; এবং তুমিও ভালোমতো জানো, সেটার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই তোমার অভিযোগের। তিন, মিস্টার পামারকে তাঁর ব্যক্তিগত ইয়ট থেকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে কোস্টগার্ডের সাহায্য নিয়েছ তুমি, যা সিভিল অর্ডিন্যান্স অ্যাক্ট উনিশ শ' বিরাশি'র সেকশন দুই সাব সেকশন ফোরের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। তোমার উচিত ছিল হয় নৌপুলিশের সাহায্য নেয়া নয়তো মিস্টার পামারের ইয়টটা বন্দরে ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা।'

চুপ করে আছে রবিন্স, জবাব খুঁজে পাচ্ছে না।

'তোমার অভিযোগপত্র ত্রুটিপূর্ণ, বাছা।'

'কিন্তু আমার অভিযোগ ত্রুটিপূর্ণ না।'

উঠে দাঁড়ালেন মিস্টার পার্কিন্সন। 'কথা হবে আদালতে। ...মিস্টার পামারকে কোথায় রেখেছ?'

গুহামুখটা চওড়ায় পাঁচ ফুটের বেশি হবে না।

ভেতরটা বদ্ধ, জলপ্রপাতের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে বেড়ে যাচ্ছে অনেকগুণ; কানের পর্দা ফাটার মতো অবস্থা হয়েছে রানার। ওয়াটারপ্রুফ ব্যাকপ্যাকের চেইন খুলে নতুনকেনা একটা শক্তিশালী লেড-ফ্ল্যাশলাইট বের করল ও, জ্বালাল। ঢুকতে শুরু করল আরও ভেতরে।

কিছুদূর যাওয়ার পরই চওড়া হয়ে গেল প্রবেশমুখটা। রানা খেয়াল করল, একটু একটু করে ওপরের দিকে উঠছে ও। দু'পাশের দেয়াল কেমন যেন চকচকে; ফ্ল্যাশলাইটের আলো পড়ে

বইঘর.কম

মনে হচ্ছে পিছলে পিছলে যাচ্ছে।

শুধু ডানে-বাঁয়েই না, থেকে থেকে মেঝের দিকেও তাকাচ্ছে রানা; এবং সেজন্যই, একদিকের দেয়ালের ছোট্ট একটা ফাটল থেকে আরেকদিকের দেয়ালের প্রায় একই সমান ফাটল পর্যন্ত মেঝের ঠিক দু'ইঞ্চি ওপর দিয়ে টেনে রাখা সরু তারটা নজর এড়াল না ওর।

বুবি ট্র্যাপ।

গিযবর্ন, নিউযিল্যাণ্ড।

স্টিলের একটা চেয়ারে বসে ছিল পামার, মিস্টার পার্কিন্সনকে দেখে উঠে দাঁড়াল। হাত মেলাল খ্যাতনামা উকিলের সঙ্গে, ওর মুখোমুখি আরেকটা স্টিলের চেয়ার দেখিয়ে দিল হাতের ইশারায়। সঙ্গে করে আনা ব্রিফকেসটা নিজের পাশে, মেঝেতে নামিয়ে রেখে বসে পড়লেন মিস্টার পার্কিন্সন।

'কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না আমি,' বলল পামার।

নাকের ওপর নেমে-আসা গোলাকার স্টীলরিমড চশমাটা ঠেলে ওপরের দিকে তুলে দিলেন মিস্টার পার্কিন্সন। 'এই পৃথিবীতে সবচেয়ে বোকা কারা, জানেন?'

জবাব দিল না পামার।

'যারা ডাক্তারের কাছে অসুখ আর উকিলের কাছে অপরাধের কথা গোপন করে, তারা।'

এবারও কিছু বলল না পামার, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মিস্টার পার্কিন্সনের দিকে।

'আলোচনার শুরুতেই আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন। এনসিসি'র কাছে কোনওকিছু স্বীকার করেননি তো আপনি?'

'না, করিনি।'

'শিয়োর?'

'হ্যাঁ।'

'ওরা এখন পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেনি আপনাকে?'

'আমি বলেছি আমার উকিলের অনুপস্থিতিতে একটা কথাও বলব না।'

'ভালো। কাজের কথায় আসি। এয়ারটাইট কী, বোঝেন?'

'বুঝি।'

'সে-রকম একটা অবস্থায় পড়ে গেছেন আপনি। এনসিসি হুট করে তুলে নিয়ে আসে না কাউকে। দিনের পর দিন ওরা পর্যবেক্ষণ করেছে আপনার গতিবিধি, তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করেছে, তারপরই হাতকড়া পরিয়েছে আপনার হাতে। এখন কথা হচ্ছে, কোন্‌টা চান আপনি—মৃত্যুদণ্ড, আজীবন কারাদণ্ড, নাকি বেকসুর খালাস?'

'অবশ্যই বেকসুর খালাস।'

'তা হলে আমি যা চাই, ঠিক তা-ই দিতে হবে আমাকে।'

'কী চান আপনি?'

'এক জায়গায় একটা গোপন সিন্দুক আছে আপনার, সেখানে আছে কিছু সোনা—বাজারদর অনুযায়ী যার মূল্য তিন মিলিয়নের মতো।'

'কী!' লাফিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে পামারের। 'আপনি জানলেন কী করে?'

শেষমুহূর্তে ব্রেক কষতে পারল রানা, পড়ে যেতে গিয়েও সামলে নিল নিজেকে। সরে এল দু'কদম। ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল ট্র্যাপটার ওপর।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, সাধারণ মানের পাতলা দড়ি ব্যবহার করা হয়েছে ফাঁদটা তৈরি করার জন্য। কাজটা কাদের, অনুমান করতে কষ্ট হয় না। এত বছর পরও ফাঁদটা কার্যকর আছে কি না, সন্দেহ জাগল রানার। ওর মনে হচ্ছে দড়িটা কেটে ফেললে কোনও সমস্যা হবে না।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ও দড়ির কাছে, আলো ফেলে দড়ির এমাথা থেকে শুরু করে ওমাথা পর্যন্ত দেখল আরও একবার।

বইঘর.কম

ফ্ল্যাশলাইট নামিয়ে রাখল, বের করল নতুন কেনা পকেট নাইফটা। ওটার সাহায্যে দু'টুকরো করে ফেলল দড়িটা।

চুপ করে বসে আছে রানা, কিছু ঘটে কি না দেখছে।

না, কিছু হচ্ছে না।

কোথাও কোনও শব্দ নেই, কোনও বিস্ফোরণের আওয়াজ নেই, কিছু ধেয়েও আসছে না রানার দিকে।

চেপে রাখা দম আস্তে করে ছাড়ল ও।

বোঝা যাচ্ছে, ঠিক পথেই আছে, কারণ যদি তা না হতো, বুবি ট্র্যাপের প্রয়োজন থাকত না। আবার এগোতে শুরু করল, তবে গতি খুব ধীর। বার বার আলো ফেলছে এখানে-সেখানে, বিশেষ করে মেঝের প্রতিটা ইঞ্চি দেখে নিচ্ছে।

গজ ত্রিশেক এগোনোর পর হঠাৎ করেই থমকে দাঁড়িয়ে গেল রানা।

গুহা যথেষ্ট চওড়া হয়েছে এখানে; একটা পাহাড়ি দেয়াল মাঝখানে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে আরেকটা গুহামুখ উন্মুক্ত করে দিয়েছে সামনে, ফাটলটার দিকে তাকানোমাত্র বোঝা গেল খিলানের মতো বানানোর চেষ্টা করা হয়েছিল ওটাকে কোনও একসময়, যদিও বিফলে গেছে চেষ্টাটা, কারণ ওই কাজে অনভিজ্ঞ জাপানি সৈনিকদের হাতের ছোঁয়ায় যে-আকৃতি পেয়েছে ওটা তা খিলানের ধারেকাছেও যায়নি।

ওটার কাছে হাজির হলো রানা পায়ে পায়ে।

সেখানে দাঁড়িয়ে ভেতরের গুহায় আলো ফেলল ও।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বড় একটা সোনার নৌকায় থরে থরে সাজানো আছে অনেকগুলো কাঠের বাক্স। ধুলোয় মাখামাখি অবস্থা সবগুলো বাক্সের, এবং প্রায় সবগুলোর কাঠই পচে গেছে।

সোনার নৌকাটার কথা একবারও বলেনি রাউনু, জাপানিরা ওটা কীভাবে বহন করে অথবা করিয়ে এ-পর্যন্ত এনেছিল তা-ও বলে যায়নি, সেটার উল্লেখ ছিল "মাই ইসাটাবু ডেইয" বইয়ে।

'জীবন একটা গুহার মতো,' দ্বিতীয় গুহায় পা দিয়ে বিড়বিড়

করে বলতে শুরু করল রানা, 'যখন সেখানে ঢোকো তুমি, তখন আসলে জন্ম হয় তোমার। সেই গুহার দু'দিকের দেয়ালের নাম নিয়তি, মাটির মেঝের নাম ভাগ্য, আর তোমার এগিয়ে চলার নাম প্রচেষ্টা। গুহাটার শেষপ্রান্তে আরেকটা ফোকর আছে, নাম মৃত্যু। তুমি যতই...' থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল আরেকবার।

বাক্সগুলো মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিল ওর; খেয়ালই ছিল না, এ-গুহার মেঝেতেও আরেকটা বুবি ট্র্যাপ থাকতে পারে।

ডান পা'র জিন্সের কাছে মৃদু একটা টান যখন অনুভব করল, দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে।

একটা ঠোঁট অনেকটা যন্ত্রচালিতের মতো বেঁকে গেল মিস্টার পার্কিন্সনের, চশমাটা ওপরের দিকে আরেকবার ঠেলে দিয়ে বললেন, 'নেটওয়ার্ক, মিস্টার পামার। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যখন কাজ শুরু করি একজন উকিলের অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে, তখনই টের পাই, এ-পেশায় টাকা আর নাম কামাতে হলে নেটওয়ার্কের কোনও বিকল্প নেই। মিস জেসিকা...সেটাই নাম বোধহয় মেয়েটার...আমার তারবিহীন নেটওয়ার্কের দু'-তিনজন প্রতিনিধি কথা বলেছে ওর সঙ্গে, ফলে আপনার ব্যাপারে এমন কিছু তথ্য জেনেছি আমি যা আমাকে আর্থিকভাবে লাভবান করতে পারে।'

'কিন্তু...কিন্তু...' কথা খুঁজে পাচ্ছে না যেন পামার, 'এটা করতে পারেন না আপনি। এটা স্রেফ ডাকাতি।

চেহারা গম্ভীর হলো মিস্টার পার্কিন্সনের। 'আজ পর্যন্ত আমার কোনও মক্কেল এত খারাপ কথা বলেনি আমাকে। এবং আজ পর্যন্ত আমার কোনও মক্কেলের অবস্থা আপনার মতো এতটা খারাপও ছিল না।' ব্রিফকেসটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। দরজার দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছেন, এমন সময় প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল পামার।

'বসুন, প্লিয। আমি তো বলিনি আপনাকে সহযোগিতা করব

বইঘর.কম

না? প্লিয চলে যাবেন না।' সিন্দুকটা কোথায় আছে তা বলে দিল পামার মিস্টার পার্কিন্সনকে, কম্বিনেশনটাও বলল। 'এবার বলুন, কত জলদি জামিনের ব্যবস্থা করতে পারবেন আমার?'

'জামিন হবে না আপনার।'

'মানে?'

'অভিযোগপত্রটা শুরু থেকে শেষপর্যন্ত পড়েছি আমি। আপনার জামিন হবে না।'

'তা হলে?'

'বেকসুর খালাস পাওয়ার আগপর্যন্ত সাময়িক জেলজীবন উপভোগ করতে থাকুন।'

গুড়গুড় শব্দ হলো একটা, মনে হলো খসে পড়ছে ভারী কিছু একটা।

সামনের দিকে ডাইভ দিল রানা।

তখনও মাটি স্পর্শ করেনি ওর শরীর, টের পেল, ভারী কিছু একটা ছুটে গেল ওর কোমরের এক ইঞ্চি দূর দিয়ে। এবং, কিছুদূর যাওয়ার পর, সম্ভবত বহু পুরনো দড়িতে টান লাগল সজোরে, ছিঁড়ে গেল দড়ি, ভোঁতা কিন্তু প্রচণ্ড শব্দ তুলে গুহার মেঝেতে আছড়ে পড়ল কিছু একটা।

মাটিতে পড়ে কয়েকবার গড়ান খেল রানা, সরে যেতে চাইছে নিরাপদ দূরত্বে। সোনার নৌকাটার কাছে গিয়ে থামল, একহাতে ভর দিয়ে উঠে বসল একটুখানি, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে রুমাল বের করে নাকমুখ চাপা দিতে হলো ওকে—ঘন ধুলোয় আঁধার হয়ে গেছে গুহার এদিকটা। চোখ বন্ধ করে ফেলল ও, বসল আরও ভালোমতো, মিনিট পাঁচেক সময় দিল নিজেকে। তারপর, উড়ন্ত ধুলো যখন থিতিয়ে এসেছে, নাকমুখ থেকে সরাল রুমাল, ফ্ল্যাশলাইটটা টেনে নিল নিজের কাছে। কী ছুটে গেছে ওর কোমর ছুঁয়ে, দেখার জন্য আলো ফেলল সেদিকে।

বিশেষ কায়দায় চেঁছে চোখা করা একটা গাছের গুঁড়ি, যেন বিরাটকায় কোনও পেন্সিল।

রানা যদি ডাইভ না দিত, অথবা যদি সরে যেতে দেরি করত, ভারী কাণ্ডটার চোখা প্রান্তটা আঘাত করত ওর বুকে বা...

আর ভাবতে চাইল না রানা। উঠে বসল আস্তে আস্তে। বাক্সগুলোর ওপর আলো ফেলল আবার।

নৌকাটার ওপর যে-ক'টা বাক্স পেরেছে রেখেছে বা রাখিয়েছে জাপানিরা, বাকিগুলো রাখা হয়েছে ওগুলোর পেছনে; সবমিলিয়ে, একনজরে অনুমান করল রানা, পঞ্চাশটার মতো হবে। প্রায় সমান মাপের প্রতিটা বাক্স—চার ফুট বাই তিন ফুট। রানা খেয়াল করল, এই গুহার প্রায় মাঝখানে রাখা হয়েছে কর্নেল কামাসাকুর তথাকথিত "সম্পদ"।

'এসো,' আবারও বিড়বিড় করে বলল রানা, 'তোমার জন্য সাজিয়েছি আমি আদিম বাসর; মাটির ঘরে, মাটির বিছানায়; একত্রিত করেছি আমার যৌবনসম্পদ—তোমাকে প্রেম দেব বলে।' হামাগুড়ি দিয়ে একটুখানি এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল একটা বাক্সের সামনে, হাত দিয়ে ঝেড়ে সাফ করল ওটার গায়ে জমে-থাকা ঝুরঝুরে মাটি, ধুকপুক করতে থাকা বুকের উত্তেজনা চেপে রেখে বার বার আলো ফেলে ভালোমতো দেখল বাক্সটা। বিশ্বাস নেই কর্নেল কামাসাকুকে—"আদিম বাসরে" অনুপ্রবেশকারীকে ভর্তা বানানোর জন্য দড়ি দিয়ে গাছের গুঁড়ির বুবি ট্র্যাপ বসিয়ে রাখতে পারে যে-লোক, নিজের অবর্তমানে নিজের "যৌবনসম্পদ" যাতে বেহাত না হয় সেজন্য কোনও বাক্সের ভেতরে বোমা ফিট করে রাখতেও পারে সে, যদিও এত বছর পরে সে বোমার কার্যকারিতা আছে কি না সন্দেহ।

কিন্তু রানা যে-বাক্সটা দেখছে, সেটাতে সে-রকম বিশেষ কোনও তারের উপস্থিতি দেখা গেল না।

ব্যাকপ্যাকটা কাঁধ থেকে খসাল ও, নামিয়ে রাখল মেঝেতে। চেইন খুলে ভেতর থেকে বের করল ছোট একটা

ক্রোবার—পেরেক দিয়ে আটকে-রাখা ঢাকনা খুলে ফেলার ইচ্ছা আছে ওর। কোমরের খাপ থেকে আলগা করল হান্টিং নাইফ। ও-দুটো নিয়ে কাজে লেগে গেল।

বাক্সের একদিকের দুটো পেরেক আলগা করতে পেরেছে, এমন সময় ফটাস্ করে আওয়াজ হলো একটা—ভেঙে নিচের দিকে দেবে গেছে সেদিকের পচা কাঠ। আর চেষ্টা করে লাভ নেই বুঝে নিবৃত্ত হলো রানা, ক্রোবারের এক বাড়িতে ভাঙা অংশটা পুরোপুরি ভেঙে ঢুকিয়ে দিল ভেতরে।

প্রায় নয় ইঞ্চি বাই ছয় ইঞ্চি মাপের গর্তটা দিয়ে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল ভেতরে, ঘাড় বাঁকিয়ে তাকাল সেখান দিয়ে।

'আশা করি প্রাথমিক আলোচনা সেরে নিতে পেরেছেন আপনারা,' প্রিযন সেলের দরজায় উদয় হয়েছে রবিন্স, সেটা খুলে ঢুকছে ভেতরে।

'তোমার দেখছি সাংঘাতিক তাড়া,' বললেন মিস্টার পার্কিন্সন, 'প্রমোশন ডিউ নাকি? কাজ দেখিয়ে খুশি করতে চাচ্ছ বড়কর্তাদের?'

'কাজের সঙ্গে প্রমোশনের যোগসূত্র খুঁজে বের করিনি আমি কখনও,' বলল রবিন্স। 'মিস্টার পামার, উকিল পেয়ে গেছেন, তাঁর উপস্থিতিতে এনসিসি'র জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হবে এখন আপনাকে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পরেই কোর্টে হাজির করা হবে আপনাকে, আশা করি আপনার জামিন পাওয়া অথবা না পাওয়ার ব্যাপারটা দেখবেন মিস্টার পার্কিন্সন।'

উঠে দাঁড়াল পামার, তাকাল মিস্টার পার্কিন্সনের দু'চোখে, নিঃশব্দ আশ্বাস দেখতে চাইল সেখানে।

দেখতে পেল কি না কে জানে, বলল, 'চলুন।'

স্বর্ণ।

ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় নিজেদের স্বাভাবিক দ্যুতি যেন কিছুটা

হলেও ফিরে পেয়েছে রাজা শামানের গুপ্তধন।

ছোট-মাঝারি-বড়, গোলাকার-আয়তাকার, হরেক প্রাণীর মূর্তি, মানুষের মূর্তি, মন্দির...মোদ্দাকথা, যতরকমভাবে উপঢৌকন দেয়া সম্ভব ছিল রাজা শামানকে, তাঁকে খুশি করার জন্য তা-ই করা হয়েছে। এবং শুধু স্বর্ণই না, সেগুলোর ফাঁকে ফাঁকে হীরা আর রত্নপাথরের উপস্থিতিও দেখা যাচ্ছে। বোঝা গেল, এগুলো যখন বাক্সবন্দি করছিল জাপানিরা, খুব তাড়াহুড়ো ছিল ওদের, কোন্‌টার সঙ্গে কোন্‌টা রাখছে তা দেখার হুঁশও ছিল না সম্ভবত।

এখনও ধুকপুক করছে রানার বুকের ভেতর, ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছা করছে অদ্ভুত দ্যুতি বিকিরণ করা স্বর্ণখণ্ডগুলোকে। ফ্ল্যাশলাইটটা বাঁ হাতে ধরে রেখে ডান হাতটা ঢুকিয়ে দিল ও ভাঙা অংশটা দিয়ে।

আজব একটা ঘটনা ঘটল তখন।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পুরো ইসাটাবু।

বাক্সটার গায়ে হেলান দিয়ে ছিল রানা, জমে গেল ওই অবস্থাতেই।

গুহার ছাদ থেকে খসে খসে পড়ছে ঝুরঝুরে মাটি আর আলগা পাথরকণা। কয়েক সেকেণ্ড স্থায়ী ভূমিকম্পটা থেমে গেছে, কিন্তু কোথায় যেন গুমগুম আওয়াজ হচ্ছে একটা, অস্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছে রানা। মাটি দিয়ে বানানো কোনও তৈজস যদি ভেঙে যায়, তা হলে যে-রকম শব্দ হবে, সে-রকম একটা শব্দ শোনা গেল; সেটার উৎসের দিকে জ্বলন্ত ফ্ল্যাশলাইটটা তাক করল রানা।

আরেকবার জমে যেতে হলো ওকে।

অন্ধকারের কালো চাদরে ঢাকা ছিল গুহার ওদিকটা, ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় সেই চাদরের পুরুত্ব আরও বাড়ল যেন; তারপরও দেখা যাচ্ছে, আস্তে আস্তে চিড় ধরে যাচ্ছে সেখানকার মাটিতে, অবিশ্বাস্যভাবে ফাটলটা এগিয়ে যাচ্ছে গুহার শেষপ্রান্তের দেয়ালের দিকে। ঠিক তখন আফটার শক টের পেল রানা, এটাও আগেরটার মতোই মাঝারি মানের।

আবারও কিছু আলগা মাটি আর পাথরকণা খসে পড়ল ছাদ থেকে, এবং তারপর...

তারপরের ঘটনাটা ঘটতে দেখে রানার মনে হলো, কোনও সিনেমাহলে আছে সে, রুপালি পর্দায় দেখছে ইণ্ডিয়ানা জোন্সের দুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চার মুভি।

প্রায় বারো ফুট উঁচু এবং সমান চওড়া একটা বোল্ডার খসে পড়ল দেয়ালের গা থেকে সদ্যসৃষ্ট ভূমিরন্ধ্রে। বোঝা গেল, এতদিন, যে-কোনও পদ্ধতিতেই হোক, আলগা ওই বিশাল পাথরখণ্ডটা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল দেয়ালের সঙ্গে, গুপ্তধনের গুহার সঙ্গে উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া একটা প্যাসেজের সীমানাপ্রাচীর গড়ে তুলেছিল ওটা।

রানার দিকে মুখ হাঁ করে আছে অন্ধকার একটা প্যাসেজ।

সেটার ভেতর দিয়ে একঝলক মৃদু বাতাস প্রবাহিত হয়ে এসে লাগল রানার গায়ে, প্রলম্বিত শিসের মতো অদ্ভুত আর নিচু একটা শব্দ শুনতে পেল ও।

ঠায় দাঁড়িয়ে আছে রানা, যেন ভুলে গেছে রাজা শামানের গুপ্তধনের কথা। যতবার বাতাস বইছে প্যাসেজটার ভেতর থেকে, আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে ততবার। রানার মনে হলো, কেউ অথবা কিছু একটা ডাকছে ওকে, 'আয়...আয়...আয়!'

ও জানে না কখন সোজা হয়ে দাঁড়াল, জানে না কোন্ অমোঘ আকর্ষণে গিয়ে দাঁড়াল মেঝের ফাটলটার কাছে, ফুট চারেক গভীর গর্তে নেমে পড়ল কখন তা-ও বলতে পারবে না। রাজা শামানের গুপ্তধনের আকর্ষণ বিদায় নিয়েছে ওর ভেতর থেকে; বার বার মনে হচ্ছে ওর, ওই গুপ্তধনের চেয়েও অভিনব কিছু একটা আছে নিজেকে-উন্মুক্ত-করে-দেয়া প্যাসেজটার শেষমাথায়।

ওটার ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা।

ভূমিকম্প টের পাওয়ামাত্র পুকুরটার দিকে ছুট লাগিয়েছিল সোহেল আর মুরল্যাণ্ড, রানার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকছে

দু'জনই। পানিতে কোমর পর্যন্ত নেমেছে কি নামেনি, আফটার শকটা বেকায়দায় ফেলে দিল ওদেরকে। আলগা কিছু পাথর সরে গেল পুকুরের তলা থেকে, বেরিয়ে পড়ল চোরাকাদা, আর তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ওরকম একজায়গায় পা দিয়ে ফেলল মুরল্যাণ্ড। ব্যাপারটা টের পাওয়ামাত্র আরও তাড়াহুড়ো করতে গেল সে, ফল হলো আরও খারাপ। দ্বিতীয় পা-টাও ঢুকে গেল আরেকটা চোরাকাদার গর্তে; যে-জায়গায় কোমরপানিতে দাঁড়িয়ে থাকা যায় অনায়াসে, সেখানে গলা পর্যন্ত ডুবে গেল ওর, খাবি খেতে শুরু করল বেচারা।

'রানা!' আবারও গলা ফাটাল সোহেল, পানি ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে জলপ্রপাতের দিকে।

'সোহেল!' সাহায্যের আশায় ডেকে উঠল মুরল্যাণ্ড।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সোহেল।

'কুইক স্যাণ্ড!' আবারও চেঁচাল মুরল্যাণ্ড। 'চোরাকাদায় পড়ে গেছি আমি! বাঁচাও!'

সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল সোহেল, ওর অবস্থা হয়েছে "শ্যাম রাখি না কুল রাখি"-র মতো। যদি রানাকে বাঁচাতে যায়, ডুবে মরবে মুরল্যাণ্ড। আর যদি মুরল্যাণ্ডকে বাঁচানোর চেষ্টা করে তা হলে হয়তো...

ঘুরল সোহেল, মুরল্যাণ্ডের দিকে এগোচ্ছে।

রানাকে চেনে ও।

নিজেকে কীভাবে রক্ষা করতে হয়, জানে এমআর নাইন।

প্রথমে ফাঁপা একটা শাফ্‌ট ছাড়া আর কিছু মনে হলো না প্যাসেজটাকে, শেষমাথায় জমাট অন্ধকার। ডানে-বাঁয়ের দেয়ালে আলো ফেলে ফেলে এগোচ্ছে রানা। ধূসর একটা আভার বিকিরণ হচ্ছে দু'দিকের দেয়াল থেকেই, মনে হচ্ছে কোনও এক কালে কেউ রঙ করেছিল ওখানে। এগোনোর গতি ধীর করল রানা, আলো ফেলল সামনে। ভেবেছিল, অন্ধকার আরও জেঁকে বসবে,

কিন্তু কিছুটা আশ্চর্য হয়ে দেখল, চকচকে কিছু একটায় প্রতিফলিত হয়ে ওর দিকে কিছুটা ফিরে আসছে আলোকরশ্মি, বাকিটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে।

এগোনোর গতি আপনাআপনি আরও ধীর হলো রানার। এখন যেখানে আছে ও, সেখানকার ছাদ নিচু হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। দু'দিকের দেয়ালে, নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকা বিচিত্র কিছু নকশা নিঃশব্দে বলে দিচ্ছে, কোনও একসময় মানুষের পা পড়েছিল এখানে। নকশা বানানোর কাজে চকচকে কিছু ব্যবহার করা হয়েছে দেয়ালগুলোতে, আলো পড়লেই প্রতিফলিত হচ্ছে। যত এগোচ্ছে রানা, প্রতিফলন বাড়ছে তত। কৌতূহল বোধ করল রানা, এগিয়ে গেল একদিকের দেয়ালের কাছে।

তরল সোনার সঙ্গে বিশেষ কোনও কায়দায় স্ফটিক মিলিয়ে পাতলা পাতের মতো বানিয়ে নকশা করা হয়েছে দেয়ালের জায়গায় জায়গায়; কোথাও দেখা যাচ্ছে সোনার ফুটকি, কোথাও বসিয়ে দেয়া হয়েছে ছোট-বড় সোনার তাল। সেখান থেকে মুখ ঘুরিয়ে আরও কয়েক কদম সামনে যাওয়ামাত্র আরও একবার থমকাতে হলো ওকে।

বড়, না, বড় বললে কম বলা হয়, বরং বলা উচিত বিশাল একটা স্ফটিকের বেঞ্চ রাখা হয়েছে মেঝের মাঝামাঝি জায়গায়। বেঞ্চটার ওপর দেখা যাচ্ছে এক শ'টার মতো মমিকরা মৃতদেহ। চেয়ারের যে-রকম পিঠ থাকে, অনেকটা সে-রকম অতি-অলঙ্কৃত, রত্নখচিত ব্যাকরেস্টের ওপর ভর দিয়ে আছে প্রতিটা দেহ; সবগুলো লাশ যেন তাকিয়ে আছে রানারই দিকে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে লিনিন দিয়ে পেঁচিয়ে রাখা হয়েছে মমিগুলো। খুলিগুলো নগ্ন, কিছুটা ঝুঁকে আছে সামনের দিকে। দেখলে মনে হয়, অত্যাশ্চর্য কোনও কারণে একসঙ্গে মারা গেছে ওদের সবাই, এবং একসঙ্গে মমি বানানো হয়েছে ওদের সবাইকে।

পায়ে পায়ে আরও কিছুটা এগোনোর পর রানার মনে হলো, মমিগুলো ওর দিকে না, আসলে তাকিয়ে আছে মেঝের ওপর

রাখা বিশাল এক খোলা সিন্দুকের দিকে। ওটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা, আলো ফেলে তাকাল নিচে।

ভেতরে মমিকরা একটা দম্পতি—পাশাপাশি শুয়ে আছে।

‘খোদা!’ বলে ফেলল রানা।

পুরুষটা দৈর্ঘ্যে সাড়ে আট ফুটের কম হবে না। মহিলাটাও সাড়ে সাত ফুটের কাছাকাছি। দু’জনের পরনেই পূর্ণাঙ্গ পোশাক। চামড়া দিয়ে বানানো আলখাল্লার মতো কিছু একটা পরেছে পুরুষলোকটা, বেশকিছু লোম দেখা যাচ্ছে পোশাকটার কাঁধে আর হাতায়। ভেতরে দেখা যাচ্ছে অনেকটা ট্রাউজারের মতো পশমি কোনও কাপড়। চুল লাল, দাড়ি বড় বড়, গোঁফের দুই প্রান্ত বাঁকানো। মহিলার পোশাক আর স্কার্ফ এখনও গাঢ় নীল, মাথায় রত্নখচিত মুকুট। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা বিশালকায় ফেল্ট বুট পা ঢেকে রেখেছে দু’জনেরই।

বিশাল কোনও তরবারি বা বর্শার খোঁজে সিন্দুকটার ভেতরে উঁকিঝুঁকি দিল রানা ভালোমতো, কিন্তু সে-রকম কিছু দেখতে পেল না।

বসে-থাকা ওই মমিগুলো আর শুয়ে-থাকা দুই মমির বয়স আড়াই-তিন হাজার বছরের কম হবে না, অনুমান করল ও। ‘দৈত্যদেবতা!’ বলল আবার। ‘তারমানে ইসাটাবুর প্রাচীন মিথ...’

‘সত্যি,’ পেছন থেকে বলল কেউ।

ভীষণ চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা, ফ্ল্যাশলাইটটা আরেকটা হলে ছুটে গিয়েছিল ওর হাত থেকে।

সোহেল বলেছে কথাটা। চোরাকাদা থেকে মুরল্যাণ্ডকে উদ্ধার করেই সঙ্গে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসেছে।

ফ্ল্যাশলাইটের আলো নাচিয়ে বসে-থাকা মমিগুলো দেখাল রানা। ‘ওরা আসলেই পূজা করত সিন্দুকের ভেতরে থাকা মানবাকৃতির এই দৈত্যগুলোকে। আমার মনে হয় বিশাল শারীরিক গঠনের কারণেই স্বাভাবিক মানুষদের কাছে দেবদেবী ছিল ওরা। ...দৈত্যটা আর ওর সঙ্গিনীর চেহারা খেয়াল কর্। পাতলা ঠোঁট,

সরু নাক। ওদের দু'জনের চুল আর লোকটার দাড়িও প্রায় অক্ষত আছে।'

'এমনকী গালে আঁকা উল্কিগুলোও,' বলল মুরল্যাণ্ড। 'অবিশ্বাস্য!'

'প্রশ্ন হচ্ছে,' বলল সোহেল, 'হাজার হাজার বছর আগে, সলোমন দ্বীপপুঞ্জের মতো অখ্যাত জায়গায় কেন ও কীভাবে হাজির হয়েছিল ওরা?'

'সে-রহস্যের সমাধান করার দায়িত্ব নৃতত্ত্ববিদদের ওপর ছেড়ে দিতে হবে আমাদের,' বলল রানা।

বসে-থাকা মমিগুলোর ওপর এবার আলো ফেলল সোহেল, 'ওগুলোর বেশিরভাগই মেয়ে। কী চমৎকার পোশাক পরেছে ওরা! রত্নপাথর, চুনি, পান্না ঝিকমিক করছে একেকজনের গায়ে। এই দ্বীপে তখন হীরাজহরতের ছড়াছড়ি ছিল বোধহয়।'

'এবং তখন হীরাজহরতের মূল্য এখনকার মত ছিল না।'

বসে-থাকা মমি আর শুয়ে-থাকা মমিগুলোর ওপর আরও একবার আলো ফেলল রানা। বলল, 'হাজার বছরের মধ্যে আমরাই বোধহয় প্রথম দেখছি এদেরকে। এমন এক সভ্যতা খুঁজে পেয়েছি আমরা ইসাটাবুতে, যার অস্তিত্ব নিয়ে কখনও কিছু কল্পনাও করেননি ইতিহাসবিদ অথবা নৃতত্ত্ববিদেরা।'

মাথা ঝাঁকাল সোহেল। অবাক দৃষ্টিতে দেখছে চারপাশ।

'এবার একটা কথার উত্তর দে, দোস্ত,' বলল সোহেল। 'আমাদের বাইরে রেখে তুই একা ঢুকলি কেন এখানে?'

'আমার ধারণা: রাজা শামানের গুপ্তধন অভিশপ্ত।' উত্তর দিল রানা। 'যাতে তোদের ওপর...'

'মানে?' মারমুখি হয়ে উঠল মুরল্যাণ্ড, 'আমরা যেন তার কবলে না পড়ি? ইসাটাবুর অভিশাপ যদি সত্য হয়, সেটা যেন তোমার নিজের ওপরই পড়ে?'

চুপ করে থাকল রানা।

'তুই হঠাৎ এমন কুসংস্কারে প্রভাবিত হয়ে পড়লি যে?'

‘কারণটা নিজেও ঠিকমতো জানি না আমি। তবে যা বলছি, সেটা যে ঠিক, তা জানি।’

‘মানে?’ তাজ্জব হয়ে গেল সোহেল ও মুরল্যাণ্ড।

‘এখানে আসার পর থেকে একের পর এক অনেকগুলো মৃত্যু দেখে কেমন একটা ভয় ঢুকে গেছে মনের মধ্যে,’ বলল রানা।

‘অর্থাৎ ওটা ছিল প্রাণের বন্ধুদের বাঁচাবার প্রয়াস? ব্যাটা বদমাইশ! খালি তুই-ই পারিস, আমরা মরতে পারি না? অভিশাপের গপ্ শোনাতে এসেছে...’

‘রাগ করিস না, দোস্ত। ভেবে দেখ, এই গুপ্তধনের সন্ধান সবার আগে পায় হারুকিচি হায়াকুটাকি, সলিলসমাধি হয় লোকটার। একই গুপ্তধনের লোভে পড়ে তাঁর ভাই কর্নেল কামাসাকু আত্মহত্যা করেন। ইসাটাবুতে আমেরিকানদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নিতে হয় জাপানিদের। প্রায় ছয় যুগ পরে, একই গুপ্তধনের পিছে লেগে, একটা পা হারায় জেকব ভাউযা। একটা আঙুল কাটা গেছে লোকটার বাগ্দত্তা রেমির, চিরদিনের জন্য উধাও হয়ে গেছে মেয়েটার ভাই ইটে। সলোমন সাগর গিলে খেয়েছে পোসেইডনের ক্যাপ্টেন রাল্ফ্ কটন আর ডুবুরি হেক্টরকে। গাড়িচাপায় মারা পড়েছে টনি। বাজ পড়েছে রিচার্ডের ওপর, মারা পড়েছে ফুগুই। দলের সদস্যদের কেউ আহত হয়েছে কেউ নিহত হয়েছে, শেষপর্যন্ত ভেঙেই গেছে দলটা। নিজের ফাঁদে আটকা পড়ে মরেছে ভেলরও।’

‘কিন্তু তুই ব্যাটা তো বেঁচে আছিস এখনও? নাকি মরে গেছিস? তোর কিছু হলো না কেন?’

‘আরেকটু হলেই গেছিলাম। বুবি ট্র্যাপ তৈরি করে রেখেছিল জাপানিরা। যাই হোক, এবার মিস্টার ফ্র্যান্সিসের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করে সব জানাবার সময় হয়েছে,’ বলল রানা।

রানার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল সোহেল। ‘তা হলে ব্যাক টু মেণ্ডানা?’

‘হ্যাঁ, তবে তার আগে রিচার্ডের অফিস।’

বইঘর.কম

'রিচার্ডের অফিস! কেন?'
'আমার পাসপোর্টটা রয়ে গেছে ওখানে।'

আটত্রিশ

সেন্ট্রাল হাসপাতাল, ইসাটাবু। একদিন পর।

আজ রিলিয দেয়া হবে ভাউযাকে। রানা এসেছে এখানে—এ-ক'দিনে হাসপাতালের বিল যা হয়েছে সব চুকিয়ে দিয়ে লোকটাকে পৌঁছে দেবে ওর বাসায়, তারপর অস্ট্রেলিয়ার প্লেন ধরবে। ওখান থেকে ফিরে যাবে বাংলাদেশে। অ্যাডমিরাল হ্যামিল্টন ডেকে পাঠানোয় ইতোমধ্যেই ফিরে গেছে মুরল্যাণ্ড। সোহেলও ফিরে গেছে ঢাকায়।

উদ্ধার করা হয়েছে রাজা শামানের গুপ্তধন। একটা হইচই পড়ে গেছে চারদিকে। বেশি হুলুস্থুল হচ্ছে দুই দৈত্যদেবতাকে নিয়ে। মিডিয়ার সামনে যেতে রাজি হয়নি রানা, ওর বিশেষ অনুরোধে পুরো আবিষ্কারটা ভাউযার কীর্তি হিসেবে চালিয়ে দিয়েছেন ফ্র্যান্সিস, বলেছেন ভাউযার কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই এই সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে রয়্যাল পুলিশ। রানার অনুরোধে সোগাভেরের সঙ্গে দেখা করেছেন তিনি, পুরো গুপ্তধনের বর্তমান বাজারদরের দশ শতাংশের সমপরিমাণ একটা চেক বুঝে নিয়েছেন।

রানাকে দেখে দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে বসল ভাউযা, ক্লান্ত হাসি হাসল। এ-ক'দিনে দাড়িগোঁফের জঙ্গলে ভরে গেছে লোকটার চেহারা, দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় আর অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই করে সুঠাম স্বাস্থ্য হারিয়ে ফেলেছে, শুকিয়ে গেছে।

‘কীভাবে ধন্যবাদ দেব আপনাকে, জানি না,’ বলল সে রানাকে। ‘আমার জীবন বাঁচিয়েছেন, নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করেছেন আমাকে, চিকিৎসার সমস্ত খরচ বহন করেছেন। আপনি একজন নিখাদ ভালোমানুষ, মিস্টার...’

‘মাসুদ রানা।’

‘মিস্টার রানা...’

‘শুধু রানা বললেই হবে। বন্ধুরা আমাকে ও-নামেই ডাকে।’

‘রানা, ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না আমি। যদি করতাম, অন্তর থেকে মঙ্গল কামনা করতাম আপনার। যদি কখনও ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস আসে, সবার আগে আপনার জন্যেই কিছু চাইব।’

‘শুনে ভালো লাগল।’

‘আপনাকে দেয়ার মতো কিছুই নেই আমার। ছিলাম মুক্তোশিকারী, এখন...ল্যাংড়া ফকির বলতে পারেন; পথের ধারে বসে থেকে ভিক্ষা করা ছাড়া আর কোনও উপায় আমার আছে বলে মনে হয় না।’

সুযোগ পেয়ে চেকটা বের করল রানা, বাড়িয়ে ধরল ভাউযার দিকে। ‘কে বলেছে তুমি ফকির? তুমি তো এখন মস্ত বড়লোক!’

ভ্রূ কুঁচকে গেছে ভাউযার, চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে আশ্চর্য হয়েছে সে। হাত বাড়িয়ে চেকটা নিল, টাকার অঙ্ক দেখে আঁৎকে উঠল। ওরেব্বাপ! এত টাকা কীসের? অবাক দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে চেয়ে রইল সে।

রানা বলল, ‘ঘাবড়ে যেয়ো না। শামানের গুপ্তধন উদ্ধার হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে মোট যত টাকা পেয়েছ তার মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট; নিজেদের জন্যে খরচ করবে তোমরা এ-টাকা। এতেই বাড়ি-গাড়ি হয়েও কয়েক কোটি টাকা থাকবে তোমার ব্যাঙ্কে।’ কথার মোড় ঘোরাল রানা, ‘তোমাকে আমার জিপের পেছনের সীটে শুইয়ে দিয়ে ড্রাইভ করছিলাম, একটা মানিবেল্ট বাঁধা ছিল তোমার কোমরে...’

‘হ্যাঁ। কিছুক্ষণের জন্যে জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলাম আমি, জানি

বইঘর.কম

না কেন তখন আপনাকেই একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য লোক বলে মনে হচ্ছিল, বেল্টটা খুলে তাই ফেলে দিই...ভেবেছিলাম...'

'বেল্টটা পেয়েছিলাম আমি। ভেতর থেকে বের হয় একটা মেয়ের ছবি, যেটার উল্টোপিঠে লেখা ছিল নান ম্যাডল।'

'হ্যাঁ, সলোমন সাগরের একজায়গায়...'

'আসলে সলোমন সাগরের যে-জায়গার কথা বললে, সেখানে রাজা শামানের প্রাসাদ কাম মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছিলে তুমি। এবং আমার ধারণা, সেটার ভেতরে ঢুকেছিলে, কিন্তু গুপ্তধন পাওনি। যা-হোক, শেষপর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে ওই সম্পদ; প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ওটার মোট মূল্যের নব্বই শতাংশ পেয়েছে সলোমন দ্বীপপুঞ্জের রাষ্ট্র, বাকিটা তুলে নিয়ে জমা দিয়েছি আমি এএনযেড ব্যাঙ্কে। তোমার নামে। মোট টাকার পাঁচ ভাগ নিজের জন্যে ব্যয় করবে তোমরা, বাকি টাকা দিয়ে তৈরি করবে আধুনিক একটা মাতৃসদন। এজন্যে একটা ফাউণ্ডেশন প্রতিষ্ঠার কাগজপত্র তৈরি হচ্ছে। তুমি আর রেমি আরও কয়েকজনের সহায়তায় চালাবে এই ফাউণ্ডেশন।'

'আমি! আমরা কেন?'

'কারণ কাজটা তোমরাই শুরু করেছ। এবং সেটা করতে গিয়ে পঙ্গুত্ব বরণ করে নিতে হয়েছে তোমাকে, একটা আঙুল কাটা গেছে রেমির।'

আহত দৃষ্টিতে নিজের কাটা পা-টার দিকে তাকাল ভাউযা। 'জানেন, ইচ্ছা করলেই আমার ইনফেকশন ঠেকাতে পারত ওই শকুনি ডাক্তারটা। ইনজেকশন আনাতে পারত সে, ওষুধ দিতে পারত। কিছুই করেনি।'

'কী বলছ!' আশ্চর্য হয়ে গেছে রানা।

'ঠিকই বলছি। অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকার ভান করে ওদের অনেক কথা শুনেছি। আমাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখাটা জরুরি হয়ে পড়েছিল ওদের জন্যে। ভেলর ছিল এই হাসপাতালের চীফ মেডিকেল অফিসার, ওর কথার ওপর কথা বলার মতো কেউ ছিল

না এখানে। ইচ্ছা করে সময় নষ্ট করেছে সে, ইনফেকশন হতে দিয়েছে, তারপর সুযোগ বুঝে পা-টা কেটে ফেলেছে যাতে আরও কিছুদিন নিজের কব্জায় রাখতে পারে—যাতে পুলিশ বা সাংবাদিক বা অন্য কারও সঙ্গে কথা বলতে না পারি আমি।'

চুপ করে থাকল রানা, ভেলরের এই শয়তানি চালটা কল্পনাও করতে পারেনি ও।

'ওই ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পেয়েছিলাম আমি, সেটা ছিল আমার দোষ। আমার হবু শালা ইটে হারিয়ে গিয়েছিল, ওকে খুঁজতে রেইন ফরেস্টে গিয়ে ঢুকেছিলাম, পেয়ে গিয়েছিলাম ওদের আস্তানার সন্ধান—সেটাও ছিল আমার দোষ। জাল টাকার কারখানা খুলে বসেছিল ওরা ওই বাড়ির একটা ঘরে, সেখান থেকে কিছু নোট চুরি করে নিয়ে পালানোর সময় ওদের একজন দেখে ফেলে আমাকে, মাচেটি নিয়ে তাড়া করে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে বাকিরাও। প্রাণ বাঁচাতে কোন্‌দিকে যে ছুট লাগাই তা নিজেও জানি না আমি। ইচ্ছা ছিল যেভাবেই হোক হাজির হব পুলিশ কমিশনারের কাছে, প্রমাণসহ ধরিয়ে দেব অপরাধীদের, কিন্তু...মানুষ ভাবে এক, হয় আর।'

'শেষপর্যন্ত ছত্রখান হয়ে গেছে দলটা। মারা পড়েছে ওদের অনেকে। মারা পড়েছে এমনকী ভেলরও। বিচার্ড...চেনো বোধহয় লোকটাকে...মরেছে বজ্রপাতে।'

'বাজ পড়ে মরেছে রিচার্ড?' খ্যাপাটে ভঙ্গিতে হা হা করে হেসে উঠল ভাউযা। 'ভালো হয়েছে। খুব ভালো হয়েছে। উচিত শাস্তি পেয়েছে ব্যাটা। জানো, লোকটা নিজের হাতে গুলি করে মেরেছে ইটেকে। যখন পাহারা দিচ্ছিল আমাকে হাসপাতালে, তখন একদিন কথাটা নিজের মুখে বলেছে।' আবারও হেসে উঠল হা হা করে। 'খুব ভালো হয়েছে।' হাসির শেষে চোখের পানি মুছল।

'মনে হয় কিছু একটা অভিশাপ সত্যিই আছে,' বলল রানা, 'যারাই লোভ করেছে ওই গুপ্তধনের ওপর, তারাই হয় খুন হয়ে

গেছে, নয়তো মারা গেছে দুর্ঘটনায়, নিদেনপক্ষে পঙ্গু হয়েছে।'

'রেমি কোথায়?'

মেয়েটা কোথায়, বলল রানা।

'ওকে দেখব আমি,' যেন তর সহ্য হচ্ছে না, এমন ভঙ্গিতে বলল ভাউযা। 'এখনই সম্ভব?'

একটা হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা করা হলো ওর জন্যে, একজন নার্স সেটা ঠেলে ভাউযাকে নিয়ে গেল রেমির কাছে।

যেন একযুগ পর দেখা হয়েছে, এমনভাবে একজন আরেক-জনকে জড়িয়ে ধরল হবু স্বামী-স্ত্রী; খুশিতে অথবা অন্য যে-কোনও কারণেই হোক কাঁদছে ওরা, কাঁদতে কাঁদতেই চুমু খাচ্ছে পরস্পরকে।

উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একটুখানি কেশে উঠে রানা বলল, 'আমার যে কিছু কথা বলার ছিল?'

ওর দিকে তাকাল ভাউযা আর রেমি, চোখ মুছছে দু'জনেই।

রানা বলল, 'যাওয়ার আগে দুটো কথা। রেমি, লেখাপড়াটা শেষ করো। আর তোমার জন্যে একটা কৃত্রিম প্রস্থেটিক পায়ের অর্ডার দিয়েছি, ভাউযা। ওটা পরলে টেরই পাবে না তোমার পায়ে কোনও অসুবিধা আছে। আমি চাই মুক্তোশিকার চালিয়ে যাবে তুমি। পরেরবার যখন আসব ইসাটাবুতে, বড়সড় একটা মুক্তোর-মালা কিনে নিয়ে যাব তোমার কাছ থেকে।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল ভাউযা আর রেমি, আবারও ছলছল করছে দু'জনের চোখ।

'আর, রেমি, পরেরবার ইসাটাবুতে এসে ব্যস্ত দেখতে চাই আমি তোমাকে ম্যাটার্নিটি ক্লিনিকটাতে।'

হাসল রানা ওদের দিকে চেয়ে, মাথা ঝাঁকাল, তারপর ভাউযা বা রেমিকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ঘুরে চলে এল রিসিপশন কাউন্টারে, দু'জনের চিকিৎসাখরচ চুকিয়ে দিল। এবার নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে হবু স্বামী-স্ত্রী। রানাও।

হোটেলে যখন ফিরছে রানা, তখন মনে পড়ে গেল, রেমির

কাছ থেকে জানা হয়নি, ওকে মিথ্যা কথা বলেছিল কেন মেয়েটা। থাক, ভাবল রানা, সবই তো মীমাংসা হয়ে গেছে, এই একটা প্রশ্নের জবাব না পেলে কী আর হবে।

অসহায় মেয়েটা যদি রানার কাছ থেকে কোনও সুবিধা পাওয়ার আশায় মিথ্যা বলে থাকে, মহাপাপ করেনি নিশ্চয়ই?

ঊনচল্লিশ

পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগেই মারা গেছে ভেলর, এবং ব্যাপারটা খুব কাজে দিয়েছে পামারের জন্য। মৃত ব্যক্তির নামে অভিযোগপত্র দায়ের করেনি রয়্যাল পুলিশ, তাই ঠিক কার সঙ্গে যোগসাজশ করে আন্তর্জাতিক অপরাধে জড়িত ছিল পামার, নিশ্চিত হতে পারেনি আদালত। পামারের বিরুদ্ধে আনীত মানি লণ্ডারিং-এর অভিযোগ, মিস্টার পার্কিন্সনের যুক্তির তোপের সামনে, স্রেফ উড়ে গেছে। কিন্তু ওর বিরুদ্ধে ট্রেস করা মোবাইল কল রেকর্ডগুলো ছিল ওর বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ, সেগুলো যখন উপস্থাপিত হলো আদালতের সামনে, শুধু পামারই না, ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেলেন মিস্টার পার্কিন্সনও।

হত্যা এবং হত্যা প্রচেষ্টার সঙ্গে পরিকল্পনাকারী এবং মদদদাতা হিসেবে পামারের জড়িত থাকার অভিযোগটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হতে গিয়েও হলো না শেষপর্যন্ত। কারণ সলোমন দ্বীপপুঞ্জের প্রধানমন্ত্রী সোগাভের, বিদেশি সাহায্য-সহযোগিতা বন্ধ হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায়, সরাসরি বলেছেন, দ্য মিউটিনিয়ার্সের সকল কর্মকাণ্ড ছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনা, এবং সেগুলো অভ্যুত্থান ঘটাতে চাওয়া গুটিকয়েক ইসাটাবুর-

নাগরিকেরই দিবাস্বপ্নের বহিঃপ্রকাশ; সেসবের সঙ্গে কোনও বিদেশি রাষ্ট্রের কোনও বিদেশি নাগরিকের কোনও রকম যোগাযোগ ছিল না।

ত্রুটিপূর্ণ অভিযোগপত্রের কথা, যেমনটা আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মিস্টার পার্কিন্সন, বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয় আদালতে, এবং সেটা গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন মাননীয় বিচারক।

আর নোট জাল করার অভিযোগের ব্যাপারে, রবিন্স নিজেই জানত, হালে পানি পাবে না সে।

সব মিলিয়ে আরেকটু হলে বেকসুর খালাস পেয়ে যাচ্ছিল পামার, কিন্তু সেটাও হলো না শেষপর্যন্ত, কারণ আদালতের অনুমতি নিয়ে বিশেষ একজন সাক্ষীকে পামারের বিরুদ্ধে হাজির করাল রবিন্স।

জেসিকা।

আদলতকক্ষে একটা বর্ণও মিথ্যা বলল না মেয়েটা, বাড়িয়েও বলল না কিছু, যা বলল তা শুনে মাথায় হাত দিতে বাধ্য হলেন মিস্টার পার্কিন্সন, ওদিকে পামার টের পেল, তীরে এসে তরী ডুবে গেছে ওর।

পামারের বিরুদ্ধে আমৃত্যু কারাদণ্ডের রায় পড়ে শোনালেন বিচারক।

রানা সেদিন উপস্থিত ছিল আদালতকক্ষে, এককোনায় চুপচাপ বসে সব শুনল ও, পরে আদালত থেকে বের করে নিয়ে যখন প্রিযনভ্যানে তোলা হচ্ছে পামারকে, কাছ থেকে দেখল লোকটাকে। ভালোই হলো, ভাবল ও, আইনই পরিণতি নির্ধারণ করে দিল লোকটার। তা না হলে হয়তো বিকল্প কিছু করতে হতো রানাকে, যা বাধ্য না হলে কখনওই করতে চায় না ও।

ধীর পায়ে হাঁটছে রানা ফুটপাথ ধরে, একসময় মিশে গেল জনতার ভিড়ে।

***